



INTERMEDIATE BENGALI SELECTIONS

**INTERMEDIATE
BENGALI SELECTIONS**

080
Cu
370



FOURTH EDITION
(*Thoroughly Revised and Enlarged*)

**PUBLISHED BY THE
UNIVERSITY OF CALCUTTA
1933**



1st Edition, 1924--F

2nd Edition, 1925--I.

3rd Edition, 1930--J

4th Edition, 1933--I

GS 2293

TSCU 2136

PRINTED BY BHOPENDRALAL BANERJEE

AT THE CALCUTTA UNIVERSITY PRESS, SENATE HOUSE, CALCUTTA.

Reg. No. 781B--Aug., 1933--I.

ভূমিকা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট সভার অনুরোধমত এই রচনা-সংগ্রহ প্রকাশিত হইল। কিন্তু আজ আমাদের বিশেষ দুঃখ এই যে, বাহার আগ্রহে, যত্নে ও উৎসাহে এই সংগ্রহ-কার্য আরম্ভ হইয়াছিল, আমরা তাঁহাকে ইহা দেখাইতে পারিলাম না।

রচনা-সংগ্রহের বিশেষ সুবিধা এই যে, ইহার ভিতর দিয়া ছাত্রগণের প্রখ্যাত-নামা লেখকগণের বিশেষ বিশেষ লেখার সহিত সহজেই পরিচয় ঘটে এবং তাঁহাদের অগাধ রচনা পড়িবার আকাঙ্ক্ষা তাহাদের মধ্যে স্বতঃই সঞ্চারিত হয়। তদ্বিন্ন, একই পুস্তকে নানা বিনয়িনী রচনার সমাবেশ থাকায় ভাব-সম্পাদ-বুদ্ধিরও বিশেষ সুবিধা ঘটে। এই উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই রচনা-সংগ্রহ সম্পাদিত হইল। ইহাতে বঙ্গ-সাহিত্যের বিখ্যাত লেখকগণের রচনা যথাসম্ভব মুদ্রিত হইয়াছে এবং কয়েকটি রচনার এমন অংশ প্রদত্ত হইয়াছে যে, উক্ত রচনাগুলি পাঠকালে যেন মূল পুস্তক পড়িবার স্পৃহা জাগরিত হয়।

পরিশেষে এই পুস্তকে যে সমস্ত রচনা গৃহীত হইয়াছে, তজ্জন্য যে সমস্ত স্বত্বাধিকারী আমাদিগকে রচনাগুলি প্রকাশের অনুমতি দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমরা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।



সূচীপত্র

গদ্যাংশ

রচয়িতা ও বিষয়	যে পুস্তক হইতে গৃহীত	পত্রাঙ্ক
তারানাথকর তর্করত্ন—		
কাদম্বরী—বৈশম্পায়ন ...	কাদম্বরী ৫১ ...	১
অক্ষয়কুমার দত্ত—		
রাজা রামমোহন রায় ...	ভারতবর্ষীয় উপাসক- সম্প্রদায় ...	১৫
মিত্রতা ...	চাকরাঠি, ওর ভাগ...	২৪
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর		
সীতার বনবাস—		
অখমেধ যজ্ঞ ...	সীতার বনবাস ...	৩৮
ভূদেব মুখোপাধ্যায়—		
জাতীয় ভাব ...	সামাজিক প্রবন্ধ ...	৪৯
রাজনারায়ণ বসু—		
সেকাল আর একাল ...	সেকাল ও একাল ...	৫৪



৮

সূচীপত্র — গজাংশ

রচয়িতা ও বিষয়

যে পুস্তক হইতে গৃহীত

পত্রাঙ্ক

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—

কাকা	...	কমলাকান্তের দপ্তর	৬৪
আমার ছুগোংসব ✓	...	ঐ	৬৯
ললিতগিরি ৬০	...	সীতারাম	৭৩
গোড়েশ্বর	...	মৃণালিনী	৭৯
কুসুমনির্মিতা			
দেবীপ্রতিমা	...	ঐ	৮৮

অক্ষয়চন্দ্র সরকার—

গৃহস্থালি	...	সাহিত্য-সাধনা	৮৯
-----------	-----	---------------	----

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়—

অশানে	...	উদ্ভাসপ্রেম	১০৪
-------	-----	-------------	-----

রাজকুমার মুখোপাধ্যায়—

সত্যতা	...	নানা প্রবন্ধ	১১১
--------	-----	--------------	-----

রমেশচন্দ্র দত্ত—

হলধোখাটার ঘুক ✓	...	রাজপুত্র জীবন-সন্ধ্যা	১২২
বিজ্ঞানসাগর	...	—	১২৭

কালীপ্রসন্ন ঘোষ—

অশ্রু	...	নিহৃত-চিত্রা	১৩৭
-------	-----	--------------	-----



সূচীপত্র—গত্যাংশ

৯

রচয়িতা ও বিষয়	যে পুস্তক হইতে গৃহীত	পত্রাঙ্ক
রজনীকান্ত গুপ্ত—		
দিল্লীর অস্তাগার	সিপাহীবৃদ্ধের ইতিহাস, ২য় ভাগ	১৪৩
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—		
বুদ্ধচরিত	বৌদ্ধ ধর্ম	১৪৮
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—		
মহাকাব্যের লক্ষণ	নানী কথা	১৫৬
অমঙ্গলের উৎপত্তি	জিজ্ঞাসা	১৬৪
অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়—		
সেকালের স্মৃতিচারণ	সিরাজুল্লা	১৭১
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—		
বিখ্যামিত্রের পতন	বাগ্মণিকর জয়	১৭৯
শ্রীমতী বিবেকানন্দ—		
অদেশ-মন্ত্র	—	১৮৮
সঙ্গ-সাগর-সঙ্গমে	পরিভ্রমক	১৮৫
বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর—		
ভক্ত উৎসব	গ্রন্থাবলী	১৯০
অশ্রুজল	ঐ	১৯২

রচয়িতা ও বিষয়

যে পুস্তক হইতে গৃহীত

পত্রিক

সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়—

জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি	জাতীয় সাহিত্য	...✓	২০৫
-------------------------	----------------	------	-----

জগদীন্দ্রনাথ রায়—

তাজমহল	...	শ্রুতি-স্মৃতি (মানসী ও মর্মান্বিত)	...	২১৬
--------	-----	------------------------------------	-----	-----

যোগীন্দ্রনাথ বসু—

ডিরোজিয়ো ও তৎকালীন ✓

শিক্ষা	...	মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত	...	২৩০
--------	-----	---------------------------------	-----	-----

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—

বিলাতের স্মৃতি	...	জীবন-স্মৃতি	...	২৪২
----------------	-----	-------------	-----	-----

স্বদেশী সমাজ	...	বঙ্গদর্শন (নব পর্যায়)	...	২৫৩
--------------	-----	------------------------	-----	-----

বিশ্ববিদ্যালয়	...	শিক্ষার বিকিরণ	...	২৬২
----------------	-----	----------------	-----	-----

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন—

লক্ষণ	...	রামায়ণী কথা	...	২৭৩
-------	-----	--------------	-----	-----

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—

লাঠিঘাল আকবর	...	পল্লীসমাজ	...	২৯৩
--------------	-----	-----------	-----	-----

বৃন্দাবনের পাঠশালা	...	পণ্ডিত মশাই	...	২৯৭
--------------------	-----	-------------	-----	-----

শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ—

কমার আদর্শ	✓...	ধর্ম (পাক্ষিক পত্র)	...	৩০৮
------------	------	---------------------	-----	-----



রচয়িতা ও বিষয়

যে পুস্তক হইতে গৃহীত

পত্রাঙ্ক

শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র রায়—

বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান ... ২য় বঙ্গীয় সাহিত্য-
সম্মিলনের সভাপতির
অভিভাষণ ... ৩১২

শ্রী ধগেন্দ্রনাথ মিত্র—

দুঃখ ... দুঃখ দুঃখ ... ৩২৪

অজিতকুমার চক্রবর্তী—

বাংলা সাহিত্যে দেবেন্দ্র-
নাথের স্থান ... মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ
ঠাকুর ... ৩৩০

শ্রী গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী—

বাঙ্গলার রূপ ... বাঙ্গলার রূপ ... ৩৩৬



পাঠ্যংশ

রচয়িতা ও বিনয়	যে পুস্তক হইতে গৃহীত	পত্রাঙ্ক
চণ্ডীদাস—		
পূৰ্ব্বরাগ বৈষ্ণব পদাবলী (বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত) ...	৩
বিজ্ঞাপতি—		
বিরহ ঐ ...	৪
বৃন্দাবনদাস—		
গৌরচন্দ্রিকা ঐ ...	৫
কাশীরাম দাস—		
সমুদ্রযত্নে শিব	... বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়, ১ম ভাগ (বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত) ...	৬
দৈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত—		
স্বদেশ কবিতা-সংগ্রহ ...	১৫



সূচীপত্র—পঞ্চাংশ

১৩

রচয়িতা ও বিষয়	যে পুস্তক হইতে গৃহীত	পৃষ্ঠা
মাইকেল মধুসূদন দত্ত		
বঙ্গভাষা ...	চতুর্দশপদী	
	কবিতাবলী ...	১৮
প্রমীলার চিত্ররোহণ	মেঘনাদবধ-কাব্য	১৯
বসন্তে .	ব্রজাঙ্গনা-কাব্য	২৯
সীতা ও সরমা ...	মেঘনাদবধ-কাব্য	৩০
হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় -		
ভারতসঙ্গীত	কবিতাবলী	৪০
• বৃহৎসংহার—কল্প-		
• পীড়ের বাত্রা - ...	বৃহৎসংহার ১।	৪৭
বিহারীলাল চক্রবর্তী		
হিমালয় ...	✓ সারদা-মঙ্গল	৬৩
গোবিন্দচন্দ্র রায়—		
যমুনা-লহরী	...	৬৮
নবীনচন্দ্র সেন —		
সিদ্ধান্তট ...	প্রভাস ...	৭৫
গিরিশচন্দ্র ঘোষ		
পাণ্ডব-গোরব ...	পাণ্ডব-গোরব ...	৭৭
সিদ্ধার্থের বৈরাগ্য ...	বুদ্ধদেব ...	৮৪
কাদম্বিনী .	কবিতা ও গান .	৯১



রচয়িতা ও বিষয়	যে পুস্তক হইতে গৃহীত	পত্রাঙ্ক
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—		
দেবতা-ভিখারী ...	গান .	৯৫
প্রতিমা ...	ঐ .	৯৬
অদেশ আহার ...	ঐ	৯৮
চিত্তরঞ্জন দাশ—		
অন্তর্যামী	—	৯৯
রজনীকান্ত সেন—		
সেথা আমি কি গাহিব		
গান ...	বাণী	১০০
সৃষ্টির বিশালতা ..	অভয়া .	১০১
গোবিন্দচন্দ্র দাস—		
অতুল ...	কঙ্করী .	১০২
দেবেন্দ্রনাথ সেন—		
ভাষাস্বী বধাশুন্দরী ..	কাব্য-দীপালি ..	১০৬
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—		
ভক্তবৎসল ভগবান্ ...	নবরত্ন-মালা ..	১০৮
সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর—		
শেষ ..	কাব্য-দীপালি ...	১১০



রচয়িতা ও বিবরণ

যে পুস্তক হইতে গৃহীত

পত্রিক

অমৃতলাল বসু—

বিজয়া	✓ বঙ্গবাণী (মাসিক পত্রিকা)	...	১১২
--------	-----	-----	----------------------------	-----	-----

রমণীমোহন ঘোষ—

অতিথি	কাব্য-দীপালি	...	১১৬
-------	-----	----	--------------	-----	-----

অক্ষয়কুমার বড়াল—

মানব-বন্দনা	✓	...	সাহিত্য (মাসিক পত্র)	✓	১১৯
-------------	---	-----	----------------------	---	-----

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত—

নমস্কার	কাব্য-সঞ্চয়ন	...	১২৬
বুদ্ধ-পূর্ণিমা	ঐ	...	১২৭
বৈকালী	ঐ	...	১৩০

যোগীন্দ্রনাথ বসু—

আজমীর	পৃথ্বীরাজ	...	১৩৭
-------	----	-----	-----------	-----	-----

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর -

ভারতলক্ষী	...	✓	স্বদেশ	...	১৪০
ভাষ্যমহল	...	✓	বলাকা	...	১৪১
শতবর্ষ পরে	চিত্রা	...	১৪৮
সার্থক বেদনা	গীতিমালা	...	১৫১
জন্মান্তর	ক্ষণিকা	...	১৫২



রচয়িতা ও বিষয়	যে পুস্তক হইতে গৃহীত	পত্রাঙ্ক
সাধনা ...	চিত্রা	১০৪
পদ্মা ...	চৈতালি	১০৮
গানভঙ্গ ...	সোনার তরী	১৬০
হৃদয়-চন্দ্র ...	চৈতালি	১০৭

শ্রী কামিনী রায়

আলোকে	আলো ও ছায়া	১৬৯
মুখ ...	ঐ	১৭০

শ্রী যতীন্দ্রমোহন বাগচী--

অন্ধ বধূ	নাগকেশর	১৭৬
শুবরোর প্রতীকা	প্রবাসী (মাসিক পত্রিকা) ...	১৭৯

শ্রী কালিদাস রায়—

লালাবাবুর লীকা	ব্রজবেণু	১৮৬
সিন্ধু-বিদ্যার	পঞ্চপুট, ২য় খণ্ড	১৯০

শ্রী অতুল প্রসাদ সেন -

মাধবী	কাকলি	১৯৪
যেথের দল	স্মৃতিওজ	১৯৫
হৃদ-বধূনা	ঐ	১৯৬

শ্রী মানকুমারী বসু—

বর্ষা-স্মরণী	কাব্যকুসুমালি	১৯৭
--------------	---------------	-----

রচয়িতা ও বিষয়

যে পুস্তক হইতে গৃহীত

পত্রাঙ্ক

নজরুল ইসলাম—

দারিদ্র্য ...

... সঙ্কিতা ...

২০২

শ্রীপ্রিয়সদা দেবী—

সামান্য ...

কাব্য-দীপালি ...

২০৭

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত—

গলাস্তোত্র ...

বরশিখা ...

২০৮

বন্দে আলী মিয়া—

প্রিয়া ...

কাব্য-দীপালি ...

২১০

হুমায়ূন কবির—

পথিক ...

সাধী ...

২১৩



গীতাংশ



INTERMEDIATE BENGALI SELECTIONS

কাদম্বরী-বৈশম্পায়ন

শূদ্রক নামে অসাধারণ দীপ্তিসম্পন্ন অতিবদান্ত মহাবল পরাক্রান্ত অশেষ-গুণশালী এক নরপতি ছিলেন। বিদিশা নামী তাঁহার রাজধানী উন্নতকলহংস-কোলাহল-মুগরিত বেগবতী বেত্রবতী নদীর কূলে অবস্থিত ছিল। রাজা নিজ বাহুবলে ও পরাক্রমে অশেষ দেশ জয় করিয়া সমাগরা ধরায় আধিপত্য স্থাপন-পূর্বক সুখে ও নিকষেগচিত্তে কাব্য-ইতিহাস, সম্রীত-আলেখ্য ইত্যাদির আলোচনা ও সমাজ্যভোগ করিতেছিলেন। একদা রাজা প্রাতঃকালে অমাত্য কুমারপালিত ও অজ্ঞাত রাজকুমারের সহিত সভামণ্ডপে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে বিখ্যতরঙ্গিত চন্দনলতার স্তায় ভীষণ-রমণীয়া, অঙ্গনাঙ্গনবিক্রম ক্রীড়াশুধারিনী, শরৎ-লক্ষীর স্তায় কলহংসগুণবসনা, এবং বিদ্যাবনভূমির স্তায় বেত্রলতাবতী প্রতীহারী আসিয়া ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া কৃতাজলিপুটে নিবেদন করিল, “মহারাজ! দক্ষিণাপথ হইতে এক চণ্ডালকন্যা আসিয়াছে। তাহার সমভিব্যাহারে এক শুকপক্ষী। সে বলিতেছে, ‘মহারাজ সকল রত্নের আকর, অতএব এই পক্ষিরত্ন



তাঁহার পাদপদ্মে সমর্পণ করিতে আসিরাছি ।’ সেই চণ্ডালকন্যা ঘারে দণ্ডায়মানা আছে, অমুমতি হইলে আসিরা পাদপদ্ম দর্শন করে ।”

রাজা প্রতীহারীর বাক্য শুনিয়া সাতিশয় কোড়ুকাবিষ্ট হইলেন এবং সমীপবর্তী সভাসদগণের মুখাবলোকনপূর্ব্বক কহিলেন, “হানি কি, লইয়া আইস ।” প্রতীহারী “বে আজ্ঞা,” বলিয়া চণ্ডালকন্যাকে সঙ্গে করিয়া আনিল চণ্ডালকন্যা অমলমণিকুন্ঠিমস্থ সভামণ্ডপে প্রবেশ করিয়া দেখিল উপরে অনতিবৃহৎ মনোহর চন্দ্রাতপ, তাহার অমলভূত হৃকূলবিতান কনকশৃঙ্খলনির্ম্মিত চারি মণিদণ্ডে বিবৃত রহিয়াছে, চন্দ্রাতপের চতুর্দিকে স্থল মুক্তাকলাপ মালার ত্রায় শোভা পাইতেছে, নিম্নে রাজা বিবিধ স্বর্ণময় অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া মণিময় সিংহাসনে বসিয়া আছেন, তাঁহার বামপদ স্রোত্মগাণ্ডন দ্ব্যটিক পাদপীঠে বিস্তৃত রহিয়াছে, অমৃতফেনের ত্রায় লঘু ভূত পরিধেয় হৃকূলবসনের প্রান্তে গোরোচনা অঙ্কিত হংস-মিথুন কনকদণ্ডযুক্ত চামরের বাতাসে প্রনত্বিত হইতেছে ; যন্তকে আয়োদিত মালতীমালা, যেন উষাকালে অন্তাচলশিখর তারকাপুঞ্জ বিক্ষিপ্ত, সমাগত রাজগণ চতুর্দিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন । অন্তান্ত পর্ব্বতের মধ্যগত হইলে কনকশিখর স্রমেকর বেক্রপ শোভা হয়, রাজা সেইরূপ অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়া সভামণ্ডপ উজ্জ্বল করিতেছেন । চণ্ডালকন্যা সভার শোভা দেখিয়া অতিশয় চমৎকৃত হইল এবং নৃপতিকে অনন্তমনা করিবার ইচ্ছায় রক্তকুবলয়দল কোমল করস্থিত বেণুবৃষ্ট-হার্য্য মণিময় সভাকুন্ঠিমে এক বার আঘাত করিল । তাহাতে চণ্ডালকন্যার হস্তস্থিত রত্নবলয় বাজিয়া উঠিল । তালফল পতিত হইলে অরণ্যচারী হস্তিবৃদ্ধ যেমন সেইদিকে



দৃষ্টিপাত করে, বেণুঘটির শব্দ শুনিবামাত্র সেইরূপ সকলের চক্ষু রাজার মুখমণ্ডল হইতে অপসৃত হইয়া সেইদিকে প্রসৃত হইল।

রাজাও সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, অগ্রে একজন পলিতকেশ ব্যায়ামপুটেশ্বরীর বৃদ্ধ, পশ্চাতে স্বর্ণশলাকানিস্মিত-পিঞ্জরহস্তে কাকপক্ষধারী একটি বালক এবং মধ্যে এক পরমা সুন্দরী অচিরোদ্বিগ্নবোধনা কুমারী আসিতেছে। সেই কুমারী সকারিণী হস্তনৌলমণিনির্মিত পুস্তলিকার ভ্রায়, তাহার সর্ভশরীর আঙুলফলিত নীল কঙ্ক-দ্বারা আবৃত, তাহার উপর রক্তাংগুরচিত্ত অবলম্বন যেন নীলোৎপলের উপর সন্ধ্যার লোহিত-লাবণ্য। সে নিদ্রার মত লোচনগ্রাহিণী, অশরীরিকের মত স্পর্শবর্জিতা, চিত্র-লিখিতার মত শুধু দর্শনীয়, সূক্ষ্মতার ভ্রায় মনোহরা। কস্তার এরূপ রূপলাবণ্য যে, কোন ক্রমেই তাহাকে চণ্ডালকস্তা বলিয়া বোধ হয় না। রাজা তাহার নিকমম সৌন্দর্য্য ও অসামান্ত সৌকুমার্য্য অনিমেষলোচনে অবলোকন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। ভাবিলেন, বিধাতা বুঝি হীনজাতি বলিয়া ইহাকে স্পর্শ করেন নাই,—যনে মনে করনাই করিয়াই ইহার রূপলাবণ্য নিষ্কাশন করিয়া থাকিবেন। তাহা না হইলে এরূপ রমণীয় কাস্তি ও এরূপ অলৌকিক সৌন্দর্য্য কিরূপে হইতে পারে? যাহা হউক, চণ্ডালের গৃহে এরূপ সুন্দরী কুমারীর সমুদ্ভব নিতান্ত অসম্ভব ও আশ্চর্য্যের বিষয়। এইরূপ ভাবিতেছিলেন, এমন সময়ে কস্তা সগুণে আসিয়া বিনীতভাবে প্রণাম করিল। বৃদ্ধ পিঞ্জর লইয়া কুতাজলিপুটে সমুখে দণ্ডায়মান হইয়া বিনয়-বচনে নিবেদন করিল,—“মহারাজ! পিঞ্জরহিত এই শুক সকল শাস্ত্রে পারদর্শী, রাজনীতি-প্রয়োগ-বিষয়ে বিলক্ষণ নিপুণ, সঙ্গতা, চতুর, নৃত্যগীতচিত্র প্রভৃতি সকলকলাভিজ্ঞ, কাব্য-



নাটক-ইতিহাসের মর্মজ্ঞ ও গুণগ্রাহী। যেসকল বিজ্ঞা মনুষ্যেরাও অবগত নহেন, তৎসমুদায় ইহার কণ্ঠস্থ। ইহার নাম বৈশম্পায়ন। ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত নরপতি অপেক্ষা আপনি বিদ্বান্ ও গুণগ্রাহী। এই নিমিত্ত আমাদের স্বামি-তুহিতা আপনার নিকট এই শুকপক্ষী আনয়ন করিয়াছেন। অমুগ্রহপূর্বক গ্রহণ করিলে ইনি আপনাকে চরিতার্থ বোধ করেন।” এই বলিয়া সম্মুখে পিঙ্গর রাখিয়া সে কিঞ্চিৎ দূরে দণ্ডায়মান হইল।

পিঙ্গরমধ্যবর্তী শুক দক্ষিণ চরণ উন্নত করিয়া অতি স্পষ্টবাক্যে “মহারাজের জয় হউক” বলিয়া আশীর্বাদ করিল। রাজা শুকের মুখ হইতে অর্থযুক্ত স্পষ্ট স্বমধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্মিত ও চমৎকৃত হইলেন। অনন্তর কুমারপালিতকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “দেখ অমাত্য। পক্ষিজাতিও স্পষ্টরূপে বর্ণোচ্চারণ করিতে ও মধুরস্বরে কথা কহিতে পারে। আমি জানিতাম পক্ষী ও পশুজাতি কেবল আহার, নিদ্রা, ভয় প্রভৃতিরই পরতন্ত্র, উহাদিগের বুদ্ধিশক্তি অথবা বাক্যশক্তি কিছুই নাই। কিন্তু শুকের এই ব্যাপার দেখিয়া অতি আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে। প্রথমতঃ, ইহাই আশ্চর্য্য যে, পক্ষী মনুষ্যের মত কথা কহিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, আশীর্বাদ-প্রয়োগের সময় ত্রাকণেরা যেরূপ দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া আশীর্বাদ করেন, শুকপক্ষীও সেইরূপ দক্ষিণ চরণ উন্নত করিয়া বর্ণাবিহিত আশীর্বাদ করিল। কি আশ্চর্য্য! ইহার বুদ্ধি এবং মনোবৃত্তিও মনুষ্যের মত দেখিতেছি।”

রাজার কথা শুনিয়া কুমারপালিত কহিলেন, “মহারাজ! পক্ষিজাতি যে মনুষ্যের জায় কথা কহিতে পারে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। লোকেরা শুক শারিকা প্রভৃতি পক্ষীদিগকে



প্রযত্নাতিশয়-সহকারে শিক্ষা দেয় এবং উহারও পূর্কজন্মার্জিত সংস্কারবশতঃ অন্যায়সে শিথিতে পারে।” এই কথা কহিতে কহিতে সভাভঙ্গস্থচক মধ্যাহ্নকালীন শঙ্খধ্বনি হইলে সমগ্র সভা চঞ্চল ও মুগ্ধ হইয়া উঠিল। জ্ঞানসময় উপস্থিত দেখিয়া নরপতি সমাগত রাজাদিগকে সম্মানস্থচক বাধ্যপ্রয়োগ-দ্বারা সম্বোধন করিয়া বিদায় করিলেন, চণ্ডালকন্যাকে বিশ্রাম করিতে আদেশ দিলেন এবং তাৎক্ষণিকরূপে বাহিনীকে কহিলেন, “তুমি বৈশাল্যায়নকে অন্তঃপুরে লইয়া যাও ও জ্ঞান ভোজন করাইয়া দাও।”

তৎপরে আপনি সিংহাসন হইতে গাত্রোথান করিলেন, ইহাতে তাঁহার কপটাম ঢলিয়া উঠিল, উত্তরীয় বস্ত্র হইতে পিঙ্গলবর্ণ কুমুদচূর্ণরেণু অলিত হইয়া পড়িতে লাগিল, কর্ণোৎপল ঢলিয়া ঢলিয়া গণ্ডমূল স্পর্শ করিতে লাগিল। চামরগ্রাহিনী বারবিলাসিনীগণ স্বক্কেদে চামর ফেলিয়া সমস্তমে সরিয়া যাইতে তাহাদের মণিনুপুর কমল মধুপানমন্ত্র-কলহংসনাদের মত বাজিয়া উঠিল, চারি দিকে সকলে প্রণত হইল।

রাজা কতিপয় সূত্র-সমভিব্যাহারে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া ভূষণ ও পরিচ্ছদ গুলিয়া ফেলিয়া চক্রতারকানুজ গগনের মত শোভমান হইলেন। ব্যাভামের উপকরণসমূহ সমাজিত হইলে সমবয়স্ক রাজকুমারগণের সহিত ক্রিয়াকাল ব্যায়াম করিলেন। তখন পরিজনসকল সান্নিপাতকরণ সমাহরণের জন্ত সজ্জ হইয়া উঠিল এবং অন্ন লোকের সহর ইত্যন্তঃ গমনাগমনে রাজভবন জনাকীর্ণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

জ্ঞানাগারে সিতবিতান প্রলম্বিত রহিয়াছে ; পরিচারিকাসকল মণ্ডলাকারে অপেক্ষা করিতেছে ; ফাটিক সান্নিপাত পাতা আছে ;



তাহার পার্শ্বে অতিশূরভি-গন্ধ-সলিলপূর্ণ স্নানকলস সকল সজ্জিত ; পরিমলারুচি ভ্রমরকুল কলসমুখ অঙ্ককার করিয়া উড়িতেছে, যেন আতপভয়ে কলসমুখ নীলবস্ত্রে আবৃত রাখা হইয়াছে ; মধ্যস্থলে গন্ধোদকপূর্ণ কনকময় জলদ্রোণী বহিয়াছে ।

রাজা স্নানগৃহে প্রবেশ করিয়া ফাটিক পীঠে উপবেশন করিলেন । বারবিলাসিনীগণ তাহার মস্তকে সুগন্ধি আমলক লেপন করিয়া দিল । তখন রাজা জলদ্রোণীতে অবতরণ করিলেন এবং বারগোবাগণ বকের অকল আকর্ষণপূর্ব্বক কটিদেশে নিবিড়-নিবদ্ধ করিয়া হস্ত ও চরণবলয় উক্কে সমুৎসারিত করিয়া, অলকদাম কর্ণপাণে সরাইয়া, স্নানকলস লইয়া চারি দিক্ হইতে রাজাকে অভিব্যেক করিতে উপস্থিত হইল ।

রাজা দ্রোণীসলিল হইতে উঠিয়া রাজহংসগুহ ফাটিক পীঠে দাঁড়াইলেন । তখন কেহ বা মরকতকলস হইতে, কেহ বা ফাটিক কলস হইতে চন্দনরসমিশ্র জল রাজার মস্তকে ঢালিয়া দিল ; কেহ রক্তকলসের পার্শ্বদেশে হস্তপল্লব-বিছাস-দ্বারা কলস উত্তোলিত করিয়া তীর্থসলিলদ্বারা বর্ষণ করিল, যেন রক্তনৌ পূর্ণচন্দ্র-মণ্ডল হইতে জ্যোৎস্নাদ্বারা ঢালিয়া দিল ; কেহ কনককলস হইতে কুঙ্কুমজল ঢালিয়া দিল, বোধ হইল যেন দিবসত্রী বালান্তপ বর্ষণ করিল ।

এইরূপে স্নান সমাপন করিয়া সর্পনির্ম্বোকেয় স্তায় ধবল লম্বু ধৌতবাস পরিধানান্তে রাজা পরমধরের মত শোভমান হইলেন ; অতিধবল-জলধরচ্ছন্দ-শুচি হৃকূলপটপল্লব-দ্বারা শিরোবেষ্টন করাতে, তুহিনসিরির মত শোভিত হইলেন ।

তৎপরে পূজা, আহার প্রভৃতি সমুদায় কার্য সমাপন করিয়া



শয়নাগারে প্রবেশপূর্বক বিবিধগন্ধামোদিত সুগন্ধ কোমল শয্যা
শয়ন করিয়া বৈশম্পায়নকে আনয়নের নিমিত্ত প্রতীহারীকে
আদেশ দিলেন। প্রতীহারী আত্মমাত্র বৈশম্পায়নকে শয়নাগারে
আনয়ন করিল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, “বৈশম্পায়ন!
তুমি কোন্ দেশে কিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছ? তোমার জনক-
জননী কে? কিরূপে সমস্ত শাস্ত্র অভ্যাস করিলে? তুমি কি
জ্ঞাতিশ্রম, অপবা কোন মহাপুরুষ—যোগবলে বিহগবেশ ধারণ
করিয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেছ, কিংবা অলৌকিক দেবতাকে সম্বোধন
করিয়া বর প্রাপ্ত হইয়াছ? তুমি পূর্বে কোথায় বাস করিতে?
কি রূপেই বা চণ্ডালহস্তগত হইয়া পিত্তবান হইলে? এই সকল
গুণিতে আমার অতিশয় কৌতূহল জন্মিয়াছে, অতএব তোমার
আত্মোপাস্ত্র সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া আমার কৌতূহলাবিষ্ট
চিত্তকে পরিতৃপ্ত কর।”

রাজার এই কথা শুনিয়া বৈশম্পায়ন বিনয়-বাক্যে কহিল, “যদি
আমার জন্মবৃত্তান্ত গুণিতে মহারাজের নিতান্ত কৌতূহল জন্মিয়া
থাকে, তবে শ্রবণ করুন,—

“ভারতবর্ষের মধ্যস্থলে বিষ্ণুচলের নিকটে এক অটবী আছে।
উহাকে বিষ্ণুটবী কহে। ঐ অটবীর মধ্যে গোদাবরী নদীর তীরে
মহর্ষি অগস্ত্যের পবিত্র স্নানস্থল আশ্রম ছিল। সে স্থানে রামচন্দ্র পিতৃ-
আজ্ঞা প্রতিপালনের নিমিত্ত সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত পঞ্চবটীতে
পর্ণশালা নির্মাণ করিয়া কিকিৎকাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন।
ঐ আশ্রমের অনতিদূরে উৎকল-কুমুদ-কুবলয়-শোভিত, জলচর-
পক্ষিসমূহ পম্পা নামক সরোবর আছে। ঐ সরোবরের পশ্চিম
তীরে ভগবান্ রামচন্দ্র শর-বারা যে সপ্ততাল বিদ্ধ করিয়াছিলেন,



তাহার নিকটে এক প্রকাণ্ড শাখালী বৃক্ষ আছে। বৃহৎ এক অজগর সর্প সর্বদা ঐ বৃক্ষের মূলদেশে বেষ্টন করিয়া থাকিতে বোধ হয় যেন আলবাল-দ্বারা বেষ্টিত রহিয়াছে। উহার শাখা-প্রশাখাসকল একপ উন্নত ও বিস্তৃত যে, বোধ হয় যেন উহা হস্ত প্রসারণপূর্বক গগনমণ্ডলের দৈর্ঘ্য পরিমাপ করিতে উঠিতেছে। স্বক্কদেশ একপ উচ্চ, বোধ হয় যেন একেবারে পৃথিবীর চতুর্দিক অবলোকন করিবার উদ্দেশ্যে মুখ বাড়াইতেছে। ঐ তরুর পল্লবাস্তরে, কোটরে, শাখাগ্রে, স্বক্কসন্ধিতে ও বকলবিবরে সহস্র কুলায় নিষ্ঠাণ করিয়া তুফ শারিকা প্রভৃতি নানাবিধ পক্ষিগণ স্তখে ও নির্ভয়ে বাস করে। তুফ অতিশয় প্রাচীন; স্মরণ্য বিরলপল্লব হইয়াও, পক্ষিশাবকদিগের দিবানিশ অবস্থিতি প্রযুক্ত সর্বদা নিবিড়পল্লবাকীর্ণ বলিয়া বোধ হয়। কোন কোন পক্ষি-শাবকের পক্ষোদ্ভঙ্গ হয় নাই, তাহাদিগকে ঐ বৃক্ষের ফল বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে। পক্ষীরা রাত্তিকালে বৃক্ষকোটে আপন আপন নীড়ে নিদ্রা যায়। প্রভাত হইলে আহারের অন্বেষণে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া গগনমার্গে উড়ীন হয়। তৎকালে বোধ হয় যেন হরিষর্গ দূর্জাদলপরিপূর্ণ ক্ষেত্র বা অসংখ্য ইন্দ্রধনু আকাশমার্গ দিয়া চলিয়া যাইতেছে। তাহারা দিগ্দিগন্তে গমন করিয়া আহারদ্রব্য অন্বেষণ-পূর্বক আপনারা ভোজন করে এবং শাবকদিগের নিমিত্ত বিবিধ ফলরস ও কলমমঞ্জরী বহন করিয়া আনে এবং রক্তানুলিপ্ত ব্যাঘ্রনখের দ্বারা চকুপুটে-দ্বারা শাবকদিগকে যত্নপূর্বক আহার করাইয়া দেয়।

সেই বৃক্ষের এক জীর্ণ কোটরে আমার পিতামাতা বাস করিতেন। কালক্রমে মাতা আমাকে প্রসব করিয়া



স্মৃতিকা-পীড়ায় অভিভূতা হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। পিতা তৎকালে বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, আবার প্রিয়তমা জায়ার বিয়োগ-শোক অতিশয় ব্যাকুল ও দুঃখিতচিত্ত হইলেন। তথাপি মেহ-বশতঃ আমাকেই অবলম্বন করিয়া শোকসংবরণপূর্বক আমার লালনপালন ও রক্ষণাবেক্ষণে যত্ববান হইয়া কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। বার্ষিকাবশতঃ তাঁহার পিচ্ছজাল স্বল্প ক্ষরুণ ও শিথিল হইয়া গিয়াছিল, তাঁহার গমন করিবার কিছুমাত্র শক্তি ছিল না; তথাপি ধীরে ধীরে সেই আবাসতরুতলে নামিয়া, অল্প পক্ষিকুলারলষ্ট শালিষমরী হইতে বে বৎকিঞ্চিৎ আহারদ্রব্য পাইতেন আমাকে আনিয়া দিতেন, আমার আহারাবশিষ্ট বাহা থাকিত আপনি ভোজন করিয়া কোনপ্রকারে জীবনধারণ করিতেন।

“একদা নিশাযসানে গগনতল যখন প্রভাত-সন্ধ্যারাগে লোহিত, চন্দ্র তখন পদ্মমধুর যত রক্তবর্ণ পক্ষপুটশালী বৃদ্ধ হংসের জায় মন্দাকিনী-পুলিন হইতে পশ্চিমসমুদ্রতটে অবতরণ করিতেছেন; দিক্চক্রবালে বৃদ্ধ রক্তমৃগের রোমের যত একটি পাণ্ডুতা ক্রমশঃ বিস্তীর্ণ হইতেছে; গজ-কধিররক্ত সিংহজটার লোমের জায় লোহিত, ঈষৎতপু লাক্ষাতন্ত্র জায় পাটলবর্ণ সুদীর্ঘ সূর্য্যরশ্মি-গুলি যেন পরাগমণি-শলাকার সম্মার্জ্জনী-দ্বারা গগনকুটিম হইতে তারাপূর্ণগুলিকে সমুৎসারিত করিয়া দিতেছে; সপ্তধিমণ্ডল উত্তরদিকে অঘরতল হইতে সন্ধ্যা-উপাসনার অন্ত যেন মানস-সরোবরের তীরে অবতরণ করিতেছেন; অরুণকরনিগিপ্ত তারাগণের জায় বিকশিত-তুঙ্গিসম্পূট-খলিত মুক্তাফলনিকর বিক্ষিপ্ত হইয়া পশ্চিমসমুদ্রতটে ধবলিত করিয়াছে; তপোবনবাসী



অগ্নিহোত্রদিগের গৃহ হইতে রাসভ-রোম-ধূসর ধূমলেখা উখিত হইয়া তরুশিখরে পারাবতমালায় ঝাষ কুণ্ডলিত হইয়া ঘুরিতেছে ; নিশাবসানহেতু জড়িমপ্রাপ্ত সমীরণ হিমশীকর বহন করিয়া, পল্লবলতা নাচাইয়া, কমলবনের শৃগন্ধ হরণ করিয়া মন্দমন্দ বহিতে লাগিল ; প্রভাতস্নিগ্ধ-সমীরণাহত হইয়া নিদ্রালসচক্ষুর উত্তপ্ত ক্ষতুরসাগ্রিষ্টে পদ্মমালা ঈষৎ বিকশিত করিয়া উষরণয্যাধূসর বনমৃগসকল জাগরিত হইয়া উঠিল ; পক্ষিগণের কলরবে অরণ্যানী মুখরিত হইল ক্রমে সূর্য্য স্পষ্ট হইতে লাগিল । কিকিছুযুক্ত নব-নলিনসল-সম্পূটের মত পাটলবর্ণ নবোদিত রবির মঞ্জিষ্ঠারাগ-লোহিত কিরণজালে গগনমণ্ডল লোহিতবর্ণ হইয়া উঠিল । তখন শাশ্বলৌক্যবৃদ্ধ পক্ষিগণ একে একে আহারের অন্বেষণে অভিলষিত প্রদেশে প্রস্থান করিল । পক্ষিশাবকেরা নিঃশব্দে কোটরে রহিয়াছে ও আমি পিতার নিকটে বসিয়া আছি, এমন সময়ে ভয়াবহ মৃগরাকোলাহল শুনিতে পাইলাম । কোন দিকে সিংহ-সকল গভীর স্বরে গর্জন করিতে লাগিল ; কোন প্রদেশে তুরঙ্গ, কুরঙ্গ, যাতঙ্গ প্রভৃতি বনচর পশুসকল বন আন্দোলন করিয়া বেড়াইতে লাগিল ; কোন স্থানে বাঘ, ভল্লুক, বরাহ প্রভৃতি ভীষণাকার জন্তুসকল ছুটাছুটি করিতে লাগিল, কোন স্থানে মহিষ, গণ্ডার প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ জন্তুগণ অতি বেগে দৌড়িতে লাগিল ও তাহাদিগের গাত্রস্বর্ণে বৃক্ষসকল ভগ্ন হইতে আরম্ভ হইল । মাতঙ্গের চৌংকারে, তুরঙ্গের হেবারবে, সিংহের গর্জনে ও পক্ষীদিগের কলরবে বন আকুল হইয়া উঠিল এবং তরুগণও বেন ভয়ে কাঁপিতে লাগিল । আমি সেই কোলাহল শ্রবণে ভয়বিহ্বল ও কম্পিতকলেবর হইয়া নিরাপদ হইবার আশায় পিতার



জীর্ণ পক্ষপুটের অন্তরালে লুকাইলাম। তথা হইতে বাসনিগের নানা প্রকার চৌকর ও কোলাতল শ্রুতিতে লাগিলাম।

“যখন যুগরাকোলাতল নিবৃত্ত হইয়া অরণ্যানী নিস্তর হইয়াছে, তখন আমি পিতার পক্ষপুট হইতে আস্তে আস্তে বিনির্গত হইয়া কোটর হইতে মুখ বাড়াইয়া যে দিকে কোলাতল হইতেছিল সেই দিকে ত্রাসচঞ্চল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম। দেখিলাম কৃতান্তের সন্তোদরের স্তায়, শাপের সারথির স্তায়, নরকের দারপালের স্তায় বিকটমূর্ধি এক সেনাপতির সমভিব্যাহারে ঘনোক্ত অন্ধকার অথবা অজ্ঞানশিলার স্তম্ভসম্মার-সদৃশ কৃষ্ণকার কুরুপ ও কদাকার কতকগুলি শবরসৈন্য আসিতেছে। তাহাদিগকে দেখিলে ভূত-বেষ্টিত ভৈরব ও দূতযথাবস্ত্রী কালান্তককে স্মরণ হয়। পরে অবগত হইলাম যে, সেই সেনাপতির নাম মাতঙ্গক। তাহার দক্ষাবলম্বী আকুটলাগ্র কুশলভার কৃষ্ণকূর মুখমণ্ডল বেটন করিয়া আছে; সুরাপানে তাহার হই চক্ষু জবাধর্ণ, সর্ষ শরীরে বিন্দু বিন্দু রক্ত লাগিয়াছে, সঙ্গে কতকগুলি বড় বড় শিকারী কুকুর আছে। তাহাকে দেখিয়া বোধ হইল যেন কোন বিকটাকার অস্তুর বস্ত্র পশু ধরিয়া খাইতে আসিয়াছে। শবরসৈন্য অবলোকন করিয়া মনে করিলাম, ইহারা কি তুরাচার ও তুচ্ছায়িত। জনশূন্য অরণ্য ইহাদিগের বাসস্থান, মত্ত, মাংস আহার, ধনু ধন, কুকুর স্তম্ভ, বায় ভনুক প্রভৃতি হিংস্র ভক্তের সহিত একত্র বাস এবং পশুদিগের প্রাণবধ করাই জীবিকা ও ব্যবসায় অস্বঃকরণে সন্মার লেশ নাই, অধর্মের ভয় নাই ও সঙ্গাচারে প্রবৃত্তি নাই। ইহারা সাধুবিগর্হিত পথ অবলম্বন করিয়া সকলের নিকটেই নিন্দাম্পদ ও ঘৃণাম্পদ হইতেছে সন্দেহ নাই। এই চিন্তা



করিতেছিলাম, এমন সময়ে মৃগয়াক্রান্ত শ্রান্তি দূর করিবার নিমিত্ত তাহারা আশাদিগের আবাসতরুতলের ছায়ায় আসিয়া উপবিষ্ট হইল। অনতিদূরস্থিত সরোবর হইতে কমলপত্রসম্পূটে করিয়া দ্রবমুক্তাফল-সদৃশ স্বচ্ছ জল ও মৃণাল আনিয়া পিপাসা ও ক্ষুধা শাস্ত করিল। তাহারা যখন অমল ধবল মৃণাল ভক্ষণ করিতেছিল, মনে হইতেছিল যেন রাহ চক্কে গ্রাস করিতেছে। কিছুক্ষণ বসিয়া শ্রান্তি দূর করিয়া তাহারা চলিয়া গেল।

শবরসৈন্তের মধ্যে এক বৃদ্ধ সেদিন কিছুই শিকার করিতে পারে নাই ও মাংস প্রাপ্তি কিছুই পায় নাই; সে উহাদিগের সঙ্গে না গিয়া তরুতলে দণ্ডায়মান থাকিল। সকলে দৃষ্টিপথের অগোচর হইলে, রুধিরবিন্দুপাটল চুই চক্ষুর দ্বারা সেই তরুর মূল হইতে অগ্রভাগ পর্যন্ত একবার এমনভাবে নিরীক্ষণ করিল যেন পক্ষিগণের আশ্রয়ে পান করিতেছে। তাহার নেত্রপাতমাত্রেই কোটরস্থিত পক্ষিশাবকদিগের প্রাণ উড়িয়া গেল। হায়, নৃশংসের অসাধ্য কি আছে। সোপানশ্রেণীতে পাদক্ষেপপূর্বক অট্টালিকায় যেক্রপ অনায়াসে উঠা যায়, সেইক্রপ অবলীলাক্রমে সেই নৃশংস সেই কণ্টকাকীর্ণ ছুরারোহ প্রকাণ্ড মহীকূহে আরোহণ করিল এবং কোটরে কর প্রসারিত করিয়া পক্ষিশাবকদিগকে ধরিয়া একে একে বহির্গত করিতে লাগিল। কোন কোন শাবক অল্প-দিবসজাত, তাহাদের নবপুত্ৰ কমনীর পাটলকাণ্ডি যেন শাখালী-কুম্বের মত, কাহারও পয়েষ নূতন দলগুলির মত অল্প উদগত পঙ্কজ, কাহারও বা পদ্মরাগের প্রায় বর্ণ, কাহারও বা লোহিতায়-মান চক্ষুর অগ্রভাগ ঈষদ্ভস্কনুখ কমলের মত, কাহারও বা মণ্ডুক অনবরত কম্পিত হইতেছে, যেন ব্যাধকে নিষারণ করিতেছে ;



এই সমস্ত অসমর্থ শুকশিত্তগুলিকে বনম্পতির শাখাসন্ধি ও কোটরাভ্যন্তর হইতে এক একটি ফলের মত গ্রহণ করিয়া প্রাণ-সংহারপূর্ব্বক ভূতলে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। পিতার বৃদ্ধ বয়স, অকস্মাৎ এই বিষম সম্বট উপস্থিত হওয়াতে তিনি নিতান্ত ভীত হইলেন। ভয়ে কলেবর দ্বিগুণ কাপিতে লাগিল এবং তালুদেশ শুক হইয়া গেল। পিতা ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন কিন্তু প্রতিকারের কোন উপায় না দেখিয়া জ্বাসে আমাকে শিথিলসন্ধি পক্ষপুটে আচ্ছাদন করিলেন ও আপন বক্ষঃস্থলের নিয়ে লুকাইয়া রাখিলেন। আমাকে যখন পক্ষপুটে আচ্ছাদন করেন, তখন দেখিলাম তাহার নয়নদুগল হইতে জলধারা পড়িতেছে নৃশংস ব্যাধ ক্রমে ক্রমে আমাদিগের কূলায়ের সমীপবর্তী হইল এবং কালসর্পাকার বামকর কোটরে প্রবিষ্ট করিয়া পিতাকে ধরিল। তিনি চকুপুট-দ্বারা যথাশক্তি আঘাত ও দংশন করিলেন কিন্তু সে কিছুতেই ছাড়িল না;—কোটর হইতে বহির্গত করিল, যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা দিল, পরিশেষে প্রাণ বিনষ্ট করিয়া নিয়ে নিক্ষেপ করিল। পিতার পক্ষদ্বারা আচ্ছাদিত ও ভয়ে সমুচিত হইয়াছিলাম বলিয়া সে আমাকে দেখিতে পার নাই। ঐ তরু-তলে শুক পর্ণরাশি পুঞ্জিত ছিল, আমি তাহারই উপর পতিত হইলাম, অধিক আঘাত লাগিল না।

“অধিক বয়স না হইলে অস্ত্রঃকরণে স্নেহের সঞ্চার হয় না, কিন্তু ভয়ের সঞ্চার জন্মাবধিই হইয়া থাকে। শৈশবপ্রযুক্ত আমার অস্ত্রঃকরণে স্নেহ-সঞ্চার না হওয়াতে আমার কেবল ভয়ই হইল। প্রাণ-পরিত্যাগের উপযুক্ত কাল পাইয়াও আমি নিতান্ত নৃশংস ও নির্দয়ের জ্ঞার মত পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া পলাইবার চেষ্টা



করিতে লাগিলাম, অস্তির চরণ ও অসমগ্রোদিত পঙ্কপুটের সাহায্যে ধীরে ধীরে গমন করিবার উদ্যোগ করাতেও বারংবার ভূতলে পড়িতে ও তথা হইতে উঠিতে লাগিলাম, ভাবিলাম, বুঝি এ যাত্রায় কৃতান্তের করাল-গ্রাস হইতে পরিজ্ঞান হইল না। পরিশেষে মনঃমন্ড গমন করিয়া নিকটস্থিত এক ধনকৃষ্ণপল্লবিত তমালতরুর মূলদেশে লুকাইলাম, তখন মনে হইল যেন পিতৃ-কোড়েই আশ্রয় পাইলাম। এমন সময়ে সেই মৃশংস চণ্ডাল শাদুলীবৃক্ষ হইতে নামিয়া পক্ষিশাবকদিগকে একত্র করিয়া লতাপাশে বদ্ধ করিল এবং যে পদে শবরসৈন্তেরা গিয়াছিল সেই পথ দিয়া চলিয়া গেল।.....”

তারানাথের তর্করত্ন।

রাজা রামমোহন রায়

ধন্য রামমোহন রায় ! বে সময়ে ভারতবর্ষ অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল বলিলে হয়, সেই সময়ে তোমার সতেজ বুদ্ধিজ্যোতি যে ঘোরতর অজ্ঞানরূপ নিবিড় জলদ-রাশি বিদূর্ণ করিয়া এতদূর বিকীর্ণ হইয়াছিল এবং তৎসহকারে তোমার সুবিমল স্বচ্ছ চিন্তা যে নিজ দেশে ও নিজ সময়ে প্রচলিত সকল প্রকার কুসংস্কার নির্বাচন করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিল, ইহা সামান্য আশ্চর্য্য ও সামান্য সাধুবাদের বিষয় নয়। তখন তোমার জ্ঞান ও ধর্মোৎসাহে উৎসাহিত হৃদয় জঙ্গলময় পঙ্কিলভূমি-পরিবেষ্টিত একটা অগ্নিময় আগ্নেয়গিরি ছিল, তাহা হইতে পুণা পবিত্র প্রচুর জ্ঞানগ্নি সতেজে উৎক্ষিপ্ত হইয়া চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইতে থাকিত। তুমি বিজ্ঞানের অমুকুল-পক্ষে যে সুগভীর রণবাণ্য বাদন করিয়া গিয়াছ, তাহাতে যেন এখনও আমাদের কর্ণকুহর ধ্বনিত করিতেছে। সেই অভূতপূর্ব গভীর তুর্ধাধ্বনি অজ্ঞাপি বার বার প্রতিধ্বনিত হইয়া এই অযোগ্য দেশে জয় লাভ করিয়া আসিতেছে। তুমি স্বদেশ ও বিদেশ-ব্যাপী নম ও কুসংস্কার সংহার-উদ্দেশ্যে আততায়ী-স্বরূপে রণ-হুর্মদ বীর পুরুষের বিক্রম প্রকাশ করিয়াছ, এবং বিচারযুদ্ধে সকল বিশক্ষ পরাস্ত করিয়া নিঃসংশয়ে সম্যক-রূপে জয়ী হইয়াছ। তোমার উপাধি রাজা, জড়ময় ভূমিখণ্ড তোমার রাজ্য নয়। তুমি একটা সুবিস্তৃত মনোরাজ্য অধিকার করিয়া রাখিয়াছ। তোমার সমকালীন ও বিশেষতঃ উত্তরকালীন



স্বমার্জিত-বুদ্ধি শিক্ষিত সম্প্রদায়ে তোমাকে রাজ-মুকুট প্রদান করিয়া তোমার জয়ধ্বনি করিয়া আসিতেছে। যাহারা আবহমান কাল হিন্দুজাতির মনোরাজ্যে নিকির্বাতে রাজত্ব করিয়া আসিয়াছেন, তুমি তাঁহাদিগকে • পরাজয় করিয়াছ। অতএব তুমি রাজার রাজা। তোমার জয়-পতাকা তাঁহাদেরই স্বাধিকার মধ্যে সেই যে উত্তোলিত হইয়াছে, আর পতিত হইল না, হইবেও না, নিয়তই একভাবেই উদ্ভাসমান রহিয়াছে। পূর্বে যে ভারতবর্ষীয়েরা তোমাকে পরম শত্রু বলিয়া জানিতেন, তদীয় সন্তানেরা অনেকেই এখন তোমাকে পরম বন্ধু বলিয়া বিশ্বাস করিতেছেন, তাহার সন্দেহ নাই। কেবল ভারতবর্ষীয়দের বন্ধু কেন, তুমি জগতের বন্ধু।†

এক দিকে জ্ঞান- ও ধর্ম-ভূষণে ভূষিত করিয়া জন্মভূমিকে উজ্জল করিবার যত্ন করিয়াছ, অপর দিকে সঙ্কটময় সুগভীর সমুদ্রসমূহ উত্তরণপূর্বক বৃটিশ রাজ্যের রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া নানা বিষয়ে রাজশাসনপ্রণালীর সংশোধন ও শুভ-সাধনার্থ প্রাণপণে চেষ্টা পাইয়াছ।‡ সে সময়ের পক্ষে এ কি কাণ্ড! কি

• প্রচলিত হিন্দুধর্ম-ব্যবস্থাপকদিগকে।

† "The promotion of human welfare and especially the improvement of his own countrymen, was the habit of his life."
—Rev. Carpenter.

"An ardent well wisher to the cause of freedom and improvement everywhere."—Miss Lucy Aikin's letter to Dr. Channing.

‡ অদ্বৈতের কল্যাণসাধন ও বিশেষতঃ ভারতবর্ষের রাজ্য-শাসন-প্রণালীর সংশোধনই রামমোহন বায়ের ইংলণ্ড গমনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। প্রচলিত হিন্দুধর্ম-পক্ষপাতী ব্যক্তির সহমরণ-নিবারণ বিষয়ক রাজনিয়মের অতিকূল-পক্ষে ইংলণ্ডে আবেদনপত্র প্রেরণ করেন, সেই বিষয়ের সুবিচার-সম্পাদন-উদ্দেশ্যে,



ব্যাপার! স্বাভাবিক শক্তির এতই মহিমা! তুমি ইংলণ্ডে গিয়া অধিষ্ঠান করিলে, তথাকার সুপণ্ডিত সাধু লোকে তোমার অসাধারণ গুণগ্রাম দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া যায়। তোমার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া, একবার তথাকার কোন মজ্জন-সমাজে চমৎকার-সম্মিলিত এইরূপ একটী অপূর্ব ভাবের আবির্ভাব হয়,

ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চাট্টার পরিবর্তন-সময়ে তৎসংক্রান্ত বিচারে লিপ্ত হইয়া যদি ভারতবর্ষীয়ের হিতসাধন করিতে সমর্থ হন—এই অভিপ্রায়ে, এবং বিশেষতঃ ইউরোপীয় বিভিন্ন জাতির আচার ব্যবহার ধর্মাদি বিষয়ের অমুমতানার্থ তিনি ইংলণ্ডে গমন করেন। দিল্লীর বাবশাহ একটী মোকদ্দমার ভার্য্যণ করিয়া তাঁহাকে তথায় পাঠাইয়া দেন, ইহাতেই তাঁহার মনোরথ-পূরণের সুবিধা ও সুস্থপায় ঘটিয়া উঠে। তিনি দত্ত দিন তথায় অবস্থিতি করেন, তত দিনই ঐ সকল মহৎ ব্যাপার সাধনার্থই ব্যস্ত ও চিন্তিত ছিলেন। তিনি রাজস্ব ও বিচার-প্রণালী-সংক্রান্ত অনেকগুলি গ্রন্থ লিখিয়া বোর্ড অব্ কন্ট্রোল নামক রাজকীয় কাৰ্যালয়ে অর্পণ করেন এবং সেই কাৰ্যালয়ের অধ্যক্ষেরা হৌস অন কমন্স নামক সভায় সেই সমস্ত পাঠাইয়া দেন। তদ্বিত্ত তিনি রাজপুরুষদের অমুরোধক্রমে পার্লামেন্টে গমনে নিজে ব্যয়ব্যয় উপস্থিত হইয়া শাসন-প্রণালী-সংক্রান্ত আপন অভিপ্রায় প্রকাশ ও সংশোধন প্রদান করেন এবং ভারতবর্ষীয় রাজকীয় ব্যাপারের উপাঙ্গণ বিচার ও উত্তরকালীন শাসন-পদ্ধতি-বিষয়ক নানাবিধ প্রস্তাব, যুক্তি ও পরামর্শ লিখিয়া বিভাগাদির নকশা-সম্মিলিত একখানি পুস্তক প্রস্তুত করেন। ঐ সমুদয় কাতিয়েকে, হিন্দুদের দায়াদিকার ও ভারতবর্ষীয় বিচার-প্রণালী-সংক্রান্ত অস্তান্ত পুস্তকও রচনা করেন।

তিনি উল্লিখিত সমুদয় গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদির মধ্যে ভারতবর্ষীয় লোকের পদবৃদ্ধির ক্ষমতা অমুরোধ ও ব্যাকুল চিত্তে কৃদিল্লীবীদের উঃখ হরণার্থ প্রার্থনা করেন।

সেই সময়ে পার্লামেন্টে ভারতবর্ষের শাসন-সংক্রান্ত নূতন নিয়মাবলী প্রস্তাবিত হয়; তিনি তদর্থে এত চিন্তিত থাকিতেন যে, অনেকে স্বার্থ-সাধন-বিষয়েও তত চিন্তিত থাকে কি না সন্দেহ।



যেন সাক্ষাৎ প্রেটো, সফ্রেটিন্ বা নিউটন্ ধরনী-মণ্ডলে পুনরায় উপস্থিত হইলেন। • তুমি আপন সময়ের অতীত বস্তু। কেবল সময়েরই কেন? আপন দেশেরও অতীত। ভারতবর্ষ তোমার যোগ্য নিবাস নয়। এক ব্যক্তি বলিয়া গিয়াছেন, একপ দেশে একপ লোকের জন্ম গ্রহণ অবনী-মণ্ডলে আর কখনও ঘটিয়াছিল বোধ হয় না।†

তাহার ঐ পুস্তকও প্রবন্ধগুলি অল্প উপকারী হয় নাই। বৃটিশ রাজ-পুস্তকগোষ্ঠী তাহার অভিপ্রায়ানুসারে ক্রমে ক্রমে অনেক কাটা করিয়াছেন ও উদ্ভাৱা বিশেষ উপকারও ঘনিষ্ঠাছে, তাহাঙ্গর মানদহ নাই

"They" (Raja Mohan Roy's Communications to British Legislature) "show him to be at once the philosopher and the patriot. They are full of practical wisdom and there is reason to believe that they were highly valued by our Government and that they aided in the formation of the new system."—Dr. Carpenter.

* Monthly Repository of June, 1831.

† যে সময় জরাজীর্ণতার প্রভাবই অল্প ও কচৎ পার্সী কাগজ (১) লিখাবন্ধি সর্বসাধারণ বিদ্যার লোকে বিজ্ঞাপিকার চরম গীবা ছিল, সেই সময়ে যিনি পৃথিবীর আচরন ও অপ্রাচীন বচনর প্রধান প্রধান ভাষা প্রভৃতি দল ভাষার ও বিবিধ বিজ্ঞানে স্বীয় অধিকার বিস্তার করেন (২), যিনি ভিন্ন ভিন্ন নানা ভাষার স্বদেশের কল্যাণকর বিবিধ পুস্তক প্রস্তুত করেন, আপকার যেশ-ভাষার রীতিমত গদ্য-গ্রন্থ-রচনার পথপ্রদর্শন করেন, সেই ভাষার ব্যাকরণ-রচনাধি-ভাৱা

(১) পার্সী ব্যাকরণ।

(২) "The wide field over which his acquirements spread comprising sciences and languages which individual knowledge rarely associates together" W. J. Fox.



সহমরণ-নিবারণ, ব্রাহ্মধর্ম-সংস্থাপন, দেশীয় লোকের পদোন্নতি-
সাধন ইত্যাদি তোমার কত জরুরী ও কৌতুকীয় জাজল্যমান

তাহার শিক্ষা-প্রচলনের উপায়ানুষ্ঠান করেন (১) এবং যেরূপ শিক্ষার লোকের
বুদ্ধি বাড়িত ও কুসংস্কার বিনষ্ট হইত, বিস্তৃত জ্ঞানপথে প্রবৃত্তি জন্মে, ইংরাজি
বিজ্ঞানীয়-সংস্থাপনাদি-দ্বারা স্বদেশে সেইরূপ শিক্ষা-প্রণালী প্রচলিত করিবার
জন্ত যথোচিত চেষ্টা পান, যে সময়ে তাহার যৌবনের অজ্ঞান ও অশেষ প্রকার
কুসংস্কারে অন্ধ হইয়াছিল, সেই সময়ে যিনি আপনার বুদ্ধি, বিজ্ঞা ও তেজস্বিতা-
প্রভাবে সমুদ্র কুসংস্কার পরিভাগপূর্বক স্বদেশের আচার, ব্যবহার, ধর্মাদি-
সংশোধন করিতে কৃতসঙ্কল্প হন, ও সে বিষয়ে সুনিপুণ ও কৃতকায্য হইবার
উদ্দেশ্যে মূল-পথে ও সমুদ্র-পথে কত কত অতিদূর-স্থিত দুর্গম দেশ পরিভ্রমণ
করিয়া নানা জাতির ধর্ম, কণ্ঠ, রীতি, নীতি প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের স বিশেষ
অনুসন্ধান করেন (২), যিনি স্বদেশের প্রলোকে বাক্য বাধিত ও কাবল্য্য রূপে
অভিযুক্ত হইয়া তথায় শিক্ষা-বিষয়ে সমুচিত বুদ্ধি প্রদান ও নিত্য সাধুকুল
ভাব প্রকাশ করেন, বহুবিবাহ রীতি ও বর্তমান দারাদিকার-বিষয়ক ব্যবস্থা
তাহাদের অশেষ ক্রোধের মূল ও অনেক অনর্থের কারণ বলিয়া প্রচার করেন,
অসঙ্গত নিগ্রহ সহ্য করিয়াও প্রাণপণে সহমরণরূপ বিবষম প্রথা নিবারণ
করেন এবং দেশময় এই জন প্রবাদ প্রচলিত হয় যে, ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমন
করিয়া বিধবা-বিবাহ প্রচলনের উদ্দেশ্যে পাইবেন এইরূপ ইচ্ছা ব্যক্ত করেন;
যে সময়ে স্বদেশীয় লোকে সাধারণ হিতানুষ্ঠান-ধর্মের মন-গ্রহণ করিতেই পারিত

(১) রামমোহন রায় বাঙ্গালা ভাষায় গৌড়ীক ব্যাকরণ ব্যতিরেকে
খগোল ও জ্যোতিষ নামে জ্যোতিষ ও ভূগোল বিজ্ঞা-বিষয়ক অপর দুইখানি
শিক্ষা-পুস্তক প্রস্তুত করেন।

(২) ভোট দেশে তিন বৎসর ও হবুরোপে সাত ছয় বৎসর অবস্থিতি
করেন। সে সময়ে নানাবিধ দুর্গম দেশে পরিভ্রমণপূর্বক ভোট দেশ পর্য্যন্ত
গমন করা সহজ ব্যাপার ছিল না।



রহিয়াছে। না জানি কি কল্যাণময়ী মহীরসী কৌর্তি-সংস্থাপন-উদ্দেশে অর্ক-ভূষণ অতিক্রম করিতে * কৃতসঙ্কর ও প্রতিজ্ঞাক্রূত হইয়াছিলে। তাদৃশ সুদুর্ভূত ভূষণাসী সুপ্রতিষ্ঠিত সাধু লোকেও তোমার অসামান্য মহিমা জানিতে পারিয়া প্রত্যাশময়-পূর্বক তোমাকে সমাদর করিবার জন্য অতিমাত্র ব্যগ্র ছিল। যনে যনে কতই শুভ সঙ্কল্প সঞ্চারিত ও কতই দয়াস্রোত প্রবাহিত

না, সেই সময়ে যিনি ঐ ধর্মটী আপনার চিরজীবনের একমাত্র নিত্যবৃত্ত-স্বরূপ অবলম্বন করেন ও তাহাদের বিদ্যম বিষয় ও যৌবনের প্রতিকূলতা অতিক্রম করিয়া তাহাদেরই দুঃখ-হরণ, সুখ-বর্দ্ধন ও সর্বপ্রকার উন্নতি-সাধন করিতে নিরন্তর প্রতিজ্ঞাক্রূত থাকেন; কেবল ব্রহ্মদির ভজনেবশ নহ, যিনি ভূষণলের অসামান্য প্রধান প্রধান ধর্ম-সংশোধন ও অস্ত্র যন্ত্রের লোকের হিতানুষ্ঠান-বিষয়েও উৎসাহ ও দত্ত প্রকাশ করেন; কেবল দ্বন্দ্বদির পরিবর্দ্ধন নহ, যিনি অগ্নি স্বামীসেপের অধিবাসী ও রাজপুত্রদের মধ্যে না হইলেও নিজের বুদ্ধিবৃত্তি ও কর্মতা-পূর্তাবে রাজ্যস্থাপন প্রণালীর সংশোধন ও উন্নতি-সাধন করিয়া স্বদেশীর লোকের দুঃখ-হরণ ও শ্রীবুদ্ধি-সম্পাদনার্থ অতিদূর সাহসিকতা প্রদর্শনপূর্বক কারমনোবাক্যে চেষ্টা পান, অসাধারণ বুদ্ধি-গৌরব, রাজ-নীতিজ্ঞতা, অধ্যবসায় ও উপচিকীৎসা-প্রকাশপূর্বক ই সমস্ত অসামান্য বিষয়ে চিরজীবন অসুস্থ থাকিয়া সে সময়েও আপনার জীবিত-কাল-মধ্যে যতদূর সম্ভব কৃতকার্য হন, এবং যিনি উন্নীত রূপ মহৎ ত্রিরাশুস্তান সর্বহিতৈষিতা, সমাশয়তা, শিষ্টাচার ও শিষ্টাচরণে সর্বোৎকৃষ্ট হনতা জাতীয় বিশিষ্ট লোকের ঐতি-পাত্র ও শুদ্ধি-ভাষন হইয়া গান, তাহার সদৃশ উত্তরূপ অসাধারণ বহুতর গুণালঙ্কারে অলঙ্কৃত ব্যক্তি ভূষণলে এবং বিশেষতঃ এইরূপ অযোগ্য দেশে আর কখনও জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এ প্রকার বেধিতে পাওয়া যায় না। একাধারে এরূপ অশেষ প্রকার অসামান্য-বিশিষ্টী অলোক-সামান্য বুদ্ধি, কর্মতা ও হিতৈষিতার একত্র সংযোগ আর কখনও ঘটে বাই বোধ হয়।

* আমেরিকা গমন করিতে।

73eC 2156



করিয়াছিলে। কিন্তু ভারতের কপাল মন্দ। সে সমুদ্র কন্দ-
ক্ষেত্রে আসিয়া আবির্ভূত হইল না। বৃস্টল।—বৃস্টল। * তুমি
কি সর্বনাশই করিয়াছ। আমাদিগকে একেবারেই অনাথ ও
অবসন্ন করিয়া রাখিয়াছ। বাহাতে অশেষরূপ অমৃত-স্বাদ ফল-রাশি
উৎপৎস্তমান হইয়াছিল, সেই অলোকসামান্য বৃক্ষমূলে মাত্ৰাতিক
কুঠার প্রহার করিয়াছ। সেই বিপদের দিন কি ভয়ঙ্কর দিনই
গিয়াছে। আমাদের সেই দিনের মৃত্যুশৌচ অস্থাপি চলিতেছে ও
চিরকালই চলিবে। সেই দিন ভারত-রাজ্যের কলাপ-শিরে বজ্রাঘাত
হইয়াছে। এ দেশায় নব্য সম্প্রদায়। সেই দিন তোমরা নিরাশ্রয় ও
নিঃসহায় হইয়া রণজিৎ-শূত্র শিশু সৈন্তের অবস্থায় পতিত হইয়াছ।
হুঃখজীবী কৃষিজীবীগণ! যে সময়ে তোমরা স্বদেশ ও বিদেশের জন্ত
অপর্যাপ্ত অন্ন প্রস্তুত করিয়াও নিজে স্বচ্ছন্দমনে ও নিরঞ্জনমনে
অত্যপকৃষ্ট তণুল-গ্রাসও গ্রহণ করিতে পাও নাই, সেই সময়ে
যিনি এই হুঃসহ হুঃখ-রাশি পরিহার করিয়া তোমাদের সমুপ্ত হৃদয়
শীতল করিবার জন্ত বাকুল ছিলেন, এবং তৎকাল বৃটিশ রাজ্যের
রাজধানীতে অধিষ্ঠানপূর্বক তোমাদের অজ্ঞাতদ্বারে প্রত্যেক
রাজপুরুষের নিকট স্বহস্তে লিখিবা বিশেষরূপ কাতরতা প্রকাশ

"Strange is it that such a man should have been given by
India to the world. * * * Strange it is—but
he was not of India so much as for India." —Rev. W. J. Fox's
Sermon.

"Such an instance is probably unparalleled in the history of
the world."—Marg Carpenter.

* ইংলণ্ডের অস্বর্ণিত বৃস্টল নামক স্থানে রামমোহন রায়ের মৃত্যু ও
সমাধি হয়।



করেন, * সেই দিনে তোমরা সেই করুণাময় আশ্রয়ভূমির আশ্রয়-
লাভে চিরদিনের মত বঞ্চিত হইয়াছ। ভারতবর্ষীয় চির-নিগ্রহ-
ভাজন অবলাগণ ! তোমাদের অশেষরূপ দুঃখবিমোচন ও বিশেষ-
রূপ উন্নতি-সাধন ঘাহার অন্তঃকরণের একটি প্রধান সঙ্গ ছিল, এবং
যে হৃদয়-বিলীর্ণ-কারী ব্যাপার স্মরণ হইলে শরীরের শোণিত শুষ্ক
হইয়া অংকম্প উপস্থিত হয়, যিনি নিতান্ত অবাচিত ও অশেষরূপ
নিপৃহীত হইয়াও তোমাদের সেই নিদারুণ আত্মঘাত-ব্যবস্থা ও
তদ্বিবক্ষন স্বজনবর্গের শোক-সন্তাপ, আতঁনাদ ও অশ্রুবর্ষণ সমস্তই
নিবারণপূর্বক ভারতমণ্ডলের মাতৃহীন অনাথ বালকের সংখ্যা
হ্রাস করিয়া যান. সেই দিনে তোমরা সেই দয়াময় পরম বন্ধুকে
হার্য হইয়াছ। বিবিধ পীড়ায় প্রপীড়িত জননী ভারত-ভূমি !
যে আশা নরলোকের জীবন-স্বরূপ সেই দিন তোমার সেই
আশাবল্লী বৃষ্টি নিমূল হইয়াছে !

পূর্বতন শোক-সংবাদ নবীকৃত হইয়া উঠিল ! অশ্রুধারা-
নিবারণে একেবারেই অসমর্থ হইয়া পড়িতেছি। এ সময়ে বিষয়াস্তর
স্মরণ করিয়া উহা বিস্মৃত হওয়া আবশ্যক। একটি প্রবোধের বিষয়ও
আছে। আমাদের রাজা একেবারে নির্দোষ হইবার বস্ত্র নন।
তিনি ভূ-লোক হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন তথাচ চিত্তাবলম্বিত
হিত-ব্রত উদ্ভাপন করিয়া যান নাই। তদীয় সমাধি-ক্ষেত্র হইতে
কত বার কত পরম শ্রেয়স্বপবিত্র মহানাদ বিনির্গত ও প্রতিধ্বনিত
হইয়া কতই হিতোৎসাহ-উদ্দীপন ও কতই শুভ সঙ্গ-সম্পাদন

* Appendix to the Report from the Select Committee of the House of Commons on the affairs of the East India Company, published in 1831.



করিয়া আসিয়াছে। অতএব তিনি প্রাণত্যাগ করিয়াও
আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন নাই; জীবৎকালের সদভিপ্রায়-
বলে ও নিজ চরিত্রের দৃষ্টান্ত-প্রভাবে যুঁহুর পরেও উপকার-সাধন
ও উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক আমাদের ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়া
রহিয়াছেন। কেবল আমাদের নয়, ইউরোপ ও আমেরিকাও
ভক্তি-শ্রদ্ধা-সহকারে তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে, *

অক্ষয়কুমার দত্ত ।

—

* " 'Being dead, he yet speaketh' with a voice to which not
only India but Europe and America will listen for generations " —
Fox's Sermon.

" 'Though dead, he yet speaketh, and the voice will be heard
impressively from the tomb, which in his life, may have excited
only the passing emotions of admiration or respect " — Dr.
Carpenter's Sermon.



মিত্রতা

সঙ্গলাভের বাসনা আমাদের স্বভাব-সিদ্ধ এবং সমস্ত সদ্গুণ আমাদের আদরণীয়। কাহারও কোন সদ্গুণ সন্দর্শন করিলে তাহার প্রতি অনুরাগ-সঞ্চার হয়, এবং অনুরাগ-সঞ্চার হইলেই তাহার সঙ্গলাভ করিবার বাসনা উৎপন্ন হয়। এই প্রকারে এক জনের প্রতি অত্র জনের শ্রদ্ধা ও প্রীতির উদ্বেগ হইতে পারে; কিন্তু উভয়ের সমান ভাব না হইলে প্রকৃতরূপ বন্ধুত্ব-ভাবের উৎপত্তি হয় না। সমান ভাব ও সমান অবস্থা সঙ্গ-সঞ্চারের মূলীভূত। এই হেতু বালকের সহিত বালকের, যুবাব সহিত যুবাব এবং প্রাচীনের সহিত প্রাচীন ব্যক্তির সৌহৃদ্য-ভাব সহজে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। এই হেতু পণ্ডিতের সহিত পণ্ডিত লোকের, অজ্ঞের সহিত অজ্ঞ লোকের, সাধুর সহিত সাধু লোকের এবং অসাধুর সহিত অসাধু লোকের মিত্রতা-ভাব অক্রেমে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই হেতু ধনীর সহিত ধনী লোকের, দ্রুখীর সহিত দ্রুখী লোকের এবং মধ্য-বিস্তের সহিত মধ্য-বিস্ত লোকের অপেক্ষাকৃত অধিক সৌহৃদ্য সংঘটিত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ মানসিক প্রকৃতির সাম্যভাবই বন্ধুত্ব-গুণোৎপত্তির প্রধান কারণ। যে সমস্ত সূচরিত্র ব্যক্তির মনোবৃত্তি একরূপ হয়, সুতরাং এক বিষয়ে প্রবৃত্তি ও এক কার্যে অনুরক্তি জন্মে, তাঁহাদেরই পরস্পর প্রকৃতরূপ মিত্রতা লাভের সম্ভাবনা।

কিন্তু মেদিনী-মণ্ডলে দুই ব্যক্তির সর্ববিধে সমান হওয়া সম্ভব



নয়। বাহাদেবের জ্ঞান সমান, তাহাদেবের অবস্থা সমান নয়। বাহাদেবের অবস্থা সমান, তাহাদেবের ধর্ম সমান নয়। বাহাদেবের ধর্ম সমান, তাহাদেবের প্রবৃত্তি সমান নয়। বাহাদেবের প্রবৃত্তি সমান, তাহাদেবের সম্পত্তি সমান নহে। অনৈক্য ঘটনার এইরূপ অশেষবিধ হেতু বিদ্যমান থাকাত্তে এক ব্যক্তির সহিত অন্য ব্যক্তির সমস্ত বিষয়ে মিলন হয় না ; সুতরাং সম্পূর্ণরূপে সৌহৃদ্য-ভাবও উৎপন্ন হয় না। যে বিষয়ে বাহাদেবের অন্তঃকরণের ঐক্য হয়, তাহাদেবের সেই বিষয় অবলম্বন করিয়া সদ্ভাব হইতে পারে, এবং যে পর্য্যন্ত অন্য বিষয়ে বৈষম্যভাব উপস্থিত না হয়, সে পর্য্যন্ত সেই সদ্ভাব স্থায়ী হইতে পারে। বাহাদেব সহিত কিয়ৎ বিষয়ে ঐক্য হয়, আমরা এ সংসারে তাঁহাকেই বন্ধু-পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া মনের ক্ষোভ নিবারণ করি। এরূপ বন্ধুও অতি দুর্লভ।

আমরা বাদুশ বন্ধু লাভের নিমিত্ত ব্যাকুল হই, যদিও বাদুশ বন্ধু ধরণী মণ্ডলে নিতান্ত দুর্লভ, তথাচ বন্ধু-ব্যতিরেকে জীবিত থাকা দুঃসহ ক্রেশের বিষয়। জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত-শিরোমণি বেকন্ উল্লেখ করিয়াছেন, বন্ধু-ব্যতিরেকে সংসার একটি অরণ্যমাত্র। অন্যর এক মহাত্মা (সিসিরো) নির্দেশ করিয়াছেন, বন্ধু-হীন জীবন আর সূর্য্য-হীন জগৎ উভয়েই তুলা। তৃতীয় এক ব্যক্তি (হিতোপদেশ-কর্তা) লিখিয়া গিয়াছেন, সংসার রূপ বিষ-বৃক্ষে দুইটি সুরস ফল বিদ্যমান আছে, কাব্যরূপ অমৃত রসের আশ্বাদন ও সজ্জনের সহিত সমাগম। যিনি দুঃখের হস্তে পতিত হইয়াও বন্ধুজনের দর্শন পান, দুঃখ কি কঠোর পদার্থ—তিনি তাহা অবগত নহেন। যিনি বন্ধুগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সম্পদ-সুখ সম্ভোগ করেন, বন্ধু-ব্যতিরেকে বিষয়-সম্পত্তি কেমন অকিঞ্চিৎকর, তাহাও তাহার প্রতীত হয়



না। বন্ধু শব্দ যেমন সুমধুর, বন্ধুর রূপ তেমনি মনোহর। বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাপিত চিত্ত শীতল হয়, এবং বিষয় বদন প্রসন্ন হয়। প্রণয়-পবিত্র সচ্চরিত্র মিত্রের সহিত সহবাস ও সদালাপ করিয়া যেমন পরিতোষ জন্মে, তেমন আর কিছুতেই জন্মে না। তাঁহার সহিত সহসা সাক্ষাৎকার হইলে, কি জানি কি নিমিত্ত শোক-সমৃপ্ত হৃৎখিত ব্যক্তিরও অধরযুগলে মধুর হাস্যের উদয় হয়। দীর্ঘকাল অনশনের পর অন্ন ভোজন করিলে যেমন তৃপ্তি জন্মে, পিপাসায় শুষ্ক-কণ্ঠ হইয়া সুশীতল জল পান করিলে যেমন সুখানুভব হয়, এবং তপন-তাপে তাপিত হইয়া সুবিমল স্নিগ্ধ সমীরণ সেবন করিলে, অঙ্গ-সম্ভাপ দূরীকৃত হইয়া যেমন প্রমোদলাভ হয়, সেইরূপ প্রিয় বন্ধুর সুমধুর সাক্ষাৎ-বাক্য-দ্বারা হৃৎখিত জনের মনের সম্ভাপ অন্তরিত হইয়া সন্তোষসহ প্রবোধ-সুধার সঞ্চার হয়।

বন্ধুত্ব-গুণের প্রশংসা করিয়া শেষ করা যায় না। উহা এমন মনোহর বিষয় যে, শত শত গ্রন্থকার উহার মাধুর্য্য ও মনোহারিত্ব বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কিন্তু কেহই তদ্বিষয়ে মনের ক্ষোভ নিবারণ করিতে সমর্থ হন নাই। ফলতঃ এ স্থলে আমাদের মিত্রতা-ঘটিত কর্তব্য কণ্ঠের বিবরণ করা যত আবশ্যিক মিত্রতার গুণ বর্ণনা করা তত আবশ্যিক নয়। কাহারও সহিত মিত্রতা-সূত্রে বন্ধ হইবার সময়ে কিরূপ অনুষ্ঠান করা উচিত; তৎপরে যতকাল তাঁহার সহিত মিত্রতা থাকে ততকাল কিরূপ আচরণ করা বিধেয়; পরিশেষে যদি বিচ্ছেদ ঘটে, তাহা হইলেই বা কিরূপ ব্যবহার করা কর্তব্য,—এই ত্রিবিধ কর্তব্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ক্রমে ক্রমে লিখিত হইতেছে।

প্রথমতঃ, জ্ঞানবান্ সচ্চরিত্র ব্যক্তি ভিন্ন অন্যের সহিত মিত্রতা করা কর্তব্য নয়। সাধু-সঙ্গ যেমন গুণকারী, অসাধু-সঙ্গ



তেমনি অশুণকারী—ইহা প্রসিদ্ধই আছে। বন্ধুর দোবে আমাদের চরিত্র দূষিত হয়। আমরা যে ব্যক্তিকে একান্ত ভালবাসি ও যাহার সহিত সর্বদা সহবাস করি, তাঁহার দোষ-সমুদায়কে দোষ বলিয়া বিবেচনা করি না; প্রত্যুত, তাঁহার অনুবর্তী হইয়া তদনুরূপ অসদাচরণ করিতেই প্রবৃত্ত হই। তাঁহার দোষ-সমুদায় আমাদের এমন অক্লেশে অভ্যাস পায় যে, জানিতেও পারি না—কিভাবে অভ্যাস হইল। অতএব যখন আমাদের গুণাগুণ ও সুখদুঃখ মিহের গুণাগুণের এত সাপেক্ষ, তখন যে ব্যক্তিকে সচ্চরিত্র ও সর্বিবেচক বলিয়া নিশ্চয় না জানা যায়, তাঁহার সহিত মিত্রতা করা কোনরূপেই শ্রেয়স্কর নয়। যাহার বুদ্ধি ও ধর্ম-প্রবৃত্তি উভয়ই বলবতী, তাঁহারই সহিত মিত্রতা করা কষ্টব্য।

মিত্রের দোষে চিরজীবন দুঃখ পাইবার সম্ভাবনা এবং মিত্রের গুণে চিরজীবন সুখী হইবার সম্ভাবনা। যে দুঃখশালী দুঃশাল ব্যক্তির সহিত কিছুদিন মিত্রতা থাকিয়া বিচ্ছেদ হইয়া যায়, তাহারও সেই অল্প কালের সংসর্গ-দোবে আমাদের চরিত্র এমন দূষিত হইতে পারে যে, ক্রমের মত দোষী থাকিয়া, অশেষবিধ ক্রেশ ভোগ করিয়া কালহরণ করিতে হয়। যদি কিয়ৎকণ হাস্য-কৌতুক ও প্রমোদ-সন্তোগমাত্র বন্ধুত্ব-করণের উদ্দেশ্য হইত, তবে, কেবল পরিহাস-পটু সুরসিক ব্যক্তি দেখিয়া তাঁহারই সহিত বন্ধুত্ব করিতাম। যদি কাহারও নিকট কিছু সাংসারিক উপকার-প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে শিষ্টতা ও সৌজন্য-প্রকাশমাত্র বন্ধুত্ব-করণের প্রয়োজন হইত, তাহা হইলে কেবল উদার-স্বভাব ঐশ্বর্যশালী অথবা ক্ষমতাপন্ন পদস্থ ব্যক্তি দেখিয়া তাঁহারই সহিত বন্ধুত্ব করিতাম। যদি লোক-সমাজে যান্ত্র লোকের মিত্র বলিয়া গণ্য



হওয়া বন্ধুত্ব-করণের অভিসন্ধি হইত, তাহা হইলে কোন লোক-
মান্ত বিখ্যাত ব্যক্তির সহিত বন্ধুত্ব করিবার জন্ত, অথবা লোকের
নিকট তাঁহার বন্ধু বলিয়া কথকিং পরিচিত হইবার নিমিত্ত
অশেষমত চেষ্টা পাইতাম। কিন্তু যদি মিত্রের সহিত মিত্রের
মনোমিলনের নাম মিত্রতা হয়, যদি মিত্রের ক্লেশে ও মিত্রের
বিপদে বিপন্ন হওয়া বিদেয় হয়, যদি মিত্রের দোষ গোপন করিয়া
সুস্পষ্ট পক্ষপাতদোষে দূষিত হওয়া আমাদের স্বভাব-সিদ্ধ হয়,
যদি পাণিষ্ঠ মিত্রের সংসর্গবশতঃ পাপকর্মে প্রবৃত্তি ও অশুভ্রুতি
হওয়া সম্ভাবিত হয়, যদি বন্ধুত্বের কদাচার-জনিত কলঙ্ক শুনিয়া
লজ্জিত ও সন্তপ্ত হওয়া অপকট-হৃদয় সুরদ্বর্গের প্রকৃতি-সিদ্ধ হয়,
তবে কাহারও সহিত মিত্রতা-গুণে বন্ধ হইবার পূর্বে, তাঁহার
গুণ ও চরিত্র যত্নপূর্বক নিরূপণ করা কর্তব্য, তাহার সন্দেহ নাই।
যিনি তোমার সহিত আদ্যীয়তা করিবার বাগনা করেন, তিনি
আপনি আপনার আদ্যীয় কি না, বিচার করিয়া দেখ।

ধরণী-মণ্ডলে ধর্ম-বাহিরেকে আর কিছুই স্থায়ী নহে। ধর্ম
যে মিত্রতার সুলীলুত নয়, তাহা কদাচ স্থায়ী হয় না। বন্ধু যেমন
বিশ্বাসস্থল, এমন আর কেহই নয়। কিন্তু অপাত্রে বিশ্বাস করিলে
অবিলম্বেই প্রতিফল পাইতে হয়। যে ব্যক্তি স্বার্থ-লাভ-প্রত্যাশায়
কাহারও সহিত মিলন করে, যদি বন্ধুজন-সম্পর্কীয় কোন গুহ্য
কথা ব্যক্ত করিলে স্বার্থ লাভ হয়, তবে সে কথা কেন না প্রকাশ
করিবে? যে ব্যক্তি অধর্ম্যচরণ করিয়া অর্থোপার্জন করিতে
বুজিত হয় না, সে বন্ধুজন-সমীপেই-বা বিশ্বাস-খাতকতা করিতে
কেন বুজিত হইবে? যে ব্যক্তি আমাদের আকস্মিক দারিদ্র্য-দশা
উপস্থিত দেখিয়া, আমাদের নিকট উপকার-প্রত্যাশা রহিত হইল



বলিয়া, চিন্তিত ও উৎকণ্ঠিত হয়, সে ব্যক্তি আমাদের হৃদয়ানলে
সাম্বনা-সলিল সেচন করিতে কেন বাগ্র হইবে? এমন ব্যক্তি
যদি আমাদের অপযশ ঘোষণা করিয়া স্বার্থলাভ করিতে পারে,
তবে আমাদের চরিত্রে অসত্য-কলঙ্ক আরোপণ-পূর্বক সূখ্যাতি
লোপ করিতেই বা কেন পরামুখ হইবে? অনেক ব্যক্তি বিশ্বাস-
ঘাতক বন্ধুর বিষয় অত্যাচার-জনিত হৃদয় ক্রেশে কাতর হইয়া
ধাকেন, এ কথা বদার্থ বটে, কিন্তু ঐ ক্রেশ কেবল সেই বন্ধুর
দোষে নয়, নিজ দোষেও উৎপন্ন হইয়া থাকে। অপাত্রে বিশ্বাস-
স্থাপন করাতেই তাঁহাকে ঐ প্রতিকূল প্রাপ্ত হইতে হয়। বন্ধু-
ঘটনার প্রারম্ভ সময়ে যে সমস্ত কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করা উচিত,
তাঁহা না করাতেই উক্তরূপ ক্রেশ-পরম্পরা ভোগ করিতে হয়।
অতএব, অসাধু লোকের সহিত বন্ধুতা করা কোনরূপেই প্রেয়স্বর
নয়। সদ্বিশ্বাসাশালী সচরিত্র দেখিয়া বন্ধু করিবে।

দ্বিতীয়তঃ, যে সময়ে কোন ব্যক্তিকে মিত্র বলিয়া অবধারণ
করা যায়, সেই সময় অবধি তৎসংক্রান্ত কতকগুলি অতি মনোহর
অভিনব ব্রতে আমাদেরকে ব্রতী হইতে হয়। সেই সমুদায় পবিত্র
ব্রতই বা কি, এবং কিরূপেই বা পালন করিতে হয়, পশ্চাৎ তাঁহার
সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিত হইতেছে। যতকাল তাঁহার সহিত
মিত্রতা থাকে, তাবৎ তাঁহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার সম্পাদন
করিতে হয়, তাঁহা অগ্রে নির্দিষ্ট হইতেছে। তাঁহার বিচ্ছেদ বা
প্রাণত্যাগ-জনিত স্মদারূপ শোক-সম্ভাপ যদি আমাদের ভাগ্যে
ঘটে, তাঁহা হইলে, তৎপরে বাবৎকাল জীবিত থাকিতে হয়, তাবৎ-
কাল তদীয় সন্তান-সংক্রান্ত যে যে নিয়ম পালন করা কর্তব্য, তাঁহা
পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইবে।



আমরা তাহার সহিত যদানিয়মে বন্ধুত্ব বন্ধনে বদ্ধ হই, তাঁহাকে অসঙ্কচিত চিত্তে অব্যাহতভাবে বিশ্বাস করা প্রথম কর্তব্য কর্ম যখন আমরা তাঁহাকে নিতান্ত বিশ্বাস-ভাজন বিবেচনা করিয়া, তাহার সহিত সৌহৃদ্য-রূপ বন্ধন বদ্ধ অবলম্বন করিয়াছি, তখন তাহার নিকট অকপটহৃদয়ে হৃদয়-কবাট উন্মোচন করা সর্বতোভাবে কর্তব্য রোমক দেশীয় কোন নীতি-প্রদর্শক (সেনেকা) নির্দেশ করিয়াছেন.—“তুমি তাহাকে আত্মবৎ বিশ্বাস না কর, তাঁহাকে যদি বন্ধু বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাক, তবে তুমি বন্ধুত্ব-গুণের প্রকৃত প্রভাব প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হও নাই; তুমি তাহার প্রতি অনুরক্ত হও, তিনি তোমার হৃদয়-নিয়ন্ত্রে প্রবেশ করিবার উপযুক্ত কি না, দীর্ঘকাল বিবেচনা করিবে। কিন্তু যখন বিচার করিয়া তাঁহাকে যথার্থরূপে উপযুক্ত বলিয়া স্থির করিবে, তখন তাঁহাকে অশ্রংকরণের অভ্যস্তুরে স্থান প্রদান করিবে ” বাস্তবিক মিত্র-সমূহ প্রত্যয় স্থল আর কেহই নাই। প্রকৃত মিত্রের অকপট হৃদয় বিশ্বাস রূপ পরম পদার্থের জন্য-তুমি বলিয়া উল্লিখিত হইতে পারে। তাহার হস্তে ধন-প্রাণাদি সমুদায়ই বিশ্বাস করিয়া অর্পণ করা যায়। কোন বিষয়ই তাঁহার নিকট গোপন রাখিবার বিষয় নয়। যে বিষয় পিতার নিকট বাক্য করিতে শঙ্কা উপস্থিত হয়, পুত্রের নিকট প্রকাশ করিতে সংশয় জন্মে, এবং ভাৰ্য্যা-সমীপেও সময়-বিশেষে গোপন রাখিতে হয়, মিত্র-সম্মুখানে তাহা অসঙ্কচিত-চিত্তে অক্লেপে ব্যক্ত করা যায়।

যে ব্যক্তি একান্ত প্রীতি-ভাজন ও নিতান্ত বিশ্বাস-পাত্র, তাহার কল্যাণ-সাধন-বিষয়ে সহজেই অনুরাগ হইয়া থাকে, এবং বিবেচনা করিয়া দেখিলে, তদর্থে বহু করা সর্বতোভাবে কর্তব্য বলিয়া



অবধারিত হয় ; তাঁহার যদি কোন বিষয়ের অপ্রতুল উপস্থিতি হয়, তাহা হইলে সে অপ্রতুল-পরিহারার্থ সাধ্যানুসারে চেষ্টা করা কঠব্য। যদি তিনি শোক-সন্তাপে সন্তপ্ত হন, তাহা হইলে শ্রীতি-বচন ও যেরূপ বিতরণ দ্বারা সেই সন্তাপের শান্তি করিতে সমর্থ হওয়া উচিত। যদিও আমরা তাঁহার শোক-হৃৎকের ঐকান্তিক নিবৃত্তি করিতে সমর্থ না হই, তথাচ কিছু-না-কিছু শমতা করিতে পারি, তাহার সন্দেহ নাই, কখন কখন প্রশম-পবিত্র প্রবোধ-বচন-দ্বারা তাঁহার হৃৎকের উপর সুখের ছায়া পাতিত করিয়া শোকের বিষয় কিয়ৎকণ বিম্বিত রাখিতে পারি। যদি তিনি নিরপরাধে লোকের নিকট নিম্নিত হন, তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে নির্দোষ জ্ঞানিয়া প্রবোধ দিতে ও তাঁহার মিথ্যা-পবাদ-জনিত মানসিক মানির শমতা করিতে সমর্থ হই, এবং জন-সন্নিধানে তলীয় নির্দোষিতা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত সাধ্যানুসারে চেষ্টা পাইতে পারি। তাঁহার উল্লিখিত-রূপ অশেষ প্রকার উপকার সম্পাদন করা, আমাদের উচিত কৰ্ম্ম। তাঁহার উপকার-সাধনে সমর্থ ও সমর্থ হওয়া, আমাদের সুখের কার্য্য ও সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়া বিবেচনা করা কঠব্য।

বন্ধুর পাশাপাশুর উৎপাটন করা সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর কঠব্য কৰ্ম্ম। আমরা তাঁহার যত প্রকার উপকার-সাধন করিতে পারি, তন্মধ্যে কোন প্রকারই উহার তুল্য কল্যাণকর নয়। যমুন্ময়র পক্ষে কোন পদার্থ ধর্ম্ম অপেক্ষা হিতকারী নহে ; অন্ত-এবং হৃদয়াধিক প্রিয়তম সুহৃৎজনের হৃতপ্রায় ধর্ম্মরত্ন উদ্ধার করিয়া দেওয়া অপেক্ষা অন্য কোন প্রকারে তাঁহার অধিকতর উপকার করিতে সমর্থ হওয়া যায় না। যে সময় যাহাকে বন্ধুত্ব-পদে বরণ করা যায়, সেই সময়ে



তিনি ষথার্থ সচরিত্র থাকিলেও পরে অসচরিত্র হওয়া অসম্ভব নহে। যহুযের মন নিরন্তর একরূপ থাকি সহজ নয় ; পুণ্য-পদবীতে এমণ করিতে করিতে দৈবাৎ পদ-খালন হইয়া বিপদগামী হইবার সম্ভাবনা আছে। বহুজনের এতাদৃশ অকল্যাণকর বিভ্রমনা ঘটিলে, তাঁহাকে পুণ্যপথে পুনরানয়ন করিবার নিমিত্ত সাধ্যানুসারে যত্ন করা কঠব্য। পাণাসক্ত ব্যক্তিকে হিত-বাক্য কহিলে, কি জানি সে বিপরীত ভাবিয়া কষ্ট ও অসন্তুষ্ট হয়, এই বিবেচনায় অনেকে মিলগণের দোষসংশোধন করিতে প্রবৃত্ত হন না ; কিন্তু তাঁহাদের এরূপ ব্যবহার উচিত নয়। পীড়িত ব্যক্তি কটু ও তিক্ত ঔষধ ভক্ষণ করিতে সন্মত না হইলেও তাহাকে ঐ সমুদায় রোগনাশক সামগ্রী সেবন করান যেমন অবশ্যই কঠব্য, অধর্ম-স্বরূপ মানসিক রোগে রুগ্ন ব্যক্তিকেও উপদেশ-ঔষধ সেবন করান, সেইরূপ অবশ্যই কঠব্য ও পুণ্য কর্ম। সে বিষয়ে পরাযুগ হইলে বহুত্ব-ব্রত লঙ্ঘন করা হয়। তাঁহার সন্তোষ-সাধন ও রোগোৎপত্তি-নিবারণ উদ্দেশ্যে মৃদুভাবে সুমধুরভাবে উপদেশ দেওয়া বিধেয়। যদি তিনি বহুত্ব-গুণের প্রকৃত মর্যাদা গ্রহণ করিতে ও আমাদের উপদেশ-বাক্যের অভিসন্ধি বুঝিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে তিনি আপনার অবলম্বিত অধর্ম-পথ পরিত্যাগ করিতে সচেষ্ট হইবেন ও আমাদের প্রতি কষ্ট না হইয়া সমধিক সন্তুষ্ট হইবেন। আমরা তাঁহার ধর্ম-রূপ অমূল্য রত্ন উদ্ধারার্থ প্রবৃত্ত হইয়াছি বলিয়া তিনি আমাদের প্রতি অধিকতর অহুরাগ প্রকাশ করিবেন, এবং প্রণবের সহিত কৃতজ্ঞতা-রস মিলিত করিয়া অপূর্ণ মাধুর্য-ভাব প্রদর্শন করিবেন।

যাঁহারা সরলান্তঃকরণে প্রিয়-বচনে মিত্রগণের দোষোন্মেষ



করিয়া সঙ্গপদেশ প্রদান করিতে পরামুখ হন, তাঁহারা প্রকৃত মিত্র-পদের বাচ্য নহেন। তাঁহারা কোন মিত্রের কু-প্রবৃত্তি-সমুদায় বঞ্চিত হইতে দেখিয়া তাঁহার রোষোৎপত্তির আশঙ্কায় বাক্যমাত্র ব্যয় করেন না, স্পষ্টবাদী শত্রুসকল তাঁহাদের অপেক্ষা হিতকারী সুস্থদ্ বলিষ্ঠা গণ্য হইতে পারে। রোমক-রাজ্যের এক পণ্ডিত কহিয়া গিয়াছেন,—“অনেক ব্যক্তি প্রিয়বদ মিত্র অপেক্ষা বন্ধুত্বের শত্রু-সমীপে অধিক উপকার প্রাপ্ত হইয়াছেন।” কারণ, তাঁহারা উক্তরূপ শত্রুর নিকট সরল বথার্থ কথা শ্রবণ করিয়াছেন, কিন্তু উক্তরূপ মিত্রগণের নিকট কস্মিন্‌কালে শুনেন নাই। তাঁহাদের বিরাগ ও অমুরাগ উভয়ই বিপরীত; কেন না, তাঁহারা অধর্মের অমুরক্তি ও সঙ্গপদেশ-গ্রহণে বিরক্তি প্রকাশ করেন। ধনাঢ্যদিগের মধ্যে অনেকেই, অথবা প্রায় সকলেই, উক্তরূপ মিত্র-মণ্ডলীতে পরিবেষ্টিত থাকেন। তাঁহারা আপনার তুষ্টিকর ভিন্ন অন্য বাক্য শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করেন না এবং তাঁহারা যে সমস্ত পদানত বন্ধুকে বন্ধু-সংোধন করেন, তাহারাও তাঁহাদের সম্ভাষ-জনক ব্যতীত অন্য বাক্য উল্লেখ করিতে সাহসী হয় না। ধনী মহাশয়েরা চতুর্দিক্ হইতে আপন ধনীর প্রতিধ্বনি শুনিতেই ভালবাসেন এবং তদীয় আজ্ঞাবহ মিত্র মহাশয়েরা প্রতি বাক্যতেই তাঁহাদের সে বাসনা সুসিক্ত করিতে থাকেন, পূজা ও পূজক উভয় বন্ধুর মধ্যে এক জন পরিচারণা ও অন্য জন অর্থলাভমাত্র অভিলাষ করেন, তাঁহারা যদি পরস্পর মিত্রশব্দের বাচ্য হইতে পারেন, তবে ক্রীত দাস ও ক্রেতা স্বামীই বা সেই শব্দের প্রতিপাদ্য কেন না হইবে? অকপট-হৃদয়ে অকুণ্ঠিত-ভাবে সঙ্গপদেশ প্রদান করা এবং সান্তিশয় আগ্রহ প্রকাশ-পূর্বক সেই উপদেশ গ্রহণ করা,



বন্ধুত্ব-শৃংখলের প্রকৃত লক্ষণ। সে স্থলে যদি চাটুকারিতা-দোষ উপস্থিত হয়, তবে সে চাটুকারিতা যেমন অনিষ্টকর হইয়া উঠে, বিদ্রোহীদিগের সুস্পষ্ট বিবেচ-বচন কদাচ সেইরূপ অনিষ্টকর নয়।

তৃতীয়তঃ, কাহারও সহিত বন্ধুত্ব-স্থলে বন্ধ হইতে হইলে, সে সময়ে কিকূপ আচরণ করিতে হয় এবং বন্ধ হইবার পরেই বা তাঁহার প্রতি কিকূপ ব্যবহার করিতে হয়, এই দুই বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত লিখিত হইল। এক্ষণে বন্ধুত্ব ঘটিত চরম ক্রিয়ার বিষয় অতি সংক্ষেপে নির্দেশ করা যাইতেছে।

সংপাত্রে প্রণয় সংস্থাপন করিলে, কস্মিন্‌কালে সে প্রণয়ের বিচ্ছেদ হওয়া সম্ভব নয়। যাহারা পূর্ব-নির্দিষ্ট পবিত্র নিয়মামুসারে পরস্পর বন্ধুত্ব-ত্রত অবলম্বন করেন, তাঁহাদের মধ্যে এক জনের অস্বিম দশা উপস্থিত না হইলে, তদীয় বন্ধুত্বেরও অস্বিম দশা উপস্থিত হয় না। কিন্তু ছর্জাগোর বিষয় এই যে, মিত্র-পরিগ্রহ-সময়ে যিনি যত বিবেচনা করেন না কেন ও যত সাবধান হউন না কেন, লক্ষণাক্রান্ত সুজন মিত্র নির্বাচন করিয়া লওয়া সুকঠিন কর্ষ। অবনী-মণ্ডলে জ্ঞান-পবিত্র সূচরিত মিত্র-সদৃশ সুদূর্লভ শল্যার্থ আর কিছুই নাই। আমরা এক সময়ে যাহাকে নিতান্ত নিম্নলব্ধ জানিয়া সুদৃঢ় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি, অল্প সময়ে তাঁহার এমন কলঙ্ক প্রকাশিত হইয়া পড়ে যে, তাঁহার সহিত সৌম্যতা রাখিবার আর পদ থাকে না। যদিও তিনি কোন গুরুতর দৃষ্টদোষে দূষিত না হন, তথাচ একরূপ সন্দিক, সারল্য-হীন ও কোপন-স্বভাব হইতে পারেন যে, তাঁহার প্রণয়-পাত্র ও বিশ্বাস ভাজন হওয়া একেবারে অসম্ভব হইয়া উঠে। অতএব যাহারা পরস্পরের গুণাগুণ বৃত্তিতে অসমর্থ হইয়া বন্ধুত্ব বন্ধনে বদ্ধ হন,



কোন-না-কোন কালে তাঁহাদের সেই বন্ধন একেবারে ছিন্ন হওয়া সম্ভব। যদিও ভাগ্যান্দোব-বশতঃ এতাদৃশ নিদারুণ ঘটনা নিত্যসুই ঘটয়া উঠে, তথাচ তাঁহাদিগের বন্ধন-ঘটিত কষ্টবা কষ্ট-সাধনের সমাপ্তি হয় না। আমরা জন্মাবধি কস্মিন্ কালে বাহার মুখাবলোকন করি নাই, আর বাহার সহিত সহবাস ও সন্লাপ করিয়া পুলকিত-চিত্তে কিয়ংকাল অতিপাত করিয়াছি, সেই উভয়ই আমাদের সমান যত্নের পাত্র বা সমান অবজ্ঞার বিষয় বলিয়া কখনই গণ্য হইতে পারে না। যদিও ঐ শেবোক্ত মুকুট মহাশয় আমাদের সহিত নিত্যসু ভ্রায়-বিরুদ্ধ ব্যবহার করিয়া আমাদের অমুরাগ-লাভের একান্তই অযোগ্য হন, তথাচ তিনি সত্বাবেশ সময়ে বিশ্বাস করিয়া আমাদেরকে যে কোন গোপনীয় বিষয় অবগত করিয়া-ছিলেন, সেই সত্বাবেশ অসম্ভাব হইলেও তাহা কদাচ ব্যক্ত করা উচিত নয়। যে সময়ে কাহারও সহিত সৌহার্দ্য থাকে, সে সময়ে তিনি আপনার মনের কথাট উদ্ঘাটন করিয়া আমাদের নিকটে এতাদৃশ গুহ্য বিষয় প্রকাশ করিতে পারেন যে, তাহা ব্যক্ত হইলে, তাঁহার অশেষ অনর্থের উৎপত্তি হইতে পারে। যদি তাঁহার উক্তরূপ অনর্থের অথবা কিছুমাত্র অনিষ্ট ঘটনার সম্ভাবনা নাও থাকে, তথাচ যখন আমরা তাঁহার নিকটে স্বীকার করিয়াছি — অমুক বিষয় অপ্রকাশ রাখিব, তখন তাহা প্রাণসহে প্রকাশ করা বিধেয় নয়। যদি তাঁহার সমীপে উক্তরূপ বাচনিক অঙ্গীকার নাই করিয়া থাকি, তথাচ তাহার সহিত প্রণয়-পাশে বদ্ধ থাকিতে হয়, তাঁহার নিকটে উক্তরূপ অঙ্গীকার করা প্রথমাবধিই সিদ্ধ হইয়া থাকে। বন্ধুজনের গুহ্য বিষয় ব্যক্ত করা বিহিত নয়, ইহা বন্ধুত্ব-বিষয়ক এক প্রধান নিয়ম বলিয়া নির্দিষ্ট আছে। অতএব



তিনি সদ্ভাব-সবে বিশ্বাস করিয়া সংগোপনে যে বিষয় আমাদের কাছে অবগত করিয়াছেন, সদ্ভাবের অসদ্ভাব হইলেও তাহা চিরকালই হৃদয়-মধ্যে যত্নপূর্বক নিহিত রাখা বিধেয়।

প্রায় সকল বিষয়ই স্থল-বিশেষে সন্ধান করিতে হয়। সৌহৃদের বিভেদ হইলেও সুহৃদ্ভবের গুহ্য বিষয় প্রকাশ করা নিতান্ত নিষিদ্ধ, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু একটি স্থলে উহা নিষিদ্ধ বলিয়া উল্লেখ করা যায় না। যদি তিনি ঘেঁষ-পরবশ হইয়া মিথ্যাংবাদ দিয়া আমাদের নির্দোষ চরিত্রকে দূষিত বলিয়া প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হন, আর তাহার পূর্ব-কথিত কোন গোপনীয় বিষয় ব্যক্ত না করিলে, সে দোষে উদ্ধার পাইবার সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলে, সে বিষয় প্রকাশ করা কদাচ অবেদন বলিয়া অঙ্গীকার করা যায় না। তিনি যখন অনর্থক অপবাদ দিয়া আমাদের অকলঙ্কিত চরিত্রকে কলঙ্কিতব্যং প্রতীয়মান করিতে উদ্বৃত্ত হইলেন, তখন বলিতে হইবে, আমরা যে তাঁহার পূর্ব-কথিত গুপ্ত বিষয় গোপন রাখিব, তিনি আর এরূপ প্রত্যাশা করেন না।

এতাদৃশ সুহৃদ্ভেদ সমধিক যন্ত্রণার বিষয়। কিন্তু অনেকের বন্ধুত্ব ইহা অপেক্ষাও স্থায়ী ও সুখকর হইয়া থাকে। জীবনান্ত-যাতিবৈকে তাঁহাদের সৌহৃদ্য-ভাবের অন্ত হয় না। সুহৃদ্ভাগাশালী উভয় মিত্রের মধ্যে এক জন যদি দুর্ভিক্ষপাক-বশতঃ প্রাণত্যাগ করেন, তাহা হইলে, অন্য জন তখনও একেবারে নিষ্কৃতি পাইতে পারেন না; এবং নিষ্কৃতি পাইতে বাসনাও করেন না। তিনি মিত্রের শোকে বিমূঢ় হইয়া অশ্রু-জলে বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিলেও সে জলে তাঁহার হৃদয়-স্থিত প্রীতির চিহ্ন প্রফালিত হয় না। তিনি বন্ধুর



দেহ দীপ্ত চিতায় দগ্ধ হইতে দেখিলেও সে বন্ধুর কখনোমুখ মনোহর
মুক্তি তাঁহার চিত্তপথ হইতে অপনোত হয় না। তিনি অতি দুঃসহ
শোক-সন্তাপে সন্তপ্ত হইলেও তাঁহার অন্তঃকরণের প্রেমের অকুর
কদাচ দগ্ধ হইয়া ভস্মীভূত হয় না। বন্ধুর মান, বন্ধুর বশ ও বন্ধুর
পরিজন তখন তাঁহার প্রীতি ও স্নেহ অধিকার করিয়া থাকে।
তিনি মৃত বন্ধুর পরিবার ও দেশান্তরনিবাসী অজ্ঞাত-কুল-শীল
ব্যক্তির পরিবার, এই উভয়ের প্রতি কদাচ সমান ভাব প্রকাশ
করিতে পারেন না। তিনি অপরিচিত ব্যক্তির দুরবস্থার বিষয়
তিনিয়া যেমন উদাসীন থাকেন, মৃত বন্ধুর সন্তানের বিপৎ-পতনের
সমাচার তিনিয়া সেরূপ উদাসীন থাকিতে কদাচ সমর্থ হন না।
মৃত বন্ধুকে শ্রদ্ধা রাখা, তাঁহার সদ্গুণ-সমূহ কীৰ্ত্তন করিয়া তদীয়
বশঃ-শশধর বিমল রাখিতে চেষ্টা পাওয়া এবং তাঁহার পরিজনবর্গের
প্রতি অনুরক্ত থাকিয়া তাহাদের প্রতি সৌজ্ঞেয় ও করুণা-ভাব
প্রকাশ করা সর্বতোভাবে বিধেয়।

অক্ষয়কুমার দত্ত ।





সীতার বনবাস—অশ্বমেধ যজ্ঞ

রাজা রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে কৃতসংকল্প হইয়া বশিষ্ঠ, জাবালি, কাশ্যপ, বামদেব প্রভৃতি মহর্ষিবর্গের নিকট আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। বশিষ্ঠদেব শ্রবণমাত্র সাধুবাদ প্রদান পূর্বক কহিলেন, মহারাজ। উদ্যম সংকল্প করিয়াছেন। আপনি সমাগরা সন্ন্যাস পৃথিবীর অধিপতি, অথবা ভূমণ্ডলে যেকোন একাদিপতা বিস্তার করিয়াছেন, পূর্ববর্তী কোন নরপতি সেরূপ করিতে পারেন নাই। রামরাজ্যে প্রজালোকে যেকোন স্থখে ও স্বচ্ছন্দে কাল যাপন করিতেছে, তাহা অদৃষ্টের ও অশক্তপূর্ব। রাজ্যভার গহন করিয়া যে যে বিষয় অনুষ্ঠান করিতে হয়, আপনি তাহার কিছুটা অসম্পাদিত রাখেন নাই, রাজকর্তব্যের মধ্যে অশ্বমেধমাত্র অবশিষ্ট আছে, এক্ষণে তাহা সম্পন্ন হইলেই আপনার রাজাদিকার আর কোন অংশে হীন থাকে না। আমরা ঐতিপূর্বের ভাবিয়াছিলাম, এ বিষয়ে মহারাজকে অনুরোধ করিব। যাহা তউক, মহারাজ যখন স্বয়ং সেই অভিলষিত বিষয়ের অনুষ্ঠানে উদ্যুক্ত হইয়াছেন, তখন আর তাহিবয়ে বিলম্ব করা বিধেয় নহে; অবিলম্বে তত্তপযোগী আয়োজনের অনুমতি প্রদান করুন।

বশিষ্ঠদেব বিবত হইবামাত্র, রামচন্দ্র পার্শ্বোপবিষ্ট অমুজদিগের প্রতি দৃষ্টপাত করিয়া কহিলেন, বৎসগণ। ইনি যাহা কহিলেন, শ্রবণ করিলে। এক্ষণে তোমাদিগের অভিপ্রায় অবগত হইলেই কর্তব্য নিরূপণ করি। আজ্ঞানুবর্তী অনুজেরা তৎক্ষণাৎ আস্থারিক অনুমোদন প্রদর্শন করিলেন। তখন রাম কুলপুরোচিত বশিষ্ঠ-



দেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্ ! যখন আমার অভিলাষ আপনাদিগের অভিমত ও অনুজদিগের অনুমোদিত হইতেছে, তখন আর তদনুযায়ী অনুষ্ঠানের কর্তব্যতা-বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। এক্ষণে আমার বাসনা এই, নৈমিষারণ্যে অভিপ্রেত মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়। নৈমিষারণ্য পরম পবিত্র বক্ষ্যকেন্দ্র। এ বিষয়ে আপনার কি অনুমতি হয়? বশিষ্ঠদেব তদ্বিষয়ে তৎক্ষণাৎ সম্মতি প্রদান করিলেন।

অনন্তর রাগচন্দ্র অনুজদিগকে কহিলেন, দেখ অনর্থক কালহরণ করা বিধেয় নহে; অতএব তোমরা সত্বর সমুদ্র আয়োজন কর। অমুগত, শরণাগত ও মিত্রভাবাপন্ন নৃপতিদিগকে নিমন্ত্রণ কর; সময়-নির্ধারণ-পূর্বক যাবতীয় নগরে ও জনপদে এই সংবাদ ঘোষণা করিয়া দাও, লঙ্কাসমর-সহায় শূরদ্বর্গকে পরম সমাদরে আহ্বান কর; তাঁহারা আমাদের যপার্থ বন্ধু, আমাদের জন্ত অকাতরে কতই ক্লেশ সহ করিয়াছেন, তাঁহারা আসিলে আমি পরম সুখী হইব। তদ্ব্যতিরিক্ত, যাবতীয় ঋষিদিগকেও নিমন্ত্রণ কর; তাঁহারা যজ্ঞদর্শনে আগমন করিলে আমি আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিব। ভরত! তুমি অবিলম্বে নৈমিষকেন্দ্রে গমন করিয়া যজ্ঞভূমি নির্মাণের উদ্যোগ কর, লক্ষ্মণ! তুমি অশ্রান্ত সমস্ত আয়োজন করিয়া সত্বর তথায় প্রেরণ কর। দেখ, যজ্ঞদর্শনের নিমিত্ত নৈমিষে অসংখ্য লোকের সমাগম হইবেক; অতএব যত্নপূর্বক যাবতীয় বিষয়ের এক্রপ আয়োজন করিবে, যেন কোন বিষয়ের অসঙ্গতি নিবন্ধন কাহারও কোন ক্লেশ বা অসুবিধা ঘটে না। তুমি সকল বিষয়ে পারদর্শী, তোমার অধিক উপদেশ দিবার প্রয়োজন নাই।



এই বলিয়া রাম বিরক্ত হইলে বশিষ্ঠদেব তাঁহাকে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, মহারাজ ! সকল বিষয়েরই উচিতাধিক আয়োজন হইবেক, সন্দেহ নাই, কিন্তু আমি এক বিষয়েরই একান্ত অসঙ্গতি দেখিতেছি। তখন রাম কহিলেন, আপনি কোন্ বিষয়ে অসঙ্গতি আশঙ্কা করিতেছেন, বলুন। বশিষ্ঠ কহিলেন, মহারাজ ! শাস্ত্রকারেরা কহেন সত্বীক হইয়া ধর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান করিতে হয়। অতএব জিজ্ঞাসা করি, সে বিষয়ের কি উপায় ভাবিয়া রাখিয়াছেন? শ্রবণমাত্র রামের মুখকমল হ্রান ও নয়নযুগল অশ্রু-জলে পরিপ্লুত হইয়া উঠিল। তিনি কিয়ৎকণ অবনত বদনে মোনাবলম্বন করিয়া রহিলেন, অনন্তর, দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্বক, নয়নে অশ্রু মার্জন ও উচ্ছলিত শোকাবেগ সংবরণ করিয়া কহিলেন, ভগবন্। ইতিপূর্বে এ বিষয়ে আমার উদ্বোধনাত্মক হয় নাই; এক্ষণে কি কঠবা, উপদেশ করুন। বশিষ্ঠদেব অনেককণ একাগ্র চিত্তে চিন্তা করিয়া কহিলেন, মহারাজ ! ভাৰ্য্যাস্তরপরিগ্রহ-ব্যতিরেকে উপায়াস্তর দেখিতেছি না।

বশিষ্ঠবাক্য শ্রবণ করিয়া সকলেই এক কালে মোনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। রাম নিত্যান্ত সীতাগতপ্রাণ, লোকবিরাগ-সংগ্রহ-ভরে সীতাকে বনবাসে প্রেরণ করিয়া জীবন্ত হইয়া ছিলেন। তাঁহার প্রতি রামের যে অবিচলিত স্নেহ ও ঐকান্তিক অশ্রু-রাগ ছিল, এ পর্য্যন্ত তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটে নাই। সীতার মোহন মূর্তি অহোরাত্র তাঁহার অন্তঃকরণে জাগরুক ছিল। তিনি যে উপস্থিত কার্য্যাসুরোধে ভাৰ্য্যাস্তরপরিগ্রহে সম্মত হইবেন, তাহার কোন সম্ভাবনা ছিল না। বাহা হউক, বশিষ্ঠদেব দার-পরিগ্রহ-বিষয়ে বারংবার অশ্রুরোধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু রাম



তদ্বিবরে ঐকান্তিকী অনিচ্ছা প্রদর্শন করিয়া মৌনভাবে অবনত-
বদনে অবহিত রহিলেন, অনন্তর, বহুবিধ বাণীমুখাদের পর
হিরণ্ময়ী সীতা প্রতিকৃতি-সমভিব্যাহারে যজ্ঞানুষ্ঠান করাই সর্ব্বাংশে
শ্রেয়ঃকর বলিয়া যীমাংসিত হইল।

এইরূপে সমুদয় স্থিরীকৃত হইলে ভরত সর্বাগ্রে নৈমিষে প্রস্থান
করিলেন, এবং সমুচিত স্থানে যজ্ঞভূমি নিরূপণ করিয়া অমুরূপ
চাস্তরে পৃথক্ পৃথক্ প্রদেশে এক এক শ্রেণীর লোকের নিমিত্ত,
তাহাদের অবস্থোচিত বাসশ্রেণী নির্মাণ করাইলেন। লক্ষ্মণও
অনতিবিলম্বে অশেষবিধ অপৰ্য্যাপ্ত আহারসামগ্রী ও শয্যাসনাদি
সংগ্রহ করিয়া যজ্ঞক্ষেত্রে প্রেরণ করিলেন। অনন্তর রামচন্দ্র
লক্ষ্মণকে রক্ষক নিযুক্ত করিয়া, বণ্যবিধানে যজ্ঞীয় অথ ঘোচন-
পূর্ব্বক, মাতৃগণ ও অপরাপর পরিবারবর্গ-সমভিব্যাহারে সসৈন্তে
নৈমিষারণ্যে প্রস্থান করিলেন।

কিয়ৎ দিন পরেই, নিমন্ত্রিতগণের সমাগম হইতে আরম্ভ হইল।
শত শত নৃপতি বহুবিধ মহামূল্য উপহার লইয়া অমুচরগণ
ও পরিচারকবর্গ-সমভিব্যাহারে উপস্থিত হইতে লাগিলেন;
সহস্র সহস্র ঋষি যজ্ঞদর্শনমানসে, ক্রমে ক্রমে নৈমিষে আগমন
করিতে লাগিলেন; অসংখ্য নগরবাসী ও জনপদবাসীরাও সমাগত
হইলেন। ভরত ও শক্রয় নরপতিগণের পরিচর্য্যার ভার গ্রহণ
করিলেন, বিভীষণ ঋষিগণের কিঙ্করকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন;
শুগ্ৰীব অপরাপর দ্বাবতীয় নিমন্ত্রিতবর্গের তত্ত্বাবধানে ব্যাপৃত
রহিলেন।

এদিকে মহর্ষি বাম্বীকি সীতার অবস্থা অবলোকন করিয়া,
এবং কুশ ও লবের বয়ঃক্রম দ্বাদশ বৎসর পূর্ণ দেখিয়া, মনে মনে



সর্বদা এই আন্দোলন করেন যে, সীতার বেরূপ অবস্থা দেখিতেছি, তাহাতে তিনি অধিক দিন জীবিত থাকিবেন, এক্ষণ বোধ হয় না ; আর কুশ ও লব রাজাধিরাজতনয় হইয়া বাবজীবন তপোবনে কালযাপন করিবেন, ইহাও কোনক্রমে উচিত নহে ; তাহাদের ধর্ম্মের ও রাজধর্ম্ম শিকার সময় বহিয়া যাইতেছে । অতএব যাহাতে সম্পূর্ণ সীতা অবিলম্বে রামচন্দ্র-পরিগৃহীতা হন, আশু তাহার কোন উপায় উদ্ভাবন করা আবশ্যক । অথবা, উপায়ান্তর-উদ্ভাবনে প্রয়োজন কি ? শিশু-স্বারা সংবাদ দিয়া রামচন্দ্রকে আমার আশ্রমে আনাই, অথবা স্বয়ং রাজধানীতে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, সম্পূর্ণ সীতার পরিগ্রহ প্রার্থনা করি । রামচন্দ্র অবশ্যই আমার অমুরোধ রক্ষা করিবেন । এইরূপ ভাবিয়া জগদকাল মৌনভাবে থাকিয়া মহর্ষি পুনরায় চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি অত্যন্ত লোকান্তরগপ্রিয় ; কেবল লোকবিরাগ-সংগ্রহ-ভয়ে পূর্ণগর্ভ অবস্থায়, নিতান্ত নিরপরাধে জ্ঞানকীরে পরিত্যাগ করিয়াছেন , এখন আমার কণায়, তাঁহারে সহজে গ্রহণ করিবেন, তাহাও সম্পূর্ণ সন্দেহহীন । যাহা হউক, কোন সংবাদ না দিয়া নিশ্চিন্ত থাকা উচিত হইতেছে না । এই দুই বালক উত্তরকালে অবশ্যই কোশলসিংহাসনে অধিরোহণ করিবেন , এই সময়ে পিতৃসমীপে নীত হইয়া, নীতিশাস্ত্রাদি বিষয়ে বিধিপূর্বক উপদ্রষ্ট না হইলে ইহার রাজকাৰ্য্য-নির্বাহে একান্ত অপটু ও রাজমর্যাদা-রক্ষণে নিতান্ত অক্ষম হইবেন , বিশেষতঃ রাজা রামচন্দ্র আমাকে কোশলরাজ্যের হিতসাধনে যত্নবিহীন বলিয়া অমুযোগ করিতে পারেন , অতএব এ বিষয়ে আর উপেক্ষা প্রদর্শন করা বিধেয় নহে । এক্ষণে রামচন্দ্রের নিকট সকল বিষয়ের সবিশেষ সংবাদ



প্রেরণ করা উচিত। অথবা, একেবারেই তাঁহার নিকট সংবাদ না পাঠাইয়া, বশিষ্ঠ বা লক্ষ্মণের সহিত পরামর্শ করা কর্তব্য ; তাঁহারাষ্ট বা কিরূপ বলেন, দেখা আবশ্যক।

একদিন মহর্ষি সায়ংসন্ধ্যা ও সন্ধ্যাকালীন হোমবিধি সমাধান করিয়া আসনে উপবেশন-পূর্বক একাকী এই চিন্তায় মগ্ন আছেন, এমন সময়ে এক রাজভৃত্য আসিয়া রামনামাক্রিষ্ট অশ্বমেধ-নিমন্ত্রণ-পত্র তদীয় হস্তে সমর্পণ করিল। মহর্ষি পত্র পাঠ করিয়া, পরম-শ্রীতি-প্রদর্শন-পূর্বক সেই লোককে বিশ্রাম করিবার নিমিত্ত বিদায় দিলেন, এবং শিষ্ণুদিগকে তাহার আহাঙ্গাদির সম্বন্ধে আদেশ প্রদান করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, আমি যে বিষয়ের নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছি, দৈব অন্তকুল হইয়া তৎসিদ্ধির বিলক্ষণ উপায় করিয়া দিলেন। এক্ষণে বিনা প্রার্থনায় কার্যসাধন করিতে পারিব। কুশ ও লবকে শিশুভাবে সমভিব্যাহারে লইয়া যাইব। রামের ও ইহাদের আকারগত যেরূপ সৌন্দর্য্য, দেখিলেই সকলে ইহাদিগকে রামের তনয় বলিয়া অনাবাসে বুঝিতে পারিবেক, আর অবলোকনমাত্র রামেরও হৃদয় নিঃসন্দেহ প্রবীভূত হইবেক ; এবং তাহা হইলেই আমার অভিপ্রোতসিদ্ধির পথ স্বতঃ পরিস্কৃত হইয়া আসিবেক।

মনে মনে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া মহর্ষি, জ্ঞানকৌরু কুটীরে উপস্থিত হইলেন, এবং কহিলেন, বৎসে! রাজা রামচন্দ্র অশ্বমেধ মহাযজ্ঞের অন্ত্যষ্ঠান করিয়া নিমন্ত্রণপত্র পাঠাইয়াছেন ; কল্যাণপ্রভৃষে প্রস্থান করিব, মানস করিয়াছি ; অপরাপর শিষ্যের জ্ঞায় তোমার পূজ্যহৃদয়ে যন্ত্রদর্শনে লইয়া যাইব। সীতা তৎক্ষণাৎ সম্মতি প্রদান করিলেন। মহর্ষি আশ্রুকূটীরে প্রত্যাগমন করিয়া



শিষ্যদিগকে আহ্বান-পূর্ব্বক প্রস্তুত হইয়া থাকিতে কহিয়া দিলেন, এবং কুশ ও লবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেখ, এ পর্য্যন্ত তোমরা জনপদের কোন ব্যাপার অবলোকন কর নাই ; রামায়ণ-নায়ক রাজা রামচন্দ্র অশ্বমেধের অনুষ্ঠান করিয়াছেন ; ইচ্ছা করিয়াছি, তোমাদিগকে যজ্ঞদর্শনে লইয়া যাইব। তোমাদের যজ্ঞদর্শন ও আত্মমুগ্ধিক রাজদর্শন সম্পন্ন হইবে, এবং তথায় যে অসংখ্য জনপদবাসী লোক সমবেত হইবেক, তাহাদিগকে দেখিয়া তোমরা অনেক অংশে লৌকিক বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারিবে। তাহারাই হই সন্যাসের রামায়ণে রামের অলৌকিক কীর্তি পাঠ করিয়া, তাঁহাকে সর্ব্বাংশে অধিতীয় পুরুষ বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছিল, তাঁহাকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিব, এই ভাবিয়া তাহাদের আশ্রমের আর সীমা রহিল না। তদ্ব্যতিরিক্ত, যজ্ঞানুষ্ঠান-সংক্রান্ত সমারোহ ও নানাদেশীয় বিভিন্নপ্রকার অসংখ্য লোকের একত্র সমাগম অবলোকন করিব, এই কৌতুহলও বিলক্ষণ প্রবল হইয়া উঠিল।

বান্ধাকিমুখে রামের নাম শ্রবণ করিয়া সীতার শোকানল-প্রবল বেগে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, নয়নধুগল হইতে অনর্গল অশ্রুজল নির্গলিত হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরেই তাঁহার অন্তঃকরণে সহসা ভাবান্তর উপস্থিত হইল। রাম সীতাগত-প্রাণ বলিয়া তাঁহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল ; আর তিনি ইহাও স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, নিষ্ঠাস্ত অনায়াস হওয়াতেই রাম তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু যজ্ঞানুষ্ঠানবাস্তা-শ্রবণে-রাম অবশ্যই ভাৰ্য্যাপুর পরিগ্রহ করিয়াছেন, এই ভাবিয়া তিনি একেবারে দ্রিষ্টমান হইলেন। যে সীতা অকাতরে পরিত্যাগহুঃখ



সহ করিয়াছিলেন, রাম পুনরায় দারপরিগ্রহ করিয়াছেন, এই শোক সেই সীতার পক্ষে একান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল। পূর্বে তিনি যনে ভাবিতেন, যদিও নিতান্ত নিরপরাধে নির্দোষিত হইয়াছি, কিন্তু আমার প্রতি তাঁহার যেরূপ অবিচলিত স্নেহ ও ঐকান্তিক অনুরাগ ছিল, তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটে নাই এক্ষণে স্থির করিলেন, যখন পুনরায় দারপরিগ্রহ করিয়াছেন, তখন অবশ্যই সেই স্নেহের ও অনুরাগের অন্তর্যাতন ঘটিয়াছে।

সীতা নিতান্ত আকুল চিত্তে এই চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে কুশ ও লব সহসা তলীয় কুটীরে প্রবিষ্ট হইয়া কহিল, মা! মহর্ষি কহিলেন, কলা আমাদিগকে রাজা রামচন্দ্রের অশ্বমেধদর্শনে লইয়া যাইবেন। যে লোক নিমন্ত্রণপত্র আনিরাছিল, আমরা কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া তাহার নিকটে গিয়া রাজা রামচন্দ্রের বিষয়ে কত কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। দেখিলাম, রাজা রামচন্দ্রের সকলই আলৌকিক কাণ্ড। কিন্তু মা! এক বিষয়ে আমরা মোহিত ও চমৎকৃত হইয়াছি। রামায়ণ পাঠ করিয়া তাঁহার উপর আমাদের যে প্রগাঢ়ভক্তি জন্মিয়াছিল, এক্ষণে সেই ভক্তি সহস্র গুণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। কথায় কথায় শুনিলাম, রাজা প্রজারক্তনা-মুরোধে নিজ প্রেয়সী মহিষীকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। তখন, আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, তবে বৃষি রাজা পুনরায় দারপরিগ্রহ করিয়াছেন, নতুবা যজ্ঞানুষ্ঠানকালে সহধর্মিণী কে হইবেক? সে কহিল, যজ্ঞসমাপন্যার্থ বশিষ্ঠদেব রাজাকে পুনরায় দারপরিগ্রহের জন্ত অনেক অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু রাজা তাহাতে কোন ক্রমেই সম্মত হন নাই। হিরণ্যয়ী সীতাপ্রতিকৃতি নির্মাণ করাইয়াছেন, সেই প্রতিকৃতি সহধর্মিণীকার্য্যে নির্বাহ করিবেক।



দেখ যা ! এমন মহাপুরুষ কোনকালে ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করেন নাই । রামচন্দ্র রাজধর্ম-প্রতিপালনে যেমন তৎপর, দাম্পত্যধর্ম-প্রতিপালনেও তদন্তরূপ যত্নশীল । আমরা ইতিহাস-গ্রন্থে অনেকানেক রাজার ও অনেকানেক মহাপুরুষের বৃত্তান্ত পাঠ করিবাছি, কিন্তু কেহই কোন অংশে রাজা রামচন্দ্রের সমকক্ষ নহেন । প্রজারঞ্জনানুরোধে প্রেয়সী-পরিত্যাগ ও সেই প্রেয়সীর রেহে যাবজ্জীবন ভার্যাস্তরপরিগ্রহে বিমুখ হইয়া কালহরণ করা, এ উভয়ই অভূতপূর্ব ব্যাপার । বাহা ইউক, যা ! রামায়ণ পাঠ করিয়া অবধি আমাদের একান্ত বাসনা ছিল, একবার রাজা রামচন্দ্রকে দর্শন করিব, এক্ষণে সেই বাসনা পূর্ণ করিবার এই বিশক্ষণ সুযোগ ঘটিয়াছে, অনুমতি কর, আমরা মহর্ষির সহিত রামদর্শনে যাই, সীতা অনুমতি প্রদান করিলেন, তাহারাও হুই সহোদরে সান্তিশয় হর্ষিত হইয়া মহর্ষি-সমীপে গমন করিল ।

রামচন্দ্র পুনরায় দারপরিগ্রহ করিয়াছেন, এই আশঙ্কা জন্মিবার যে অতি বিষম বিবাদবিষে সীতার সর্বশরীর আচ্ছন্ন হইয়াছিল, হিরণ্যবী প্রতিকৃতির কথা শ্রবণ করিয়া তাহা সম্পূর্ণরূপে অপসারিত এবং তদীয় চিরপ্রদীপ্ত শোকানল অনেক অংশে নির্বাপিত হইল তখন, তাঁহার নয়নযুগল হইতে আনন্দবাম্প বিগলিত হইতে লাগিল এবং নির্বাসনক্ষেভ তিরোহিত হইয়া তদীয় হৃদয়ে অভূতপূর্ব সৌভাগ্যগর্ভ আবির্ভূত হইল ।

পরদিন প্রভাত হইবামাত্র, মহর্ষি বান্দ্রীকি কুশ, লব ও শিষ্যবর্গ সমভিব্যাহারে নৈমিষে প্রস্থান করিলেন । দ্বিতীয় দিবস অপরাহ্ন সময়ে তথার উপস্থিত হইলে বশিষ্ঠদেব পরম সমাদর-প্রদর্শন-পূর্বক তাঁহাকে ও তাঁহার শিষ্যদিগকে নির্দিষ্ট বাসস্থানে লইয়া গেলেন ।



কৃণ ও লব দূর হইতে রাম দর্শন করিয়া পুলকিত হইল, এবং পরস্পর কহিতে লাগিল, দেখ ভাই! রামায়ণে রাজা রামচন্দ্রের যে সমস্ত অলৌকিক গুণ কীর্তিত হইয়াছে, তাহা ইহার আকারে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে, দেখিলেই অলৌকিক গুণসমুদয়ের একাধার বলিয়া স্পষ্ট প্রতীতি জন্মে। ইনি যেমন সৌম্যমুদ্রিতেনই গম্ভীরাকৃতি। আমাদের গুরুদেব বৈষ্ণব অলৌকিক কবিত্ব-শক্তিসম্পন্ন, রাজা রামচন্দ্র তেমনই অলৌকিক গুণসমুদয়-সম্পন্ন, বলিতে কি, একরূপ মহাপুরুষ নারকস্থলে পরিণতীত না হইলে, ভগবৎপ্রণীত মহাকাব্যের এত গৌরব হইত না। রাজা রামচন্দ্রের অলৌকিক গুণকীৰ্ত্তনে নিরোজিত হওয়াতেই মহাবীর অলৌকিক কবিত্বশক্তির সম্পূর্ণ সার্থকতা সম্পাদিত হইয়াছে। যাহা হউক, এত দিনে আমাদের নয়নের চরিতার্থতা লাভ হইল।

ক্রমে ক্রমে যাবতীয় নিমজ্জিতগণ সমবেত হইলে নিক্রান্ত দিবসে মহাসমারোহে সংকল্পিত মহাযজ্ঞের আনন্দ হইল, অসংখ্য অসংখ্য দীন দরিদ্র অনাথগণ পৃথক পৃথক প্রার্থনার যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে লাগিল, অন্নার্থী অপর্যাপ্ত অন্নলাভ, অর্থালিখী প্রার্থনাধিক অর্থলাভ, ভূমিকাজ্ঞী অভিলষিত ভূমিলাভ করিতে লাগিল। ফলতঃ, যে ব্যক্তি যে অভিলাষে আগমন করিতে লাগিল, আগমনমাত্র তাহার সেই অভিলাষ পূর্ণ হইতে লাগিল। অনবরত চতুর্দিকে নৃত্য কী্ত বায়ুক্রিয় হইতে লাগিল, সকলেই যনোহর বেশভূষা ধারণ করিল। সকলেরই মুখে আনন্দ ও আশ্বাসের সম্পূর্ণ লক্ষণ স্পষ্ট লক্ষিত হইতে লাগিল, কাহারও অন্তঃকরণে কোনপ্রকার দুঃখ বা ক্রোধের সন্ধান আছে, একরূপ বোধ হইল না, যে সকল দীর্ঘজীবী রাজা, ঋষি বা অন্তাদৃশ



লোক যজ্ঞদর্শনে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা যুক্তকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, আমরা কখন এক্ষণ যজ্ঞ দর্শন করি নাই ; অতীতবেদী ব্যক্তিরাজ কহিতে লাগিলেন, কোন কালে কোন রাজা ঈদৃশ সমৃদ্ধি ও সমারোহ-সহকারে যজ্ঞ করিতে পারেন নাই, রাজা রামচন্দ্রের সকলই অদ্বুত কাণ্ড ।

এইরূপে প্রত্যহ মহাসমারোহে যজ্ঞক্রিয়া হইতে লাগিল, এবং যাবতীয় নিয়ন্ত্রিতগণ সভায় সমবেত হইয়া, যজ্ঞসংক্রান্ত সমৃদ্ধি ও সমারোহ দর্শন করিতে লাগিলেন ।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ।



জাতীয় ভাব

কয়েক বৎসর হইল, বিশেষ প্রজ্ঞাভাজন একটা ইউরোপীয়ের সহিত আমার নিম্নলিখিতরূপ কথোপকথন হইয়াছিল।

তিনি বলিলেন, স্বাধীনতা হারাইয়া জাতীয় ভাব পরিবর্তনের চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র।

আমি বলিলাম, কোন জিনিস হারাইলে তাহা ত পাইবার জন্য যুঁজিতে হয়—জাতীয় ভাব পরিবর্তনের বে চেষ্টা, তাহাই কি ঐ হারানো জিনিসটার অমুসন্ধান নয় ?

তিনি। কথ্যটা বেশ সূক্ষ্ম করিয়াই বলিলে বটে—এ-কথার কোন সাক্ষাৎ উত্তর নাই—কিন্তু যাহা অতল জলে পড়িয়া গিয়াছে, অথবা যাহা কখনই হাতে ছিল না, তাহা যুঁজিতে যাওয়া কি বৃথা পরিশ্রম এবং সময় নষ্ট করা নয় ? একপে আশ্বাস করা অপেক্ষা অন্তরূপ চেষ্টা করা ভাল বলিয়াই বোধ হয়।

আমি। অল্প কোন দ্রবোর জন্য অথবা অল্প কোন প্রকার চেষ্টা করিতে বলেন, তাহা বলুন, প্রজ্ঞাদিত হইয়াই শুনিব। কিন্তু আমরা যাহা যুঁজিতেছি, তাহা যে অতল জলে পড়িয়াছে, তাহা ত জলে নামিয়া না দেখিলে নিশ্চয় হইতে পারে না। আর, যে জিনিসটা হারাইয়া গিয়াছে মনে করিতেছি, তাহা যে পূর্বে হাতে ছিল না, তাহাই বা কেমন করিয়া মনে করিব। এ-জিনিসটা এমন যে, উহা হারাইয়াছে মনে করিলেই উহা যে হাতে ছিল, তাহার প্রমাণ হয়।



তিনি তোমার আমার আর ওরূপ ছেদো কথায় কাজ নাই। আমি নিজ জীবনবৃত্তের কিকিৎ বলিতেছি, তাহা শুনিলেই আমার মনের সকল ভাব বৃদ্ধিতে পারিবে। আমার জন্মস্থান আয়ারলণ্ড দ্বীপ আমার পিতা রোমান ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী ছিলেন—আমি ডাবলিন নগরে একটা কলেজে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলাম। ১৮৪৮ অব্দে সমুদয় ইউরোপ-ব্যাপক যে রাষ্ট্র-বিপ্লব হইয়াছিল, সেই বিপ্লবের একটা ঢেউ আয়ারলণ্ডে আসিয়া লাগে এবং তথায় উপদ্রব জন্মায়। আমি কয়েকজন সমাধায্যীর সহিত ঐ উপদ্রবে যোগ দিয়াছিলাম। আমাদের মনে জাতীয় ভাবের অত্যধিক উদ্বেক হইয়াছিল। ইংরাজ গভর্নমেন্ট ঐ উপদ্রব শাস্ত করিলেন। আমি জেলে গেলাম। পরে জেল হইতে পলাইয়া ফরাসিদিগের দেশে আশ্রয় লাভ করিয়া বহু বৎসর ঐ দেশে বাস করিয়াছিলাম। অনন্তর ইংলণ্ডে আসিয়া কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হই, এবং ব্যোবুজি-সহকারে আমার এই প্রতীতি জন্মে যে, আমার হৃদয়স্থিত সংকীর্ণ আইরিস জাতীয় ভাবটা, সুবিস্তীর্ণ ব্রিটিশ জাতীয় ভাবে পর্যাবসিত হওয়াই উচিত, এখন তাহাই হইয়াছে, এবং তাহা হইয়াছে বলিয়াই বলিতেছি যে, তোমাদিগেরও এই উখানোগ্রুথ ভারতবর্ষীয় ভাব ব্রিটিশ জাতীয় ভাবে পর্যাবসিত হওয়া বিধেয়।

আমি আপনার জীবনবৃত্তের যে ব্যাপারগুলি শুনিলাম, তাহাতে দুইটা তথ্য উপলব্ধ হইল। এক তথ্য এই যে, আপনি আমাদিগের মনের ভাব অনেকটা বৃদ্ধিতে পারিবেন। দ্বিতীয় তথ্য এই যে, অনেকটাই বৃদ্ধিতে পারিবেন না। বৃদ্ধিতে পারিবেন যে, আমরা বাচিয়া থাকিতে চাই, একেবারে ইংরাজের জিনিস হইয়া



বাহিতে চাহি না। বৃত্তিতে পারিবেন না যে, আমরা ইংলণ্ড হইতে স্বাতন্ত্রিকতা চাহি না,—অন্ততঃ বহুকালের জন্য তাহা চাহি না। আপনাদের মনে যেমন জাতীয় ভাবের উদ্রেক হয়, অমনি আপনারা ইংরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া বসেন। আমাদের মনে জাতীয় ভাবের উদ্রেকে আমরা রাজ্যবিদ্রোহ করিতে চাই না। আমরা বেশী করিয়া ইংরাজী শিক্ষা, বেশী করিয়া সংস্কৃতের সমাদর করি, কাঙ্গকর্ষ এমন যত্ন এবং শয়-সহকারে নির্বাহ করিবার চেষ্টা করি বাহাতে ইংরাজ রাজপুরুষেরাও আমাদের দ্বারা পরাস্ত হয়েন। স্বজাতীয় কোন মনিবের অধীন থাকিয়া যদি চাকুরি করিতে হয় তাহা বিশেষ যত্ন এবং পরিশ্রম-সহকারে নির্বাহ করি, আর সম্মান-সম্মতিকে দৃঢ়কায়, পরিশ্রমী, বিদ্বান্ এবং অধ্যয়নিষ্ঠ ও স্বজাতির মুখোপেক্ষী করিবার নিমিত্ত নিরন্তর প্রাণপণ যত্ন করি।

তিনি ঐগুলি ত অতি সাধারণ কাজ বলিয়াই বোধ হয়। স্বজাতিবৎসল না হইলে কেহ স্বদেশবৎসল হইতে পারেন না ঐ সকল কাজে জাতীয় ভাব বর্ধনের উপায় হয় বটে, কিন্তু জাতীয় ভাব উৎপাদনে উহাদিগের তেমন বিশেষ উপযোগিতা নাই। রাজনীতিক বিষয়ে বিচার করিবার জন্য সভা স্থাপন করা—প্রকাশ্যে বক্তৃতা করা পুস্তিকা বিবচন করা, এই সকল কার্যের প্রতি তুমি কি আস্থাশীল ?

আমি ও সকল কাজে আমার আস্থা নাই, এমত নহে ; তবে ও-গুলির প্রতি আপনাদিগের বক্তৃতা আস্থা আছে বলিয়া মনে করি, আমার আস্থা বোধ হয় তত অধিক নয় ও-গুলি ইংরাজাধিকারে ইংরাজী শিক্ষার অবশ্যস্তাবী ফল, এবং নিরবচ্ছিন্ন



অমুচিকীর্ষা-প্রসূত, এই জন্ত কিয়ৎ পরিমাণে অবশ্যই অন্তঃসারশূন্য। আমি দুইটী দৃষ্টান্ত-দ্বারা দেখাইতেছি, বহুতাদি-দ্বারা আন্দোলনের ফল কিরূপ হয়। প্রথমটী সফল আন্দোলনের দৃষ্টান্ত। কোন সময়ে ইংরাজ-ভূম্যধিকারিগণের পক্ষপাতা ব্যবস্থার বলে ইংলণ্ডে বৈদেশিক শস্তের আমদানী বন্ধ ছিল। সেই ব্যবস্থা রহিত করিলে ইংলণ্ডের প্রজাসাধারণের উপকার হইবে, এই কথা প্রতিপন্ন করিবার জন্ত কবুডেন সাহেব সভা-সংস্থাপন, প্রকাণ্ডে বহুতা-প্রদান, এবং পুস্তিকার-চর্চাদি করাইয়া যৎপরোনাস্তি প্রয়াস পাইয়াছিলেন, পরিশেষে তৃত্তিক উপস্থিত হওয়াতে মহিদল অগত্যা তাঁহার মতামুবত্তনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এ স্থলে ইংরাজে ইংরাজে কথা, অর্থাৎ লাভের ভাগীও ইংরাজ, আর লোকসানের ভাগীও ইংরাজ—আবার তাহাতে একটি তৃত্তিকের সমাগম যদি একপ মণিকাঞ্চনযোগ উপস্থিত না হইত, তাহা হইলে কি কবুডেন সাহেবের কৃত আন্দোলনের কোন ফল দর্শিত? দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটী একটি বিফল আন্দোলনের। এই আন্দোলনের ক্ষেত্র আপন্যারই ক্ষমভূমি আরলও। এই আন্দোলনের কথা কবুডেনের অপেক্ষাও শতগুণে শেষ্ঠ—বাগ্গিবর ওকোনেল সাহেব, আরলওর কাপলিক সম্প্রদায়ভুক্ত আবামবুদ্ধবানিতা যাবতীয় ব্যক্তি ওকোনেলকে দেবতুল্য ভক্তি করিত—দুই দিন, চারি দিন, দশ দিনের পথ হইতে তাঁহার বহুতা তিনিতে আসিত; তিনি হুকুম করিয়া পাঠাইলেই কাপলিক বাড়কগণ চতুর্দিক হইতে লোক সংগ্রহ করিয়া সমভিব্যাহারে অনিত ও লইয়া বাইত। তাঁহার অনুচরের এবং পারিষদের কোন অভাব ছিল না।—তিনি সমস্ত আরলওর একাধিপতি-স্বরূপ হইয়াছিলেন। কিন্তু তৎকৃত



রাজনৈতিক আন্দোলনের ফল কি হইল? পুলিশ হইতে যেমন পরওয়ানা বাহির হইল, অমনি লোকসমাগম ধামিল—রাজ্যের উপদ্রাবক বলিয়া মহাত্মা ওকোনেল আদালতে অভিযুক্ত হইলেন— তিনি জেলে গেলেন—কয়েক বর্ষ সেইখানে থাকিতে থাকিতেই তাঁহার বল, বুদ্ধি, শৈশীর্ষ্য, গাভীর্ষ্য, বাগ্মিতা সকলই বিলুপ্ত হইয়া গেল—তিনি পরে দেশত্যাগী হইয়া বন্ধুবান্ধববিহীন পররাজ্যে দেহভাগ করিলেন।

তিনি। ওকোনেল নিজের দোহেই সকল হারাইয়াছিলেন। তিনি যেমন বাগ্মিপ্রধান যদি হেমনি কার্যকুশল হইতেন, তবে আর দেশের লোকেরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিত না। আয়ার্লণ্ড অবশ্য স্বাধীনতা লাভ করিত

এই কথাগুলি বন্ধুবর কিছু বাগ্মতা-সহকারে এবং একটু উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া ফেলিলেন। কিন্তু কথাগুলি তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইবামাত্র বুদ্ধিতে পারিলেন যে, এখনও তাঁচার নিজের মন হইতে জাতীয় ভাবটা অপনোত হয় নাই। সেই যৌবনাবস্থার—সেই ৪৮ আকের অগ্নি এখনও নির্দাপিত হয় নাই—উহা এত দিনের পর ধক্ করিয়া জলিয়া উঠিল

ভূদেব মুখোপাধ্যায়।



সেকাল আর একাল

অঙ্ককার বহুতার বিষয় “সেকাল আর একাল ” ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে হিন্দুকালেজ এই মহানগরে সংস্থাপিত হয়। ১৮৩০ সালে ঐ বিদ্যালয়ের প্রথম ফল ফলে। ঐ বৎসরে কতকগুলি যুবক ইংরাজীতে কৃতবিদ্ব হইয়া বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন। তাঁহারা সেই সময়ে ইউরোপীয় বিদ্যার আলোক লাভ করিয়া সমাজসংস্কারকার্যে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই সময়ে একটি নূতন ভাব হিন্দুসমাজে প্রবিষ্ট হয়। ইংরাজী আমলের প্রথম হইতে হিন্দুকালেজ সংস্থাপন পর্য্যন্ত যে সময়, তাহা “সেকাল” এবং তাহার পরের কাল “একাল” নামে নির্ধারণ করিলাম।

সেকালের বিষয় বলিতে হইলে সেকালের সাহেবদের বিষয় অগ্রে বলিতে হয়। আপনারা স্জিজাসা করিতে পারেন যে, বাঙ্গালীদের বিষয়ে বলিতে গিয়া সাহেবদের কথা প্রথমে বলা হয় কেন? তাহার বিশিষ্ট কারণ আছে। সাহেবেরা আমাদের শাসনকর্তা ও তাঁহাদের সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সাহেবদের সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকা জন্ত, সেকালের সাহেবেরা কি প্রকৃতির লোক ছিলেন ও সেকালের বাঙ্গালীদের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিতেন, তাহা না জানিলে সেকালের বাঙ্গালীদের অবস্থা ভাল জানা যাইতে পারে না, অতএব সেকালের সাহেবদিগের বর্ণনা সর্বাগ্রে করা কঠব্য। সাহেবেরা আমাদের



রাজা। রাজার সম্মান অগ্রে রক্ষা করা কর্তব্য। সেকালে সাহেবেরা অর্ধেক হিন্দু ছিলেন। পূর্বে মুসলমানেরা এই ভারতবর্ষকে আপনাদের গৃহস্বরূপ জ্ঞান করিতেন। তাঁহাদের অশুভাগ এইখানেই বদ্ধ থাকিত। ইংরাজের আগলের প্রথম সাহেবেরা অনেক পরিমাণে ঐক্য ছিলেন। তাহার এক কারণ এই, তখন বিলাতে যাতায়াতের এমন সুবিধা ছিল না। তাহার। এখানে আসিতেন, তাঁহাদের সর্বদা বাটী বাওয়া ঘটিয়া উঠিত না। আর এক কারণ এই, তাঁহারা অতি অল্প লোকই এখানে থাকিতেন; সুতরাং এখানকার লোকদিগের সহিত তাঁহারা অনেক পরিমাণে এ দেশীয়দের আচার-ব্যবহার পালন করিতেন। তখন সকাল বিকাল কাছারী হইত, মধ্যাহ্নকালে সকলে বিশ্রাম করিত। মধ্যাহ্নকালে কলিকাতা বিপ্রহরা রজনীর জায় নিস্তব্ধ হইত। তখনকার সাহেবেরা পান খেতেন, আলখোলা দু'কুতেন, বাইনাচ দিতেন ও হলি খেলতেন। টুয়াট নামে একজন প্রধান সৈনিক সাহেব ছিলেন; হিন্দুধর্মের প্রতি তাঁহার বিলক্ষণ শ্রদ্ধা ছিল। তজ্জন্ত অস্তান্ত সাহেবেরা তাঁহাকে হিন্দু টুয়াট বলিয়া ডাকিত। তাঁহার বাটীতে শালগ্রামশিলা ছিল। তিনি প্তাহ পূজারী ব্রাহ্মণের দ্বারা তাঁহার পূজা করাইতেন। বাল্যকালে গুনিতাম, কালীঘাটের কালীর মন্দিরে প্রথমে কোম্পানীর পূজা হইয়া তৎপরে অন্তান্ত লোকের পূজা হইত। ইহা সত্য না হইতে পারে, কিন্তু ইহা-দ্বারা প্রতীত হইতেছে যে, তৎকালের সাহেবেরা বাঙ্গালীদের সহিত এতদূর ঘনিষ্ঠতা করিতেন যে, তাঁহাদিগের ধর্মের পর্যাঙ্ক অশুভোদন করিতেন। একালেও গবর্নর জেনেরল লর্ড এলেনবর্গ সাহেব বাহাদুর আফগানিস্থানের



যুদ্ধে জরী হইয়া ফিরিয়া আসিবার সময় বৃন্দাবন, যথুরা প্রভৃতি স্থানের প্রধান প্রধান দেবালয়ে দান করিয়া আসিয়াছিলেন। সেকালের সাহেবেরা আমলাদের উপর এমন সদয় ছিলেন যে, তঁহা গিয়াছে, তাঁহারা তাঁহাদের দেওয়ানদের বাটীতে গিয়া তাঁহাদের ছেলেদিগকে তাঁটের উপর বসাইয়া আদর করিতেন ও চন্দ্রপুলি খাইতেন। তাঁহারা অত্যন্ত আমলাদের বাসায়ও যাইয়া, কে কেমন আছে, জিজ্ঞাসা করিতেন। এখন সে কাল গিয়াছে। এখনকার সাহেবদিগকে দেখিলে, তাঁহাদিগকে সেই সকল সাহেবদের হইতে এক স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া বোধ হয়। ইহাদের আর এদেশীয়দের সহিত মেরুপ বাধার ব্যথি নাই, তাঁহাদের প্রতি ইহাদিগের মেরুপ ঘেহ নাই, মেরুপ মমতা নাই। অবশ্য অনেক সদাশয় ইংরাজ আছেন, তাহারা এই কথার ব্যভিচারস্থল-স্বরূপ। কিন্তু আমি মেরুপ বর্ণনা করিলাম, এরূপ সাহেবই অধিক। পূর্বে যে সকল ইংরাজ মহাপুরুষেরা এখানে আসিয়া এদেশের বধেষ্ট উন্নতি করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের নাম এদেশীয়দের হৃদয়ে অঙ্কিত রহিয়াছে। কোন উদ্ভট-কবিতাকার হিন্দুদিগের প্রাতঃস্মরণীয় স্ত্রীলোকদিগের নাম যে শ্লোকে উল্লিখিত আছে, তাহার পরিবর্তে সেকালের কতিপয় ইংরাজ মহাত্মার নাম উল্লেখ করিয়া একটি শ্লোক প্রস্তুত করিয়াছিলেন। আদর্শ ও নকল দুইটি শ্লোকই নিম্নে লিখিত হইল।

আদর্শ

অহল্যা দ্রোপদী কুন্তী তারা যন্দোদরী তথা।

পঞ্চ কন্তাঃ শ্রবণিতাঃ মহাপাতকনাশনম্ ॥



নকল

হেয়ার্ কবিন্ পামরন্ট কেরি মার্শমেনস্তথা ।

পঞ্চ গোরাঃ অরোরিতাং মহাপাতকনাশনম্ ॥

এই সকল মহাপুরুষদিগের বিষয় মহাশয়েরা অনেকেই অবগত আছেন। ডেবিড হেয়ার এই দেশে ঘড়ীর ব্যবসায়-দ্বারা লক্ষ টাকা উপার্জন করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার স্বদেশ ফটলণ্ডে ফিরিয়া না গিয়া সেই সমস্ত অর্থ এতদেশীয় লোকের হিতসাধনে ব্যয় করিয়া পরিশেষে দরিদ্রদশায় উপনীত হইয়াছিলেন তাঁহাকে এতদেশীয়দের ইংরাজী শিক্ষার প্রথম সৃষ্টিকর্তা বলিলে অত্যাতি হয় না। তিনি হেয়ার-স্কুল সংস্থাপন করেন ও হিন্দু-কালেক্স সংস্থাপনের একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। আমি তাঁহার একজন ছাত্র ছিলাম। আমি যেন দেখিতেছি, তিনি ঔষধ হস্তে লইয়া পীড়িত বালকের শয্যার পাশে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, অথবা যেখানে যাত্রা হইতেছে, শুধায় হঠাৎ আসিয়া অভিনেতা বালককে নীচ আয়োদক্ষেত্র হইতে বলপূর্বক লইয়া যাইতেছেন। কবিন্ সাহেব এই কলিকাতা নগরের একজন প্রধান সওদাগর ছিলেন। তিনি অত্যন্ত পরোপকারী ও সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার পুত্র উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের লেফটেনেন্ট গবর্নর হইয়াছিলেন। তিনি সিপাইদের বিদ্রোহের সময় অনেক কষ্ট ভোগ করিয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন। তিনিও একজন অতি দয়ালু ও সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন। এতদেশীয়দের প্রতি তাঁহার বিলক্ষণ ঘেহ ছিল। জন পামরকে লোকে "Prince of Merchants" অর্থাৎ সওদাগরদের রাজা



বলিয়া ডাকিত। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার গোরের উপরে
 “Here lies John Palmer, Friend of the Poor.”—
 “এখানে দরিদ্র-জন-বন্ধু জন পামর আছেন。” কেবল এই বাক্যটি
 লিখিত হইয়াছিল। কেরি ও মার্শমেন সাহেব খৃষ্টীয় ধর্ম-প্রচারক
 ছিলেন। তাঁহারা ত্রিগ্রামপুরে বাস করিতেন। তাঁহারা বাঙ্গালা
 অভিধান, বাঙ্গালা সংবাদপত্র ও উন্নত প্রণালীর বাঙ্গালা পাঠ-
 শালার সৃষ্টিকর্তা ছিলেন। তাঁহারা অনেক প্রকারে বঙ্গদেশের
 মহোপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। সেকালের এই সকল
 মহাহস্তকরণ সাহেবেরা চিরকাল বাঙ্গালীদিগের স্মৃতিক্ষেত্রে বিজয়মান
 থাকিবেন, তাঁহাদের সন্দেহ নাই।

অতঃপর সেকালের বাঙ্গালীদের বিষয় বলিতে প্রবৃত্ত হই-
 তেছি। সেকালের বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর লোকদিগের বর্ণনা
 করিতে গেলে আমাদের দৃষ্ট গুরুমহাশয়ের উপর প্রথম পতিত
 হয়। গুরুমহাশয়দিগের শিক্ষাপ্রণালী উন্নত ছিল না এবং
 তাঁহাদের অবলম্বিত ছাত্রদিগের মধ্যে বিধানটি বড় কঠোর
 ছিল। নাদুগোপাল অর্থাৎ তাঁটু গাড়িয়া বসাইয়া হাতে প্রকাণ্ড
 ইষ্টক অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত রাখানো, বিছুটি গায়ে দেওয়া ইত্যাদি
 অনেক প্রকার নির্দিষ্ট দণ্ড-প্রদানের রীতি প্রচলিত ছিল। পাঁচ
 বৎসর বয়স হইতে দশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তালপাতে; তার-
 পর পনের বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কলার পাতে; তারপর কুড়ি
 বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কাগজে লেখা হইত। সামান্য অঙ্ক কষিতে
 সামান্য পত্র লিখিতে আর গুরুদক্ষিণা ও দাতাকর্ষ নামক পুস্তক
 পড়িতে সমর্থ করা, গুরুমহাশয়দিগের শিক্ষার শেষ সীমা ছিল।
 গুরুমহাশয় অতি ভীষণ পদার্থ ছিলেন। আমার স্মরণ হয়,



আমি যখন গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় পাঠ করিতাম, তখন রায়নারায়ণ নামে আমার একজন সহাব্যায়ী ছিলেন। তিনি কোন দোষ করিলে, গুরুমহাশয় যখন 'রায়নারায়ণ' বলিয়া ডাকিতেন, তখন তাঁহার ভয়হৃৎক একটি শারীরিক ক্রিয়া হইত।

গুরুমহাশয়ের পর আখন্ডীর বর্ণনা করা কষ্টবা আখন্ডী অতি অদ্ভুত পদার্থ ছিলেন। যনে করুন হিন্দুর বাতীর একটি ঘরে মুসলমানের বাসা। তিনি তথায় বৃহদাকার বদনা ও স্তূপাকার পেঁয়াজ লইয়া বসিয়া আছেন। সাগরেন্দ্রা নিম্নত-বশবত্তী চাকর-দ্বারা জল আনয়ন কার্যা করিয়া লওয়া আখন্ডীর মনঃপূত হইত না। তাঁহার সাগরেন্দ্রিগকে কলসী লইয়া জল আনিয়া দিতে হইত। তখন পারশী পড়ার বড় ধুম। তখন পারশী পড়াই এতদের্শয়দিগের উচ্চতম শিক্ষা বলিয়া পরিগণিত হইত। এই পারশী ভাষা সকল আদালতে চলিত ছিল। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার ব্যবহার আদালতে রহিত হয়। পদ্ম-নামা, গোলেন্দ্রা, বোস্তা, জ্বেলখা, আল্লামী প্রভৃতি পুস্তক সাধারণ পাঠ্য পুস্তক ছিল। কেহ কেহ আরবী বাকরণ একটু একটু পাঠ করিতেন। আখন্ডীরা পারশীর উচ্চারণ অতি বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

অতঃপর সেকালের ভট্টাচার্যগণ আমাদেরিগের বর্ণনার বিষয় হইতেছেন। তখনকার ভট্টাচার্যগণ অতি সরলস্বভাব ছিলেন। এখনকার ভট্টাচার্যগণ যেমন বিষয়বুদ্ধিতে বিষয়ী লোকের ঘাড়ে বান, সেকালের ভট্টাচার্যগণ সেরূপ ছিলেন না। তাঁহারা সংস্কৃত শাস্ত্র অতি প্রগাঢ়রূপে জানিতেন এবং অতি



সরল ও সলাশয় ছিলেন। সেকালের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সমকালবর্ধী রামনাথ নামে একজন পণ্ডিত ছিলেন তিনি নবদ্বীপের নিকটস্থ একটি গ্রামে বাস করিতেন। তিনি রাজ-সভাবিচরণকারী চাটুকার ভট্টাচার্য্যদিগের শ্রায় সভাতার নিয়ম পরিজ্ঞাত ছিলেন না। এই জন্ত লোকে তাঁহাকে বুন্দো রামনাথ বলিয়া ডাকিত। একদিন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র অমাত্য-সমভি বাহারে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। রাজা তাঁহার অবস্থা দেখিয়া তাঁহাকে কিছু অর্থ সাহায্য করিতে ইচ্ছুক হইলেন। কিন্তু তাঁহার কি প্রয়োজন তাহা জানিতে হইবে, এ জন্ত ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহাশয়ের কিছু অমুশপত্তি আছে?” এখন, শ্রায়শাস্ত্রে অমুশপত্তির অর্থ, যার কোন সিদ্ধান্ত হয় না। ভট্টাচার্য্য তাহাই বুঝিয়া লইলেন এবং বলিলেন, “ঠেক না, আমার কিছুই অমুশপত্তি নাই।” রাজা তাহা বুঝিতে পারিয়া অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহাশয়ের কিছু অসঙ্গতি আছে?” এখন, অসঙ্গতি শব্দের শ্রায়শাস্ত্রোল্লিখিত অর্থ অসমবয়। ভট্টাচার্য্য বলিলেন, “না, কিছুই অসঙ্গতি নাই, সকলই সমবয় করিতে সমর্থ হইয়াছি।” রাজা দেখিলেন, মহা মুগ্ধ। তখন তিনি স্পষ্ট করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “সাংসারিক বিষয়ে আপনার কোন অনটন আছে?” ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন, “না, কিছুই অনটন নাই; আমার কয়েক বিঘা ভূমি আছে, তাহাতে যথেষ্ট ধান উৎপন্ন হয়, আর সম্মুখে এই তিস্তিড়ী বৃক্ষ দেখিতেছেন, ইহার পত্র আমার গৃহিণী দিয়া পাক করেন, অতি সুন্দর লাগে, আমি স্বচ্ছন্দে তাহা দিয়া অন্ন আহার করি।”



আমি আশ্চর্য্য বোধ করি যে, এমন সরল সাধু সম্ভ্রুতিচিহ্ন ব্যক্তিকে লোকে বুঝে বলিত। ইনি যদি বুঝে, তবে সভ্য কে ? আর এক ভট্টাচার্য্য ছিলেন, তাঁহার ত্রী ডাইল পাক করিতেছিলেন। তিনি স্বামীকে রন্ধনশালায় বসাইয়া পুষ্করিণীতে জল আনিতে গেলেন। এ দিকে ডাইল উধলিয়া উঠিল। ভট্টাচার্য্য দেখিলেন, বিষয় বিপদ। ডাইল উধলিয়া পড়া কি প্রকারে নিবারণ করিবেন, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া হাতে পইতা জড়াইয়া পতনোন্মুখ ডাইলের অব্যবহিত উপরিস্থ শূত্রে তাহা স্থাপন করিয়া চণ্ডীপাঠ করিতে লাগিলেন : কিন্তু তাহাতেও তাহা নিবারিত হইল না। এমন সময় তাঁহার ব্রাহ্মণী পুষ্করিণী হইতে ফিরিয়া আইলেন। তিনি কহিলেন, “এ কি। ইহাতে একটু তেল ফেলিয়া দিতে পার নাই ?” এই বলিয়া তিনি ডাইলে একটু তেল ফেলিয়া দিলেন। ডাইলের উধলিয়া পড়া নিবারিত হইল। এই ব্যাপার দেখিয়া ভট্টাচার্য্য গললঘবাস হইয়া করযোড়ে ব্রাহ্মণীকে বলিলেন, “তুমি কে আমার গৃহে অধিষ্ঠিতা, বল ; অবশ্য কোন দেবী হইবে, নতুবা এই অদ্ভুত ব্যাপার কি প্রকারে সাধন করিতে পারিলে ?” যতপি এই গল্পে বাহ্যিক-বর্ণনার সুস্পষ্ট চিহ্ন লক্ষিত হইতেছে, তথাপি উহা যে সেকালের ভট্টাচার্য্যদিগের অসামান্য সারল্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে, তাহার আর সন্দেহ নাই।

ভট্টাচার্য্যদিগের অবৈষয়িকতার আর একটি সুন্দর গল্প আছে। এক জন ভট্টাচার্য্য পুথি পড়িতেছিলেন, পড়িতে পড়িতে অনেক রাত্রি হইলে তাঁহার তামাক খাইবার বড় ইচ্ছা হইল। তখন ভট্টাচার্য্য মহাশয় একখানি টীকা লইয়া বাটার



বাহির হইলেন। দেখিলেন দূরে একটা পাড়া পুড়িতেছে। তিনি আস্তে আস্তে সেই স্থানে টাকা ধরাইতে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু ঘরে যে প্রলীপ জলিতেছিল তাহা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

অতঃপর সেকালের রাজকন্মচারীদিগের বণনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। ইংরাজের আমলের প্রথমে আমলাদিগের বড় প্রাদুর্ভাব ছিল এক এক জন আমলার উপর অনেক কন্মের ভার থাকিত। তাহার অনেক টাকা উপাঞ্জন করিতেন এক এক জন দেওয়ান বিপুল অর্থ উপাঞ্জন করিয়া গিয়াছেন। টাকা নগরের এক জন দেওয়ানের কথা এইরূপ শুনা যায়, তিনি আহারের সময় একটি প্রকাণ্ড ঘণ্টা বাজাইয়া দিতেন, নগরের সমুদায় বাসাড়ে লোক সেই ঘণ্টার রব শুনিয়া তাহার বাসায় আসিয়া আহার করিত। তখন ঐ সকল পদ এক প্রকার বংশপরম্পরাগত ছিল। এক জন দেওয়ানের মৃত্যু হইলে প্রায়ই তাহার সন্তান অথবা অন্য কোন ঘনিষ্ঠ সম্পর্কীয় লোক দেওয়ান হইত শুনা আছে, কলিকাতার নিকটবর্তী কোন গ্রামবাসী এক দেওয়ানের মৃত্যুর পর তাহার সপ্তদশ বৎসর বয়স্ক কনিষ্ঠ ভ্রাতা কাণের মাকড়ী ও হাতের বালা খুলিয়া দেওয়ানী করিতে গেলেন, সাহেবেরা তাহাদিগের দেওয়ানদিগের প্রতি কিক্রম ব্যবহার করিতেন, তাহা পূর্বে বলিয়াছি। সে সময়ে উংকোচ লইবার বাড়াবাড়ি ছিল। শুক বাঙ্গালীরা যে উংকোচ লইতেন এমন নহে, বড় বড় সাহেবেরাও উংকোচ লইতেন এখন সেক্রম নহে। এ বিনয়ে অবশ্যই উন্নতি দেখিতেছি।



পরিশোধে সেকালের ধনী লোকদিগের বণনা করা হইতেছে। ইহারা অত্যন্ত বদান্ত ছিলেন। পুষ্করিণী-খননাদি পুৰ্ত্তকয়ে তাঁহারা বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। তাঁহারা সম্রাসী ও দরিদ্রদিগকে বিলক্ষণ দান করিতেন। তাহারা অতিথিসেবায় তৎপর ছিলেন। তাঁহারা গুণী লোকদিগকে বিলক্ষণরূপে পালন করিতেন। ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও প্রসিদ্ধ গায়কদিগকে বিশিষ্ট অর্থায়ুকূল্য করিতেন। কোন কোন স্থলে উপযুক্ত পাত্রে তাঁহাদিগের দানশীলতা প্রযোজিত হইত না বটে, কিন্তু তাঁহারা যে অত্যন্ত বদান্ত ছিলেন, তাহার আর সন্দেহ নাই।

রাজনারায়ণ বসু ।



একা

(শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্তীর উক্তি)

“কে গায় ওই ?”

বহুকাল-বিস্মৃত স্মরণের স্বতন্ত্র ছায়া ঐ মধুর গীতি কণরক্রে প্রবেশ করিল। এত মধুর লাগিল কেন ? এই সঙ্গীত যে অতি সুন্দর, এমত নহে। পথিক পথ দিয়া আপন মনে গায়িতে গায়িতে যাইতেছে জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি দেখিয়া তাহার মনে আনন্দ উছলিয়া উঠিতেছে। স্বভাবতঃ তাহার কণ্ঠ মধুর,— মধুর কণ্ঠে, এই মধুমাসে, আপনার মনের সুখের মধুর্য্য বিকীর্ণ করিতে করিতে যাইতেছে। তবে বহুতর্য্যাবিশিষ্ট বাজের তরঙ্গীতে অঙ্গুলী-স্পর্শের ছায়া ঐ গীতিকারি আমার হৃদয়কে আলোড়িত করে কেন ?

কেন কে বলিবে ? রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী—নদী-সৈকতে কোমলী হাসিতেছে। অন্ধাবৃত্তা সুন্দরীর নীলবসনের ছায়া শীর্ণশরীরী নীলসলিলা তরঙ্গিনী সৈকত বেষ্টিত করিয়া চলিয়াছেন, রাজপথে কেবল আনন্দ—বালক, বালিকা, যুবক, যুবতী, প্রোঢ়া, বৃদ্ধা বিমল চম্ভকিরণে রাত হইয়া আনন্দ করিতেছে। আমিই কেবল নিরানন্দ—তাই ঐ সঙ্গীতে আমার হৃদয়-বস্ত্র বাজিয়া উঠিল।

আমি একা—তাই এই সঙ্গীতে আমার শরীর কণ্টকিত হইল। এই বহুজনাকীর্ণ নগরীমধ্যে, এই আনন্দময় অনন্ত



জনশ্রোতোমধ্যে, আমি একা। আমিও কেন ঐ অনন্ত জনশ্রোতো-
মধ্যে মিশিরা, এই বিশাল আনন্দভরস-তাড়িত জলবুদ্বুদসমূহের
মধ্যে আর একটি বুদ্বুদ না হই? বিন্দু বিন্দু বারি লইয়া সমুদ্র,
আমি বারিবিন্দু, এ সমুদ্রে মিশাই না কেন?

তাহা জানি না—কেবল ইহাই জানি যে আমি একা কেহ
একা থাকিও না। যদি অক্ল কহে তোমার প্রণয়ভাগী না হইল,
তবে তোমার মনুষ্যজন্ম বৃথা। পুষ্প সুগন্ধি, কিন্তু যদি ত্রাণ-গ্রহণ-
কণা না থাকিত, তবে পুষ্প সুগন্ধি হইত না—ঘাপেন্দ্রিয়বিশিষ্ট
না থাকিলে গন্ধ নাই। পুষ্প আপনার জন্তও ফুটে না। পরের
জন্ত তোমার হৃদয়-কুসুমকে প্রস্তুতি করিও।

কিন্তু বারেকমাত্র শ্রুত ঐ সঙ্গীত আমার কেন এত মধুর
লাগিল, তাহা বলি নাই। অনেক দিন আনন্দোন্মিত সঙ্গীত
শুনি নাই—অনেক দিন আনন্দানুভব করি নাই। যৌবনে যখন
পৃথিবী সুন্দরী ছিল, যখন প্রতি পুষ্পে সুগন্ধ পাইতাম, প্রতি
পত্রমর্শ্বরে মধুর শব্দ শুনিতাম, প্রতি নক্রে চিত্রারোহিণীর শোভা
দেখিতাম, প্রতি মনুষ্য-মুখে সরলতা দেখিতাম, তখন আনন্দ
ছিল। পৃথিবী এখনও তাই আছে, সংসার এখনও তাই আছে,
মনুষ্যচরিত্র এখনও তাই আছে, কিন্তু এ হৃদয় আর তাই নাই
তখন সঙ্গীত শুনিয়া আনন্দ হইত, আজি এই সঙ্গীত শুনিয়া
সেই আনন্দ মনে পড়িল যে অবস্থায়, যে সুখে, সেই আনন্দ
অনুভব করিতাম, সেই অবস্থা, সেই সুখ মনে পড়িল মুহূর্ত-
জন্ত আবার যৌবন ফিরিয়া পাইলাম। আবার তেমনি করিয়া
মনে মনে সববেত বন্ধুগণের মধ্যে বসিলাম; আবার সেই অকারণ-
সম্প্রদায় উচ্চ হাসি হাসিলাম, যে কথা নিশ্চয়দোষনীর বলিয়া এখন



বলি না, নিশ্চয়োজনেও চিত্তের চাকল্য-হেতু তখন বলিতাম, আবার সেই সকল বলিতে লাগিলাম ; আবার অকৃত্রিম হৃদয়ে পরের প্রণয় অকৃত্রিম বলিয়া মনে মনে গ্রহণ করিলাম । ক্ষণিক ভাস্তি জন্মিল—তাই এ সঙ্গীত এত মধুর লাগিল । শুধু তাই নয় । তখন সঙ্গীত ভাল লাগিত—এখন লাগে না—চিত্তের যে প্রফুল্লতার ক্ষণ ভাল লাগিত, সে প্রফুল্লতা নাই বলিয়া ভাল লাগে না । আমি মনের ভিতর মন লুকাইয়া সেই গুপ্ত যৌবন-সুখ চিন্তা করিতেছিলাম—সেই সময়ে এই পূর্বস্মৃতিসূচক সঙ্গীত কর্ণে প্রবেশ করিল, তাই এত মধুর বোধ হইল ।

সে প্রফুল্লতা, সে সুখ আর নাই কেন ? সুখের সামগ্রী কি কমিয়াছে ? অর্জন এবং কতি উভয়ই সংসারের নিয়ম কিন্তু কতি অপেক্ষা অর্জন অধিক, ইহাও নিয়ম । তুমি জীবনের পথ যতই অতিবাহিত করিবে, ততই সুখের সামগ্রী সঞ্চয় করিবে তবে যথাসে ক্ষুধা কমে কেন ? পৃথিবী আর তেমন সুন্দরী দেখা যায় না কেন ? আকাশের তারা আর তেমন জলে না কেন ? আকাশের নীলিমায় আর সে উজ্জলতা থাকে না কেন ? যাহা তৃণপল্লবময়, কুসুমসুবাসিত, স্বচ্ছ-কল্লোলিনী-শীতল-সিস্ত, বসন্ত-পবনবিদ্যুত বলিয়া বোধ হইত, এখন তাহা বালুকাময়ী মরুভূমি বলিয়া বোধ হয় কেন ? কেবল রক্তিল কাচ নাই বলিয়া, আশা সেই রক্তিল কাচ । বৌবনে অর্জিত সুখ অল্প, কিন্তু সুখের আশা অপরিমিতা । এখন অর্জিত সুখ অধিক, কিন্তু সেই ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিনী আশা কোথায় ? তখন জানিতাম না, কিসে কি হয়, অনেক আশা করিতাম । (এখন জানিয়াছি, এই সংসার-চক্রে আরোহণ করিয়া যেখানকার, আবার সেইখানে ফিরিয়া আসিতে



হইবে ; এখন মনে ভাবিতেছি, এই অগ্রসর হইলাম, তখন কেবল আবর্তন করিতেছি মাত্র । এখন বুঝিয়াছি যে, সংসার-সমুদ্রে সন্তরণ আরম্ভ করিলে, তরঙ্গে তরঙ্গে আমাকে গ্রহণ করিয়া আবার আমাকে কূলে ফেলিগা যাইবে । এখন জানিয়াছি যে, এ অরণ্যে পথ নাই, এ প্রান্তরে জলাশয় নাই, এ নদীর পার নাই, এ সাগরে ঘোণ নাই, এ অন্ধকারে নক্ষত্র নাই । এখন জানিয়াছি যে, কুহুমে কীট আছে, কোমল পল্লবে কণ্টক আছে, আকাশে মেঘ আছে, নির্মলা নদীতে আবর্ত আছে, ফলে বিষ আছে, উষ্ট্রানে সর্প আছে, যমুঘ্রদয়ে কেবল আত্মাদর আছে । এখন জানিয়াছি যে, বৃক্ষে বৃক্ষে ফল ধরে না, ফুলে ফুলে গন্ধ নাই, মেঘে মেঘে বৃষ্টি নাই, বনে বনে চন্দন নাই, গন্ধে গন্ধে মৌক্তিক নাই । এখন বুঝিতে পারিয়াছি যে, কাচও হীরকের স্থায় উজ্জল, পিত্তলও সুবর্ণের স্থায় ভাস্বর, পঙ্কও চন্দনের স্থায় স্নিগ্ধ, কাংস্তও রজতের স্থায় মধুরনাদী ।

কিন্তু কি বলিতেছিলাম, ভুলিয়া গেলাম । সেই গীতধ্বনি ! উহা ভাল লাগিয়াছিল বটে, কিন্তু আর দ্বিতীয়বার শুনিতে চাহি না । উহা যেমন যমুঘ্রকণ্ঠস্বীত সঙ্গীত, তেমনি সংসারের এক সঙ্গীত আছে, সংসাররসে রসিকেরাই তাহা শুনিতে পায় । সেই সঙ্গীত শুনিবার জন্ত আমার চিত্ত বড়ই আকুল । সে সঙ্গীত আর কি শুনিব না ? শুনিব, কিন্তু নানাবাণেশ্বনি-সম্মিলিত, বহুকণ্ঠপ্রসূত সেই পূৰ্ব্বস্বীত সংসারগীত আর শুনিব না । সে গায়কেরা আর নাই—সে বয়স নাই, সে আশা নাই । কিন্তু তৎপরিবর্তে বাহা শুনিতেছি, তাহা অধিকতর শ্রীতিকর । অনন্তসহায় একমাত্র-গীতি-ধ্বনিতে কর্ণবিবর পরিপূরিত হইতেছে । শ্রীতি সংসারে



৬৮

একা

মর্জিয়াপিনী—প্রীতিই ঐশ্বর। প্রীতিই আমার কণে একশকার
 সংসারসঙ্গীত। অনন্তকাল সেই মহাসঙ্গীত-সহিত যমুস্ব-হৃদয়তন্ত্রী
 বাজিতে থাকুক। যমুস্বজাতির উপর যদি আমার প্রীতি থাকে,
 তবে আমি অন্য সুখ চাই না।

বহিঃমহা চট্টোপাধ্যায়।



আমার দুর্গোৎসব

(শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্তীর উক্তি)

সপ্তমী পূজার দিন কে আমাকে এত আফিক চড়াইতে বলিল !
আমি কেন আফিক খাইলাম ! আমি কেন প্রতিমা দেখিতে
গেলাম ! যাহা কখন দেখিব না, তাতা কেন দেখিলাম ! এ কুতক
কে দেখাইল !

দেখিলাম—অকস্মাৎ কালের স্রোত দিগন্ত ব্যাপিয়া প্রবলবেগে
ছুটিতেছে—আমি ভেলায় চড়িয়া ভাসিয়া যাইতেছি । দেখিলাম—
অনন্ত, অকূল অন্ধকারে বাত্যাঝিকু তরঙ্গসঙ্কুল সেই স্রোত—
মধো উজ্জল নক্ষত্রগণ উদয় হইতেছে, নিবিতেছে—আবার
উঠিতেছে । আমি নিতান্ত একা—একা বলিয়া ভয় করিতে
লাগিল—নিতান্ত একা—মাতৃহীন—‘মা ! মা !’ করিয়া ডাকিতেছি ।
আমি এই কাল-সমুদ্রে মাতৃসন্ধানে আসিয়াছি । কোথা মা ? কই
আমার মা ? কোথায় কমলাকান্ত-প্রসূতি বদভূমি ! এ ঘোর
কাল-সমুদ্রে কোথায় ভূমি ? সহসা স্বর্গীয় বাত্মে কর্ণরক্ত পরিপূর্ণ
হইল—দিম্বাগুলে প্রভাতোদয়গোধন লোহিতোজ্জল আলোক
বিকীর্ণ হইল—স্নিগ্ধ মন্দ পবন বহিল—সেই তরঙ্গসঙ্কুল জলরাশির
উপরে, দূরপ্রান্তে দেখিলাম—সুবর্ণমণ্ডিতা, এই সপ্তমীর শারদীয়া
প্রতিমা । জলে হাসিতেছে, ভাসিতেছে, আলোক বিকীর্ণ
করিতেছে ! এই কি মা ? হ্যা, এই মা । চিনিলাম, এই
আমার জননী—জন্মভূমি—এই মূর্য্যা—মুক্তিকাক্ষিনী—অনন্ত-



রত্নভূষিতা—একধে কালগর্ভে নিহিতা। রত্নমণ্ডিত দশ ভূজ—দশ দিক্—দশ দিকে প্রসারিত; তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত; পদতলে শত্রু বিমর্দিত—পদাপ্রিত বীরজন-কেশরী শত্রু-নিপীড়নে নিযুক্ত। এ বৃদ্ধি এখন দেখিব না—আজি দেখিব না—কাল দেখিব না—কালস্রোত পার না হইলে দেখিব না;—কিন্তু একদিন দেখিব—দিগ্ভূজা, নানা-প্রহরণপ্রহারিণী শত্রুমর্দিনী, বীরেন্দ্রপৃষ্ঠ-বিহারিণী,—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী বিজ্ঞা-বিজ্ঞান-বুদ্ধিময়ী, সঙ্গে বলরূপী কার্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ, আমি সেই কালস্রোতোমধ্যে দেখিলাম, এই সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা।

কোণায় ফুল পাইলাম, বলিতে পারি না—কিন্তু সেই প্রতিমার পদতলে পুষ্পাঞ্জলি দিলাম,—ডাকিলাম, সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গলো শিবে, আমার সর্ব্বার্থসাধিকে। অসংখ্যাসস্তানকুল-পালিকে। ধর্ম্ম-অর্থ-সুখ-দুঃখ-দায়িকে। আমার পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ কর। এই ভক্তি-প্রীতি বৃদ্ধি-শক্তি করে লইয়া তোমার পদতলে পুষ্পাঞ্জলি দিতেছি, তুমি এই অনন্তজলমণ্ডল ত্যাগ করিয়া এই বিশ্ববিমোহিনী বৃদ্ধি একবার জগৎসমীপে প্রকাশ কর। এসো মা। নবরাগরঙ্গিণি, নব-বলধারিণি, নবদর্পে দর্শিণি, নবস্বপ্নদর্শিণি।—এসো মা, গৃহে এসো—ছয় কোটি সস্তানে একত্রে এককালে, ছাদশ কোটি কর ঘোড় করিয়া তোমার পাদপদ্ম পূজা করিব। ছয় কোটি মুখে ডাকিব,—মা প্রভৃতি অধিকে! ধাত্রি ধরিত্রি ধনধাত্তদায়িকে। নগাহ-শোভিনি নগেন্দ্রবালিকে! শরৎসুন্দরি চারুপূর্ণচন্দ্রভালিকে! ডাকিব,—সিদ্ধ সেবিত্তে সিদ্ধ পূজিত্তে সিদ্ধ যথনকারিণি। শত্রুবধে দশভূজে দশপ্রহরণধারিণি অনন্তশ্রী অনন্তকাল-স্থায়িণি। শক্তি দাত্ত সস্তানে, অনন্তশক্তি-প্রদায়িণি! তোমার কি বলিয়া ডাকিব,



মা ? এই ছয় কোটি মুণ্ড ঐ পদপ্রান্তে পুতিত করিব—এই ছয় কোটি কণ্ঠে ঐ নাম করিয়া হুঙ্কার করিব—এই ছয় কোটি দেহ তোমার জন্ত পতন করিব—না পারি, এই দ্বাদশ কোটি চক্ষে তোমার জন্ত কাঁদিব। এসো মা, গৃহে এসো—যাহার ছয় কোটি সন্তান, তাঁহার ভাবনা কি ?

দেখিতে দেখিতে আর দেখিলাম না—সেই অনন্ত কাল সমুদ্রে সেই প্রতিমা ডুবিল। অন্ধকারে সেই তরঙ্গসঙ্কুল জলরাশি ব্যাপিল, জলকল্লোলে বিশ্বসংসার পুরিল। তখন যুক্তকরে সজল-নয়নে ডাকিতে লাগিলাম,—উঠ মা হিরণ্ময়ি বঙ্গভূমি। উঠ মা ! এবার সুসন্তান হইব, সৎপথে চলিব—তোমার মুখ রাখিব। উঠ মা, দেবি দেবামুগ্ধহীতে। এবার আপনা তুলিব—ত্রাত্বৎসল হইব, পরের মঙ্গল সাধিব—অদর্শ, আলস্য, ইন্দ্রিয়ভক্তি ত্যাগ করিব—উঠ মা, একা রোদন করিতেছি, কাঁদিতে কাঁদিতে চক্ষু সেল মা।

উঠ উঠ মা। উঠ বঙ্গজননি। মা উঠিলেন না। উঠিবেন না কি ?

এসো ভাইসকল। আমরা এই অন্ধকার কালপ্রান্তে কাপ দিই। এসো আমরা দ্বাদশ কোটি ভুজ্জে ঐ প্রতিমা তুলিয়া, ছয় কোটি মাথায় বহিয়া ঘরে আনি। এসো, অন্ধকারে ভয় কি ? ঐ যে নগ্ন মধ্যো মধ্যো উঠিতেছে, নিবিতেছে, উহার পথ দেখাইবে—চল। চল। অসংখ্য বাহর প্রক্ষেপে এই কাল-সমুদ্র তাড়িত, মথিত, ব্যস্ত করিয়া আমরা সন্তরণ করি—সেই স্বর্ণপ্রতিমা মাথায় করিয়া আনি। ভয় কি ? না হয় ডুবিব, মাহুহীনের জীবনে কাজ কি ? আইস, প্রতিমা তুলিয়া আনি বড় পূজার ধুম বাধিবে। ছেয়ক-ছাগকে হাড়িকাঠে ফেলিয়া সংকীর্তি-খড়্গে



মাঘের কাছে বলি দিব—কত পুরাবৃত্তকার-টাকী ঢাক ঘাড়ে করিয়া
বজ্রের বাজনা বাজাইয়া আকাশ ফাটাইবে—কত ঢোল, কঁাসি,
কাড়ানাগরাধ বজ্রের ডগ বাসিত হইবে। কত সানাই পো ধরিয়া
গাইবে, “কত নাচ গো।”—বড় পূজার ধুম বাধিবে। কত
ব্রাহ্মণপণ্ডিত লুচি-মণ্ডার লোভে বঙ্গপূজার আসিয়া পাতুড়া
যারিবে—কত দেশ-বিদেশী ভদ্রাভদ্র আসিয়া মাঘের চরণে প্রণামি
দিবে—কত দীন-দুঃখী প্রসাদ খাইয়া উদর পূরিবে। কত নর্তকী
নাচিবে, কত গায়কে মঙ্গল গায়িবে, কত কোটি ভক্ত ডাকিবে,
মা। মা। মা।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়



ললিতগিরি

এক পারে উদয়গিরি, অপর পারে ললিতগিরি, মধ্যে স্বচ্ছসলিলা
কলোদিনী বিরূপা নদী নীল বারিরাশি লইয়া সমুদ্রাভিমুখে
চলিয়াছে। গিরিশিখরদ্বয়ে আরোহণ করিলে নিরে সহস্র সহস্র
তালবৃক্ষ-শোভিত ধাত্ত বা হরিংক্ষেত্রে চিত্রিত পৃথিবী অতিশয়
মনোমোহিনী দেখা যায়—শিশু যেমন যার কোলে উঠিলে
যাকে সর্বদা মন্দরী দেখে, যত্ন পূর্ব্বতারোহণ করিয়া পৃথিবী
দর্শন করিলে সেইরূপ দেখে। উদয়গিরি (বর্তমান আলুতিগিরি)
বৃক্ষরাজিতে পরিপূর্ণ, কিন্তু ললিতগিরি (বর্তমান নালুতিগিরি)
বৃক্ষশূন্য প্রান্তরময়। এককালে ইহার শিখর ও সাহুদেশ অটালিকা,
স্তূপ এবং বৌদ্ধ মন্দিরাদিতে শোভিত ছিল। এখন শোভার মধ্যে
শিখরদেশে চন্দনবৃক্ষ, আর মৃত্তিকা-প্রোষিত ভগ্ন গৃহাবশিষ্ট প্রস্তর,
ইষ্টক বা মনোমুগ্ধকর প্রস্তরগঠিত মন্দিরাশি। তাহার দুইচারিটা
কলিকাতার বড় বড় ইমারতের ভিতর থাকিলে কলিকাতার
শোভা হইত। হায়! এখন কি না হিন্দুকে ইণ্ডিয়ান স্কুলে
পুতুল-গড়া শিখিতে হয়। কুমারসম্ভব ছাড়িয়া সুইনবর্ন পড়ি,
গীতা ছাড়িয়া মিল পড়ি, আর উড়িয়ায় প্রস্তর-শিল্প ছাড়িয়া
সাহেবদের চীনের পুতুল হাঁ করিয়া দেখি। আরও কি কপালে
আছে, বলিতে পারি না।



আমি বাহা দেখিরাছি, তাহাই লিখিতেছি। সেই ললিতগিরি আমার চিরকাল মনে থাকিবে। চারিদিকে—ষোড়শের পর ষোড়শ ব্যাপিয়া—হরিষর্গ ধাত্তক্ষেত্র—মাতা বহুমতীর অঙ্গে বহু-বোজন-বিভূতা পীতাম্বরী শাটী! তাহার উপর মাতার অলঙ্কার-স্বরূপ তালবৃক্ষ-শেখী সহস্র সহস্র, তারপর সহস্র সহস্র তালবৃক্ষ, - সরল, সুপত্র, শোভাময়! যথো নীলসলিলা বিরূপা নীল-পীত-পুষ্পময় হরিৎক্ষেত্রমধ্য দিয়া বহিতেছে—সুকোমল গালিচার উপর কে ননী আঁকিয়া দিয়াছে। তা বাক—চারি পাশে যুত মহাআদেব মহীশসী কীর্তি। পাথর এমন করিয়া বে পালিশ করিয়াছিল, সে কি এই আমাদের যত হিন্দু? এমন করিয়া বিনাবন্ধনে বে গাঁথিয়াছিল, সে কি আমাদের যত হিন্দু? আর এই প্রস্তরমূর্তি-সকল বে খোদিয়াছিল,—এই দিব্য পুষ্পমালাভরণভূষিত বিকল্পিত-চেলাকলপ্রবৃদ্ধ সৌন্দর্য্য, সর্বাঙ্গসুন্দর গঠন, পৌরুষের সচিহ্ন লাবণ্যের মূর্তিমান্ সন্মিলনস্বরূপ পুরুষমূর্তি বাহারা গড়িয়াছে, তাহারা কি হিন্দু? এইরূপ কোপ-প্রেমগর্ভ-সৌভাগ্যদুরিতাধরা, চীরাধরা, তরলিত-রত্নাহারা—

“তয়ী কামা শিখরিদশনা পকবিধাধরোষ্ঠ

যথো কামা চকি তহরিবীপ্রেক্ষণা নিয়নাভিঃ .”

এই সকল স্ত্রীমূর্তি বাহারা গড়িয়াছে, তাহারা কি হিন্দু? তখন হিন্দুকে মনে পড়িল।

(তখন মনে পড়িল, উপনিষদ, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, কুমারসম্ভব, শকুন্তলা, পাণিনি, কাত্যায়ন, সাংখ্য, শান্তস্কল,



বেদান্ত, বৈশেষিক ; এ সকল হিন্দুর কীর্তি—এ পুতুল কোন ছার। তখন মনে করিলাম, হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া জন্ম সার্থক করিয়াছি ।)

সেই ললিতগিরির পদতলে বিরূপা-তীরে গিরির শরীরমধ্যে হস্তিগুপ্তা নামে এক গুহা ছিল। গুহা বলিয়া, আবার ছিল বলিতেছি কেন ? পর্বতের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কি আবার লোপ পায় ? কাল বিগুণ হইলে সবই লোপ পায়। গুহাও আর নাই ! ছাদ পড়িয়া গিয়াছে, গুপ্তসকল ভাসিয়া গিয়াছে—তলদেশে ঘাস গজাইতেছে। সর্বত্র লোপ পাইয়াছে, গুহাটার জন্ত তুংখ কাজ কি ?

কিন্তু গুহা বড় সুন্দর ছিল। পর্বতাদি হইতে ফোদিত সুস্ত, প্রাকার প্রভৃতি বড় রমণীয় ছিল। চারি দিকে অপূর্ণ প্রস্তরে ফোদিত নরমুদিসকল শোভা করিত। তাহারই দুইচারিটি আঙ্গণও আছে। কিন্তু ছাতা পড়িয়াছে, রং জলিয়া গিয়াছে, কাহারও নাক ভাসিয়াছে, কাহারও হাত ভাসিয়াছে, কাহারও পা ভাসিয়াছে। পুতুলগুলাও আধুনিক হিন্দুর মত অঙ্গহীন হইয়াছে।

কিন্তু গুহার এ দশা আজকাল হইয়াছে। আমি যখনকার কথা বলিতেছি, তখন এমন ছিল না—গুহা সম্পূর্ণ ছিল। তাহার ভিতর পরম যোগী মহাত্মা গঙ্গাধর স্বামী বাস করিতেন।

যথাকালে সন্ন্যাসিনী ত্রীকে সমভিব্যাহারে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, গঙ্গাধর স্বামী তখন ধ্যানে নিমগ্ন। অতএব কিছু না বলিয়া তাঁহারা সে রাত্রি গুহাপ্রান্তে শয়ন করিয়া বাপন করিলেন।



প্রত্যাগত হইলে গঙ্গাধর স্বামী সাত্রোথান-পূর্বক বিরূপায় স্নান করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিলেন। পরে তিনি প্রত্যাগত হইলে সরাসিনী প্রণতা হইয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন, শ্রীও তাহাই করিল।

গঙ্গাধর স্বামী শ্রীর সঙ্গে তখনও কোন কথা কহিলেন না। তিনি কেবল সরাসিনীর সঙ্গে কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন। চুর্ভাগা—সকল কথাই সংকুত ভাষায় হইল। শ্রী তাহার এক বর্ণ বুঝিল না। যে কয়টা কথা পাঠকের জানিবার প্রয়োজন, বাক্যলার বলিতেছি।

স্বামী। এ ছৌ কে ?

সরাসিনী। পথিক।

স্বামী। এখানে কেন ?

সরাসিনী। ভবিষ্যৎ লইয়া গোলে পড়িয়াছে। আপনাকে কর দেখাইবার ক্ষমতা আসিয়াছে, উহার প্রতি ধর্ম্মানুযায়িত আদেশ করুন।

শ্রী তখন নিকটে আসিয়া আবার প্রশ্ন করিল। স্বামী তাহার মুখপানে চাহিয়া দেখিয়া হিন্দীতে বলিলেন, “তোমার কর্কট রাশি।”

শ্রী নীরব।

“তোমার পুণ্য-নক্ষত্রস্থিত চক্রে জন্ম।”

শ্রী নীরব।

“গুহার বাহিরে আইস—হাত দেখিব।”

তখন শ্রীকে বাহিরে আনিয়া তাহার বামহস্তের রেখাসকল স্বামী নিরীক্ষণ করিলেন। খড়ি পাতিয়া জন্ম-শক, দিন, বার,



তিথি, দণ্ড, পল, সকল নিরূপণ করিলেন। পরে জন্ম-কুণ্ডলী অঙ্কিত করিয়া, গুহ্যস্থিত তালপত্র-লিখিত প্রাচীন পঞ্জিকা দেখিয়া ষাটশভাগে গ্রহগণের যথাযথ সমাবেশ করিলেন। পরে শ্রীকে বলিলেন, “তোমার লগ্নে স্বক্কেত্রস্থ পূর্ণচন্দ্র এবং মঙ্গলমে বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র—তিনটি শুভগ্রহ আছেন। তুমি সন্ন্যাসিনী কেন যা ? তুমি যে রাজ্যমহিষী।”

শ্রী। ওনিয়্যছি, আমার স্বামী রাজা হইয়াছেন। আমি তাহা দেখি নাই।

স্বামী। তুমি তাহা দেখিবে না বটে। এই মঙ্গলস্থ বৃহস্পতি নীচস্থ, এবং শুভগ্রহত্রয় পাণগ্রহের ক্ষেত্রে পাপদৃষ্ট হইয়াছেন। তোমার অদৃষ্টে রাজ্যভোগ নাই।

শ্রী তা কিছুই বুঝে না, চুপ করিয়া রহিল। আরও একটু দেখিয়া স্বামীকে বলিল, “আর কিছু দর্ভাগ্য দেখিতেছেন ?”

স্বামী। চন্দ্র শনির ত্রিংশাংশগত।

শ্রী। তাহাতে কি হয় ?

স্বামী। তুমি তোমার প্রিয়জনের প্রাণহন্ত্রী হইবে।

শ্রী আর বসিল না—উঠিয়া চলিল। স্বামী তাহাকে ইঙ্গিত করিয়া ফিরাইলেন ; বলিলেন, “তিষ্ঠ। তোমার অদৃষ্টে এক পরম পুণ্য আছে। তাহার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। সময় উপস্থিত হইলে আমি-সন্দর্শনে গমন করিও।”

শ্রী। কবে সে সময় উপস্থিত হইবে ?

স্বামী। এখন তাহা বলিতে পারিতেছি না। অনেক গণনার প্রয়োজন। সে সময়ও নিকট নহে। তুমি কোথায় বাইতেছ ?

শ্রী। পুরুষোত্তম-দর্শনে বাইব, মনে করিয়াছি।



স্বামী। যাও। সমরাস্তুরে আগামী বৎসরে তুমি আমার
নিকটে আসিও। সময় নির্দেশ করিয়া বলিও।

তখন স্বামী সরাসিনীকেও বলিলেন, “তুমিও আসিও।”

তখন গঙ্গাধর স্বামী বাক্যলাপ বন্ধ করিয়া ধ্যানস্থ হইলেন।
সরাসিনীও ঠাকাকে প্রণাম করিয়া শুভা হইতে বহির্গত হইলেন।

বহ্নিমন্ত্র চট্টোপাধ্যায়।



গৌড়েশ্বর

অতি বিস্তীর্ণ সভাসভাপে নবদীপোজ্জলকারী রাজাধিরাজ গৌড়েশ্বর বিরাজ করিতেছেন। উচ্চ খেতপ্রস্তুরের বেদীর উপরে রত্নপ্রবাল-বিভূষিত সিংহাসনে, রত্নপ্রবাল-মণ্ডিত ছত্রতলে বসীয়া রাজা বসিয়া আছেন। শির উপরি কনক-কিঙ্করী-সংবেষ্টিত বিচিত্র কারুকার্যখচিত স্তম্ভচক্রাভূষণ শোভা পাইতেছে। এক দিকে পৃথগাসনে হোমাবশেষ-বিভূষিত অনিন্দ্যমূর্তি ব্রাহ্মণমণ্ডলী সভাপণ্ডিতকে পরিবেষ্টন করিয়া বসিয়াছেন। যে আসনে একদিন হলায়ুধ উপবেশন করিয়াছিলেন, সে আসনে এক্ষণে এক অপরিণামদর্শী চাটুকার অধিষ্ঠান করিতেছিলেন। অল্প দিকে মহামাত্য ধন্যাদিকারকে অগ্রবর্তী করিয়া প্রধান রাজপুরুষেরা উপবেশন করিয়াছিলেন। মহাসামন্ত, মহাকুমারামাত্য, প্রমাতা, ঔপরিক, দাসাশ্রয়াদিক, চোরোদ্ধরণিক, শৌঙ্খিক, গোপ্তিকগণ, ক্যাত্রপ, প্রান্তপালেরা, কোষ্ঠপালেরা, কাওরিক্য, তদায়ুক্তক, বিনিযুক্তক প্রভৃতি সকলে উপবেশন করিতেছেন। মহাপ্রতীহার সশস্ত্রে সভার অসাবধানতা রক্ষা করিতেছেন। স্তাবকেরা উভয়পার্শ্বে শেলীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। সৰ্বজন হইতে পৃথগাসনে কুশাসনযাত্র গ্রহণ করিয়া পণ্ডিতপ্রবর মাধবাচার্য্য উপবেশন করিয়া আছেন।

রাজসভার নিয়মিত কার্য্যসকল সমাপ্ত হইলে সভাভঙ্গের উদ্দেশ্য হইল। তখন মাধবাচার্য্য রাজাকে সম্বোধন করিয়া



কহিলেন, “মহারাজ ! ব্রাহ্মণের বাচালতা মাঝনা করিবেন
আপনি রাজনীতিবিশারদ, এক্ষণে ভূমণ্ডলের বড় রাজগণ আছেন,
সর্বাধিপতি বহুদশা ; প্রজাপালক ; আপনি আজন্ম রাজা ।
আপনার অবিস্মিত নাই যে, শত্রুদমন রাজার প্রধান কর্ম ।
আপনি প্রবল শত্রুদমনের কি উপায় করিয়াছেন ?”

রাজা কহিলেন, “কি আজ্ঞা করিয়াছেন ?” সকল কথা
বর্ষীরানু রাজার প্রতিশ্রুত হয় নাই ।

মাধবাচার্য্যের পুনরুক্তির প্রতীকা না করিয়া ধর্ম্মাধিকার
পত্তপতি কহিলেন, “মহারাজাধিরাজ ! মাধবাচার্য্য রাজসমীপে
জিজ্ঞাসু হইয়াছেন যে, রাজশত্রু দমনের কি উপায় হইয়াছে ?
বঙ্গেশ্বরের কোন্ শত্রু এ পর্য্যন্ত দমিত হয় নাই, তাহা এখনও
আচার্য্য ব্যক্ত করেন নাই । তিনি সবিশেষ বাচন করুন ।”

মাধবাচার্য্য অন্ন হস্ত করিয়া এবার অভ্যুচ্চস্বরে কহিলেন,
“মহারাজ ! তুরকীঘেরা আর্থাবর্ত্ত প্রায় সমুদয় হস্তগত করিয়াছে ।
জাপাততঃ তাহারা যথ্য জয় করিয়া গৌড়রাজ্য আক্রমণের
উদ্দেশ্যে আছে ।”

এবার কথা রাজার কর্ণে প্রবেশ লাভ করিল । তিনি
কহিলেন, “তুরকীদিগের কথা বলিতেছেন ? তুরকীঘেরা কি
আসিয়াছে ?”

মাধবাচার্য্য কহিলেন, “ঈশ্বর রক্ষা করিতেছেন । এখনও
তাহারা এখানে আসে নাই । কিন্তু আসিলে আপনি কি প্রকারে
তাহাদিগের নিবারণ করিবেন ?”

রাজা কহিলেন, “আমি কি করিব—আমি কি করিব ?
আমার এ প্রাচীন শরীর, আমার বুকের উদ্যোগ সম্ভবে না ।



আমার একশে পঞ্চাশত হইলেই হয়। তুরকীয়েরা আসে আশুক।”

এবহুত রাজবাঁকা সমাপ্ত হইলে সভায় সকলেই নীরব হইল। কেবল মহাসামন্তের কোষমধ্যস্থ অসি অকারণ ঈষৎ ঝনৎকার শব্দ করিল। অধিকাংশ শ্রোতৃবর্গের মুখে কোন ভাবই বাস্তব হইল না। মাধবাচার্য্যের চক্ষু হইতে একবিন্দু অশ্রুপাত হইল।

সভাপণ্ডিত দামোদর প্রথমে কথা কহিলেন, “আচার্য্য, আপনি কি ক্ষুব্ধ হইলেন? ধেরূপ রাজাক্সা হইল, ইহা শাস্ত্র-সঙ্গত। শাস্ত্রে ঋষিবাক্য প্রযুক্ত আছে যে, তুরকীয়েরা এ দেশ অধিকার করিবে। শাস্ত্রে আছে, অবশ্য ঘটিবে—কাহার সাধ্য নিবারণ করে? তবে যুদ্ধোদ্যমে প্ররোজন কি?”

মাধবাচার্য্য কহিলেন, “ভাল, সভাপণ্ডিত মহাশয়। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আপনি এতদুক্তি কোন্ শাস্ত্রে দেখিয়াছেন?”

দামোদর কহিলেন, “বিষ্ণুপুরাণে আছে, যথা—”

মাধবাচার্য্য। যথা থাকুক—বিষ্ণুপুরাণ আনিতে অনুমতি করুন; দেখান, এরূপ উক্তি কোথায় আছে।

দামোদর। আমি কি এতই ভ্রান্ত হইলাম? ভাল, শ্রবণ করিয়া দেখুন দেখি, মনুতে এ কথা আছে কি না?

মাধ। গোড়েশ্বরের সভাপণ্ডিত মানব ধর্ম্মশাস্ত্রেও কি পারদর্শী নহেন?

দামো। কি জালা! আপনি আমাকে বিহ্বল করিয়া ফুলিলেন। আপনার সম্মুখে সরস্বতী বিমনা হইবেন, আমি কোন্ ছার! আপনার সম্মুখে গ্রন্থের নাম শ্রবণ হইবে না, কিন্তু কবিতাটা শ্রবণ করুন।



মাধ। গৌড়েশ্বরের সভাপতিত্বে যে অমুদ্রিত ছন্দে একটি কবিতা রচনা করিয়া থাকিবেন, ইহা কিছুই অসম্ভব নহে ; কিন্তু আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি—তুরকজাতীয় কর্তৃক গৌড়বিজয়বিষয়িণী কথা কোন শাস্ত্রে কোথাও নাই।

পতুপতি কহিলেন, “আপনি কি সৰ্ব্বশাস্ত্রবিৎ ?”

মাধবাচার্য্য কহিলেন, “আপনি যদি পারেন, তবে আমাকে অশাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া প্রতিপন্ন করুন।”

সভাপতিত্বের একজন পারিষদ কহিলেন, “আমি করিব। আত্মশাসা শাস্ত্র-নিষিদ্ধ। যে আত্মশাসাপরম্পর সে যদি পণ্ডিত, তবে মূৰ্খ কে ?”

মাধবাচার্য্য কহিলেন, “মূৰ্খ তিন জন। যে আত্মরক্ষায় যত্নহীন, সেই যত্নহীনতার প্রতিপোষক, আর যে আত্মবুদ্ধির অতীত বিষয়ে বাক্যব্যয় করে, ইহারাই মূৰ্খ। আপনি ত্রিবিধ মূৰ্খ।”

সভাপতিত্বের পারিষদ অধোবদনে উপবেশন করিলেন।

পতুপতি কহিলেন, “যবন আইসে, আমরা যুদ্ধ করিব।”

মাধবাচার্য্য কহিলেন, “সাধু ! সাধু ! আপনার বেক্রম যশ, সেইরূপ প্রস্তাব করিলেন। জগদীশ্বর আপনাকে কুশলী করুন। আমার কেবল এই জিজ্ঞাস্তা যে, যদি যুদ্ধই অভিপ্রায়, তবে তাহার কি উদ্যোগ হইয়াছে ?”

পতুপতি কহিলেন, “যন্ত্রণা গোপনেই যুক্তব্য। এ সভাতলে প্রকাশ্য নহে, কিন্তু যে অশ্ব, পদাতি এবং নাবিকসেনা সংগৃহীত হইতেছে, কিছু দিন এই নগরী পর্য্যটন করিলে তাহা জানিতে পারিবেন।”

মাধ। কতক কতক জানিয়াছি।



পত্নী । তবে এ প্রস্তাব করিতেছেন কেন ?

মাধ । প্রস্তাবের তাৎপর্য্য এই যে, এক বীরপুরুষ এক্ষণে এখানে সমাগত হইয়াছেন । মগধের যুবরাজ হেমচন্দ্রের বীর্য্যের খ্যাতি শুনিয়া থাকিবেন ।

পত্নী । বিশেষ শুনিয়াছি । ইহাও শ্রুত আছি যে, তিনি মহাশয়ের শিষ্য । আপনি বলিতে পারিবেন যে, ঈদৃশ বীরপুরুষের বাহ্যরক্ষিত মগধরাজ্য শত্রুহস্তগত হইল কি প্রকারে

মাধ । স্ববনবিপ্লবের কালে যুবরাজ প্রবাসে ছিলেন । এইমাত্র কারণ ।

পত্নী । তিনি কি এক্ষণে নবদ্বীপে আগমন করিয়াছেন ?

মাধ । আসিয়াছেন । রাজ্যাপহারক স্ববন এই দেশে আগমন করিতেছে শুনিয়া, এই দেশে তাহাদিগের সহিত সংগ্রাম করিয়া দস্যুর দণ্ডবিধান করিবেন । গোড়রাজ তাহার সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করিয়া উভয়ের শত্রুবিনাশের চেষ্টা করিলে উভয়ের মঙ্গল ।

পত্নী । রাজবলভেরা অন্তই তাহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইবে । তাহার নিবাসার্থ যথাযোগ্য বাসগৃহ নির্দিষ্ট হইবে । সন্ধিনিবন্ধনের মঙ্গলা যথাযোগ্য সময়ে স্থির হইবে

পরে রাজ্যজ্ঞায় সভাভঙ্গ হইল ।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ।



কুসুমনির্মিতা দেবী প্রতিমা

উপনগরপ্রান্ত্রে গঙ্গাতীরবর্তী এক অটালিকা হেমচন্দ্রের বাসার্থ রাজপুরুষেরা নির্দিষ্ট করিলেন। হেমচন্দ্র মাধবাচার্যের পরামর্শ-অনুসারে স্বরম্য অটালিকায় আবাস সংস্থাপিত করিলেন।

নবদ্বীপে জনার্দন নামে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি বয়োবাহুলা-প্রযুক্ত এবং শ্রবণেন্দ্রিয়ের হানি-প্রযুক্ত সর্কতোভাবে অসমর্থ, অপচ নিঃসহায়। তাঁহার সহধর্ম্মিণীও প্রাচীনা এবং শক্তিহীনা। কিছু দিন হইল, ইহাদিগের পর্ণকুটীর প্রবল বাতায় বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই অবধি ইহারা আশ্রয়ভাবে এই বৃহৎ পুরীর একপার্শ্বে রাজপুরুষদিগের অমুমতি লইয়া বাস করিতেছিলেন। এক্ষণে কোন রাজপুত্র আসিয়া তথায় বাস করিবেন শুনিয়া, তাঁহারা পরাধিকার ত্যাগ করিয়া, বাসাস্তরের অন্বেষণে ঘাইবার উদ্দেশ্য করিতেছিলেন।

হেমচন্দ্র উহা শুনিয়া চাঞ্চিত হইলেন বিবেচনা করিলেন যে, এই বৃহৎ ভবনে আমাদিগের উভয়েরই স্থান হইতে পারে। ব্রাহ্মণ কেন নিরাশ্রয় হইবেন? হেমচন্দ্র দিগ্বিজয়কে আজ্ঞা করিলেন, “ব্রাহ্মণকে গৃহত্যাগ করিতে নিবারণ কর।” ভৃত্য ঈষৎ হাস্ত করিয়া কহিল, “এ কার্য্য ভৃত্যের দ্বারা সম্ভবে না। ব্রাহ্মণ-ঠাকুর আমার কথা কাণে তুলেন না।”

ব্রাহ্মণ বস্ততঃ অনেকেরই কথা কাণে তুলেন না ;—কেন না, তিনি বধির। হেমচন্দ্র ভাবিলেন, ব্রাহ্মণ অভিমানপ্রযুক্ত ভৃত্যের



আলাপ গ্রহণ করেন না ; একজন্ত স্বয়ং তৎসমুদায় গেলেন ।
ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিলেন ।

জনার্দন আশীর্বাদ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কে ?”

হেমচন্দ্র । আমি আপনার ভৃত্য ।

জনার্দন । কি বলিলে, তোমার নাম রামকৃষ্ণ ?

হেমচন্দ্র অনুমান করিলেন, ব্রাহ্মণের শ্রবণশক্তি বড় প্রবল
নহে অতএব উচ্চতরস্বরে কহিলেন, “আমার নাম হেমচন্দ্র
আমি ব্রাহ্মণের দাস ।”

জ । ভাল ভাল । প্রথমে ভাল তুলিতে পাই নাই, তোমার
নাম হনুমান্ দাস ।

হেমচন্দ্র মনে করিলেন,—নামের কথা দূর হউক ; কার্যসাধন
হইলেই হইল ; বলিলেন, “নবদ্বীপাধিপতির এই অট্টালিকা,
তিনি ইহা আমার বাসের জন্ত নিযুক্ত করিয়াছেন । তনিনাম,
আমার আসায় আপনি স্থানভাগ করিতেছেন ।”

জ । না এখনও গন্ধান্বানে ঘাই নাই ; এই স্থানের উদ্যোগ
করিতেছি ।

হে । (অতুষ্ণঃস্বরে) স্থান বধাসময়ে করিবেন । এক্ষণে
আমি এই অনুরোধ করিতে আসিয়াছি যে, আপনি এ গৃহ ছাড়িয়া
যাইবেন না ।

জ । গৃহে আহার করিব না ? তোমার বাটীতে কি ?
আপ্তশ্রাদ্ধ ?

হে ভাল, আহাৰাদির অভিলষ করেন, তাহারও উদ্যোগ
হইবে । এক্ষণে বেক্রপ এ বাটীতে অবস্থিতি করিতেছেন,
সেইরূপই করুন ।



জ। ভাল ভাল ; ব্রাহ্মণভোজন করাইলে দক্ষিণা ত আছেই, তা বলিতে হইবে না তোমার বাড়ী কোথা ?

হেমচন্দ্র হতাশ্বাস হইয়া প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন, এমন সময় পশ্চাৎ হইতে কে তাঁহার উত্তরীয় ধরিয়া টানিল। হেমচন্দ্র ফিরিয়া দেখিলেন ; দেখিয়া প্রথম মুহূর্ত্তে তাঁহার বোধ হইল, সম্মুখে একখানি কুসুমনির্মিতা দেবীপ্রতিমা। দ্বিতীয় মুহূর্ত্তে দেখিলেন, প্রতিমা সজীব ; তৃতীয় মুহূর্ত্তে দেখিলেন, প্রতিমা নহে, বিদাতার নির্যাণকৌশল-সীমারূপিনী বালিকা অথবা পূর্ণযৌবনা তরুণী।

বালিকা না তরুণী ? ইহা হেমচন্দ্র তাহাকে দেখিয়া নিশ্চিত করিতে পারিলেন না।

বীণানিন্দিত স্বরে স্তম্ভরী কহিলেন, “তুমি পিতামহকে কি বলিতেছিলে ? তোমার কথা উনি শুনিতে পাইবেন কেন ?”

হেমচন্দ্র কহিলেন, “তাহা ত পাইলেন না, দেখিলাম তুমি কে ?” বালিকা বলিল, “আমি মনোরমা।”

হে। ইনি তোমার পিতামহ ?

মনোরমা। তুমি পিতামহকে কি বলিতেছিলে ?

হে। শুনিলাম, ইনি এ গৃহ ত্যাগ করিয়া বাইবার উদ্দেশ্যে করিতেছেন। আমি তাই নিবারণ করিতে আসিয়াছি।

ম। এ গৃহে এক রাজপুত্র আসিয়াছেন। তিনি আমাদেরকে থাকিতে দিবেন কেন ?

হে। আমিই সেই রাজপুত্র। আমি তোমাদিগকে অনুরোধ করিতেছি, তোমরা এখানে থাক।

ম। কেন ?



এ ‘কেন’র উত্তর নাই। হেমচন্দ্র অল্প উত্তর না পাইয়া কহিলেন, “কেন ? মনে কর, যদি তোমার ভাই আসিয়া এই গৃহে বাস করিত, সে কি তোমাদিগকে তাড়াইয়া দিত ?”

ম। তুমি কি আমার ভাই ?

হে। আজ হইতে তোমার ভাই হইলাম। এখন বুঝিলে ?

ম। বুঝিয়াছি। কিন্তু ভগিনী বলিয়া আমাকে কখন তিরস্কার করিবে না ত ?

হেমচন্দ্র মনোরমার কথার প্রণালীতে চমৎকৃত হইতে লাগিলেন ; ভাবিলেন,—এ কি অলৌকিক সরলা বালিকা, না উন্মাদিনী ? বলিলেন, “কেন তিরস্কার করিব ?”

ম। যদি আমি দোষ করি ?

হে। দোষ দেখিলে কে না তিরস্কার করে ?

মনোরমা ক্ষুণ্ণভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন ; বলিলেন, “আমি কখন ভাই দেখি নাই, ভাইকে কি লজ্জা করিতে হয় ?”

হে। না।

ম। তবে আমি তোমাকে লজ্জা করিব না,—তুমি আমাকে লজ্জা করিবে ?

হেমচন্দ্র হাসিলেন ; কহিলেন, “আমার বস্তুব্য তোমার পিতামহকে জানাইতে পারিলাম না,—তাহার উপায় কি ?”

ম। আমি বলিতেছি।

এই বলিয়া মনোরমা মৃদু মৃদু স্বরে জনার্দনের নিকট হেমচন্দ্রের অভিপ্রায় জানাইলেন।

হেমচন্দ্র দেখিয়া বিস্মিত হইলেন যে, মনোরমার সেই মৃদু কথা বধিরের বোধগম্য হইল।



ব্রাহ্মণ আনন্দিত হইয়া রাজপুত্রকে আশীর্বাদ করিলেন এবং
কহিলেন, “মনোরমা, ব্রাহ্মণীকে বল,—রাজপুত্র তাঁহার নাতি
হইলেন—আশীর্বাদ করুন,” এই বলিয়া ব্রাহ্মণ স্বয়ং “ব্রাহ্মণি ।
ব্রাহ্মণি !” বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন । ব্রাহ্মণী তখন স্থানান্তরে
গৃহকাণ্ডে ব্যাপৃত ছিলেন—ডাক শুনিতে পাইলেন না । ব্রাহ্মণ
অসম্বৃত্ত হইয়া বলিলেন, “ব্রাহ্মণীর ঐ বড় দোষ । কাণে কম
শোনে ।”

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ।



গৃহস্থালি

(অনুগী)

মহাভারতের বনপর্বে যুধিষ্ঠির-বন্ধের প্রমোদরে আমরা একটি কথা পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারি। বন্ধ যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কো মোদতে ?”—সুখী কে ? ইতিপূর্বে বন্ধ তাঁহাকে অনেক বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলেন ; তাহাতে ধর্ম্মের কথা, বৈরাগ্যের কথা বিস্তর আছে,—এবার ধর্ম্মের বা বৈরাগ্যের প্রশ্ন নহে—গৃহীর সুখ-হঃখের কথা। যুধিষ্ঠির উত্তর দিতেছেন,—

“পঞ্চমেহহনি যঠে বা শাকং পচতি য়ে গৃহে ।

অনুগী চাপ্রবাসী চ স বারিচর মোদতে ॥”

—বনপর্ব, ৩১২ অ, ১১৫ ।

যে ঋণগ্রস্ত ও প্রবাসী না হইয়া আপনার গৃহে দিবসের পঞ্চম বা ষষ্ঠ ভাগে শাক মাত্রও পাক করে, সেই ব্যক্তিই সুখী

তিনটি কথায় ভারতবর্ষের গার্হস্থ্যধর্ম্মের তিনটি মূল কথা বিবৃত হইয়াছে। ঋণ না করিয়া সংসার চালানো, বিদেশে না গিয়া নিজ গৃহে বাস করা, আর সামান্তে সন্তুষ্ট থাকা—এই তিনটি হইল ভারতবাসীর গার্হস্থ্যধর্ম্মের প্রধান কথা।

ঋণ সম্বন্ধে বিদেশের মহাকবি সেক্সপিয়র কি বলিয়াছেন



ভাবিয়া দেখ। পুত্রকে পিতার উপদেশ-ব্যপদেশে তিনি বলিয়াছেন,—

“Neither a borrower, nor a lender be .
For loan oft loses both itself and friend ;
And borrowing dulls the edge of husbandry.”

ঋণ দাতা বা গ্রহীতা হ'বে না কখন ;
ঋণ দিলে হেন হয় অনেক সময়—
বাক্য-বিচ্ছেদ আর নিদ্রা অর্থক্ষয় ।
না থাকে সংযম, ঋণ করিলে গ্রহণ—
কুকেরের ধনে আর না হয় কুলন ।

বাস্তবিক ঋণ হুই দিকে কাটে ; ঋণ বে দেয় আর যে লয়—
প্রায় কাহারও ভাল হয় না । বন্ধুর বা আর কাহারও উপকার
করিতে হইলে যাহা পার সাহায্য কর, কিন্তু ঋণ দিলাম মনে
করিয়া তাহাকেও বাধিও না, আপনিও বাধা পড়িও না ।

ঋণগ্রস্ত হইয়া কোন কর্ম করিলে তাহার ফল পাওয়া যায়
না । নিত্যনৈমিত্তিক কার্যে ভিত্তি করিবে, তবু ঋণ করিবে না ,
আর যদি সঙ্কতিতে না কুলায় তাহা হইলে কাম্য কর্ম একেবারে
করিবেই না । ঋণ করিলে মানুষকে যত আত্মসম্মান হারাইতে হয়,
এত আর কিছুতেই নয় । ঋণী ব্যক্তি সর্বদাই সশঙ্ক, সর্বদাই
কুণ্ঠিত । উত্তমর্ণের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হইলে মুখ শুকাইয়া যায়—
বুঝিবা লোকটি পথের মাঝেই তাগাদা করেন । উত্তমর্ণের ভবনে
উৎসব, তিনি উৎসবে যোগদানার্থ নিমন্ত্রণ করিতে আসিলে আশঙ্কা
হয়,—এ সময় তাহার খরচপত্র হইবে, হযত পাওনা টাকার তাগাদা



করিবেন। আমার নিজের বাড়ীর উৎসবে উত্তমরূপে নিমন্ত্ৰণ করিতে যাইতে ভয় হয়—যদি বলেন, ঋণ থাকিতে এত বাড়াবাড়ি না করিলেই ভাল হইত। আত্মীয়-কুটুম্ব বাড়ীতে আসিলে বাজার হইতে একটা বড় ইলিসমাছ কিনিবার ইচ্ছা হইলেও কিনিবার উপায় নাই,—মহাজনের বাড়ীর কাছ দিয়া আসিতে চেষ্টা যে। টানাটানি করিয়া সংসার চালাইয়াও স্বস্তি নাই। তিনি তুমি যদি বলেন, “ওহে ভাই, এত কবাকষি করিয়া সংসার চালাইতেছ, ভালই, আমার টাকা কটা ফেলিয়া দাও না।”

এইরূপে দেখা যায় ঋণ করিলে খাইতে শুইতে, উৎসবে বাসনে, আহারে বিহারে—কিছুতেই স্বস্তি পাওয়া যায় না ; কেবল কর্ম-ভোগ ভুগিতে হয়, কর্মের সুফল মিলে না। জমিদার মহাশয় ঋণগ্রস্ত, দেখিবে তিনি যখন হাসিতেছেন তখন তাঁহাকে বিকারের রোগী বলিয়া মনে হইতেছে—এমনই বিকৃত বদন-বাদান, এমনই উচ্চশ্বনি, এমনই হস্তপদের আন্দোলন। তাঁহার নিজ প্রভুপরায়ণ ভৃত্য মুহুরি তাঁহাকে হিসাব দেখিতে বলিলে তিনি চটিয়া লাল হন। কখন মনে করেন, ঋণ আছে বলিয়া কর্মচারী বিজ্ঞপ করিতেছে, কখন মনে করেন, মহাজনের টাকা খাইয়া তাঁহার ঋণ পরিশোধ করিবার পরামর্শ দিবে। এইরূপে দেখিবে, ঋণের বাড়ী বিড়ম্বনা আর নাই। সততই মনে হয়, মহাজন যেন বৃকের উপর বসিয়া আছে ; বৃকের উপর যেন জগদল পাখর চাপানো আছে। এমন যে সন্ধ্যা-আহ্নিক, দেবপূজা তাহাতেও শাস্তি আসে না। মহাদেবের ‘রত্নকম্বোজলাঙ্গম্’ ভাবিতে গিয়া মহাজনের কুকুটি-কুটিল কটাক্ষ মনে পড়ে ; ধ্যানপূজা সমস্ত



পণ্ড হইয়া যায়, যদি সুখ, স্বাস্থ্য, শান্তি চাও, তবে ঋণী হইও না, ঋণ না করিয়া যেকপে পার সংসার চালাইবার চেষ্টা করিও।

এখনকার দিনে এই উপদেশের সম্পূর্ণ বিপরীতাচরণ সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়। কোঠাবাড়ী দালান না হইলে এখন সহর অঞ্চলে ভদ্রলোক হওয়া যায় না; আর ঋণ না করিয়া নগদ দামে চূণ-সুর্কি-ইট কিনিতেই নাই। কাজেই সহর ও সহরতলীর ভদ্রলোক যাত্রাই ইট-চূণ-সুর্কির মহাজনের কাছে ঋণী। তাহার পর নগদ দাম দিয়া যে কাপড়-চোপড় কেনে তাহাকেও ভদ্র বলা প্রথা নয়,—সুতরাং কাপড়ের দোকানে ঋণ থাকাই প্রশস্ত। কাজেই এখন লোকে অকুলনের দামে না হইলেও ভদ্রতার দামে ঋণী হইতেছে। তাহার পর এখন একটা ‘ব্যবসা’ বলিয়া কথা উঠিয়াছে। তা’ নাকি ঋণ করিয়া করাই উচিত। ৮ টাকা হারে সুদ কবুল করিয়া, বাস্তবাড়ী বন্ধক দিয়া কাটা-কাপড়ের কারবার করিলাম; তাহাতে ১২ টাকা করিয়া লাভ পোষাইবে, সুতরাং খামকা ৪ টাকা করিয়া লাভ থাকিবে,—জানিয়া-তিনিয়া এমন লাভ ত্যাগ করা নিবুদ্ভিত। কাজেই ঋণ করাই সুবুদ্ধির পরামর্শ।

আমরা সহর অঞ্চলের কথা বলিতেছি বলিয়া এমন মনে করিতে হইবে না যে, পল্লীগ্রামে ঋণ কম। অধিকাংশ পুরাতন সম্ভ্রান্ত পরিবার এখন ঋণে যে উদ্বাস্ত হইয়াছেন। যদি তাঁহাদের মধ্যে দুই এক জনের ভাল চাকরি ছুটিল, তবেই কথঞ্চিৎ-রক্ষা, নতুবা ঋণ বাড়িতে বাড়িতেই চলিল।

সেতাপিয়র সুন্দর বলিয়াছেন, ঋণ করিতে শিখিলে আর মিতব্যয়িতা-প্রবৃত্তির তীক্ষ্ণতা থাকে না, ভোতা হইয়া যায়।



মিতব্যয়িতা হইল গার্হস্থ্যার্থের প্রাণ। মিতব্যয়িতা নষ্ট হইলে সংসারে আর প্রাণ থাকে না, সমস্ত শিথিল হইয়া যায়। আমাদের মত মধ্যবর্তী লোকের মিতব্যয়িতা থাকিলে সংযম থাকে, মিত্রাচার থাকে, বিলাসিতা কম থাকে, আড়ম্বর কম থাকে, পরিবারস্থ জীপুরুষের পরিশ্রমে অভ্যাগাস থাকে ; আর ঋণ করিতে শিথিলে বিলাসিতা আসে, আলস্য আসে, সংযম থাকে না—লক্ষ্যছাড়া হইতে হয়।

ধনবৃদ্ধির ক্ষুদ্র ঋণ, মানবৃদ্ধির ক্ষুদ্র ঋণ, বিলাসবৃদ্ধির ক্ষুদ্র ঋণ—
নানারূপ ঋণে বাজালার গৃহস্থগণ নষ্ট হইয়া যাইতেছেন। অর্থাভাবে ঋণই কিন্তু বেশী। প্রয়োজনীয় পদার্থের সংগ্রহ হয় না, সেইজন্য সামান্য আয়ের ভদ্রসহান বাধা হইয়া ঋণ করেন। আয়ের দশাংশের এক অংশ সরকারের ক্ষুদ্র রাখিয়া নয় অংশ ব্যয় করিলে তবে গৃহস্থালি হয়, এ কথা আমরা কুলিয়া গিয়াছি। প্রথমতঃ দুইটি কারণে ঐ উপদেশ আমরা গ্রাহ্য করি না,—(১) পোষাক-পরিচ্ছদের সহিত মান-সম্মানের সম্বন্ধ আছে, এইরূপ মনে করিতে আমরা শিখিতেছি। ২। আর শিখিতেছি, খাদ্য-দ্রব্য, পোষাক-পরিচ্ছদের চাপচলন ক্রমে ক্রমে বাড়ানো কর্তব্য, তাহা হইলে অধিকতর অর্থোপার্জনের প্রয়োজন হয় ; প্রয়োজন হইলেই প্রয়োজন মিটাইবার উপায় অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্তি হয় ; উপায় ক্রমে বাহির হইয়া পড়ে, কাজেই আয় বাড়িয়া যায়।

আমরা যদি পোষাক-পরিচ্ছদ দেখিয়া সম্মান করিতে, সম্ময় করিতে, মর্যাদা করিতে শিখি, তাহা হইলে সমাজে ঘোর অনর্থ-পাতের সূত্রপাত করি। ধনবান্ লোকেই আড়ম্বরে পোষাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতে পারেন ; কেবল পোষাক-পরিচ্ছদ দেখিয়া



সম্মান করিলে, কেবল ধনবানেরই সম্মান করা হয়। যে সমাজে কেবল ধনবানের সম্মান আছে, সে সমাজ অতি অপকৃষ্ট সমাজ। সমাজে গুণের ও কর্মের সম্মান থাকা আবশ্যিক। গুণকর্ম-বিভেদেই আতিভেদ হইয়াছিল।

প্রয়োজন বাড়াইলেই আর বাড়ে—যোর মিথ্যা কথা প্রয়োজন বাড়াইয়াছি বলিয়াই আমরা ঋণগ্রস্ত হইতেছি ; ইহার দৃষ্টান্ত পাইবার জন্য আমাদেরকে অধিক কষ্ট পাইতে হইবে না ঘরে ঘরেই ইহার জলন্ত দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। এখনকার দিনে এত যে হাহাকার, প্রয়োজনবৃদ্ধি তাহার মূল কারণ। ছোট ছেলে—নিজে ভালমন্দ কিছুই বুঝে না, তাহার জন্য ‘নটুন কাপল’ ও ‘আগা জুতো’ হইলেই সে মহা খুশী, আমরা কিন্তু বাকুড়ি-লাগানো শাটীনের জামা ও চীনের জুতা তাহাকে দিবার জন্য বিব্রত। কাজেই আমরা ঋণপথে অষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত।

এই সকল বিলাস-দ্রব্যের যারা কাটাইয়া আমাদেরকে আবার হিন্দু সংসারী হইতে হইবে ; তাহা হইলে স্বস্তি পাইব, শান্তি পাইব, সংসারে আবার শৃঙ্খলা স্থাপিত হইবে আয়ে-ব্যয়ে যে সামঞ্জস্য-সাধন, তাহাই হইল সংসারের শ্রেষ্ঠ শৃঙ্খলা। সেই শৃঙ্খলা হারাইয়া আমরা ভয়কর্ণ নোকার মত এদিক্ ওদিক্ ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। প্রত্যাহ পসারীর কাছে ঋণ করিয়া নিত্য-ব্যবহার্য জিনিষপত্র আনি বলিয়া আমরা ভাল জিনিষ পাই না, আর মাসকাবারের দিনে ডাহিনে আনিতে বামে কুলার না ; কোন জিনিষে কিছুতেই আর দেয় না, সদাই অনটন ; আমরা লক্ষীর সম্মান হইয়াও দিন দিন নিত্য লক্ষীছাড়া হইতেছি।



(অপ্রবাসী)

যুধিষ্ঠিরের কথা—অপ্রবাসী হইলে তবে সুখী হইতে পারা যায়। প্রবাসে কি সুখ পাওয়া যায় না? যুধিষ্ঠির কিরূপ সুখের কথা বলিতেছেন তাহা বুঝিলে, তবে ঐ কথার উত্তর দেওয়া যায়। অশ্বিনী ব্যক্তিই সুখী হইতে পারে, এই কথা বলাতেই আমরা কতক কতক বুঝিতে পারিয়াছি যে, তিনি স্বস্তির কথা, শাস্তির কথা লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছেন। এখন বুঝিতে হইবে কোন্ বিষয়টি লক্ষ্য করিয়া তিনি “প্রবাস” হুঃখের হেতুভূত মনে করিয়াছেন।

বংশপরম্পরাক্রমে একই দেশে থাকিয়া কি জীবজন্তুর, কি গাছপালার—সেই দেশের জলবায়ুর সহিত, তাপমাত্রার সহিত এক প্রকার সখ্য বা সৌহার্দ্য হয়। এ দেশের কলাগাছ পশ্চিম মূলুকে বসাইলে মুন্ডাইয়া যাইতে থাকে, কিছু দিনে মরিয়া যায়। পশ্চিমের মনুষ্য পাখী দুই বৎসর বাঁচাইয়া রাখা দায়। সকলেই জানেন, হাতী, উট, ঘোড়া সকল দেশে জন্মায় না, আনাইয়া রাখিলেও স্বদেশের যত উহাদের বংশবৃদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধি হয় না। মানুষের বেলায়ও ঠিক সেই ভাব। পুত্রের পীড়ার দায়ে পশ্চিমোত্তর প্রদেশের ইটৌওয়া নগরে পাঁচ মাস প্রবাস করিয়া-ছিলাম; প্রবাসী বাঙ্গালীদের সঙ্গে আলাপ করিয়াছিলাম। সেখানে এক-পুরুষে বা দুই-পুরুষে বাঙ্গালীর বাস অধিক, এক ঘর চারি-পাঁচ-পুরুষে ছিলেন। তাঁহাদের নিবাস ছিল হালিসহরে, বোধ করি তাঁহারা ‘খনের চাটুতি,’ সরকারের প্রথম অবস্থায় ইহাদের পূর্বপুরুষ ভাল চাকরি লইয়া আসেন, ঐ জেলায় প্রায়



বার্ষিক ছয় হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি করেন। আমার সহিত যখন তাঁহাদের আলাপ হয়, তাঁহার পোষ তখনও জীবিত ছিলেন, অক্ষ হইয়াছিলেন। পুত্র, ভ্রাতৃপুত্র, পৌত্রাদি অনেকগুলি—কিন্তু কি বলিয়া তাঁহাদের অধঃপতন বুঝাইব, তাহা বলিতে পারি না। পশ্চিমের আফিং খাওয়া আর বাঙ্গালীর মোকদ্দমা করা—এই দুইটা রোগ একত্র মিশিত হইয়া তাঁহাদিগকে কি বেগড়িয়া তুলিয়াছে, তাহা বর্ণনা করা যায় না। তাঁহাদিগকে বাস্তবিকই যাহুজ বলিতে কুণ্ডা হয়—পাছে বাকি যাহুবে মান-হানির দাবি করে।

ইটাওয়া হইতে কানপুরে আসি। সেখানে একটি খাটি বাঙ্গালোপাড়াই আছে, অতি অপরিষ্কার পল্লী; অধিবাসীদের অবস্থা সর্ববিষয়েই শোচনীয়। তাঁহার পর প্রয়াগে আসিলাম—সেখানে দুই জন গণ্যমান্ত শিক্ষকের সহিত এই বিষয়ে আমার কথাবাতা হইল। এক জন ত্রিযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, “প্রবাসী”র সম্পাদক—আজকাল প্রবাস পরিত্যাগ করিয়াছেন, আর এক জন ত্রিযুক্ত উমেশচন্দ্র ঘোষ, গবর্নমেন্ট কলেজের অধ্যাপক, এখনও সেই পদেই আছেন। দুই জনেই একবাক্যে বলিলেন যে, তাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছেন, স্বকৃত-প্রবাসীর পুত্র-পৌত্র পর্য্যন্ত হিন্দুস্থানী বালক-যুবকদের অপেক্ষা ভাল থাকে, কিন্তু কোন প্রবাসী বাঙ্গালীর প্রপৌত্র হিন্দুস্থানীদের সমকক্ষতাও রক্ষা করিতে পারে না। বুঝিলাম, প্রবাসে বংশের অবনতিই হইয়া থাকে।

আর এক কথা—দেশে আমরা ৫০ ঘর প্রতিবেদী আজি দুই শত বৎসর বাবৎ একস্থানে একত্র বাস করিতেছি; সকলের দোষগুণ সকলে জানি, দোষগুণ জানিয়া সেই মত ব্যবহার করিয়া



থাকি। প্রতিবাসিনীগণী একরূপ একটি বৃহৎ পরিবার হইয়া পড়িয়াছে; পরস্পরের সুখদুঃখে পরস্পর ভড়িত থাকে—বিপদে সাহায্য পাই, উৎসবে আনন্দ পাই। কোন্ ভাবে কে সাহায্য চায়, তাহা জানি; কাহাকে কি ভাবে সাহায্য করিতে হইবে, তাহা বুঝি।

বিদেশে ইহার কিছুই হয় না। যদি ৫০ঘর বিদেশীর মধ্যে আমি এক ঘর রহিলাম, তাহা হইলে ত আমাকে বনবাসের অপেক্ষাও কষ্টে থাকিতে হইবে। তা না হইয়া যদি ৫০ঘরের মধ্যে আমরা দশ ঘর বাঙ্গালী থাকি, তদুও বিড়ম্বনা বড় কম নয়। আমরা দশ ঘর বাঙ্গালী বটে,—কিন্তু তাহার মধ্যে দুই ঘর বা খ্রীষ্টীয়, তিন ঘর বরিশালী, দুই ঘর বর্কমানী, দুই ঘর কলিকাতার। সভ্যতার পালিশের গুণে হয় ত একপ্রকার সৌজন্য আছে; কিন্তু সৌহার্দ্য একেবারেই অসম্ভব। তুমি হয়ত দুইটি রোগী ও রোগী ছেলে, বৃদ্ধ মাতা ও ভাৰ্যা লইয়া প্রবাসে পড়িয়া আছ, দেখিবে প্রবাসে বাঙ্গালীর মধ্যে সৌজন্যের অভাব নাই। প্রভাতে পরিক্রমের সময়ে দেখিবে দলে দলে বাঙ্গালী বাবুরা আসিয়া কেবল সৌজন্য-সহকারে ভব (land en juries) লইতেছেন—জর কত ডিগ্রী উঠিয়াছিল, সকলেই জিজ্ঞাসা করিতেছেন; কিন্তু এই যে তোমরা আগন্তুক দম্পতী রোগের সেবায় ক্রমাগত রাত্রি জাগিয়া যারা যাইতে বসিয়াছ, কোনরূপ সাহায্য করিবা তোমাদের একটু ‘আশান্’ দিবার প্রস্তাব কেহ কখন করিবেন কি? প্রবাসে জন্মের টান প্রায়ই হয় না। তাহার উপর ইংরাজি সভ্যতার একটা মোহ হইয়াছে, ভজলোকে মনে করেন সৌজন্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারিলেই মনুষ্যের রক্ষা হয়। পরস্পর সাহায্যে মনুষ্য—



ঘাড়-নাড়ানাড়ি বা হাত-নাড়ানাড়ি, একত্র ভাষাক খাওয়া বা চা পান করায় মনুষ্যত্ব হয় না। বরংই দয়ার ভাবে খোজখবর লও, তাহাতে মনুষ্যত্ব হয় না—দয়ার বা প্রীতির বা মৈত্রীর কার্য্য করা আবশ্যক। প্রবাসে সকলেই যে মনুষ্যত্বহীন এমন কথা বলি না, তবে মনুষ্যত্ব থাকিলেও পাঁচ জনের মধ্যে বংশপরম্পরার ঘনিষ্ঠতা না থাকায় মনুষ্যত্ব ফুটে না—বরং শুকাটয়া যায়।

প্রবাসে এক শূকর-পেটের পূরণ আর মিহ্র বা অমিহ্র-ভোজে খাসী-চর্কির খানায় দানবোদরের সম্পূরণ ছাড়া ক্রিয়া-কলাপ কিছুই নাই। পূর্বপুরুষ-প্রতিষ্ঠিত শালগ্রাম শিলা আছেন—পুরোহিত ঠাকুরের ভাড়াঘরের কুলুসিতে, চুস্তবস্ত্রী গাড়ী আছেন গোয়ালার গোয়ালঘরের দাওয়ায়, বড় বাড়ী দেখিয়া বাড়ীর ধারে রোয়াক অতিপি চীংকার করিতেছে—ডেপুটীবাবু তখন প্রবাসে চায়ে চিনি কম হইয়াছে বলিয়া চাপরাসীকে ভৎসনা করিতেছেন! দেশের লোকের খোজখবর নাই, পিতৃপুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক নাই, দেবতা-ব্রাহ্মণে ভক্তি নাই, পূজা নাই, অর্চনা নাই, শ্রাদ্ধ নাই, শাস্তি নাই—প্রবাসে হিন্দুর মনুষ্যত্ব কেমন করিয়া থাকিবে? না—আমরা পেটের দায়ে, অবস্থা-উন্নতির দায়ে, রোগের দায়ে, সখের দায়ে—কারণে অকারণে প্রবাসী হইয়া প্রকৃত মনুষ্যত্বের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত সুখ হারাইতেছি।

সংসারীর সুখ-বৃচ্ছন্দতা, স্বস্তি-শান্তি—সকলই আর পাঁচ জন সংসারীকে লইয়া। প্রতিবাসীর বংশের রীতি-নীতি জানিলে, তবে তাঁহাদের সঙ্গে সামাজিক ব্যবহারে সুখ পাওয়া যায়। প্রবাসে এক জন আর এক জনের বংশের পরিচয় কিছুই জানেন না; কাজেই পরম্পরে পরম্পরের বংশ-পরম্পরার পরিচয়ে যে



ঘনিষ্ঠতা দেশে হয়, প্রবাসে তাহার কিছুই হয় না। এটি হইল সাধারণ কথা। আবার বিশেষ কথাও আছে। সখ করিয়া যাহারা প্রবাসী হন, তাঁহাদের মধ্যে দেশে হৃদয় করিয়া বিদেশে আশ্রয় লইয়াছেন, এমনও দুই এক জন থাকেন। তাঁহাদের সহিত আলাপ-পরিচয় করিতে যাওয়া মহা বিড়ম্বনা। তাঁহারা সর্বদা সশঙ্ক থাকেন, সর্বদাই মনে করেন এ ব্যক্তি বুঝি আমার দেশের সংবাদ রাখে; কাজেই দেশের কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেই চটিয়া লাল হন; লোকটা হঠাৎ কেন এমন করিল ভাবিয়া বিড়ম্বিত হইতে হয়। এইরূপ ভাবিয়া দেখিলে বেশ বুঝা যায় যে, প্রবাসে নানারূপ বিড়ম্বনা অবশ্যস্তাবী। প্রবাসে যাওয়া বা থাকা বত কমানো যায়, ততই ভাল। ব্রহ্মচর্য-অবস্থায় গুরু সহিত বিদেশ-ভ্রমণ, গৃহস্থ-অবস্থায় তীর্থপর্যটন, (এখন আশ্রমভেদ নাই বলিলেও হয় কিন্তু) বানপ্রস্থের মত সময়ে প্রবাসে পর্যটন, আর দেশে মহামারী-আদি হইলে প্রবাসে অগত্যা বাস—এই সকল সময় ছাড়া বাঙ্গালীর পক্ষে স্বৈচ্ছার অনর্থক প্রবাসবাস একেবারে পরিবর্জনীয়।

(স্বগৃহে পাক)

অকুণ্ঠ, অপ্রবাসী হইয়া যে ব্যক্তি আপনার গৃহে অতি যৎসামান্ত খাদ্য প্রস্তুত করিতে পারে—সেই সুখী। দুইটি কথা লক্ষ্য করিবার আছে,—একবার ‘অপ্রবাসী’ বলা হইয়াছে, আবার ‘স্ব গৃহে’ বলা হইয়াছে। কেবল দেশে থাকিলে হইবে না, আপনার একটি গৃহ থাকা চাই। আমাদের রাষ্ট্রীয় কুলীন



ব্রাহ্মণদিগের একটা নিদার কথা ছিল, “নিবাস যন্তর-ঘরে।”—
সেরূপ অগ্রবাসী হইলে চলিবে না, সত্যসত্যই নিজের একটি
ঘর থাকা চাই। এমন কেহ মনে করিও না যে, ইহাতে
একান্নবত্তী পরিবারে বাস করা নিষিদ্ধ হইতেছে; যে ভাবে
আমরা বলি, “পদ্ভাতী ভাল, পদ্মবী কিছু নয়”—এ সেই ভাবের
কথা। গৃহী মাত্রেই গৃহ থাকা চাই এবং গৃহিণীও থাকা
আবশ্যক। কিন্তু সে কথা যুধিষ্ঠিরের উত্তরে স্পষ্ট করিয়া নাই,
আমরাও বলিব না। গৃহে গৃহিণী থাকা চাই—এ উপদেশ
বাজালীকে দিবার প্রয়োজন নাই! অতি সামান্য আয়ের
কেরানীবাবুও এখনকার দিনে পরিবার নিকটে রাখিবার জ্ঞাত
বাগ, কাজেই ও কথা বলার প্রয়োজন নাই। আর লক্ষ্য করিবার
কথা ‘পচতি’—পাক করে বা প্রস্তুত করে। দিনান্তে এক বার
মাত্র হউক, অতি যৎসামান্ত হউক, তাহা যদি সে প্রস্তুত করিতে
পারে, তবেই সে সুখী; ‘খাইতে পাইলে সুখী,’ এমন কথা নাই।
কেন না খাওয়াটা গৃহস্থালির বড় জিনিষ নয়, পাক করিবার
কমতা থাকা গৃহস্থের লক্ষণ—তবে ত দেবতা-অতিথিকে দিয়া
আহার। সুতরাং পাক করা চাই।

যুধিষ্ঠিরের উত্তরে বুঝা গেল, দরিদ্রের কুটীরে পর্মান্ত সুখ থাকিতে
পারে। তাহার ঋণ না থাকিলেই হইল, (জন্মভূমিতে) একখানি
স্থায়ী কুটীর থাকিলেই হইল এবং দিনান্তে হাঁড়ী চড়িলেই হইল।
সুখ ভোগে নহে, সুখ ঐর্ষ্যে নহে, সুখ ভোগ বিষয়ের প্রাচুর্যে
নহে। এইটি ভারতের একটি মূল কথা। ঋণ করিয়া ভোগের
আডম্বরের কথায় আমরা এই কথারই আলোচনা করিয়াছি,
আবার সেই কথারই তোলাপাড়া করিতেছি।

(সন্তোষ)

আমরা বলি সন্তোষ দুখের মূল ; বিদেশীয়েরা বলেন সন্তোষ সকল দুঃখের আকর।—সন্তোষ হইতে আলস্য আসে, আলস্য হইতে অভাবমোচনের শক্তি কমিয়া যায়, অভাবগ্রস্ত হইয়া আমরা নানা দুঃখ পাই। সুতরাং কি রাজনীতি, কি সমাজনীতিতে অসন্তোষই হইল উন্নতির উপায়। কিন্তু বাহারা এইরূপ অসন্তোষের উপদেশ নিয়ত দিয়াছেন, তাঁহারাই এখন একটু ইতস্ততঃ করিতেছেন। এখন রাজনীতিকেরা ভারতে মহা অসন্তোষ দেখিয়া তাঁহাদের চক্ষু কুটয়াছে, বলিতেছেন—এরূপ অসন্তোষ ভাল নহে। আমরা রাজনীতির কথা তুলিব না, তবে সমাজে অসন্তোষের সৃষ্টি করিয়া বা বৃদ্ধি করিয়া বাহারা সমাজের মঙ্গল-কামনা করেন, তাঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তির বা প্রকরণ-পদ্ধতির প্রশংসা করিতেও পারি না। অসন্তোষ—অধর্ম। অধর্মে কোন সমাজের বা ব্যক্তির বা পরিবারের উন্নতি হইতে পারে, এমন কথা বুঝিতে পারি না।

বালকে আপনাব অবস্থা বুঝে না, কাজেই সর্বদা—ইহা কৈ, উহা কৈ, ক্ষীর খাইব, মিঠাই খাইব বলে। বালকের সেই অসন্তোষে প্রশ্রয় দিয়া তাকে অসন্তুষ্ট যুবা কবিত্তে পারিলেই কি সুবুদ্ধিমানের কাজ হয়? না,—সেই বালককে বুঝাইতে হইবে যে, বাপু, আমরা ক্ষীর-মিঠাই কোথা পাইব? বাহার যেমন সঙ্গতি, তাহার ছেলেপিলেরা সেই মতই খাইতে পায়; আমাদের যেমন অবস্থা, সেই মত অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। তোমার জন্ত মোয়া আছে, লাডু আছে, তাহাই খাইয়া সন্তুষ্ট হও। যে যে অবস্থার লোক হইয়া কেন, সন্তোষ সকলকেই শিখিতে হইবে, কেন না



অপরিসীম উপকরণ থাকার সম্ভাবনা নাই।—এই যে চৌর্য্য, দস্যুতা প্রভৃতি পাপ—এগুলি কি সম্ভ্রামের ফল ? না অসম্ভ্রামের পরিণাম ? নিশ্চয় অসম্ভ্রাম হইতেই এই সকলের উৎপত্তি ; সুতরাং সম্ভ্রামই বাঞ্ছনীয়—অসম্ভ্রাম নহে । তবে সম্ভ্রাম হইতে আলস্য আসিয়া পড়ে—এ কথাও একেবারে ফেলিয়া দিবার উপায় নাই । কিন্তু এখনও আমরা যেমন ‘পেট বড় ওস্তাদ’ বুঝিয়া গৃহস্থালি বদলে পাকস্থলীকে ওস্তাদিতে বাহাল রাখিয়াছি, আর তাহারই ভাঙনার আলস্য ত্যাগ করিতেছি, সেইরূপ পূর্ব্বের মত যদি গৃহস্থালিকে আবার ওস্তাদিতে বসাইতে পারি—যদি অতিথি-সেবতার পূজা, অবশ্য-পোষ্যের পালন পেটপূরণের মত প্রয়োজনীয় মনে করি, তাহা হইলে আমরা অলস হইবার অবসর পাইব না । পাঁচ জনকে দিয়া, তবে পেট পূরাইতে হয়—এই ধারণা বহুমূল্য থাকিলে আলস্য আর আমাদের উপর বল করিতে পারে না ।

(শ্রীস্বন্দিক)

আর শ্রাঙ্কের পর আমরা পিতৃলোকের নিকট কীরূপ বর প্রার্থনা করি, তাহা শ্রবণ কর,—

“দাতারো নোহিভিবর্কৃষ্টাং বেদাঃ সম্ভতিরেব চ ।

শ্রদ্ধা চ নো যা যাগযদ্ বহু দেয়ঞ্চ নোহিহিতি ॥”

—যমু, ৩।২৫৯ ।

—হে পিতৃগণ ! আমাদের কুলে যেন দাতা লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ; অধ্যয়ন, অধ্যাপন ও যাগাদির অমুষ্ঠান-দ্বারা বেদশাস্ত্রের যেন সম্যক আলোচনা হয় ; আমাদের পুত্রপৌত্রাদি বংশপরম্পরা



যেন চিরকাল বিস্তৃত থাকে ; বেদের উপর অটল শ্রদ্ধা যেন আমাদের কুল হইতে তিরোহিত না হয় এবং দান করিবার জন্ত দেয় দ্রব্যেরও যেন কখন অসম্ভাব না থাকে ।

যে ঐকান্তিকতা-সহকারে ঐক্লপ প্রার্থনা আপনার পিতৃপুরুষের কাছে করিতে পারে, সে কি কখন আর অলস হইতে পারে ? এখনকার দিনের বিজ্ঞেরা বলেন, ষ্টাইল (style) না বাড়াইলে উপার্জন বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা হইবে কেন ? সাংসারিক উন্নতি হইবে কি প্রকারে ? আমরা বিনীতভাবে সেই বিজ্ঞদিগকে জিজ্ঞাসা করি, ঐ প্রার্থনায় কি ষ্টাইল বৃদ্ধি করিবার ইচ্ছা প্রকাশ পায় না ? পায় বৈ কি । তবে আমাকে কোপ্তা-কাবাব, কারি-কাটলেট দাও—সে কথা নাই বটে ; গাড়ী দাও, জুড়ি দাও—সে কথাও নাই বটে ; শাল দাও, কুমাল দাও—সে কথাও নাই বটে, —কিন্তু আমার বংশে দেয় বস্তু বৃদ্ধি পাউক, বংশে দাতার সংখ্যা বৃদ্ধি পাউক—এ কি শ্রীবৃদ্ধির কথা নহে ? যে বস্তু পরের হুঃখ দূর করিতে পারে, তাহাকে আমরা তত শ্রীমান্ মনে করি । সেই শ্রী লাভ করিবার জন্ত আমরা ব্যগ্র—আমরা কখন অলস হইতে পারি কি ? আর যে আলস্তে এণ বৃদ্ধি হয়, সে আলস্ত কি আমাদের আশ্রয় হইতে পারে ? তাহা পারে না । আমরা যুধিষ্ঠিরের উপদেশ সম্যক্ প্রতিপালনের চেষ্টাই করিয়া থাকি । আমরা বুঝি তাহাতেই স্বচ্ছন্দতা, সুখ, স্বস্তি এবং পারিবারিক শান্তি ।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার ।



শ্মশানে

এইখানে আসিলে সকলেই সমান হয়। পণ্ডিত, মূর্খ; ধনী, দরিদ্র; সুন্দর, কুৎসিত; মহৎ, ক্ষুদ্র; ব্রাহ্মণ, শূদ্র; ইংরেজ, বাঙ্গালী—এইখানে সকলেই সমান। নৈসর্গিক, অনৈসর্গিক সকল বৈষম্য এইখানে তিরোহিত হয়। শাক্যসিংহ বল, শঙ্করাচার্য্য বল, ঈশা বল, কসো বল, রামমোহন বল; কিন্তু এমন সাম্য-সংস্থাপক এ জগতে আর নাই। এ বাজারে সব এক দর—অতি মহৎ এবং অতি ক্ষুদ্র, মহাকবি কালিদাস এবং বটভঙ্গার নাটকলেখক, একই মূল্য বহন করে। তাই বলি, এ স্থান ধর্ম্মভাবপূর্ণ—এ স্থান সদুপদেশপূর্ণ—এ স্থান পবিত্র।

এইখানে বসিয়া একবার চিন্তা করিতে পারিলে, মনুষ্য-মহত্বের অসারতা বুঝিতে পারি, অহঙ্কার চূর্ণীকৃত হয়, আত্মানন্দ সঙ্কুচিত হয়, স্বার্থপরতার নীচতা হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হই। আজি হউক, কালি হউক, দশ দিন পরে হউক, সকলকেই আসিয়া এই শ্মশানমৃত্তিকা হইতে হইবে। যে অনতিভবনীয় বীৰ্য্য, যে দুর্জয় অহঙ্কার—আর পৃথিবী নাই বলিয়া রোদন করিয়াছিল, তাহা এই মৃত্তিকাসাৎ হইয়াছে,—তুমি আমি কে? যে উৎকট আত্মাভিমান ইউরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর কাছে সাহস্বরে কর চাহিয়াছিল, *

* See Lewes's History of Philosophy. Auguste Comte.



তাহা এই মাটিতে বিলীন হইয়াছে, —তুমি আমি কে ? সে দিন যে চিন্তাশক্তি ঈশ্বরকে স্বকার্য্য-সাধনে অক্ষম বলিতে সাহস করিল,* তাহা এই মাটিতে মিশিয়াছে,—তুমি আমি কে ? যে রূপের অনলে উয় পুড়িয়াছিল, যে সৌন্দর্য্য-তরঙ্গে বিপুল রাবণবংশ ভাসিয়া গিয়াছিল, যে লাবণ্য-রজ্জুতে জুলিয়স্ সিজর বঁধা পড়িয়াছিল, যে পবিত্র সৌকুমার্য্যে এ পাপহৃদয়ে কালানল জলিয়াছে, সে সুন্দরী, সে দেবী, সে বিলাসবতী, সে অনির্কচনীয় এই মাটিতে পরিণত হইয়াছে,—তুমি আমি কে ? কয় দিনের জন্ত সংসার ? কয় দিনের জন্ত জীবন ? এই নদীহৃদয়ে জলবিধের জায় যে বাতাসে উঠিল, সেই বাতাসেই মিলাইতে পারে। আজি যেন অহঙ্কারে মাতিয়া একজন নাতাকে চরণে দলিত করিলাম কিন্তু কালি এমন দিন আসিতে পারে যে, আমাকে শৃগালবুদ্ধের পদাঘাত করিলেও আমি তাহার প্রতিবিধান করিতে পারিব না। কেন অহঙ্কার ? কিসের জন্ত অহঙ্কার ? এ অনন্ত বিধে আমি কে— আমি কতটুকু —আমি কি ? এই মাটির পুতুলে অহঙ্কার শোভা পায় না। তাই বলিতেছিলাম, এই স্থান যনে উঠিলে সকল অহঙ্কার—বিজ্ঞার অহঙ্কার, প্রভুত্বের অহঙ্কার, ধনের অহঙ্কার, সৌন্দর্য্যের অহঙ্কার, বুদ্ধির অহঙ্কার, প্রতিভার অহঙ্কার, ক্ষমতার অহঙ্কার, অহঙ্কারের অহঙ্কার—সকল অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া যায়, আর সেই দিন অপরিহার্য্য—পলাইয়া রক্ষা নাই। যে ভীকশ্রেষ্ঠ লক্ষণ সেন জীবনের ভয়ে যবনহস্তে জন্মভূমি নিষ্ক্ষেপ করিয়া, মুখের গ্রাস ভোজনপাত্র ফেলিয়া তীর্থযাত্রা করিলেন, তিনিও এড়াইতে পারিলেন না। অনিরাছি, স্বর্গে বৈষম্য নাই—ঈশ্বরের

* See J. S. Mill's Three Essays on Religion.



চক্ষে সকলেই সমান। স্বর্গ কি, তাহা জানি না—কখনও দেখি নাই, হয় ত কখনও দেখিবও না। কিন্তু শ্মশানভূমির এই উপদেশ জীবন্ত। এ স্থান স্বর্গের অপেক্ষাও বড়। এ স্থান পবিত্র।

আর স্বার্থপরতা? তাহারও ক্ষুদ্র অমুমিত হয়। সমুখে, অসীম জলরাশি অনন্তপ্রবাহে প্রবাহিত হইতেছে। পদতলে, বিপুল ধরিত্রী পড়িয়া রহিয়াছে। যন্তুকোপরি, অনন্ত আকাশ বিস্তৃত রহিয়াছে। তাহাতে অসংখ্য সৌরমণ্ডল, অগণনীয় নাকত্রিক জগৎ নাচিয়া বেড়াইতেছে; সংখ্যাভীত ধূমকেতু ছুটোছুটি করিতেছে। ভিতরে অনন্ত দুঃখরাশি, ক্ষুদ্রসাগরবৎ, মদমত্ত যাতনবৎ, দুলিতেছে। যে দিকে দৃষ্ট ফিরাও, সেই দিকেই অনন্ত—আমি অতি ক্ষুদ্র—কত সামান্ত। এই সামান্তের, এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতরের জন্ত এত আয়াস, এত যত্ন, এত গোল, এত বিদাট, এত পাপ!—বড় লজ্জার কথা। এই ক্ষুদ্রকে কেন্দ্র করিয়া যে জীবন অতিবাহিত হইল, তাহার মহত্ব কোথায়? কিন্তু তুমি ক্ষুদ্র হইলেও মানবজাতি ক্ষুদ্র নহে। একটি একটি মনুষ্য লইয়াই মনুষ্যজাতি, স্বীকার করি; কিন্তু জাতিমাত্রই মহৎ। বিন্দু বিন্দু বারি লইয়া সমুদ্র; কণা কণা বাষ্প লইয়া মেঘ; রেণু রেণু বালুকা লইয়া মরুভূমি; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্ষত্র লইয়া ছায়াপথ; পরমাণু লইয়া এ অনন্ত বিশ্ব। একতাই মহত্ব—মনুষ্যজাতি মহৎ। মহৎ কার্যে আত্মসমর্পণ করায় মহত্ব আছে—স্বীকার করি, ব্যক্তিমাত্রের জ্ঞান জাতিমাত্রেরও ধ্বংস আছে। এরূপ প্রমাণ আছে যে, এ কাল পর্য্যন্ত অনেক প্রাচীন জাতি পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইয়াছে এবং অনেক নূতন জাতির আবির্ভাব হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে



আমার কতি কি ? যে দিন মনুষ্যজাতির লোপ হইবে, সে দিন আমিও তাহা দেখিতে থাকিব না, কেননা, আমিও মনুষ্য—মনুষ্যজাতির অন্তর্গত। কিন্তু কি বে বলিতেছিলাম, ভুলিয়া গিয়াছি—

এইখানে আসিয়া সকল জিনিষের সমাপ্তি হয়। ভাল মন্দ, সং অসং—সব এই পথ দিয়া সংসার পরিত্যাগ করিয়া যায়। এ সুখের স্থান। এইখানে শয়ন করিতে পারিলে শোকতাপ যায়, আলায়গুণা কুরায়, সকল দুঃখ দূর হয়—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক—সকল দুঃখ দূর হয়। আবার তাও বলি, এ দুঃখের স্থান। এইখানে বে আগুন অলে, তাহা এ জন্মে নিবে না। তাহাতে সৌন্দর্য্য পোড়ে, প্রেম পোড়ে, সরলতা পোড়ে, ব্রীড়া পোড়ে, বাহা পুড়িবার নয়, তাহাও পোড়ে—আর তার সঙ্গে সঙ্গে অপরের আশা, উৎসাহ, প্রফুল্লতা, সুখ, উচ্চাভিলাষ, মায়া—সব লুপ্ত হয়। তাই বলি, এ স্থান সুখেরও বটে, দুঃখেরও বটে,—বে চলিয়া যায়, তার সুখ; বে পাড়য়া থাকে, তার দুঃখ। এ সংসারেরই ঐ নিরম—সবই ভাল, সবই মন্দ। কুসুমের সৌরভ আছে, কণ্টকও আছে; মধুতে মিষ্টতা আছে, তীব্রতাও আছে; সূর্য্যরশ্মিতে প্রফুল্লতা আছে, রোগজনন-প্রবণতাও আছে; * রমণীর চক্ষে সৌন্দর্য্য আছে, সর্ব্বনাশও আছে; রমণীহৃদয়ে ভালবাসা আছে, প্রতারণাও আছে; ধনে ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, যৌননির্ব্বাচনের প্রতিবন্ধকতাও করে। জগতে কোথাও নির্দোষ কিছু দেখিতে পাইবে না। সকলই ভাল-মন্দ-মিশ্রিত। সূত্রাং

* Sonstroke. See Tanner's Practice of Medicine, Vol. I.



প্রকৃতি দেখিয়া যতদূর বুদ্ধিতে পারি, তাহাতে বোধ হয় যে, এই পরিদৃষ্টমান বিশ্বের বে আদি কারণ, সেও ভালমন্দতে মিশ্রিত, অথবা দুইটি শক্তি হইতে এ জগৎ সমুৎপন্ন—সেই শক্তির একটি ভাল, একটি মন্দ ; একটি স্নেহ, একটি ঘৃণা ; একটি অমুরাগ, একটি বিরাগ ; একটি আকর্ষণ, অপরটি প্রতিক্ষেপ । কিন্তু কি বলিতে বলিতে কি বলিতেছি—

এই যে সংসার, ইহা এক মহাশ্মশান । চিরবহমান কালস্রোত দিনে দিনে, দণ্ডে দণ্ডে, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে, পলকে পলকে, সব ভাসাইয়া লইয়া গিয়া বিশ্ব্তির গর্ভে ফেলিতেছে পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তে যাহা দেখিরাছি, উপস্থিত মুহূর্ত্তে আর তাহা নাই—প্রাণ দিলেও আর ফিরিয়া আসিবে না । এইক্ষণে যাহা রহিয়াছে, পরক্ষণে আর তাহা থাকিবে না—অখিল সংসার খুঁজিয়া দেখিও, কোথাও পাইবে না । কোথায় বাইবে, কোথায় যায়, তাহা তুমিও যতদূর জান, আমিও ততদূর জানি, এবং তুমি আমি যাহা জানি, তাহার অধিক কেহই জানে না । সবই যায়, কিছুই থাকে না—থাকে কেবল কীৰ্ত্তি । কীৰ্ত্তি অক্ষয় । কালিদাস গিয়াছেন, শকুন্তলা আছে ; মেঘদূত গিয়াছেন, হাফলেট আছে ; ওয়াসিংটন গিয়াছেন, আমেরিকার স্বাধীনতাধ্বজা আজও উড়িতেছে ; রসো গিয়াছেন, সাম্যের হৃদুভিনাদ আজও পৃথিবী ভরিয়া ঘোষিত হইতেছে । কীৰ্ত্তি থাকে, অকীৰ্ত্তিও থাকে । লর্ড নর্থব্রক যাবেন, কিন্তু লক্ষ্মী রাণীর চক্ষের জল শুকাইবে না, বরদার ভ্রুখণ্ডাস মিলাইবে না । অকীৰ্ত্তিও থাকে লোকের ভাল, লোকের মন্দ, লোকের সঙ্গে চলিয়া যায়, কীৰ্ত্তি এবং অকীৰ্ত্তি জগতে বিচরণ করিতে থাকে । ওয়াসিংটনের স্বদেশানুরাগ



তাঁহার সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে, দেহপীড়নের চরিত্রদোষও তাঁহার সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে; কিন্তু তাঁহার লোকের বে উপকার করিয়াছেন, তাহার সৌরভ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। তাই বলি—

“ভাল মন্দ দুই

সঙ্গে চলি যাব,—

পর উপকার সে লাভ।”

ইহাই জগতের সার তত্ত্ব—ধর্মের মূল ভিত্তি—পুণ্যের সুবর্ণ-সোপান। কিন্তু কি বলিতেছিলাম?

—এই সংসার এক মহাশ্মশান। বে চিত্তানল ইহাতে গর্জিত-
তেছে, তাহাতে না পোড়ে এমন জিনিষ নাই। জড়প্রকৃতি
কাহারও মুখ ভাওয়া না, বাহা সঙ্গথে পড়ে, তাহাই পোড়াইয়া,
সমান জ্বলিতে জ্বলিতে, সমান হাসিতে হাসিতে চলিয়া যায়। ঐ
যে নক্ষত্রনিচয় অরাককারে ঝক্ ঝক্ করিতেছে, ঐ সকল এই
বিধবাপী মহাবহ্নির শুল্কমাত্র। এ সংসারে কোথায় অনল
নাই? নির্মল চন্দ্রিকার, প্রফুল্ল মল্লিকার, কোকিলের রবে,
কুসুমের সৌরভে, মৃদল পবনে, পাখীর কুঞ্জে, রমণীর মুখে,
পুরুষের বৃকে—কোথায় অনল নাই? কিসে যাহুব পোড়ে না?
ভালবাস, পুড়িতে হইবে, ভালবাসিও না, তদধিক পুড়িতে হইবে।
পুলকস্তা না হইলে, শূন্য গৃহ লইয়া পুড়িতে হইবে; হইলে, সংসার-
জ্বালায় পুড়িতে হইবে। শুক মনুষ্য কেন, সমস্ত জীবই পুড়িতেছে।
প্রাকৃতিক নির্বাচনে পুড়িতেছে, বৈজ্ঞানিক নির্বাচনে পুড়িতেছে,
সামাজিক নির্বাচনে পুড়িতেছে, পরস্পরের অভ্যাচারে পুড়িতেছে।
কে পোড়ে না? এ সংসারে আসিয়া সুস্থ-মনে, অক্ষত-শরীরে



কে গিয়াছে ? আবার দুঃখের উপর দুঃখ এই যে, এ পাপ সংসারে
 সহনীয়তা নাই, সহানুভূতি নাই, করুণা নাই । এই অনন্ত জীব-
 সমূহ এই মহাবহিতে হাড়ে হাড়ে দগ্ধ হইতেছে ;—জড়-প্রকৃতি
 কেবল ব্যঙ্গ করে মাত্র । শশধরের সদা হাসি-হাসি মুখে কখনও
 কি বিবাদচিহ্ন দেখিয়াছ ? নক্ষত্ররাজির সোহাগের মৃদু-কম্পনে
 কখনও কি ক্রাসবুজি দেখিয়াছ ? করোলিনীর কল-নিম্নাদে
 কখনও কি স্বরবিকৃতি দেখিয়াছ ? নবকুম্মিতা ব্রহ্মতীর দোলনৌতে
 কখনও কি ভালভঙ্গ দেখিয়াছ ? আমরা গুড়িতেছি—কিন্তু ঐ
 দেখ, বৃক্ষরাজি করতালি দিয়া নাচিতেছে—ঐ শুন, সমীরণ
 হাসিতেছে—হো—হো—হো ।

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

সত্যতা

আজি কালি যেখানে সেখানে সত্যতা শব্দটা লইয়া বিলক্ষণ টানাটানি পড়ে। চলিত কথাবাৰ্ত্তায়, সাময়িক পত্রিকায়, ধর্ম-স্বাক্ষরীয় উপদেশে, রাজনৈতিক বক্তৃতায়, ঐতিহাসিক বা দার্শনিক প্রবন্ধে ও বহুবিধ মুদ্রিত গ্রন্থে সত্যতা শব্দের ছড়াছড়ি। ইহাতে যনে হইতে পারে যে, সত্যতা কাহাকে বলে আমরা বেশ বুঝি। কিন্তু সত্যতার লক্ষণ কি জিজ্ঞাসা করিলে দেখিবে অনেকেই সহজতর দিতে পারেন না; আর ভিন্ন ভিন্ন মূন্নির ভিন্ন ভিন্ন মত। কেহ কেহ ভাবেন যে, প্রাচীন ভারতবাসীরা সত্যতার চরম-সোপানে উঠিয়াছিলেন; কেহ কেহ বলেন ইংরেজেরাই সত্যতার সর্বোচ্চশিখরে আরোহণ করিয়াছেন। কেহ আমাদের আচার-ব্যবহার সভ্যসমাজের উপযোগী জ্ঞান করেন; কেহ ইংরেজদিগের রীতিনীতির পক্ষপাতী। কেহ কেহ বিবেচনা করেন যে, ইংরেজদিগের অশুকরণে আমাদের অবনতি হইবে; কেহ কেহ বা ইহা দেখিয়া আশ্চর্য হন যে, আমরা ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান বুঝিতে শিখিয়াছি, অথচ মাত্রে বসি, হাত দিয়া আহার করি, সর্বদা গায়ে বস্ত্র রাখি না, ও মূন্নির দীপের আলোকে লেখা-পড়া করি। শেযোক্ত ব্যক্তিবর্গের কথা শুনিয়া বোধ হয়, তাঁহারা কলিকাতার লালবাজারের যদোন্মত্ত বর্ণজ্ঞানশূন্ত গোরাতেও সত্য বলিতে প্রস্তুত, কিন্তু ধুতিচাদরপরা নিরামিষভোজী নিৰ্ম্মলজলপায়ী সর্বশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতকেও অসত্য শ্রেণীতে স্থান দিতে চাহেন।



সভ্যতা সম্বন্ধে আমাদের মতো একদল মতভেদ হইবার প্রথম কারণ এই যে, আমরা একদল হইতে প্রতিকূল স্রোতের মাঝে পড়িয়াছি, (১) দেশীয় শিক্ষা এবং (২) বিলাতি শিক্ষা। দেশীয় শিক্ষা আমাদের একদিকে লইয়া যাইতেছে; বিলাতি শিক্ষা আর এক দিকে। দেশীয় শিক্ষা আমাদের বলিতেছে যে, এতদেশীয় প্রাচীন রীতি-নীতি, চিরাগত আচার-ব্যবহার ও কৰ্ম-কাণ্ড উত্তম। বিলাতি শিক্ষা পদে পদে তাহাদিগের প্রতি দোষারোপ করিতেছে এবং তাহাদিগের অপেক্ষা ভাল বলিয়া পাশ্চাত্য রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার ও কৰ্ম-কাণ্ড আমাদের সম্মুখে আদর্শরূপ ধরিতেছে। দেশীয় শিক্ষা বলিতেছে যে, ভারতবর্ষের পূৰ্ব্বকালীন মহিমা পুরাতনপ্রণালীসমৃদ্ধ। বিলাতি শিক্ষা বলিতেছে যে, পুরাতন পথ পরিত্যাগ না করিয়াই ভারতবর্ষ অধঃপাতে গিয়াছে। এইরূপ অবস্থায় ইহা আশ্চর্য্য নহে যে, কেহ দেশীয় স্রোতে, কেহ বা বিলাতি স্রোতে গা তালিয়া দিয়াছেন, এবং কেহ দোটানায় পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছেন।

সভ্যতা সম্বন্ধে মতভেদ হইবার দ্বিতীয় কারণ এই যে, গূঢ়ভাবব্যঞ্জক বা বহুগুণবাচক কথা শুনিয়া প্রায়ই মানসপটে ভদ্রমুদ্রায় একটা স্পষ্ট প্রতিমূর্তি উদ্ভিত হয় না, সুতরাং কথাটি সঙ্গতরূপে ব্যবহৃত হইল কি না অনেক সময়ে আমরা বুঝিতে পারি না। এই কারণেই অনেক সময়ে বড় বড় কথায় লোক ভুলাইয়া থাকে। এই কারণেই অনেক সময়ে “পবিত্র ধর্ম্মের” নামে ভ্রমগুলি প্রাবৃত হইয়াছে। এই কারণেই অনেক সময়ে “স্বাধীনতা”র পতাকা উড়াইয়া দোকাচারিতা ফ্রান্স প্রভৃতি কত দেশে রাজত্ব করিয়াছে, এই কারণেই অনেক সময়ে অসভ্য



জাতিদিগকে “সভ্য” করিবার ছলে তাহাদিগকে নিশ্চূল বা দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ করা হইয়াছে।

ভ্রাম, অস্ত্রায়, সভ্য, মিথ্যা, ধর্ম, অধর্ম প্রভৃতি বড় বড় কথাই অর্থ যে অধিকাংশ লোকেই ভাল করিয়া বুঝে না, ইহা ইউনানি পণ্ডিতকুল-চূড়ামণি সক্রেটিস্ বিলম্বণ বুঝিয়াছিলেন। যদি তিনি ভূমণ্ডলে পুনরাগমন করিতে পারিতেন, তিনি দেখিতে পাইতেন যে, বিসহস্রাধিক বর্ষ পূর্বে আথেন্স মহানগরীতে লোকে অর্থ না বুঝিয়া যেদ্রুপ শব্দ প্রয়োগ করিত, এই উন্নতিগর্ভিত ঊনবিংশতি শতাব্দীতেও সভ্যতাভিমাত্রী ব্যক্তিবর্গও সেইরূপ করিয়া থাকেন।

কোন শব্দের ব্যুৎপত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিলে তাহার অর্থের আভাস কিয়ৎপরিমাণে পাওয়া যায়। ব্যুৎপত্তির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই জানা যায় যে “পক্ষী” শব্দে পক্ষবিশিষ্ট জীব বুঝায় এবং “উরগ” বলিতে বৃকের উপর ভর দিয়া চলে এমন কোন জন্তু বুঝায়। এই প্রণালীতে “সভ্যতা” শব্দের অর্থ নির্ণয় করিতে হইলে দেখা যাইতেছে যে, সমাজবাচক “সভ্য” শব্দ হইতে সভ্যতা শব্দের উৎপত্তি; সুতরাং সভ্যতা শব্দের অর্থ সামাজিকতা হইতেছে, অর্থাৎ সমাজবদ্ধ হইয়া থাকিতে হইলে বাহা কিছু তদবস্থার উপযোগী, তাহাই সভ্যতার অঙ্গস্বরূপ বলিয়া গণনীয় হইতেছে।

কিন্তু কোন শব্দের ব্যুৎপত্তি দেখিয়া অনেক সময়ে তাহার প্রচলিত অর্থ জানিতে পারা যায় না। ব্যুৎপত্তি দেখিয়া জানা যায় যে “তৈল” বলিতে প্রথমে তিলের নির্যাস বুঝাইত; কিন্তু এক্ষণে আমরা সরিষার তৈল, বাদামের তৈল, মাষ তৈল ইত্যাকার অনেক প্রকার কথা ব্যবহার করিয়া থাকি। সুতরাং প্রচলিত প্রয়োগে তৈল বলিতে কেবল তিলের নির্যাস না বুঝাইয়া নানা-



প্রকার নির্যাস বুঝাইতেছে। এইরূপ ব্যুৎপত্তি ধরিতে গেলে “অন্নজান” শব্দে যে বায়ুর সংযোগে অন্ন উৎপাদিত হয় সেই বায়ুকে বুঝায়। আদৌ রসায়নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা এই অর্থেই “অন্নজান” শব্দ প্রয়োগ করিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে পরীক্ষা-দ্বারা জানা গিয়াছে যে এখন অনেক অন্ন আছে বাহ্যতে উক্ত অন্নজান বায়ু নাই। সুতরাং এখন আর ব্যুৎপত্তি দেখিয়া “অন্নজান” শব্দের প্রচলিত অর্থ জানা যায় না। এই প্রকার দোহনবোধক হুহু ধাতু হইতে দুহিতা শব্দের উৎপত্তি ; কিন্তু এক্ষণে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, গৃহে গাভীদোহন বাহ্যর কার্য্য সে দুহিতা নহে। ব্যুৎপত্তি-অনুসারে যে পালন করে সেই পিতা। এরূপ হইলে অনেক কুলীন ব্রাহ্মণ বহুসন্তানসম্বৎ পিতা নামের অধিকারী নহেন।

এক্ষণে দেখা যাউক কিরূপ হলে সভ্য ও অসভ্য শব্দের প্রয়োগ ঘটিয়া থাকে। বাহ্যাদিগকে আমরা অসভ্যজাতি বলি তাহাদিগের সহিত যদি আমরা সভ্যনামপ্রাপ্ত জাতিদিগের তুলনা করি, তাহা হইলে দৃষ্ট হইবে যে, অসভ্যজাতি বিচ্ছিন্নভাবে ভ্রমণশীল অল্পসংখ্যক লোকের সমষ্টি ; সভ্যজাতিগণ বহুসংখ্যক লোকে একত্র হইয়া গ্রামে ও নগরে আপন আপন নির্দিষ্ট বাসগৃহে অবস্থিতি করেন। অসভ্যজাতিদিগের মধ্যে বাণিজ্য-ব্যবসায় প্রায় নাই বলিলেই হয় ; সভ্যজাতিদিগের মধ্যে বাণিজ্য-ব্যবসায়ের বাহুলা। অসভ্যজাতিদিগের মধ্যে প্রায় প্রত্যেক ব্যক্তিই স্ব-স্ব-প্রধান, কদাচিৎ যুদ্ধোপলব্ধ ব্যক্তিৱেকে অনেকে সমবেত হইয়া কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না, এবং অনেকে একত্র হইয়া থাকিতে ভাল বাসে না ; সভ্যজাতিদিগের মধ্যে আসক্তিপ্ৰবৃত্তি বলবতী,



পরস্পর পরস্পরের সাহায্য অপেক্ষা করে, এবং সাধারণ উদ্দেশ্য-সাধনার্থে অনেকে সমবেত হইয়া থাকে। অসভ্যজাতিদিগের মধ্যে আত্মরক্ষা-জ্ঞ প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রায় কেবল স্বীয় ছল-বলের উপর নির্ভর রাখিতে হয়, এবং প্রত্যেকের স্বত্বরক্ষা-জ্ঞ আইন, আদালত বা রাজশাসন নাই; সভ্যজাতিদিগের মধ্যে স্ব স্ব শরীর ও সম্পত্তি-রক্ষার্থে লোকে আপন আপন শক্তি অপেক্ষা সামাজিক শাসনের সহায়তা অবলম্বন করে।

পৃথিবীতে এমন অসভ্যজাতি অল্প, যাহাদিগের মধ্যে সমাজ-বন্ধনের স্বত্বপাতযাত্র হয় নাই; এবং অস্তাপি ভূমণ্ডলে এমন কোন জাতীয় লোক দৃষ্ট হয় না, যাহারা সামাজিক অবস্থার সর্বোচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা এক প্রকার ষণা যাইতে পারে যে, সামাজিক ভাবের তারতম্যাত্মমারেই অনেক পরিমাণে সভ্যতার তারতম্য নির্ধারিত হয়। এই সামাজিক ভাব বলিতে কি বুঝায়, একবার বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক। প্রথমতঃ সমাজান্তর্গত ব্যক্তিবর্গকে এক শাসনতন্ত্রে আবদ্ধ রাখিতে পারে, এমন একটা নিয়মী শক্তি চাই। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির স্বার্থ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। যাহাতে একের সুখ তাহাতে অন্যের দুঃখ। এইরূপ সাংসারিক স্বার্থবিরোধে সমাজ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। সুতরাং সকলের বিবাদভঞ্জন করিতে পারে, সকলের উপর আদেশ চালাইতে পারে এবং কাহাকে তাস্তা-পালনে পরায়ুখ দেখিলে উপযুক্ত দণ্ড দিতে পারে, কোন স্থলে একরূপ ক্ষমতা থাকা নিতান্ত আবশ্যিক, সমাজবন্ধনের মূলে রাজার হস্তেই ঐদৃশ ক্ষমতা থাকে। কিন্তু বর্তমান সামাজিক উন্নতি হইতে থাকে, শুভ ধর্ম, রীতি ও নীতিসম্বন্ধীর শাসনশক্তি লোক-



সাধারণের হস্তে যায় ; এবং পরিশেষে প্রজ্ঞাতমুপ্রণালী প্রবর্তিত হইয়া সর্বপ্রকৃতিমণ্ডলীর নির্বাচিত প্রতিনিধিবর্গের প্রতি সমাজরক্ষার ভার অর্পিত হয় ।

দ্বিতীয়তঃ, সমাজমধ্যে কার্যবিভাগ আবশ্যক । অসভ্যাবস্থায় লোকে পরস্পরের মুখাপেক্ষী নহে ; প্রত্যেক ব্যক্তি আপনার প্রয়োজনমত সমুদয় কার্য করে । একই ব্যক্তি স্বত্বদার, কস্মকার, কুস্তকার, যন্তুজীবী, শিকারী, গৃহনির্মাতা, ইত্যাদি । ইহাতে কোন কাজই সুচারুরূপে সম্পাদিত হয় না, কোন দিকে উন্নতি হয় না । যদি ভিন্ন ভিন্ন লোকের হস্তে ভিন্ন ভিন্ন কার্য পড়ে, প্রত্যেকেই আপন আপন কন্দের প্রতি বিশেষরূপ মনোযোগ দিতে পারে, সুতরাং তৎসম্বন্ধে দক্ষতা ও কৌশল দেখাইতে এবং উৎকর্ষলাভ করিতে পারে । এইরূপে পরস্পর-সাপেক্ষতাগুণে কার্যবিভাগ-দ্বারা সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের উপকার সাধিত হয় । অতি প্রাচীন কালেই সামাজিক কার্যবিভাগ-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । ভারতবর্ষে ও মিসরে এইরূপে জাতিশ্রেণী সংস্থাপিত হয় । ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায় । ব্রাহ্মণ বা হাজকগণ জ্ঞান ও ধর্মের চর্চা করিবেন । ক্ষত্রিয় বা যোদ্ধা দেশরক্ষা করিবেন । বৈশ্য বা বণিক বাণিজ্য ও কৃষির প্রতি মনোযোগ দিবেন । শূদ্র বা দাস অন্ত শ্রেণীর লোকের সেবা-গুহ্রবা করিবেন । কিন্তু এ গুলিও কেবল মোটামুটি বিভাগ । ভারতবর্ষে যে সকল মিশ্রবর্ণ জন্মিল, তাহাদিগেরও পুরুষানুক্রমিক ব্যবসায় নির্দিষ্ট হইল । বৈশ্য চিকিৎসক, নাপিত ফৌরকর্মকার, তন্তুবাগ বস্ত্রবয়নব্যবসায়ী ইত্যাদি । এ প্রকার নিয়মে প্রথমে বিশেষ উপকার হয় ।

যে যাহা শিখিত আপন সম্মান-সম্মতিকে ইচ্ছাপূর্বক শিখাইত
ইহাতে এক এক বংশের এক এক বিষয়ে দক্ষতা বাড়িয়া যায়।
কিন্তু যখন শ্রেণীবদ্ধন এরূপ পাকাপাকি হইয়া গেল যে, এক
শ্রেণীর লোক অল্প শ্রেণীতে গৃহীত হইবার সম্ভাবনা থাকিল না,
তখন তিনটি অপকার ঘটিল, (১) সাধারণ সমাজ অপেক্ষা
আপন শ্রেণীর স্বার্থের দিকে প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকতর দৃষ্টি
হইল ; (২) অল্প শ্রেণীর সহিত বিবাহবন্ধন রহিত হইয়ায় কোন
শ্রেণীতে নুতন বল বা প্রতিভা প্রবিষ্ট হইবার পথ রুদ্ধ হইল ; (৩)
যে ব্যক্তি স্বশ্রেণীর ব্যবসায় ছাড়িয়া অল্প শ্রেণীর ব্যবসায় অবলম্বন
করিলে সমাজের উন্নতি করিতে পারিত, তাহার পায়ে শৃঙ্খল
পড়িল। এইরূপে যে সামাজিক পরস্পরসাপেক্ষতার গুণে
কার্য-বিভাগ-প্রণালীর সৃষ্টি, পরিণামে তাহারই মূলে কুঠারাঘাত
হইল। ঐদৃশ্য গৃহবিচ্ছেদপূর্ণ সমাজ যে বহিঃশত্রুর আক্রমণ
নিবারণ করিতে অসমর্থ হইবে, ইহা আশ্চর্য্য নহে। ভারতবর্ষ
এবং মিসরই ইহার সুন্দর দৃষ্টান্তস্বল।

তৃতীয়তঃ, সমাজবদ্ধ হইয়া থাকিতে হইলে পরস্পরের ইচ্ছা
ও অভিপ্রায় জ্ঞাপনার্থে একটা সাধারণ ভাষা থাকা আবশ্যিক।
যে ব্যক্তি একাকী বনে বনে ভ্রমণ করে, তরলতা-পশুপক্ষী
বাহার সহচর, ভাষায় তাহার প্রয়োজন নাই। কোকিলের কূজন
শুনিয়া সে আনন্দে কুহুরব করে, ককক। নিঃশব্দে বসন্ত-বিহগের
গীত শ্রবণ করিলেও তাহার ক্ষতি নাই। সমীরণ-প্রভাবে
যহীরাহবাহের শব্দ শুনিয়া তন্দ্রাকরণ করিতে তাহার প্রবৃত্তি হয়,
ইউক। নীরব ডাবুক হইলেও তাহার হানি নাই। কিন্তু
মহুশ্যসমাজে বাক্যালাপ না করিলে চলে না। পদে পদে অন্তরের



সাহায্য লইতে হয়। বাহা মনে আছে, তাহা প্রকাশ করিয়া না বলিলে কিকণে সাহায্য মিলিবে? যে যে বস্তুতে যাহার প্রয়োজন আছে, সে সে বস্তুর অক্ষয়ভাণ্ডার তাহার থাকা অসম্ভব। সুতরাং অন্তের নিকটে অভাবপূরণার্থে মনের কথা বলিতে হয়। আবার ভাবিয়া দেখ, আমরা অন্তের নিকটে অনেক সময়ে উৎসাহ, প্রশংসা, প্রশংসা চাই; বাক্য দ্বারাই এ সকল ভাল করিয়া ব্যক্ত হয়। যদি অন্য লোককে আপন মতে আনিতে চাই, তাহা হইলেও ভাবাই আনানিগের প্রধান সম্বল। সাক্ষাতিক অঙ্গসঞ্চালন দ্বারা কিয়ৎপরিমাণে মনের ভাব অপর লোকের নিকটে প্রকাশ করা যায়, সত্য। কিন্তু একপ সঙ্কেত অতি জল্প বিষয়েই খাটে। ভাষার সাহায্যে মনের ভাব যে প্রকার পরিষ্কৃতরূপে বিজ্ঞাপিত হইতে পারে, সে প্রকার আর কিছুতেই হয় না। জ্ঞানবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভাষার বিকাশ হইতে থাকে, এবং ভাষার সাহায্যে আবিস্কৃত সত্য সকল উত্তরকালবর্তী লোকের জ্ঞানগোচর হইয়া সামাজিক উন্নতি সংসাধন করে।

চতুর্থতঃ, সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের পরস্পরের প্রতি ক্রমা ও দয়া প্রকাশ করা অভ্যাস চাই। অন্তের দোষমার্জনা করিতে শিক্ষা করা অত্যন্ত কঠিন কার্য। কিন্তু অনেকে একত্র থাকিতে হইলে অনেক অপরাধ সহ্য করা আবশ্যক হইয়া উঠে। এই প্রকার শিক্ষার অভাবে আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশে অতি সামান্য কারণে নরহত্যা হয়। দোষীকে ক্ষমা করা বৈরূপ একটা সামাজিক গুণ, বিপর্যয়ক সাহায্য করাও তরূপ আর একটা। ঘটনাস্থলে কত লোক বিপদ-জালে নিরন্তর আবদ্ধ হয়, মদ্য হইয়া তাহানিগের মুক্তিসাধনার্থে যত্নশীল হইলেই সামাজিক পরস্পর-সাপেক্ষতাহাব্যঙ্গী

কার্য্য করা হয়। এই প্রকার সহায়তা-লাভ-প্রত্যাশাই সমাজ বন্ধনের মূল।

পঞ্চমতঃ, সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে একতা চাই; একজনের বা এক অঙ্গের হুঃখে অল্প সকলের হুঃখিত হওয়া চাই, এবং সমাজরক্ষা-জন্তু প্রাণবিসর্জন করিতে সকলেরই প্রস্তুত হওয়া চাই। একপা যেখানে নাই, সেখানে সমাজ বহুকাল স্থায়ী হইতে পারে না। গ্রীস ও রোমে বহুসংখ্যক দাস ছিল। দাসদিগের হুঃখে রাজপুরুষদিগের হুঃখ হইত না, সুতরাং সমাজ রক্ষা করিতেও দাসদিগের প্রবৃত্তি ছিল না। আমানিগের বিবেচনার ইহাই গ্রীস ও রোমের পতনের প্রধান কারণ। আর আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, ভারতবর্ষ ও মিসরে জাতিভেদ-সংস্থাপন-নিবন্ধন একতাহ্রাস তত্ত্বদেশের স্বাভাবিকলোপের মুখ্য হেতু।

কোন জাতিই অত্যাধি সামাজিক অবস্থার চরমসোপানে উঠিতে পারে নাই। উক্ত সোপানে উঠিলে সমাজের নূতন আকার হইবে। তখন প্রত্যেক ব্যক্তিই পরোপকারার্থ জীবনধারণ করিবেন, আত্মস্বার্থ বিস্মৃত হইয়া অপর মানবগণের মঙ্গলসাধনকার্য্যে দেহমন সমর্পণ করিবেন। তখন স্বার্থপরতা ও পরশীকাতরতা কোথাও থাকিবে না, সর্ব্বত্র তায়পরতা, সত্যনিষ্ঠা ও উপচিকীর্ষা বিরাজমান দৃষ্ট হইবে। কবিগণ কর্তৃক এই স্বর্ণযুগ দর্শন করিয়াছেন। খ্রীষ্টভক্ত দূরে এই “মিলেনিয়ম” দেখেন; দেখেন যে সমুদ্রয় যক্ষুজাতি ঈশার প্রেমময় রাজ্যে এক-পরিবারভূক্ত হইয়াছে এবং অন্তঃশত্রু ভাঙ্গিয়া হল প্রস্তুত হইতেছে। এতদেবীয় শাস্ত্রকারগণ দিব্যচক্ষে কলির অবসানে এই প্রকারে সত্যযুগের আবির্ভাব দেখিতে পান। দর্শনবিৎ ঐতিহাসিক ঘটনাবলী অবলম্বন করিয়া



অনুমান করেন যে, সমাজের উন্নতিসহকারে সর্বহিতকরী নিঃস্বার্থ-প্রবৃত্তিনিচয় নৈসর্গিক নির্বাচন-প্রভাবে বর্দ্ধিত হইয়া এইরূপ সুখময় সময় উপস্থিত করিবে। কিন্তু এখনও এ সকল বহুদূরের কথা ; স্বপ্নবৎ বা আশ্রয়োপক্ৰাসবৎ বিধা না হউক, দূরবর্তী নীহারিকাবৎ সামান্যদৃষ্টিপথের অতীত। এখনও সংসার স্বার্থপরতায় পরিপূর্ণ। তথাপি যখন গনে হয় যে, এখনকার সুসভ্য ভূমালোক হয়ত নরমাংসভোজী রাক্ষসের বংশধর এবং এই মানবকূলে বুদ্ধ ও ঈশা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তখন চিত্তে আশার সঞ্চার হয়, এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁহার বিশ্ববিমোহন বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিতে প্রবৃত্তি হয়।

কিন্তু মনুষ্যের সভ্যতা বলিতে কেবল সামাজিকতা, অর্থাৎ রাজনীতি, অর্থনীতি, ব্যবহার ও ধর্মনীতি সম্বন্ধে উন্নতি মাত্র বুঝায় না ; যে জ্ঞানের প্রভাবে মনুষ্য জীবকুলশ্রেষ্ঠ, সেই জ্ঞানের উন্নতিও বুঝায়। জ্ঞানোন্নতির ফল দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প ইত্যাদি ; এ সকল কি গ্রীস, কি ইতালী, কি ভারতবর্ষ, কি চীন, কি মিসর, কি কান্টোয়া,—কি ফ্রান্স, কি জার্মানী, কি ইংলণ্ড, কি আমেরিকা, যেখানে দৃষ্ট হউক, সেইখানেই আমরা সভ্যতার আবির্ভাব স্বীকার করিব। বাব্বীকি, হোমার বা সেক্সপিয়র, —গৌতম, অরিন্দ্রতন বা বেকন—আর্গুভট, টেলেমি বা নিউটন, —যেখানে সমুদিত, সেখানে সভ্যতা সপ্রমাণ করিতে অল্প দাঁকী চাই না।

সুবিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত গিজো বুঝিয়াছিলেন যে, সভ্যতা বলিতে কেবল “সামাজিক সম্বন্ধ-বর্দ্ধনই” বুঝায় না, মনুষ্যের উৎকৃষ্ট বৃত্তিসকলের উন্নতিসাধনও বুঝায়। সমাজ অসম্পূর্ণ হইলেও



যে সকল দেশ সভ্য বলিয়া পরিগণিত, তাহাদিগের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন .

“যদিও সমাজ অন্তঃস্থ হ্রাসের অপেক্ষা অসম্পূর্ণ, তথাপি যথেষ্ট অধিকতর মহিমা ও প্রভাব সহকারে বিস্তারমান । অনেক সামাজিক অধিকার-বিস্তার বাকি আছে, কিন্তু আশ্চর্য্যরূপ নৈতিক ও বৌদ্ধিক অধিকার-বিস্তার ঘটিয়াছে ; বহুসংখ্যক লোকের অনেক অধিকার ও স্বত্ব নাই, কিন্তু অনেক বড় লোক জগতের নয়নপথে জাজ্বল্যমান বিরাজিত । সাহিত্য, বিজ্ঞান ও শিল্প তাহাদিগের প্রভা বিকাশ করিতেছে । যেখানে যথেষ্টজাতি মানবপ্রকৃতির উৎকর্ষ মহিমাপ্রদ এই সকল মূর্ত্তির সমুজ্জ্বল আবির্ভাব দর্শন করে, যেখানে এই সকল উন্নতিপ্রদ আনন্দের ভাণ্ডার দেখিতে পায়, সেইখানেই সভ্যতার পরিচয় পাইয়া তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করে ।

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ।



রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা

হলদীঘাটার যুদ্ধ

তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। একদিকে অসংখ্য অবমাননার প্রতিশোধ-বাহু, অপরদিকে শিশোদিয়া-কুলের চিরস্বাধীনতারক্ষার বির-প্রতিজ্ঞা। একদিকে মোগল ও অধরের অসংখ্য সুশিক্ষিত সৈন্য, অপরদিকে মেঘবারের অতুল ও অপরিমিত বীরত্ব।

হলদীঘাটার উপত্যকার ও উভয় পার্শ্বের পর্বতের উপর দাবিংশ সহস্র রাজপুত সম্মিলিত রহিয়াছে, দলে দলে যোদ্ধগণ আপন আপন কুলাদিপতির চারিদিক্ বেষ্টন করিয়া অপূৰ্ণ রণ দিতেছে ; কখনও বা দূর হইতে তীর বা বর্ষা নিক্ষেপ করিতেছে, কখনও বা কুলাদিপতির হস্তিতে বর্ষাকালের তরঙ্গের জায় হৃদমনীয় তেজে শত্রুসৈন্তের মধ্যে পড়িয়া ছারখার করিতেছে।

পর্বত-শিখরের উপর অসভ্য জাতিগণ ধনুর্ক্ষণহস্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, বর্ষার বৃষ্টির জায় তীর নিক্ষেপ করিতেছে, অথবা সুবিধা পাইলেই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড শত্রুসৈন্তের উপর গড়াইয়া দিতেছে।

অন্ত তুমুল উৎসবের দিন, সে উৎসবে কেহ পরাযুথ হইল না ; চোহান ও রাঠোর, খালা, চন্দার ও গাওয়ার—সকল কুলের যোদ্ধগণ ভীষণনাদে শত্রুর উপর পড়িতে লাগিল। এক দল হত হয়, অন্য দল অগ্রসর হয় ; অসংখ্য সৈন্তের শবরাশির উপর দিয়া অসংখ্য সৈন্য অগ্রসর হইতে লাগিল।



কিন্তু দিল্লীর অসংখ্য সৈন্যের বিরুদ্ধে এ বীর কি করিবে ? দিল্লীর ভীষণ কামানশ্রেণী হইতে ঘন ঘন মৃত্যুর আদেশ বহির্গত হইতে লাগিল, দলে দলে রাজপুতগণ আসিয়া জীবনদান করিল ।

এই বিঘোর উৎসবে প্রতাপসিংহ পশ্চাতে ছিলেন না । যুদ্ধের আরম্ভ হইতে অঘরাধিপতির দিকে তিনি ধাবমান হইলেন, কিন্তু দিল্লীর অসংখ্য সেনা ভেদ করিয়া তথায় উপস্থিত হইতে পারিলেন না ।

তৎপরে প্রতাপসিংহ, সলীম বখার হস্তী আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন, সেই দিকে নিজ অশ্ব ধাবমান করিলেন । এবার ভীষণনাদে রাজপুতগণ মোগলসৈন্য বিদীর্ণ করিয়া অগ্রসর হইল । স্তরে স্তরে মোগলসৈন্য সজ্জিত ছিল, কিন্তু বর্ষাকালের পর্কত-তরঙ্গের স্তায় সমস্ত প্রতিবন্ধক ভেদ করিয়া প্রতাপসিংহ ও তাঁহার সৈন্যগণ অগ্রসর হইলেন, বর্ষা ও অসির আঘাতে মোগলদিগের সৈন্যরেখা লুপ্তও করিয়া অগ্রসর হইলেন । সলীম ও প্রতাপসিংহ সশুধীন হইলেন ।

দুই পক্ষের প্রসিদ্ধ বোদ্ধগণ নিজ নিজ প্রভুর রক্ষার্থে অগ্রসর হইলেন । অচিরে যে তুমুল হত্যাকাণ্ড, যে গগনভেদী জয়নাদ ও আনন্দনাদ আরম্ভ হইল, তাহা বর্ণনা করা যায় না । রাজপুত ও মোগলদিগের বিভিন্নতা রহিল না, শত্রু ও মিত্রের বিভিন্নতা রহিল না । দুই পক্ষের পতাকার চারিদিকে শব রানীকৃত হইল ।

প্রতাপের অব্যর্থ খজাঘাতে সলীমের রক্ষকগণ ভূতলশায়ী হইল । তখন প্রতাপ সলীমকে লক্ষ্য করিয়া দীর্ঘ বর্ষা নিক্ষেপ করিলেন, হাওদার লোহে সেই বর্ষা প্রতিরুদ্ধ হওয়ায় সলীম সেদিন জীবনরক্ষা পাইলেন । রোষে তর্জন করিয়া প্রতাপ অশ্ব ধাবমান



করাইলেন, অববর চৈতকও প্রতাপের বোঁগা, লক্ষ দিয়া হস্তীর শরীরের উপর সমুখ-পদ স্থাপন করিল। প্রতাপের অব্যর্থ আঘাতে হস্তীর মাহত হত হইল। হস্তী তখন প্রভুর বিপদ জানিয়াই যেন সলীমকে লইয়া পলায়ন করিল। তুমুল শব্দে হৃদমনীয় প্রতাপসিংহ ও তাঁহার সঙ্গিগণ পশ্চাৎদাবন করিলেন; যোগলসৈন্তের শ্রেণী বিদীর্ণ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। প্রতাপসিংহের সে অসাধারণ বীরত্ব দেখিয়া হিন্দুগণ অর্জুনের কথা স্মরণ করিল, মুসলমানগণ সুহৃদের জন্ত মনে মনে প্রমাদ গণিল।

তখন মুসলমানগণ নিজের বিপদ দেখিয়া ক্ষিপ্তপ্রায় হইল। মুসলমান যোদ্ধগণ ভীক নহে, পঞ্চাশত বৎসর ভারতবর্ষ শাসন করিয়াছে, অস্ত্র হিন্দুর নিকট অবমাননা স্বীকার করিবে না। একবার “আল্লাহ্ আকবর” শব্দে আকাশ ও মেদিনী কম্পিত করিয়া প্রতাপকে চারিদিকে বেষ্টন করিল। রাজপুতগণ পলায়ন জানে না, প্রভুর চারিদিকে হত হইতে লাগিল। শরীরের সমুদ্বাহনে আহত হইয়াও প্রতাপ বিপদ জানেন না, তখনও অগ্রসর হইতেছেন।

পশ্চাৎ হইতে কয়েকজন রাজপুত যোদ্ধা মহারাণার বিপদ দেখিলেন এবং হুঙ্কার শব্দ করিয়া শিশোদিয়ার পতাকা লইয়া অগ্রসর হইলেন। পতাকা দেখিয়া সৈন্যগণ অগ্রসর হইল, প্রতাপ যে স্থানে যুদ্ধ করিতেছিলেন, তথায় যাইয়া উপস্থিত হইল, সবলে প্রভুকে সেই নিশ্চয়-যুত্ব হইতে সরাইয়া আনিল। সে উদ্যমে শত রাজপুত প্রাণদান করিল।

পুনরায় প্রতাপসিংহ যুদ্ধমদে সংজ্ঞা হারাইয়া যোগলরেথার ভিতর প্রবেশ করিলেন। পুনরায় তাঁহার রাজচ্ছত্র শত্রুঘোষিত



দেখিয়া রাজপুতগণ পশ্চাৎ হইতে অগ্রসর হইয়া সমরোন্মত্ত বীরকে নিশ্চয়-মৃত্যুর কবল হইতে সবলে উদ্ধার করিয়া আনিল।

কিন্তু প্রতাপসিংহ অস্থ ক্রিপ্ত—উন্মত্ত! জ্ঞানশূন্য হইয়া তৃতীয় বার মোগলসৈন্যরেখার ভিতর প্রবেশ করিলেন। এবার মোগলগণ ক্রিপ্তপ্রায় হইল, রোষে হুকার করিয়া শত শত সেনা প্রতাপকে বেষ্টন করিল। প্রতাপের বহির্গমনের পথ রাখিল না। এবার মোগলগণ এই কাকের বীরকে হত করিয়া দিল্লীখরের রূপের কণ্টকোদ্ধার করিবে, যানসিংহের অবমাননার প্রতিশোধ দিবে।

পশ্চাতে রাজপুতগণ মহারাণার বিপদ দেখিয়া বার বার তাঁহার উদ্ধারের চেষ্টা করিল; কিন্তু মোগলসৈন্য অসংখ্য, রাজপুতদিগের প্রধান প্রধান বীর হত হইয়াছে, রাজপুতগণ হীনবল হইয়াছে, এবার প্রভুর উদ্ধার অসম্ভব।

বার বার দলে দলে রাজপুতগণ প্রভুর উদ্ধার-চেষ্টা করিল, দলে দলে কেবল অসংখ্য শত্রু বিনাশ করিয়া আপনারা বিনষ্ট হইল, মোগলরেখা অতিক্রম করিতে পারিল না, এবার প্রভুর উদ্ধার করিতে পারিল না।

দূর হইতে দৈলওয়ারার অধিপতি এই ব্যাপার দেখিলেন; মুহূর্তের জন্ত ইষ্টদেবতা স্মরণ করিলেন, পরে আপনার ঝালাবংশীয় বোদ্ধা লইয়া সম্মুখে ধাবমান হইলেন। মেওয়ারের কেতন সুবর্ণ-সূর্য্য একজন সৈনিকের হস্ত হইতে আপনি লইলেন এবং মহা কোলাহলে সেই কেতন লইয়া ঝালাকুলের সহিত অগ্রসর হইলেন।

সে তেজ মোগলগণ প্রতিরোধ করিতে পারিল না, বীর দৈলওয়ারাপতি শত্রুরেখা বিদূর্ণ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঝালাকুল,



বধীর প্রতাপ উন্নত রণকৌশলের জ্ঞান যুদ্ধ করিতেছিলেন, তথায় উল্লাসরবে উপহিত হইলেন। সবলে প্রভুকে রক্ষা করিলেন, প্রতাপকে সেই শত্রুরেখা হইতে উদ্ধার করিয়া আনিলেন ও সেই উত্তমে সমুখরণে আপনার প্রাণদান করিলেন।

পতনশীল দেহের নিকে চাহিয়া মহামুভব প্রতাপ বলিলেন, “দৈলওয়ারা! অস্ত্র আপনার জীবন দিয়া আমার জীবন রক্ষা করিয়াছ।” দৈলওয়ারা ক্ষীণস্বরে উত্তর করিলেন, “মালা স্বামিধর্ম জানে, বিপৎকালে মহারাজার পার্শ্ব ত্যাগ করে না।”

প্রতাপসিংহ শ্রবণ করিলেন, ফাঙ্কন মাসের শেষদিন রজনীতে দৈলওয়ারাপতি এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন। দৈলওয়ারাপতির জীবনশূন্য দেহ ভূতলে পড়িল।

ষাণ্মাস সহস্র রাজপুত্র যোদ্ধার মধ্যে চতুর্দশ সহস্র সে দিন ভূতলশায়ী হইল, অবশিষ্ট আট সহস্র মাত্র যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিল। প্রতাপসিংহ অগত্যা হলদীঘাটার যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিলেন। যোগলগণ জয়লাভ করিল, কিন্তু সে যুদ্ধকথা সহসা বিস্মৃত হইল না। বহুবৎসর পরে দিল্লীতে, দাক্ষিণাত্যে বা বঙ্গদেশে প্রাচীন বোদ্ধগণ যুবক সেনাদিগের নিকট হলদীঘাটা ও প্রতাপসিংহের বিখ্যকর গল্প বলিয়া রজনী অতিবাহিত করিত।

রমেশচন্দ্র দত্ত ।



বিদ্যাসাগর

স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একখানি সুন্দর জীবন-চরিত বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইয়াছে বটে, কিন্তু এই মাননীয় পণ্ডিতের যশ শুধু বাঙ্গালার মধ্যেই আবদ্ধ নহে ; উনবিংশ শতাব্দীর একজন প্রধান কণ্ঠস্বর বলিয়া তিনি ভারতের সর্বত্রই বিখ্যাত । সার সেসিল বিভনের বন্ধু ও ড্রিন্‌ক্‌ওয়াটার বেথুনের সহযোগী এই উন্নতমনা বাঙ্গালীর মহৎ চরিত্র ও কীর্তিকলাপের প্রশংসা করেন নাই, এরূপ ইংরাজ তৎকালে অতি অল্পই ছিলেন ।

ভারতের ইতিহাসে বিদ্যাসাগর মহাশয় চিরকালই অতি উচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত থাকিবেন । ইংরাজ-রাজত্ব ও ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে এদেশে নব আশা, নূতন ভাব ও নূতন উত্তমের সৃষ্টি হয় । উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাজা রামমোহন রায়ের জীবনে এবং পরে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কার্যে ইহার পরিচয় ।

এই দুই কণ্ঠস্বরের জীবনের কতিপয় প্রধান ঘটনা প্রায় একই সময়ে ঘটে । ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে রাজা রামমোহন রায়, সমাজ ও ধর্মসংস্কার-সম্বন্ধীয় ঊাহার চূড়ান্ত কার্য্য ব্রাহ্মসমাজ বা একেশ্বরবাদী হিন্দুসমাজ স্থাপন করেন ; পর বৎসর বালক ঈশ্বরচন্দ্র ঊাহার



জীবনের কার্যোপযোগী বিজ্ঞানশিক্ষার্থ জনস্বাস্থ্য ইহতে কলিকাতায় আগমন করেন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে রাজা রামমোহন ইংলণ্ডে প্রাপত্যাগ করেন, ইহার কয়েক বৎসর পরেই ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজের অধ্যয়ন সমাপনান্তে দক্ষতার সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ‘বিদ্যাসাগর’ এই উপাধি লাভ করেন।

বিলাত হইতে যে সকল অল্পবয়স্ক সিবিলিয়ান এদেশে আসিতেন, তাঁহাদের বাঙ্গালা, হিন্দি, উর্দু প্রভৃতি এদেশীয় ভাষাসকল শিক্ষা দিবার নিমিত্ত ১৮০০ খৃষ্টাব্দে লর্ড ওয়েলেসলি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে একুশ বৎসর বয়সে ইহার প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন। এই পদপ্রাপ্তি হইতেই তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের সৌভাগ্য-গৌরব স্ফুটিত হয়। ইতিপূর্বে তিনি অতি অল্পই ইংরাজি শিখিয়াছিলেন, কিন্তু এই সময়ে প্রয়োজনবশতঃ তাঁহার উত্তমরূপে ইংরাজি ভাষা শিখিবার বাসনা বলবতী হয়। তিনি সমবয়স্ক ও একাগ্রচিত্ত রাজনারায়ণ বসুর সহিত ইংরাজি শিক্ষা করেন। এই রাজনারায়ণবাবু পরে বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের জীবনের এই অংশ কতকগুলি বিশেষ গুরুতর ঘটনার জন্ত চিরস্মরণীয়। তাঁহাকে এই সময়ে কতিপয় বিশিষ্ট ইংরাজ ও কয়েকজন দেশীয় কৰ্ম্মবীরের সংস্পর্শে আসিতে হয়। তাঁহারই সাহায্যে অল্পবয়স্ক ভূর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (ত্রিগুণ্ড সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পিতা) ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের হেড রাইটারের পদ প্রাপ্ত হন। এই সময়েই তিনি হিন্দুসমাজের তৎকালীন নেতা রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের নিকট পরিচিত

হন ও এই সময়েই অসাধারণ প্রতিভাশালী অক্ষয়কুমার দত্তের সহিত তাঁহার জীবনব্যাপী বন্ধুত্বের প্রথম সূত্রপাত।

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ কোর্ট উইলিয়াম কলেজ পরিদর্শন করিতে আসিলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত তাঁহার অনেক কথাবার্তা হয়। পরবর্তী দুই বৎসরের মধ্যে যখন যকের বিভিন্ন প্রদেশে এক শত একটি 'হার্ডিঞ্জ বিদ্যালয়' স্থাপিত হইল, তখন সেই সমুদয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক-নির্বাচনের ভার মার্শাল সাহেব ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপর অর্পিত হইল। এই প্রভূত ক্ষমতার পরিচালনে বিদ্যাসাগর মহাশয় কখনও ব্যক্তিগত স্বার্থের দিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই। তাঁহার উপর যে গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ কার্যভার অর্পিত হইয়াছিল, তিনি সর্বতোভাবে তাহার সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি কিরূপ স্বার্থত্যাগ করিয়া সুযোগ্য ব্যক্তিকে উচ্চ পদলাভে সাহায্য করিতেন, তাহার একটি সুন্দর মর্ম্মস্পর্শী দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণ-অধ্যাপকের পদ শূন্য হইলে, মার্শাল সাহেবের সুপারিশে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ঐ পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা হয়। ঐ পদের বেতন ৯০ টাকা। বিদ্যাসাগর মহাশয় তৎকালে ৪০ টাকা মাত্র বেতন পাইতেন। তিনি কিন্তু ঐ পদ-গ্রহণে অসম্মত হন; কারণ তাঁহার বিবেচনায় প্রসিদ্ধ ভারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় ব্যাকরণ-শাস্ত্রের অধ্যাপনায় যোগ্যতর ব্যক্তি বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল। তর্ক-বাচস্পতি মহাশয়ই ঐ পদে মনোনীত হইলেন এবং তাঁহাকে এই সংবাদ প্রদান করিবার নিমিত্ত বিদ্যাসাগর মহাশয় পদত্বজে কলিকাতা হইতে কালনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই অপূর্ণ স্বার্থত্যাগ দেখিয়া তর্কবাচস্পতি মহাশয় অতিশয় বিস্মিত ও



চমৎকৃত হইয়াছিলেন এবং বিশ্বয়-বিশ্বলচিন্তে বলিয়াছিলেন, “ধন্য বিজ্ঞানাগর ! তুমি যাহুয নও, তুমি যনুয্যাকারে দেবতা !”

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের পদ শূন্য হয়। তখন খাতনামা বাবু রসময় দত্ত সংস্কৃত কলেজের সম্পাদক ছিলেন। তিনি ইতিপূর্বেই বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের অসামান্য প্রতিভা ও অসাধারণ উদ্যমের পরিচয় পাইয়াছিলেন। সহকারী সম্পাদকের পদের বেতন বৃদ্ধি করিয়া বিজ্ঞানাগর মহাশয়কে ঐ পদে নিযুক্ত করিতে তিনি শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষগণকে অতুরোধ করেন। বেতন বৃদ্ধি করা হইল না বটে, কিন্তু বিজ্ঞানাগর মহাশয় ঐ পদে মনোনীত হইলেন। ঐ পদে নিযুক্ত হইয়া তিনি সংস্কৃত-শিক্ষা-প্রণালী-সংস্কারে মনোনিবেশ করিলেন। সংস্কার-সম্বন্ধীয় তাঁহার কঠোর ব্যবস্থাসকল দেখিয়া রসময়বাবু পর্য্যন্ত ভীত হইলেন এবং তাঁহার কণ্ঠিপর প্রস্তাব অমু্যোদিত না হওয়ার বিজ্ঞানাগর মহাশয় পদত্যাগ করিয়া কিছুদিনের ক্ষণ্ত কর্মজীবন হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে তিনি পুনরায় সংস্কৃত কলেজের সংস্কৃত সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং তাঁহার প্রস্তাবিত সংস্কার-সম্বন্ধীয় একটি বিস্তৃত রিপোর্ট প্রকাশিত করেন। রসময়বাবু দেখিলেন, এক্ষণে তাঁহার পদত্যাগ করাই শ্রেয়স্কর। তখন সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদকের পদ এক হইয়া প্রিন্সিপাল পদের সৃষ্টি হইল। বিজ্ঞানাগর মহাশয় সংস্কৃত কলেজের প্রথম প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হইলেন ও তাঁহাকে ইচ্ছামত সংস্কৃত-শিক্ষা-প্রণালী-সংস্কারে ক্ষমতা প্রদত্ত হইল।

দেখিতে দেখিতে বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের বয়স চতুর্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। তখন তাঁহার বয়স ত্রিশ বৎসর মাত্র। তিনি

বঙ্গদেশের সম্ভ্রান্ত জমিদারগণের দ্বারা বহুকণে পরিগণিত হইলেন। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণ এই নূতন সহযোগীকে পাইয়া আনন্দসহকারে ইহার সংবর্ধনা করিলেন। যে সকল সহৃদয় ইংরাজ ভারতের উন্নতি-কাজে ঐকান্তিক যত্ন-চেষ্টা করিতেছিলেন, তাঁহারা একজন উপযুক্ত সাহায্যকারী পাইলেন। তিনি এ দেশে স্ত্রী-শিক্ষা-প্রচলনে যত্ন, প্রাণ সমর্পণ করেন এবং এতৎ-সম্বন্ধে মহামুভব বেথুন সাহেবকে অনেক সাহায্য করেন। বঙ্গের প্রথম ছোটলাট স্তার ফ্রেড্রিক হ্যালিডে সাহেব তাঁহার কার্যে সন্তুষ্ট হইয়া বেথুন সাহেবের মৃত্যুর পর বেথুন স্কুল নামক বালিকা-বিদ্যালয়ের ভার তাঁহার উপর অর্পণ করেন।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে যখন এ দেশে বাঙ্গালা ও ইংরাজি বিদ্যালয় সংস্থাপিত করা গবর্নমেন্টের অভিপ্রেত হয়, তখন বিজ্ঞাসাগর মহাশয় এ সম্বন্ধে একটি রিপোর্ট লেখেন। এই রিপোর্ট-পাঠে সন্তুষ্ট হইয়া কর্তৃপক্ষেরা তাঁহাকে ২০০০ টাকা বেতনে হুগলি, বর্ধমান, মেদিনীপুর ও নদীয়া জেলাসমূহের একজন বিশেষ ইনস্পেক্টররূপে নিযুক্ত করেন। ইহা ভিন্ন তিনি সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপালের বেতন ৩০০০ টাকাও পাইতেন। তিনি ঐ চারিটি জেলায় বালকবালিকাগণের জন্য অনেকগুলি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এ সময়ে তাঁহাকে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজের ও নর্ম্যাল স্কুলের কার্যেরও তত্ত্বাবধান করিতে হইত। তাঁহার একান্ত অমুরোধে অক্ষয়কুমার দত্ত নর্ম্যাল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন।

এই সমস্ত কার্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও বিজ্ঞাসাগর মহাশয় সাহিত্য-চর্চায় বিরত হন নাই। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার বাঙ্গালা



‘শকুন্তলা’ প্রকাশিত হইল। ইহার তিন বৎসর পরে তাঁহার সর্বোৎকৃষ্ট পুস্তক ‘সীতার বনবাস’ প্রকাশিত হয়। বর্তমান কালের বাঙ্গালা গল্পসাহিত্য সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্যের জন্য বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের ও অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের নিকট স্বামী।

রাজা রামমোহন রায় ও তাঁহার সমসাময়িক লেখকগণের ভাষা তেজোময়ী ও ভাবপ্রকাশক হইলেও অতীব জটিল ও দুর্বোধ্য ছিল। বিজ্ঞানাগর মহাশয় ও অক্ষয়কুমার-বাবুই যে আধুনিক মনোহারী বাঙ্গালা গল্পসাহিত্যের সৃষ্টিকর্তা, ইহা বলিলে কিছুমাত্র অতিরঞ্জিত করা হয় না। যে সকল ইংরাজ লেখক রাজ্যী আনের সময়ে ইংরাজি গল্পকে বর্তমান ছাচে ঢালিয়া ভাষার স্রোত ফিরাইয়া দিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সহিত বিজ্ঞানাগর মহাশয় ও অক্ষয়কুমার স্বদেশীয় সাহিত্য-সেবা-বিষয়ে তুলনায় সমকক্ষ।

এই সময়ে বিজ্ঞানাগর মহাশয় একটি গুরুতর কার্যে ব্যস্ত হইয়া পড়েন। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে এই বহুশাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত নির্ভীকচিত্তে প্রকাশ করিলেন যে, শাস্ত্রে হিন্দু-বিধবাদিগের চির-বৈধব্যা-বিধি নাই এবং বিধবা-বিবাহ শাস্ত্র-সম্মত। চতুর্দিকে ভীষণ অগ্নি জলিয়া উঠিল। বাঙ্গালার প্রত্যেক নগরে এবং প্রত্যেক গ্রামে তুমুল আন্দোলন হইতে লাগিল। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও দাশরথি রায় এই নব্য সমাজ-সংস্কারকে ব্যঙ্গ করিয়া কবিতা লিখিতে লাগিলেন। গ্রামে গ্রামে উৎসবাদি-উপলক্ষে বিধবা-বিবাহ-বিষয়ক গান গীত হইতে লাগিল। শান্তিপুরের তন্তবায়েরা শ্রীলোকদিগের শাড়ীর পাড়ে এই সম্বন্ধে গান বুনিতে আরম্ভ করিল। তখন ঘরে ঘরে শ্রী পুরুষ সকলেরই মুখে কেবল এই কথা। অতঃপর এই সংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

করিয়া রাজা রামাকান্ত দেব স্বয়ং গবর্নমেন্টের নিকট আবেদন করিলেন।

এই প্রবল ঝটিকার মধ্যে বিজ্ঞানাগর মহাশয় অচল ও অটল। বিরুদ্ধ মতসকল খণ্ডন করিয়া তিনি আর একখানি পুস্তক প্রচার করিলেন। ইহাতে তিনি যেকোন প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও সুন্দর যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে এই আন্দোলন প্রায় একরূপ বন্ধ হইয়া যায়। শুধু তাহাই নহে, তিনি প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ, প্রতাপচন্দ্র সিংহ প্রভৃতি অনেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তিকে নিম্নমতাবলম্বী করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহার পর পুনর্বিবাহিত হিন্দুবিদবাগণের সম্মানসম্মতিকে আইনসম্মত উত্তরাধিকারী করিবার ক্ষমতা গবর্নমেন্টের নিকট আবেদন করা হয় এবং ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে এই বিষয়ক আইন পাস হয়।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে যখন লর্ড ক্যানিং কলিকাতা-বিদ্যবিজ্ঞান হাউস করেন, তখন ইহার সভ্যসংখ্যা ৩৯ জন মাত্র। তন্মধ্যে কেবল ৬ জন এ দেশীয়। বিজ্ঞানাগর মহাশয় ইহার মধ্যে একজন ছিলেন। কিন্তু এক্ষণে শিক্ষাবিভাগের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ শেষ হইয়া আসিল। এডুকেশন কাউন্সিলের স্থানে ডাইরেক্টর অব পাবলিক ইন্সট্রাকশন পদের সৃষ্টি হইল ও গর্ডন ইয়ং সাহেব প্রথম ডাইরেক্টর নিযুক্ত হইলেন। ইনি একজন নবীন ও অল্পদক্ষ কর্মচারী। এ স্থলে সেই পুরাতন নিয়মানুযায়ী ব্যবস্থাই হইল। বিজ্ঞানাগর মহাশয় সংস্কৃত-শিক্ষাপ্রণালী-সংস্কারক, বাঙ্গালা শিক্ষার জননদাতা, দ্বিতীয়া-প্রবর্তনকারী, একাগ্রচিত্ত সংস্কারক ও লক্ষ প্রতিষ্ঠ সাহিত্যসেবক, তথাপি স্বদেশের শিক্ষাবিভাগের সর্বোচ্চ পদ লাভ তাঁহার অদৃষ্টে ঘটিল না। কারণ তিনি এ দেশীয়।



আবার যিনি তাঁহার উপরে নিযুক্ত হইলেন, সেই গর্ডন ইয়ং সাহেব তাঁহার গুণগ্রহণে সমর্থ হইলেন না, পরন্তু তাঁহার সহিত বিশেষ ভাল ব্যবহারও করিতেন না, এরূপ শুনা যায়। ইহাতে বিজ্ঞানাগর মহাশয় অতিশয় মর্মান্বিত হইয়াছিলেন এবং ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে প্রায় ৪০ বৎসর বয়সে তিনি গবর্নমেন্টের সহিত সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করেন। তাঁহার এত দিনের কার্যের পুরস্কারস্বরূপ তিনি কোনরূপ পেন্সন বা পুরস্কারও পাইলেন না। তাঁহার কর্মত্যাগ মঞ্জুর করিয়া ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ২রা ডিসেম্বর গবর্নমেন্ট যে পত্র লিখেন, তাহার শেষে লেখা ছিল, দেশীয় শিক্ষার জন্ত তিনি যে দীর্ঘকালব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা গবর্নমেন্ট স্বীকার করিতেছেন।

ইহা অবশ্য অতিশয় সুখের বিষয় যে, এই কর্মত্যাগের পর বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের অপর অপর কার্যে দানশীলতার সুবিধা হইয়াছিল এবং তিনি পূর্বাশ্রমের মহাবীর পরিচয় দিয়াছিলেন। যত দিন না বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা সাধারণে বুঝিয়াছিল, ততদিন সাহিত্যিক হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সমকক্ষ অপর কেহই ছিল না। এ পর্যন্ত পৃথিবীতে যে সকল পত্রোপকারী এবং আর্থ ও দরিদ্রদিগের দুঃখমোচনকারী মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে সর্বোচ্চ শ্রেণীতে বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের স্থান। তাঁহার পুস্তকের প্রভূত আয় আর্থ ও দরিদ্রদিগের দুঃখ দূর করিতে ব্যয়িত হইত, শত শত দরিদ্র-বিধবা জীবিকার জন্ত ও শত শত অনাথ বালক শিক্ষার জন্ত তাঁহার নিকট গুলী। বঙ্কিমচন্দ্রের ঘরে ঘরে তাঁহার নাম-কীর্তন হইত, কি ধনী—কি দরিদ্র সকলেই তাঁহাকে সমভাবে ভালবাসিত।

তাঁহারা বিজ্ঞানাগরের বিরুদ্ধ-যত্নাবলম্বী ছিলেন, তাঁহারাও



ইহাকে ইহার সহযোগীদের জায় মাত্র করিতেন। বঙ্গের শ্রেষ্ঠ জমিদারগণ এই প্রকাশ্পদ, সরল, অসম-সাহসী ও অসীম-দয়াবান্ পণ্ডিতকে সম্মানিত করিয়া আনন্দিত হইতেন। তৎকালীন ছোটলাট স্থার সেন্সিল বিডন এই অবসরপ্রাপ্ত, শিকাকাৰ্য্যে বিশেষ পারদর্শী পণ্ডিতের সহিত প্রায়ই পরামর্শ করিতেন এবং তাঁহার সহিত সর্বদা আলাপ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইতেন।

বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের সহিত আমার মধ্যে মধ্যে সাক্ষাৎ হইত এবং তাঁহার জীবনের শেষ কুড়ি বৎসর আমি তাঁহার সহিত পত্র-ব্যবহার করিয়াছিলাম। তাঁহার জীবনের প্রথম ভাগের কার্য্য-সংগ্রাম ও জয়-পরাজয়ের উল্লেখ করিতে তিনি তখনও উৎসাহিত হইয়া উঠিতেন। তিনি বাহাদুরগির সহিত একযোগে কার্য্য করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই তখনকার দিনে এক এক জন কম্বীবীর। প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ, হরিন্দ্ৰ মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস পাল, যদনমোহন তর্কালঙ্কার, মধুসূদন দত্ত, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি অনেকেই এই তালিকাভুক্ত। ঊনবিংশ শতাব্দীর আমাদের জাতীয় কার্য্যের ইতিহাস আশার শুভ আলোকে সমুজ্জল এবং ইহার সহিত বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের জীবনের ইতিহাস সর্বাপেক্ষা সূক্ষ্মভাবে জড়িত।

আমি প্রায়ই বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের প্রভাতত্রয়ের সঙ্গী হইতাম এবং কখনও কখনও তাঁহার সহিত তাঁহার বাটীতে সাক্ষাৎ করিতাম; তখন আমি তাঁহার সংগৃহীত ইংরাজি ও সংস্কৃত পুস্তকরাশি দেখিবার অল্পমতি পাইতাম। তাঁহার কথাবার্তায় তাঁহার ঘটনাবহুল জীবনের অনেক গল্পই শুনা যাইত এবং



তাঁহার সরস রসিকতা তাঁহার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁহাতে বর্তমান ছিল।

আমি যখন আমার কর্মস্থলে পুস্তকালয় স্থাপন করিলাম, তখন তিনি প্রায়ই স্বরচিত পুস্তকাবলী আমাকে প্রেরণ করিতেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে যখন আমি প্রতিবাদের ভীষণ ঝটিকার মধ্যে স্বদেশের বাঙ্গালী অনুবাদ করিতে আরম্ভ করি, তখন মহামতি বিজ্ঞানাগর মহাশয় আমার বিশেষরূপে সাহায্য করেন।

এই সময়ে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল এবং তিনি প্রায়ই কলিকাতা ছাড়িয়া কর্মঠারের বাটতে বায়ুপরিবর্তনের জন্য গমন করিতেন। তথায় সরল গ্রামবাসিগণ দলে দলে তাঁহাকে দেখিতে আসিত এবং তিনি তাহাদের বিপদে-আপদে সর্বদাই সাহায্য করিতেন; তিনি এই দরিদ্রদিগের মধ্যে ঔষধ বিতরণ করিতেন। তাঁহার দয়ায় ইহারা অভিজ্ঞ হইয়া পড়িয়াছিল। অবশেষে সকলই ফুরাইল, ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ৭০ বৎসর বয়সে এই সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী আমাদের ছাড়িয়া অনন্তধামে চলিয়া গেলেন।

রমেশচন্দ্র দত্ত।

অশ্রু

“Sweet tears, the awful language eloquent
Of infinite affection far too big
For words,”

তোমার ঐ মণিমুক্তার মোহন-মালা দূরে রাখ ; আমি একবার
নয়ন ভরিয়া মনুষ্যের নয়ন-বিলম্বিনী অশ্রুমালা নিরীক্ষণ করিয়া
লই । মণিমুক্তা পরিণামে পৃথিবীর ধূলি-সমান ; বালক, বণিক
কিংবা বিনোদ-ভাব-বিহ্বলা অবলা ভিন্ন আর কাহারও কাছে
উহার মূল্য নাই । অশ্রুমালা দ্রবীভূত মনুষ্যহৃদয়ের সজীব ধারা ;
পৃথিবীর কোন বস্তুর সহিতই উহার তুলনা নাই ।

এই সংসার-মরুতে মনুষ্যহৃদয়ের অবলম্ব কি ?—মনুষ্যহৃদয় ।
মামুষী তুফার তৃপ্তিস্থল কোথায় ?—মনুষ্যহৃদয়ে । হৃদয় যদি
হৃদয়কে সন্তুষ্ট করিয়া প্রতिसন্তুষ্টে প্রীত, আশুস্ত ও পরিতৃপ্ত
না হয় তাহা হইলে কে এই শূন্যসংসারে ইচ্ছাসহকারে জীবন
ধারণ করে ? হৃদয় যদি হৃদয়ের উপর ভর করিয়া প্রতিনির্ভরে
প্রাণ-বল না পায়, তাহা হইলে কে এই দগ্ধ শ্মশানে অস্থি-সংগ্রাহের
জন্ত পড়িয়া থাকিতে সম্মত হয় ? হৃদয় যদি প্রীতির পূর্ণোচ্ছ্বাসে
আত্ম-দান করিয়া প্রতিদানে হৃদয় না পায়, তাহা হইলে কে এই
তিমিরাক্র-ভুবনে ভবলীলার নট-নৈপুণ্য-শিকার জন্ত বন্দী রহিতে
পারে ? রাজার প্রাসাদ, বুড়ু ভিখারীর পর্ণকুটীর, বোগীর
তপোবন, বিয়োগীর নিভৃত-কানন, পুণ্যস্থার শান্তিনিকেতন,



প্রমোদীর বিলাস-ভবন,—ইহার সর্বত্রই মনুষ্যের আশ্রয়স্থান মনুষ্য-
 হৃদয়। কবিতা মনুষ্যহৃদয়েরই প্রীণনের জন্য কুলের মধু, লতার
 মাধুরী এবং এই অনন্ত বিশ্বের অনন্ত সৌন্দর্যের সারভূত সৌন্দর্য্য-
 সুধা পাকিলীর জ্বায় চকুপুটে সঞ্চয়ন করিয়া নিত্য আনিয়া উপহার
 যোগাইতেছে। চিন্তা হৃদয়েরই ক্ষুধিবৃত্তি ও প্রকৃত পুষ্টির জন্য,
 আকাশে উড্ডীন হইয়া, সাগরে ডুব দিয়া এবং ভূ-গহবরে প্রবেশ
 করিয়া সুস্বাদ ও সুভক্ষ্য ফল চয়ন করিতেছে। উদ্দীপনাও
 হৃদয়েরই উদ্বোধনের জন্য, তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিয়া, উৎসাহের
 প্রতাপ মদিরা এবং প্রতাপ তাড়িত প্রবাহ উদ্ভাদিনীর মত ঢালিয়া
 দিতেছে। কলতঃ, হৃদয় না থাকিলে এই জগতে কাহার জন্য
 কে? বুদ্ধি জ্ঞান দান করিতে পারে; বিবেক নির্মল-চেতা
 নির্ভীক সুহৃৎজনের জ্বায় নীতির দুর্গম-পথ প্রদর্শন করিতে
 পারে;—কিন্তু তুফায় তৃপ্তি দান করিতে, জ্বালা ও বেদনাদ
 শান্তি দিতে, এবং শান্তি বধন আশাতীত ও অসম্ভব হয়, তখন
 সহানুভূতির অমৃতস্পর্শে প্রাণ জুড়াইতে মানবজগতে একমাত্র
 বস্তু মনুষ্যহৃদয়। অশ্রুধারা সেই মনুষ্যহৃদয়ের জীবনময়ী নির্ঝরিলী।
 উহা কখনও ধীরে বহে, কখনও বেগে প্রবাহিত হয়, কখনও
 বা নিশীর শিশিরবিন্দুর জ্বায় বিন্দু বিন্দু ঝরিতে থাকে। কিন্তু
 যেই মনুষ্য উহার দিকে দৃষ্টিপাত করে, অমনি তাহার হৃদয়
 অন্তরতম স্থলে স্পৃষ্ট হইয়া এই বিশ্বাস ও এই গভীর আনন্দে
 উল্লসিত হয় যে, এই সংসার কঙ্করময় কান্ডার অথবা হৃদয়-শূন্য
 দগ্ধ প্রান্তর নহে।

যাহারা ক্ষণকালও কোন বিষয়ে বনোনিবেশ করিতে চাহে
 না, অথবা প্রকৃতির চাপল্যে ক্ষণকালের তরেও কোন বিষয়ে



মনোনিবেশ করিতে সমর্থ হয় না,—কার্য্য, কারণ, সৃষ্টি, স্থিতি, জীবন ও মৃত্যু, এবং মানবজীবনের উন্নতি ও অবনতি প্রভৃতি সমস্ত তথ্যই বাহাদিগের নিকট হাতের বিষয়, সেই বিকটবুদ্ধি কিন্তু পুরুষেরা অবশ্যই মনুষ্যের অশ্রু লইয়া উপহাস করিতে পারে। আর বাহারা মনুষ্যকূলে জন্মগ্রহণ করিয়া, শিক্ষা, সংসর্গ অথবা কর্ম্মক্ষেত্রে ক্রুরকর্ম্মা রাক্ষস হইতেও নিষ্ঠুর হইয়াছে,—কাব্যে বাহাদিগের নাম ধূম্রলোচন কিংবা ফ্রন্ট-ডি-ব্রিগফ, ইতিহাসের ঘৃণা ও অবজ্ঞার চিত্রে বাহারা ভিটেলস কি ভিস্কন্টী, তাহারাও মনুষ্যের অশ্রুদর্শনে খিল খিল করিয়া হাসিতে পারে! কিন্তু বাহারা সর্ব্বাংশে অন্তঃসারহীন ও প্রাণবিহীন নহেন, মনুষ্যত্ব একেবারে বাহাদিগকে পরিভাগ করুে নাই, উহা স্বভাবতঃই বাহাদিগের ভক্তি ও প্রীতি আকর্ষণ করে, এবং আপনি তরল হইয়াও বাহাদিগের ভারল্যকে স্তম্ভিত করিয়া ফেলে। মনুষ্যের অশ্রু বস্তুতঃও সামান্ত পদার্থ নহে।

অশ্রু দয়ার প্রবাহ। স্বার্থপরতা নিভূতে যসিয়া ক্ষতি-লাভ গণনা করে। লোভ কাহার কি হরণ অথবা কোথা হইতে কি উপায়ে কখন কি আহরণ করিবে, সেই চিন্তায় সর্ব্বত্র সাবধানে বিচরণ করে। ঈর্ষ্যা পরের সুখসম্পদ ও সম্মান-দর্শনে আপনি পুড়াইয়া মরে এবং বিবাক্ত দৃষ্টি ও বিবাক্ত বাক্যে অন্তকে পুড়াইয়া ভস্ম করে। কামাদি কলুষিত বৃত্তি প্রমত্ত পশুর ছায় আরক্তলোচনে সত্যত ভোগ্য বিষয়েরই অনুসন্ধান করে কিন্তু পরহুঃখ-কাতরা দয়া নয়নজলে বিগলিত হইয়া,—আপনাকে আপনি পরের আগুনে ঢালিয়া দিয়া, পরকীর হৃদয়ের হুঃখ-দাহ নির্কারণ করে। দয়ার অশ্রু দেবতারও হৃর্ভদ্র ধন। বাহার চক্ষু



দয়ার অশ্রুতে সিদ্ধ হয়, তিনি দেবতার মধ্যে দেবতা। তাঁহাকে অভিবাদন কর। তিনি হীন-কুল-জাত হইলেও মহাকুলীন, মূর্খ হইলেও পণ্ডিতের মুকুটস্থানীয়, এবং কাঙ্গালের ঘরে জন্মিয়া থাকিলেও রাজরাজেশ্বর। কেন না, সংসারে বৃথাজ্ঞানী ও বৃথাভিমানীরা নানাবিধ বৃথা শ্রম করিয়াও, চিরজীবনে যাহা করিতে পারিতেছে না, তিনি স্বভাবতঃই তাহাতে সিক,—তাহারা কৃত্রিম প্রতিপত্তির কৌশলময় সোপানপরম্পরায়, শত সহস্র ভেরী তুরীর বাস্তকোলাহলের মধ্যে, ভ্রতপদ-সন্ধারে আরোহণ করিয়াও মনুষ্যদের যে উন্নতমঞ্চে অধিকৃত হইতে অসমর্থ, তিনি জন্মান্তরীণ মহাপুরুষের মত স্বভাবতঃই সেখানে অধ্যাসীন। তিনি এই-পৃথিবীর পাপ-চক্ষে পাণাঘা হইলেও, তুমি তাঁহাকে পুণ্যপুঞ্জময় পবিত্রবস্ত্রস্থানে পূজা করিও। কেন না, তাঁহার জীবন পরের জন্ত,—তাঁহার অস্তিত্ব পরের সুখশান্তির উদ্দেশ্যে,—তিনি দয়ার বিগ্রহ অথবা দয়ার সেবক এবং সুতরাং তিনি তাঁহার অন্তরের অন্তস্তলে,—লোকলোচনের অগোচরে, জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতসারে,—লৌকিক জীবনের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অনন্ত অমুষ্ঠানে দয়াময় মঙ্গলের মহাসিদ্ধক, দয়াময়ের প্রকৃত উপাসক।

যে যাহারে ভালবাসে, সে তাহারে প্রাশংসাই ভালবাসিতে পারে। কিন্তু, পরকে ভালবাসে কে? আপনার পুত্র, কন্যা ও ব্রাহ্মসদ ব্যক্তির প্রতি সকলেরই স্নেহ-সন্মতি হয়। কিন্তু পরকে প্রমুগ্ধচিত্তে স্নেহ বিলাইতে পারে কে? যেখানে রূপ আছে, গুণ আছে, প্রতিভার উজ্জল দীপ্তি কিংবা কুসুমের সুসুমার সৌরভ আছে, সেখানে সকলেরই অমুরাগ আকৃষ্ট হইতে পারে। কিন্তু যেখানে রূপ নাই, গুণ নাই, নয়ন-মনোবিনোদনের কিছুই

নাই—আছে হৃৎকের কালিয়া এবং হৃর্ভাগ্যের কশাঘাতজন্য
কৃতবিকৃত চিহ্ন, তাদৃশ স্থানে হৃদয়ের স্বতঃপ্রসূত সুরণে অনুরক্ত
হইতে পারে কে ? যেখানে সম্পদের সুখ সামগ্রী যাক্ষিক-প্রকৃতি
মনুষ্যগণকে মধুগন্ধে মোহিত রাখে, সেখানে সকলে গিয়া যমতার
বন্ধনে বদ্ধ হইতে পারে । কিন্তু, যেখানে বিপদের ভয়ঙ্কর ঘূর্ণবাতে
সকলই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, বাহা আছে, তাহাও বিনাশ
পাইতেছে, এবং আশার শেষ আলোকবর্তিকাও নিবিয়া বাইতেছে,
আপনা হইতে সেখানে বাইয়া আপনাকে আপনি যমতার রজ্জুতে
জড়াইতে পারে কে ? যে পবিত্র, পুত-চরিত্র ও প্রজ্ঞাম্পদ,
তাহাকে সকলেই প্রজ্ঞা করিতে পারে । কিন্তু যে অধম, অপাত্ত,
অপবিত্র ও অশুভ্র, তাহাকে তুলিয়া লইয়া আবরিতে পারে কে ?
হৃদয় যেখানে উড়িয়া পড়িতে সুখানুভব করে,—সুখ-সংস্পর্শে
শীতল হয়, সেখানে সকলেই স্বয়মাহুত উপহিত হইতে পারে ।
কিন্তু যেখানে সকলই হঃসহ, হুর্নিরীক্ষ্য ও নিদারুণ হুর্ভোগ,—
যে স্থানের বীভৎস দৃশ্যে বিরক্তি ও ঘৃণা ব্যতীত আর কোন
ভাবেরই উদ্রেক হয় না,—যেখানে বল-প্রয়োগেও চিত্তকে প্রেরণ
করা যায় না, সেখানে আপনা হইতে বাইয়া অশ্রবষণ করিতে
পারে কে ?

তুমি প্রভুত্বের উপাসনার আত্মসমর্পণ কর,—প্রভুত্বলাভে
পূর্ণকাম হইবার জন্য অকণ্ঠ ক্লেশ স্বীকার কর,—সে তোমার
আপনার জন্য ; পরের জন্য নহে । তুমি সারস্বত সমুদ্রে সাতার
দিয়া একেবারে উহাতে ডুবিয়া থাক,—সরস্বতীর পাদপদ্মে
একেবারে বিলীন হইয়া যাও,—সে তোমার আপনার জন্য ; পরের
জন্য নহে । যদি প্রভুত্বের উপাসনার ও সরস্বতীর পদারবিন্দসেবায়



কোনরূপ অলৌকিক নাদকতা না থাকিত, তাহা হইলে তুমি তাহাতে দেহ-মন অর্পণ করিতে পারিতে কি না, সন্দেহের কথা। তুমি কীর্তির বিশ্ববিনোদ বংশোদ্ভব-শ্রবণে উদ্ভাস্ত হইয়া কীর্তিকর ও বশন্তর যে সকল কার্যের অনুষ্ঠান কর,—যে সকল কঠোর, কষ্টজনক ও হুঃসাধ্য কৰ্ম সম্পাদন করিয়া সমাজের কীৰ্ত্তিস্তম্ভনিবহে আপনার নামাকর লিখিয়া রাখিতে যত্নপর হও, তাহাও তোমার আপনার ক্ষুদ্র —পরের ক্ষুদ্র নহে। পরের ক্ষুদ্র দয়ার অশ্রু,—পৃথিবীর অমূল্য ধন, প্রাণপ্রদ—প্রাণস্পর্শী এবং অপ্রত্যক্ষ মহেশ্বের প্রত্যক্ষ ফল।

কালীপ্রসন্ন ঘোষ।



দিল্লীর অস্ত্রাগার

দিল্লীর প্রসিদ্ধ অস্ত্রাগার নগরের অন্তর্ভাগে রাজপ্রাসাদের কিয়দূরে অবস্থিত ছিল। অস্ত্রাগারে সমস্ত আবশ্যক যুদ্ধোপকরণের কিছুই অভাব ছিল না। কামান, বারুদ, গোলা, গুলি সমস্তই এই অস্ত্রাগারের যথাস্থলে যথানিয়মে সন্নিবেশিত ছিল। লেপ্টেনেন্ট জর্জ উইলোবি নামক একজন সৈনিকপুরুষ এই অস্ত্রাগারের অধ্যক্ষ ছিলেন। ইহার অধীনে ৮ জন ইউরোপীয় কার্য করিতেন। অস্ত্রাগারের অবশিষ্ট লোক ভারতবর্ষীয়। সোমবার (১১ই মে, ১৮৫৭) প্রাতঃকালে উইলোবি অস্ত্রাগারের কার্য পরিদর্শন করিতেছিলেন এমন সময়ে, দিল্লীর ব্রিটিশ রেসিডেন্ট শ্রীর টমাস মেট্‌কাফ তাঁহাকে জানান যে, মিরাট হইতে উত্তেজিত অশ্বারোহী সৈনিকদল নদী পার হইতেছে। ইহাদিগকে বাধা দিবার জন্য রেসিডেন্ট দুইটি কামান প্রার্থনা করেন। তিনি এই কামান যমুনার নোমেন্তুতে রাখিয়া আগন্তুক অশ্বারোহীদিগকে উড়াইয়া দিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি জানিতে পারিলেন যে, বাধা দিবার সময় অতিক্রান্ত হইয়াছে। অশ্বারোহিগণ নদী পার হইয়া নগরে প্রবেশ করিয়াছে। ইহা অবগত হইয়াই মেট্‌কাফ সাহেব অবিলম্বে কার্যাসূত্রে গেলেন, এবং উইলোবি আপনার অস্ত্রাগার রক্ষা করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার আশঙ্কা ছিল যে, আগন্তুক সৈনিকদিগের সহিত নগরের উন্নত লোক অস্ত্রাগারে প্রবেশ করিয়া বারুদ, গোলা, গুলি ইত্যাদি লুণ্ঠিয়া



লইতে পারে। যিরাট হইতে ইউরোপীয় সৈন্ত না আসিলে তিনি দীর্ঘকাল এই অস্ত্রাগার রক্ষা করিতে পারিবেন না। অস্ত্রাগারের একজন দ্বারবানের উপর উইলোবির সন্দেহ হয়। এই দ্বারবানের নাম করিমবক্স। উইলোবির বিশ্বাস ক্ষণে বে, এই ব্যক্তি শত্রু-পক্ষের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাদের অনিষ্টসাধনের চেষ্টা করিতেছে। এই বিশ্বাসে উইলোবি আপনার একজন ইউরোপীয় সহযোগীকে আদেশ দিয়াছিলেন যে, যদি করিমবক্স অস্ত্রাগারের দ্বারের দিকে অগ্রসর হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ যেন তাহাকে গুলি করা হয়।

অস্ত্রাগারে আর যে সকল এতদ্বর্ণীয় লোক ছিল, তাহারাও উন্নত সিপাহীদিগের পক্ষসমর্থনে ক্রটি করে নাই। উপস্থিত সময়ে, সকলেই, ইউরোপীয়দিগের বিরুদ্ধে, অলক্ষ্যভাবে একত্রে গ্রথিত হইয়াছিল; এক আশঙ্কা, এক চিন্তা, এক অশ্রুভৃতি ও এক ধারণা, সকলকেই এক করিয়া তুলিয়াছিল। সে সময়ে অনেক ইঙ্গরেজ পূর্বে ইহা বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু যখন ভয়ঙ্কর সময় উপস্থিত হইল, তখন তাহারা বুঝিতে পারিলেন যে, এক সময়ে তাহারা তাঁহাদের অধীনে শাস্ত্রভাবে কার্য্য করিয়াছিল, শাস্ত্রভাবে তাঁহাদের নিকট সৌজন্য ও নম্রতার পরিচয় দিয়াছিল। তাহারা সকলেই এখন তাঁহাদের বিরুদ্ধে সমুখিত হইয়াছে, এবং সকলেই পরস্পর একতাসম্পন্ন হইয়া এক উদ্দেশ্যসাধনের ক্ষম প্রস্তুত রহিয়াছে।

অস্ত্রাগারে বে ৯ জন ইঙ্গরেজ ছিলেন, তাহারা আত্মরক্ষা করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন, এবং যিরাট হইতে নীচ সাহায্য পাওয়া যাইবে তাবিয়া আশস্তরুদয়ে আপনাদের কর্তব্য কার্য্যে যনোনিবেশ করিলেন। অস্ত্রাগারের দ্বার রুদ্ধ হইল। রুদ্ধ দ্বারদেশে গোলাপূর্ণ

কামান সকল সাজাইয়া রাখা হইল। এক এক জন আশুন হাতে করিয়া এই সজ্জিত কামানের কাছে দাঁড়াইয়া রহিলেন। এই কাজ শেষ হইলে যে গৃহে বাকুদ ছিল, সেই গৃহ হইতে অস্ত্রাগারের প্রাঙ্গণস্থিত একটি বৃক্ষ পর্যন্ত মাটির নীচে বাকুদ সাজাইয়া রাখা হইল। এইখানে অস্ত্রাগারের স্থলি নামক একজন কন্সটারী দাঁড়াইয়া রহিলেন। অনুরে বকুলি নামক উইলোবির একজন সহকারী শেষ আদেশ জানাইবার জন্ত দণ্ডায়মান থাকিলেন। যদি আর কোন উপায় না থাকে, তাহা হইলে উইলোবির আদেশে বকুলি সাহেব টুপি খুলিয়া হৈদিত করিবাশ্রয়, মৃত্তিকার নিম্নস্থিত বাকুদে আশুন লাগাইয়া সমস্ত অস্ত্রাগার উড়াইয়া দেওয়া হইবে, এইরূপ বন্দোবস্ত করা হইল। স্থলি উইলোবির এই শেষ আদেশ পালনের জন্ত মৃত্তিকার নিম্নস্থ সেই সজ্জিত বাকুদের নিকট রহিলেন।

যখন অস্ত্রাগারের ইঞ্জরেজ রক্ষকগণ এইরূপ বন্দোবস্ত করিতে ছিলেন, তখন বিপক্ষদিগের কয়েকজন আসিয়া দিল্লীর সম্রাটের নামে অস্ত্রাগার তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিতে কহিল। ইঞ্জরেজ রক্ষকগণ কোন উত্তর দিলেন না, নীরবে ঐ কথার প্রত্যাখ্যান করিলেন। ইহার পর আরও অনেকে আসিয়া কহিতে লাগিল যে, সম্রাট অস্ত্রাগারের দ্বার খুলিয়া দিতে আদেশ দিয়াছেন, অস্ত্রাগারে যে সকল যুদ্ধোপকরণ রহিয়াছে, তৎসমুদয় তিনি সৈনিকদিগের হস্তে সমর্পণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। কিন্তু উইলোবি এ কথারও কোন উত্তর দিলেন না। তিনি নীরবে আশ্রয়কার উপায় দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে বিপক্ষগণ দলবদ্ধ হইয়া অস্ত্রাগারের প্রাচীরের নিকট দাঁড়াইল এবং প্রাচীরের গায়ে কতকগুলি মহি



ফেলিয়া দিল। অস্ত্রাগারের অভ্যন্তরে যে সকল প্রতিক্ষেপ্য কর্মচারী ছিল, তাহারা অবিলম্বে অস্ত্রাগারের ছোট ছোট ঢালু ছাদ দিয়া প্রাচীরের উপর উঠিল, এবং অপরপাশস্থিত মহি দিয়া নীচে নামিয়া আক্রমণকারীদিগের দলে মিশিল।

ইঙ্গরেজ রক্ষকগণ এমন কালবিলম্ব না করিয়া বিপক্ষদিগের উপর গোলাবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। গোলায় পর গোলা আসিয়া বিপক্ষদলে পড়িতে লাগিল। বিপক্ষেরাও এই বাধা অতিক্রম করিতে লাগিল। তাহাদের নিক্ষিপ্ত গুলিও রক্ষকদিগের বাহুভেদ করিতে লাগিল। ৯ জন ইঙ্গরেজের মধ্যে ২ জন আহত হইলেন। এ দিকে আক্রমণকারীগণ অবিশ্রান্ত গুলিবৃষ্টি করিতেছিল। তাহারা কিছুতেই নিরস্ত হইল না। অনেকে অমুমান করেন যে, মিরাটের ১১গণিত ও ২০গণিত সৈনিকদলই প্রধানতঃ এই কার্য সাধন করিতেছিল; দিল্লীর ৩৮গণিত সৈনিকদিগেরও অনেকে ইহাদের সহিত মিলিত হইয়াছিল। যাহা হউক, আক্রমণকারীগণ এক্রপ অবলম্বেগে গুলিবৃষ্টি করিতে লাগিল যে, ইঙ্গরেজ রক্ষকগণ আর কিছুতেই সেই আক্রমণের গতি বোধ করিতে পারিলেন না। তাহাদের শেষ উদ্যম পূর্ণাঙ্গ হইল। তাহারা আর অন্য উপায় না দেখিয়া আপনাদের শেষ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিতে উদ্যত হইলেন। উইলোবি অবিলম্বে ইঙ্গিত করিলেন। ইঙ্গিত করামাত্র বকুলি মাধার টুপি খুলিয়া স্বলিকে দেখাইলেন। স্বলি নিভীকচিত্তে সজ্জিত বাকুধে আগুন দিলেন। মুহূর্তমধ্যে ঘোরতর শব্দের সহিত অস্ত্রাগার ভুটিয়া উঠিল।

এই ভয়ঙ্কর ঘটনায় ইঙ্গরেজ কর্মচারীদিগের ৯ জনের মধ্যে ৬ জনের প্রাণরক্ষা হইল। উইলোবি একজন সহকারীর সহিত



মেইন গার্ডে উপনীত হইলেন। আর কয়েকজন ভিন্ন দিক্ দিয়া পলাইয়া মিরাট প্রভৃতি নিরাপদ স্থানে পহুছিলেন। কিন্তু যিনি সজ্জিত বাকুদে আগুন দিয়াছিলেন, তাঁহার প্রাণবায়ু উৎকর্ষায়ী ধূমপ্তরের সহিত মিশিয়া গেল। স্বলি অসীমসাহসে ও অগ্নানভাবে প্রজ্জ্বলিত বাকুদে আত্মবিসর্জন করিলেন। এইরূপ অপূর্ব সাহস-সহকৃত আত্মত্যাগে বীরপুরুষের বীরত্বকীর্তি অক্ষয় হইয়া রহিল।

রজনীকান্ত গুপ্ত।

— — —



বুদ্ধচরিত

জাতকে লিখিত আছে যে, সিদ্ধার্থ আষাঢ় মাসে পূর্ণিমা তিথিতে পিতৃগৃহ হইতে অভিনিষ্ক্রমণ করেন। সেই রাত্রিতে তাঁহার রাজ্যের সীমা অতিক্রম করিয়া অনেক বোজন দূরে অনোমা নামক নদীর তীরে আসিয়া পৌঁছিলেন। সেখানে অথ হইতে নামিয়া রাজমুকুট দূরে ফেলিয়া দিলেন, ও অঙ্গ হইতে মণিমুক্তা আভরণ সকল গুলিয়া ছন্দকের হস্তে দিয়া কহিলেন, “ছন্দক, এই সমস্ত আভরণ নাও, আর কণ্টককে লইয়া বাড়ী ফিরিয়া যাও ; আমি এ স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম।” ছন্দক বিস্তর অশ্রুনয়-বিনয় করিয়া কহিল, “প্রভু ! আমাকে ফিরাবেন না, আমিও গৃহত্যাগী হইয়া আপনার অশ্রুগামী হইব।” কিন্তু সিদ্ধার্থ তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া, তাহাকে ফিরিয়া যাইতে পুনঃ পুনঃ আদেশ করিলেন ; বলিলেন, “তোমার এখনও সন্ন্যাস-গ্রহণের সময় হয় নাই, তুমি না ফিরিলে আমি কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছি মনে করিয়া আমার পিতা ও বাড়ীর আর সকলে কি ভাবিবেন। তুমি যাও, এবং রাজবাটীর সকলকে বল আমার সমস্তই মঙ্গল। আমি বহুকাল ধরিয়া যে প্রতিক্ষা হৃদয়ে পোষণ করিয়াছি, এক্ষণে তাহা পালন করিতে চলিলাম, আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইলেই আমি বাড়ী ফিরিব, আমার ভক্ত কেহ বেন চিন্তাকুল না হন।”



কুমারের আদেশক্রমে ছন্দক অগত্যা অথ ও আভরণ লইয়া শৌকার্ত্তহৃদয়ে রাজ্যভবনে ফিরিয়া গেল, এবং রাজাকে সংবাদ দিল যে, যুবরাজ গৃহত্যাগী হইয়া সন্ন্যাসিবেশে কোথায় চলিয়া গেলেন, তাহার কোন ঠিকানা নাই।

গৌতম ছন্দককে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া আশ্রম হইতে আশ্রমান্তরে বিশ্রাম করত পরিশেষে যগধ-রাজধানী রাজগৃহে আসিয়া উপস্থিত হন। বিধিসার তখন ঐ প্রদেশের প্রবলপ্রতাপ নরপতি ছিলেন। সিদ্ধার্থ নগরে তিফা করিয়া নিজের আহার সংগ্রহ করিতেন। তাঁহার শরীরে অলোকসামান্য তেজঃপুঞ্জদৃষ্টে নাগরিকেরা অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিল। এই নবীন সন্ন্যাসীর আগমনবার্তা রাজসভা পর্গান্ত পৌছে। বিধিসার একদিন প্রাতঃকালে বহু পরিজন-সমভিষায়াহারে বহুল্য ভেট লইয়া সিদ্ধার্থের সমীপে উপস্থিত হন। তিনি তাঁহার স্ববিনল দেহকান্তি-দর্শনে বিমোহিত হইলেন। পরে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “প্রভু! আপনার দর্শন লাভ করিয়া আমি পরম প্রমুদিত হইয়াছি। আপনি আমার সহকারী হউন। যদি আপনি আমার অনুবর্তী হন, আপনি এই অতুল ঐশ্বর্যের অধীশ্বর হইবেন। আপনি যাহা চান, সকলই পাইবেন।” তৎপরে তাঁহাকে বহুবিধ মূল্যবান সামগ্রী উপঢৌকন দিয়া কহিলেন, “আমার সঙ্গে আসুন, এই হৃর্ত্ত কাম্যবস্ত্রসকল উপভোগ করিয়া সুখী হইবেন।” এই সাধুকে গৃহহ্যাত্রমে ফিরাইয়া আপনার পার্শ্বে করিয়া লইবার অভিপ্রায়ে রাজা এইরূপ অশেষ প্রলোভন দেখাইতে লাগিলেন। সিদ্ধার্থ মধুর প্রিয় বাক্যে উত্তর করিলেন, “মহারাজ! আপনার সর্বথা মঙ্গল হউক, এই সকল ভোগ্য বিবর আপনারই থাকুক, আমি কোন



কাম্যবস্তুর প্রার্থী নহি। বিবর-বাসনা আমার চিত্ত হইতে সম্পূর্ণ-রূপে তিরোহিত হইয়াছে। আমার লক্ষ্যস্থান স্বতন্ত্র।” পরে তিনি রাজার নিকট আশ্রয়পরিচয় দিয়া বলিলেন, “কপিলবস্তুর রাজা শুদ্ধোদন আমার পিতা। বুদ্ধ হু লাভের আশয়ে আমি পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছি।” বিধিসার তখন বলিলেন, “স্বামিন্, আমি তবে বিনায় হই। আপনি যদি ভবিষ্যতে বুদ্ধ হু লাভ করেন, আমি আপনার ধর্মের আশ্রয় লইব।” এই বলিয়া বিধিসার তাঁহার চরণ বন্দনা করিয়া রাজভবনে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। রাজার সহিত সিকার্থের এই প্রথম পরিচয়। এক্ষণে তিনি বোধিসত্ত্ব বুদ্ধ হু লাভের পর তাঁহাদের পুনর্মিলন হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার অভীষ্ট-সিকির নানা উপায় অব্যবহা করিতে লাগিলেন।

রাজগৃহ ভাগীরথীর রমণীয় অধিত্যকায় অবস্থাপিত এক অপূর্ণ সাধনক্ষেত্র। বিদ্যাচলের উত্তরস্থ পক্ষ শৈলখণ্ডে পরিবেষ্টিত, বাহিরের উপগ্ৰব হইতে সুরক্ষিত, প্রকৃতির শোভা-সৌন্দর্য্যে পরিবৃত্ত, বিজ্ঞানতামূলক অথচ নগরীর সম্মিকর্যবশতঃ শিক্ষার-সংগ্রহের অশুকুল ইত্যাদি কারণে, ঐ সকল গিরিগুহায় বহুসংখ্যক সন্ন্যাসী বাস করিত। তাঁহাদের মধ্যে আলাড় কলম ও রুদ্রক নাযক দুইজন খ্যাতনামা ব্রাহ্মণ উপাধ্যায়ের সঙ্গে গৌতমের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মে। প্রথমে তিনি আলাড় কলমের নিকট গমন করেন। আলাড়ের তিন শত শিষ্য ছিল। গৌতম তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া তাঁহার নিকটে দর্শন ও ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, কিন্তু সে শিক্ষায় তিনি তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন নাই। পরে তিনি রুদ্রকের নিকট কিছু কাল ধর্মশিক্ষা করেন। তাঁহাও



তাহার মনঃপূত হইল না। এই ছই গুরুপদটি স্থানমার্গে তাহার অভ্যস্তিত গম্যস্থানে পৌছিতে না পারিয়া, তিনি সিদ্ধিলাভের অন্য পন্থা অবলম্বন করিতে কৃতশিচর হইলেন।

পুরাকাল হইতে ভারতবর্ষে এই একটি সংস্কার বদ্ধমূল আছে যে, তপশ্চর্য্যার দ্বারা দেবতাদেরও সমকক্ষ হওয়া সম্ভব হয়, এবং নৈবশক্তি, অন্তর্দৃষ্টি-লাভ ও প্রভূত পুণ্যসঞ্চয় করা যায়। আলাড় ও রুদ্ধকের নিকটে দর্শন শিক্ষা করিয়াও গৌতম যখন সম্ভাব লাভ করিতে পারিলেন না, তখন তিনি স্থির করিলেন যে, একান্তে অবস্থানপূর্ব্বক সেই লোকবিক্রম পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া তাহার চূড়ান্ত সীমা পর্য্যন্ত গিয়া দেখিবেন তিনি কি ফল লাভ করিতে পারেন। তদনুসারে তিনি বর্তমান বুদ্ধগয়ায় মন্দিরের মন্দির উকবেলা বনে গমন করিয়া নৈরঞ্জনা নদীতীরে পাঁচজন অমুরক্ষ শিল্পের সাহচর্য্যে ছয় বৎসর বাবৎ ঘোরতর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন। “শূন্যে আলম্বিত বৃহৎ ঘণ্টাধারিত জায়” তাহার এই তপস্তার খ্যাতি চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া গেল। এই কঠোর তপশ্চরণে তাহার মুখবিবর ও নাসিকারন্ধ্র হইতে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিরুদ্ধ হইল। ক্রমে তাহার কর্ণচ্ছিন্ন রক্ত হইল। তিনি তাহার আহার সংযত করিয়া আনিলেন, এমন কি শেষে একটিমাত্র তুণ্ড ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিতেন, এবং এইরূপ উপবাস ও শরীর-শোষণে অস্থিচর্ম্মসার হইয়া গেলেন। অবশেষে একদিন চিন্তামগ্ন চিত্রে ধীরে ধীরে পদচারণা করিতে করিতে তিনি হঠাৎ মুচ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। শিষ্যদিগের মধ্যে কেহ কেহ মনে করিল যে, তাহার বথার্থই মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু ক্রমে তিনি সংজ্ঞা লাভ করিলেন। এই



অবস্থায় একটি রাখাল বালক তাঁহাকে এক বাজী হুগ্ধ আনিয়া দিল, সেই হুগ্ধ পান করিয়া তিনি কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইলেন। এই প্রকার তপশ্চর্য্যার দ্বারা কাঙ্ক্ষিত ফললাভে হতাশ হইয়া পূর্ব্ববৎ নিয়মিত আহারাদি করিতে লাগিলেন, এবং তপস্তার সংকল্প ত্যাগ করিলেন। এই সঙ্কটে-সময়ে, “যখন তাঁহার পক্ষে অপরের সমবেদনা বিশেষ আবশ্যক ছিল, যখন অমূৰ্খস্বভাবের প্রীতি, ভক্তি ও উৎসাহবাক্য তাঁহার সম্মুখাচ্ছন্ন চিত্তে বল দিতে পারিত, তখন তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া বারণসী চলিয়া গেল। তপশ্চরণ পরিত্যাগ করার দরুন তিনি তাহাদের শ্রদ্ধা হারাষ্টলেন, এবং এই দারুণ দুঃসময়ে তিনি তাহাদের কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া বিকলতার ভীত জালা একাকী সন্ধ্যা করিতে বাধ্য হইলেন।”

এই অসহায় অবস্থায় তিনি নৈরন্তর্য্যাতীত্রে একাকী ভ্রমণ করিতে করিতে নিকটস্থ এক অরণ্য বৃক্ষতলে গিয়া ধ্যানমগ্ন হন। ইহার অব্যবহিতপূর্বে পার্শ্ববর্তী পল্লীবাসিনী সূজাতা নাম্নী একটি মাধবী রমণী এই বনে আগমন করেন। সূজাতা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন—“আমার একটি শিশু-সন্তান হইলে বনদেবতার নিকট পূজা দিব।” যখন তিনি এই ঘোরতর উপোষণাদি কৃচ্ছ্রসাধনে নিয়মান্ত তপস্বীকে দেখিলেন, তিনি তাঁহাকে বনদেবতা ভাবিয়া তাঁহার সম্মুখে ভেট লইয়া আসিলেন। সিদ্ধার্থ জিজ্ঞাসা করিলেন, “বাছা, কি আনিয়াছ ?” সূজাতা কহিলেন, “আমি আপনার জন্ত এই পরম উপাদেয় পরমার আনিয়াছি, ভগবন্। সত্যপ্রসূত শত গাভীহৃদে আমি পঞ্চাশট গাভী পোষণ করিবাছি, তাহাদের হৃদে পচিশ, তাহাদের হৃদে আবার বারোটি গাভী



পরিপুষ্ট। এই দ্বাদশ গাভীর দুগ্ধ পান করাইয়া আমার পালের মধ্যে ছয়টি ভাল ভাল গরু বাছিয়া তাহাদের দুধ দুহিয়া লই। সেই দুগ্ধ উৎকৃষ্ট তণ্ডুলে সুগন্ধি মশলা দিয়া পাক করিয়া আনিয়াছি। আমার ব্রত এই যে, দেবতার অনুগ্রহে আমার একটি পুত্র-সন্তান জন্মিলে এই অন্ন উৎসর্গ করিয়া দেবার্চনা করিব। প্রভু! এখন সেই পরমায় লইয়া আপনার নিকট আসিয়াছি, প্রসন্ন হইয়া গ্রহণ করুন।” সিদ্ধার্থ সুজাতাকে আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন, “তুমি যেমন তোমার ব্রত পালন করিয়া সুখী হইয়াছ, সেইরূপ আমিও যেন আমার জীবনব্রত সাধন করিতে সক্ষম হই।” এই দুগ্ধপানে তিনি শরীরে বল পাইয়া পূর্কোক্ত বৃক্ষতলে গিয়া যোগাসনে আসীন হইলেন। সেই রাত্রিতে ঐ বৃক্ষতলে সমাধিহ হইয়া তিনি দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া প্রবুদ্ধ হইলেন। সেই অবধি ঐ বৃক্ষ ‘বোধিবৃক্ষ’ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিল।

বোধিসত্ত্ব যখন নৈরঞ্জনাভীরে বোধিবৃক্ষমূলে যোগাসনে আসীন হন, তখন তিনি এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেন —

ইহাসনে শুদ্ধত্ব মে শরীরং ।
 ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ক যাতু ॥
 অপ্রাপ্য বোধিং বহুকরতুলভাং ।
 নৈবাসনাং কায়মতচলিষ্যতে ॥

এ আসনে দেহ মম যাক্ শুকাইয়া,
 চর্ম অস্থি মাংস যাক্ প্রলয়ে ডুবিয়া ।

না লভিয়া বোধিজ্ঞান দুর্লভ জগতে,
টলিবে না নেহ মোর এ আসন হ'তে ।

এই আসনে বসিয়া বোধিসত্ত্বের দিবাচক্ষু প্রস্ফুটত হইল ।
তিনি তত্ত্বজ্ঞানের সাফাৎ দর্শন লাভ করিলেন । তিনি বৃক্ষতলে
ধ্যানযোগে জগত্তর বে কার্য্যকারণশৃঙ্খল প্রত্যক্ষ করিলেন,
তাহা এই,—

অবিজ্ঞা হইতে সংস্কার ।
সংস্কার হইতে বিজ্ঞান (Consciousness) ।
বিজ্ঞান হইতে নামরূপ ।
নামরূপ হইতে বড়ায়তন (অর্থাৎ মন ও পঞ্চেন্দ্রিয়) ।
বড়ায়তন হইতে স্পর্শ ।
স্পর্শ হইতে বেদনা ।
বেদনা হইতে তৃষ্ণা ।
তৃষ্ণা হইতে উপাদান (আসক্তি) ।
উপাদান হইতে ভব ।
ভব হইতে জন্ম ।
জন্ম হইতে রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু, দুঃখ ও যন্ত্রণা ।

অবিজ্ঞাই সকল দুঃখের মূল । অবিজ্ঞা-নাশে সংস্কার বিনষ্ট
হয় ; পরে নামরূপ, বড়ায়তন, স্পর্শ, তৃষ্ণা, আসক্তি প্রভৃতি
পর্য্যায়ক্রমে বিনষ্ট হইলে জন্মবন্ধন ছিন্ন হয় ; পরিশেষে জন্ম,
মৃত্যু, রোগ, শোক, সর্ব্ব দুঃখ বিদূরিত হয় । এইরূপে দুঃখের
মূলকারণ ও মূলচ্ছেদ বুদ্ধদেব ধ্যানযোগে সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিলেন ।
তিনি দেখিতে পাইলেন যে, অবিজ্ঞা বা অজ্ঞানই আমাদের



সকল দুঃখের কারণ, এবং অবিত্তার অপগমেই দুঃখের সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়।

বোধিসত্ত্ব যে মুহূর্তে জগতের দুঃখের উৎপত্তি ও নিরোধের এইরূপ প্রণালী নিষ্কারণ করিলেন, সেই মুহূর্ত হইতেই তিনি 'বুদ্ধ' এই নাম ধারণ করেন।

বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াই তিনি নিম্নোক্ত উদ্যান গান করিয়া-
ছিলেন,—

অনেকজাতিসংসারঃ সন্ধাবিস্‌সন্‌ অনিবিবসন্‌
গহকারকং গবেসন্তো দুঃখাজ্জাতি পুনরুনং ।
গহকারক দিট্ঠোমি পুন গেহং ন কাহসি
সন্ধাতে ফাঙ্ককা ভগুগা গহকূটং বিসংখিতং
বিসংখারগতং চিত্তং তণ্‌হানং খরমজ্জগা ।

জন্মজন্মান্তর পথে ফিরিয়াছি, পাইনি সন্ধান,
সে কোথা গোপনে আছে, এ গৃহ যে করেছে নির্মাণ ।
পুনঃ পুনঃ দুঃখ পেরে দেখা তব পেয়েছি এবার,
হে গৃহকারক ! গৃহ না পারিবি রচিবারে আর ;
ভেঙেছে তোমার স্তম্ভ, চূরমার গৃহভিত্তিচয়,
সংসার-বিগত চিত্ত, তুমি আজি পাইয়াছে কয়

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ।



মহাকাব্যের লক্ষণ

ইংরাজি এপিক্-শব্দের অনুবাদে মহাকাব্য-শব্দের প্রয়োগ চলিয়া আসিতেছে ; কিন্তু এপিকের সমস্ত লক্ষণের সহিত মহাকাব্যের সমস্ত লক্ষণ মিলে কি না, তাহা বলিতে পারি না। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে আমার কিছুমাত্র জ্ঞান নাই, কিন্তু শুনিয়াছি যে, অলঙ্কারিকেরা মহাকাব্যের লক্ষণ যেরূপ সূক্ষ্মভাবে বাধিয়া দিয়াছেন, তাহাতে মহাকবিগণের চিন্তার কারণ কিছুই রাখেন নাই। কালিদাস, ভারবি, মাঘ প্রভৃতি কবিগণের রচিত মহাকাব্য এ দেশে চলিত আছে, এবং ঐ সকল মহাকাব্য সম্ভবতঃ অলঙ্কারশাস্ত্রসম্মত মহাকাব্য। রামায়ণ ও মহাভারত, এই দুই গ্রন্থকে মহাকাব্য বলা চলে কি না, তাহা লইয়া একটা ভূয়ল সমস্তা গোড়াতেই দাঁড়ায়। ইংরাজি পুস্তকে রামায়ণ ও মহাভারত এপিক্ বলিয়া নির্দিষ্ট হয়, কিন্তু আমাদের পণ্ডিতেরা উহাদিগকে মহাকাব্য বলিতে সন্ধান সন্মত হন না। প্রথমতঃ এ দুই গ্রন্থ অলঙ্কারশাস্ত্রের নিয়মাবলী অত্যন্ত উৎকটরূপে লঙ্ঘন করিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ মহাকাব্য বলিলে উহাদের গৌরবহানির সম্ভাবনা জন্মে। ইতিহাস, পুরাণ, ধর্মশাস্ত্র ইত্যাদি আখ্যা দিলে বোধ করি এই দুই গ্রন্থের মর্যাদা রক্ষা হইতে পারে। কিন্তু মহাকাব্য বলিলে উহাদের মাহাত্ম্য খর্ব্ব করা হয়।

বস্তুতঃই মাহাত্ম্য খর্ব্ব করা হয়। কুমারসম্ভব ও কিরাতার্জুনীয় বে অর্থে মহাকাব্য, রামায়ণ-মহাভারত কখনই সে অর্থে মহাকাব্য



নহে। কুমারসম্ভব, কিরাতার্জুনের যে শ্রেণীর-যে পর্যায়ের গ্রন্থ, রামায়ণ-মহাভারত কখনই সে শ্রেণীর—সে পর্যায়ের গ্রন্থ নহে। একের নাম মহাকাব্য দিলে, অত্ৰকে মহাকাব্য বলা কিছুতেই সম্ভব হয় না।

রামায়ণ-মহাভারতের ঐতিহাসিকের ও ধর্মশাস্ত্রের সম্পূর্ণ আব্দাবান থাকিয়াও আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, উহাতে কাব্যরসও যথেষ্ট পরিমাণে বিস্তৃত। মহাবি বাখ্যাক ও কৃষ্ণদ্বৈপায়নের মুখ্য উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক, উহার যাতা লিখিয়া ফেলিয়াছেন, তাহাতে প্রচুর পরিমাণে কবিত্ব রহিয়া গিয়াছে,— হয় ত উহাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে রহিয়া গিয়াছে; কিন্তু কবিত্ব যে আছে, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ করিবার উপায় নাই।

রামায়ণ-মহাভারতে কবিত্বের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে গেলেই, মহাবিদ্বদকে মহাকবি ও উহাদের কাব্যদ্বয়কে মহাকাব্য না বলিলে চলে না কেন না, ভাবিতে আর কোন শক নাই, যদ্বারা এই কাব্যদ্বয়ের সম্ভব নামকরণ চলিতে পারে। কুমার-সম্ভব-কিরাতার্জুনকে আপাততঃ মহাকাব্যের শ্রেণী হইতে খারিজ করিয়া দিয়া আমরা রামায়ণ-মহাভারতকেই মহাকাব্য বলিয়া গ্রহণ করিলাম।

মনে হইতেছে মেকলে কোথায় বলিয়াছেন, সভ্যতার সহিত কবিত্বের কতকটা খাদ্য-খাদক বা অহি-নকুল সম্বন্ধ রহিয়াছে। সভ্যতা কবিত্বকে গ্রাস করে; অথবা সভ্যতার আওতায় কবিতার লতা বাড়িতে পার না। বলা বাহুল্য, মেকলের অনেক উক্তিই মত এই উক্তিটিকেও সুদীর্ঘনে উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। বিগত ঊনবিংশ শতাব্দীতে সভ্যতার আশ্চালন



সবেরও ইউরোপখণ্ডে কবিত্বের বৈশিষ্ট্য দেখা গিয়াছে, তাহাই তাহার প্রমাণ। অল্প প্রমাণের প্রয়োজন নাই।

কিন্তু আমার বোধ হয় মেকলের ঐ উক্তির ভিতর একটু প্রচ্ছন্ন সত্য আছে। সভ্যতা কবিত্বের যন্তক চর্চণ না করিতে পারে, কিন্তু মহাকাব্যকে বোধ করি সশরীরে গ্রাস করিয়া ফেলে। আবার বলা আবশ্যক, মহাকাব্য-শব্দ আমি আলঙ্কারিক সম্মত অর্থে ব্যবহার করিতেছি না। রঘুবংশ, কুমারসম্ভব ও প্যারাডাইস্ লস্টকে আমি এ স্থলে মহাকাব্যের মধ্যে ফেলিতেছি না। রামায়ণ-মহাভারত যে পর্যায়ের কাব্য, সেই পর্যায়ের কাব্যকেই আমি মহাকাব্য বলিতেছি। পৃথিবীতে কত কবি কত কাব্য লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন, কিন্তু মহাকাব্য সেই কোন্ কালে রচিত হইয়া গিয়াছে, তাহার পর আর একখানাও রচিত হইল না। পাশ্চাত্য কাব্যসাহিত্যে লেখকের কিছুমান ব্যুৎপত্তি নাই; কিন্তু সন্দেহ হয়, কেবল হোমারের নামে প্রচলিত গ্রন্থ দুইখানি ব্যতীত আর কোন কাব্যকে রামায়ণ-মহাভারতের সমান পর্যায়ে স্থান দেওয়া বাইতে পারে না। পাশ্চাত্য দেশে সভ্যতাবৃদ্ধির সহিত কবিত্বের অবনতি হইয়াছে, এ কথা কেহই বলিতে পারিবেন না; কিন্তু শেক্সপীয়ারের নাম মনে রাখিয়াও অকুতোভয়ে বলা বাইতে পারে, ইউরোপ-মহাদেশেও একবারের বেশী হোমারের জন্ম হয় নাই।

বস্তুতঃই পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে ও সভ্যতার ইতিহাসে কোন্ প্রাচীনকালে বান্দীকি, ব্যাস ও হোমারের উদ্ভব হইয়াছিল; তাহার পর কত-হাজার বৎসর অতীত হইয়া গেল, কিন্তু মহাকাব্যের আর উৎপত্তি হইল না। কেন এরূপ হইল, তাহার

কারণ চিন্তনীয় ; কিন্তু সেই কারণ আবিষ্কারে লেখকের ক্ষমতা নাই। তবে এক একবার মনে হয়, যুগ্মসমাজের বর্তমান অবস্থা বোধ করি আর সেই শ্রেণীর মহাকাব্য উৎপাদনের পক্ষে অসুকূল নহে।

রামায়ণ-মহাভারত ও হোমারের মহাকাব্যে আমরা যুগ্ম-সমাজের যে চিত্র অঙ্কিত দেখি, তাহাতে সেই সমাজকে আধুনিক হিসাবে সভ্য বলিতে পারা যায় না। যুগ্মসমাজের সে অবস্থা আবার কখনও ফিরিয়া আসিবে কি না, তাহা জানি না ; কিন্তু তাত্‌কালিক সমাজে যে সকল ঘটনা প্রতিদিন সংঘটিত হইত, সমাজের বর্তমান অবস্থায় তাহা ঘটিতে পারে না। আমরা এমন কল্পনায় আনিত্তে পারি না যে, আমেরিকার যুক্তরাজ্যের সভাপতি কোন ইউরোপের রাজসভায় আতিথ্য-স্বীকার করিয়া অবশেষে রাজলক্ষীকে ঈশ্বরে তুলিয়া প্রস্থান করিতেছেন, ও তাহার প্রতিশোধগ্রহণার্থ ইউরোপের নরপালবর্গ ওয়াশিংটন অবরুদ্ধ করিয়া দশ বৎসরকাল বসিয়া আছেন। ডিলারী বন্দীকৃত লর্ড মেথুয়েনকে গাড়ীর চাকায় বাধিয়া দক্ষিণ-আফ্রিকার বহুর উপত্যকায় ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইতেছেন, ইহা কোন দিনের টেলিগ্রামে দোঁখবার কেহ আশা করেন নাই। সিডান্-ক্ষেত্রে বিসমার্ক লুই নেপোলিয়নকে হস্তগত করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার বুক চিরিয়া নেপোলিয়ন-বংশের শোণিতের আবাদগ্রহণ আবশ্যক বোধ করেন নাই। ত্রেতাযুগ-অবসানের বহুদিন পরে ব্যরদেশে লঙ্কাকাণ্ডের অপেক্ষাও তুমুল ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু কোন বিজয়ী মহাবীরকে তজ্জল লাস্ত্রুলের ব্যবহার করিতে হয় নাই।



সেকালের এই অসত্যতা আমাদের চোখে বড়ই বীভৎস
ঠেকে সন্দেহ নাই, কিন্তু সেকালের সামাজিকতার আর একটা
দিক আছে, একালে সে দিকটাও তেমন দেখিতে পাই না।
বার্ক এক সময় আপনার মহাপ্রাণতার খোঁকে বলিয়াছিলেন,
শিভানুরির দিন গত হইয়াছে। শিভানুরি-নামক অনির্বাচ্য
বস্তু নয় বর্ষরতার সহিত নিরাবরণ মনুষ্যদের অপূর্ণ মিশ্রণে
সমুৎপন্ন। একালে মানুষের রক্তপান করিয়া জিঘাংসার
ভূমি করিতে চাহে না বটে, কিন্তু আবার জ্যেষ্ঠভ্রাতার কটাক্ষ-
মাত্রশাসনে, পত্নীর অপমান স্বচক্ষে দেখিয়াও, আত্মসংযমে সমর্থ
হয় কি না, বলা যায় না। একালের রাজারা মালকোচা মারিয়া
যুদ্ধক্ষেত্রে গদাহস্তে অবতীর্ণ হন না সত্য বটে, কিন্তু ভীষ্মভিষ্মস্ত
পিতার একটা কথা রাখিবার জন্য ফিজিওপে নিরাসন গ্রহণ
করিতে প্রস্তুত থাকেন কি না, বলিতে পারি না। অথথাযা
ঘোর নিশাকালে শূখশূখ বালকবৃন্দের হত্যাসাধন করিয়া ভীষণ
ক্রুরতা দেখাইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই, কিন্তু সভা ডাকিয়া ও
খবরের কাগজে প্রবন্ধ লিখিয়া সেই ক্রুরতার সমর্থন তাঁহার
নিতান্তই আবশ্যক হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণসহায় পাণ্ডবগণ যখন
জয়বিষয়ে নিতান্ত হতাশ হইয়া নিশাকালে শত্রুশিবিরে ভীষ্মের
নিকট দীনভাবে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার ভীষ্মকে
তাঁহার জীবনটুকু দান করিতে অমুরোধ করিয়াছিলেন সত্য,
কিন্তু তাঁহাদের লৌহবর্ষের অন্তরালে কারেন্সি নোটের গোছা
লইয়া যাওয়া আবশ্যক বোধ করেন নাই।

গত চারি হাজার বৎসরের মধ্যে মনুষ্যসমাজের বাহিরের
মূর্খিটা অনেকটা পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে সত্য, কথা, কিন্তু



তাহার আভ্যন্তরিক প্রকৃতির কতটা পরিবর্তন হইয়াছে, তাহা বলা হুঙ্কর। মনুষ্যের বাহিরের পরিচ্ছদটা সম্পূর্ণ বদলাইয়াছে, কিন্তু মনুষ্যের ভিতরের গঠন অনেকটা একরূপই আছে। সেকালের রাজারাজড়াও বোধ করি সমগ্রমত কোপীনধারী হইয়া সভামধ্যে বাহির হইতে লজ্জিত হইতেন না, কিন্তু এখনকার অন্নহীন শ্রমজীবীরাও সমস্ত অঙ্গের মালিন্য ও বিকৃপতা পোষাকের আচ্ছাদনে আবৃত রাখিতে বাধ্য হয়। সেকালে কুরতা ছিল, বর্করতা ছিল, পাশবিকতা ছিল এবং তাহা নিতান্ত নগ্ন নিরাবরণ অবস্থাতেই ছিল। তাহার উপর কোন আচ্ছাদন, কোনরূপ পালিশ, কোনরূপ রঙ-ফলানো ছিল না। একালেও কুরতা, বর্করতা ও পাশবিকতা হয় ত ঠিক তেমনি বর্তমান আছে, তবে তাহার উপর একটা কৃত্রিম ভণ্ডামির আবরণ স্থাপিত হইয়া তাহার বীভৎস ভাবকে আচ্ছন্ন রাখিয়াছে। সম্প্রতি চীনদেশে সভ্য ইউরোপের সম্মিলিত সেনা যে পরাক্রম প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছে, তাহাতে আটলা ও জর্জিস্ খাঁর প্রেতাত্মার আর লজ্জিত হইবার কোন কারণই নাই।

বস্তুতঃই চারি হাজার বৎসরের ইতিহাস সুস্পষ্টভাবে তুলাইয়া দেখিলেই বুঝা যায়, মনুষ্যচরিত্র অধিক বদলায় নাই; তবে সমাজের নুর্দিটা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে, এবং মনুষ্য-সমাজের অবস্থা যে কাব্যগ্রন্থে প্রতিকলিত হইয়া থাকে, সেই কাব্যের মূর্তিও যে তদনুসারে পরিবর্তিত হইয়া যাইবে, তাহাতে বিশ্বাসের কারণ নাই। বিশ্বাসের কারণ থাক্ আর নাই থাক্, আধুনিক কালের সাহিত্যে বাস্তবিক, ক্যাস ও হোমারের আর আবির্ভাব হয় নাই, এবং আর যে কখনও হইবে, তাহা



আশা করাও ছকর। সাহিত্যে মহাকাব্যের যুগ বোধ হয় অতীত হইয়া গিয়াছে। কালের যখন অবধি নাই ও পৃথ্বী যখন বিপুল, তখন বড় কবির ও কাব্যের অসম্ভাব কখন হইবে না; কিন্তু মনুষ্যসমাজের সেই প্রাচীন অবস্থা কিরিয়া আসিবার যদি সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলে মহাকবির ও মহাকাব্যের বোধ করি আবির্ভাব আর হইবে না।

বস্তুতঃই আর আবির্ভাবের আশা নাই। মহাকাব্যের মধ্যে একটা উন্মুক্ত অকৃত্রিম স্বাভাবিকতা আছে, তাহা বোধ করি আর কখনও ফিরিয়া আসিবে না। সুনিপুণ শিল্পী একালে ভাস্কর্য্য গড়িতে পারেন, কিন্তু পিরামিডের দিন বুঝি একেবারে চলিয়া গিয়াছে। মহাকাব্যগুলিকে আমরা মহাকাব্য অদ্বিত পিরামিডের সঙ্গে তুলনা করিতে পারি। এক একবার মনে হয়, উহাদিগকে কোন মানবহস্তনির্মিত কৃত্রিম কার্য্যের সহিত তুলনা না করিয়া প্রকৃতির হস্তনির্মিত নৈসর্গিক পদার্থের সহিত উপমিত করা উচিত।

আমাদের ভারতবর্ষের মহাভারতকে এক একবার ভারতবর্ষের হিমাচলের সঙ্গে তুলনা করিতে ইচ্ছা হয়। হিমাচল যেমন তাহার বিপুল পামাণকলেবরের অকদম্বে ভারতবর্ষকে রক্ষা করিতেছে, মহাভারতের বিপুল কলেবর তেমনি ভারতীয় সাহিত্যকে কত সহস্র বৎসরকাল অন্ধে রাখিয়া লালন-পালন ও পোষণ করিয়া আসিতেছে। হিমাচলের বিশাল বক্ষোদেশ হইতে বিনিঃসৃত সহস্র উৎস হইতে সহস্র স্রোতবিনী অমৃত-রসপ্রবাহে ভারতভূমিকে আর্দ্র ও সিক্ত করিয়া ‘সুজলা সুফলা শতভ্রামলা’ পৃথ্বীভূমিতে পরিণত করিয়াছে, সেইরূপ মহাভারতের



যদ্য হইতে সহস্র উপাখ্যান, সহস্র কাহিনী, সহস্র কথা সমগ্র
জাতীয় সাহিত্যের মধ্যে সহস্র দ্বারা প্রবাহিত করিয়া পুণ্যতর
ভানপ্রবাহে জাতীয় সাহিত্যকে চিরহরিৎ রাখিয়া বহুকাণী
লোকের জাতীয় জীবনে পুষ্ট ও কান্তি প্রদান করিয়া আসিতেছে।
ভূতবর্ষে যেমন ত্রিমাচলের ক্রমবিস্তৃত স্তরপরম্পরা পর্যবেক্ষণ
করিয়া তাহার যদ্য হইতে কত বিস্ময়কর জীবনের অস্থিকঙ্কাল
উদ্ধার করিয়া অতীতের নুপুর্নিত কালের কুক্ষি হইতে উন্মোচন
করেন, সেইরূপ প্রত্নতত্ত্ব এই বিশাল গ্রন্থের স্তরপরম্পরা
হইতে ভারতীয় জনসমাজের অতীত ইতিহাসের বিস্তৃত নিদর্শনের
চিহ্ন ধরিয়া ইতিহাসের অতীত অধ্যায় আবিষ্কার করেন।

রামেন্দুসুন্দর ত্রিবেদী।

—



অমঙ্গলের উৎপত্তি

একখানি সাময়িক পত্রে দেখিলাম, লেখক বিগত ভূমিকম্প ঘটনার দুইটি উদ্দেশ্য স্থির করিয়াছেন। প্রথম, বাঙ্গালাদেশের জমিদারেরা গরিব প্রজার উপর অত্যাচার করিয়া থাকেন; সেইজন্য ঈশ্বর তাঁহাদের ঘরবাড়ী ভাঙ্গিয়া, কাহারও বা হাড়গোড় ভাঙ্গিয়া যথোচিত শাস্তি দিলেন। দ্বিতীয়, দুর্ভিক্ষে গরিব লোকের অন্নান্ধ উপস্থিত হইয়াছিল; এখন বহুলোকের ঘরবাড়ীর নির্মাণ-উপলক্ষে বহুতর লোক মজুরি পাইয়া জীবন রক্ষা করিবে, উভয়ই ঈশ্বরের করুণার পরিচয়।

কিন্তু কুটবুদ্ধি লোকে জিজ্ঞাসা করিতে ছাড়ে না, দোষীর সহিত অনেক নির্দোষ ব্যক্তিরও প্রাণ গেল কেন? অমুক বড় লোক প্রজাপীড়ক ছিলেন, ঘরের দেওয়াল পড়িয়া তাঁহার হাড় ভাঙ্গিয়াছে, ইহা সন্দেহ; কিন্তু সেই সঙ্গে অমুক নিরীহ ব্যক্তি, তাহার সুশীলতায় এ পর্য্যন্ত কেহ সংশয় করে নাই, তাহার মাথা চেপ্টা করিয়া দিয়া তাহার অনাথা পত্নীর অন্তর সংহান বন্ধ করা কেন হইল?

এ প্রশ্নের এইরূপ উত্তর দেওয়া হয়। সে ব্যক্তি না হয় নির্দোষ ও নিষ্কলঙ্ক ছিল, কিন্তু তাহার পত্নীর কথা কে জানে? অথবা তাহার দোষ না থাকুক, তার বাপের দোষ ছিল, অথবা পিতামহের দোষ ছিল, অথবা এ জনে দোষ না থাক, পূর্বজনে দোষ ছিল না, তাহা কে বলিল? ব্যাঘ্র মেঘশাবককেও ঠিক এইরূপ বলিয়াছিল।



ইহুদী জাতির বাইবেল-নামক প্রামাণিক ইতিবৃত্তে দেখা যায়, তাহাদের জেহোবা-নামধের ঈশ্বর সমগ্রে সমগ্রে অত্যন্ত কুপিত হইয়া আপন প্রিয়তম জনসমাজের মধ্যে অত্যন্ত হলহুল ঘটাইয়া দিতেন এবং তৈমুরলঙ্গ ও জঙ্গিস খাঁর অবলম্বিত নীতির আশ্রয় করিয়া পাপের শাস্তি আবাল-বৃদ্ধবনিতা সকলের উপর অপকৃপাতি অর্পণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

আজকাল আমাদের দেশে শিক্ষিতসমাজের মধ্যে অনেকে বাইবেলের জেহোবার ছাঁচে ঈশ্বর গঠন করিয়া লইয়াছেন। তাহাদের মুখে ঈশ্বরের পরমকারুণিকতা ও স্থায়পরতা-সম্বন্ধে ঐক্যমুখিত অহরহঃ শুনিতে পাওয়া যায়।

জগতের যেসকল ঘটনা সূর্যদশার চোখে খাঁটি অমঙ্গলরূপে প্রতিভাত হয়, তাহার অভ্যন্তরেও পরমকারুণিক বিদ্যাহৃৎপুঙ্খের যে মঙ্গলময় উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে, সে বিষয়ে সূর্যদশা লোকের কোন সংশয় নাই।

জগতে অমঙ্গলের উৎপত্তির অসুসন্ধানের পূর্বে, প্রথমে অমঙ্গল আছে কি না, ভাবিয়া দেখা উচিত। নতুবা কেহ যদি বলিয়া বসেন, অমঙ্গল আদৌ অস্তিত্বহীন, তাহা হইলে সমুদয় পরিশ্রম পাণ্ড হইবার সম্ভাবনা।

পৃথিবীতে যদি চেতন জীবের অস্তিত্ব না থাকিত, তাহা হইলে ধরাপৃষ্ঠ কম্পিত কেন, সমস্ত ভূমণ্ডল চূর্ণ হইয়া আকাশে বিক্ষিপ্ত হইয়া গেলেও, কাহারও কোনও মাথাব্যথা ঘটিত না এবং ব্যাপারটা মঙ্গল কি অমঙ্গল, তাহা ভাবিবার কোন প্রয়োজনই উপস্থিত হইত না। জগতে জীবের অস্তিত্ব না থাকিলে এবং জীবের আবার সুখদুঃখ সুস্থিতির শক্তি না



ধাকিলে, অমঙ্গল শব্দের অর্থ লইয়া বিচার করিবার অবকাশই উপস্থিত হইত না। অচেতন প্রাণহীন জড় জগতে মঙ্গলও নাই, অমঙ্গলও নাই।

এক দল পণ্ডিত আছেন, তাঁহারা জীব-মধ্যে কেবল মনুষ্যের ইষ্টানিষ্ট হিসাব করিয়া মঙ্গল ও অমঙ্গলের নির্ণয় করিয়া থাকেন। যাহাতে মনুষ্যের ইষ্ট আছে, তাহাই মঙ্গল; যাহাতে মনুষ্যের অনিষ্ট, তাহাই অমঙ্গল। ইহাদের ভাবটা এই,—এই প্রকাণ্ড জগৎ তাহার বৈচিত্র্য লইয়া মানুষের ভোগের জন্যই বর্তমান রহিয়াছে; মনুষ্য জগৎকে উপভোগ করিতেছে বলিয়াই জগতের অস্তিত্ব সার্থক; মনুষ্যের ভোগের উপযুক্ত না হইলে কোনও পদার্থের কোনও প্রয়োজন থাকিত না। সৃষ্টিকর্তা মানুষের ভোগের জন্যই এতটা পরিশ্রম করিয়াছেন; তাঁহার সৃষ্ট পদার্থসমূহের মধ্যে যাহা মানুষের সুখবিধানে যত সাহায্য করে, তাহার অস্তিত্ব ততদূর সার্থক এবং সৃষ্টিকর্তার চেষ্টা ততদূর সফল এবং তাঁহার নৈপুণ্য ততদূর প্রশংসনীয়। সৃষ্টিকর্তা যত্ন, কেন না, তাঁহার নিশ্চিত জগৎ আমাদের চক্ষে এমন সুন্দর লাগে, আমাদেরিগকে এমন প্রীতি দান করে। তিনি যত্ন, কেন না, এত বিচিত্র জীব্যের সমাবেশ করিয়া এত বিবিধ উপায়ে তিনি আমাদের জীবনরক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। তিনি সুনিপুণ কারিকর, কেন না, এত কৌশলসহকারে তিনি যখন যেটি দরকার, যখন যাহা নহিলে মানুষের অসুবিধা হইবে, তখন তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তিনি কৃতজ্ঞতাজ্ঞান, প্রতিভাজ্ঞান ও প্রীতিভাজ্ঞান, কেন না, তাঁহার রচিত জগতের মধ্যে আমরা এত স্তুতি-সহকারে বেড়াইতেছি। অতএব গাও হে তাঁহার নাম ইত্যাদি।



সূর্য কেমন অদৃশ্য পদার্থ। সূর্যের উত্তাপ নহিলে আমরা কোথায় থাকিতাম? বিজ্ঞানবিজ্ঞা শতমুখে সূর্যের সৃষ্টিকর্তার গুণ গান করিতেছে। বায়ু নহিলে আমরা কোথায় থাকিতাম? বিধাতা আমাদেরকে বায়ু দিয়াছেন। জল নহিলে আমরা কোথায় থাকিতাম? তাই বিধাতা আমাদেরকে জল দিয়াছেন। পৃথিবী না থাকিলে আমাদের দাঁড়াইবার স্থল থাকিত না, পৃথিবীর সৃষ্টি তাঁহার কেমন দূরদর্শিতার পরিচায়ক! এমন কি, বিধাতা আমাদের আহারের জন্ত ঘাসের ফলকে শস্ত্রে ও আমাদের শীত-নিবারণের জন্ত কাপাসের ফলকে তুলার পরিণত করিয়া কি অপূর্ব মানবহিতৈষ্যতার পরিচয় দিয়াছেন! এই ভূমণ্ডল দেখ কি সুখের স্থান, সকল প্রকারে সুখ করিতেছে দান,—দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ও শাস্ত্রকার ও ধর্মবস্তা সকলেই যুখে এই একই কথা চিরকাল শুনা বাইতেছে।

সমস্ত জগৎটাই যখন মনুষ্যজাতির উপকারের জন্ত ও সুবিধার জন্ত নির্মিত, তখন জগতের মধ্যে যদি এমন কোন পদার্থ থাকে, বাহা মনুষ্যের কোন কাজে লাগে না, তাহা হইলে সেই পদার্থের অস্তিত্ব নিরর্থক হইয়া দাঁড়ায়। ইহাতে সৃষ্টিকর্তার কার্য্যপ্রণালীতে দোষারোপ ঘটে। সেইজন্ত এক দলের পণ্ডিত জাগতিক সমুদয় পদার্থের মনুষ্যের পক্ষে উপকারিতা প্রতিপন্ন করিবার জন্ত ব্যাকুল। যদি সহজ চোখে কোনরূপ প্রমাণ না মিলে, তাহা হইলে ভবিষ্যতে জ্ঞানের উন্নতি-সহকারে ইহার উপকারিতা প্রতিপন্ন হইবে, এইরূপ আশ্বাস দিয়া তাঁহারা মনকে প্রবোধ দিয়া থাকেন।

কিন্তু এইখানে একটা সমস্তা আসিয়া দাঁড়ায়। কোটি সূর্য-মণ্ডলে পরিপূর্ণ জগতের মধ্যে পৃথিবী একটি কুদ্রাদপি কুদ্র



বালুকাকণামাত্র, এবং এই প্রকাণ্ড জগতের অতি ক্ষুদ্র অংশ লইয়াই মনুষ্যের কারবার। আবার এই পৃথিবীতেই এই কয়েক বৎসর যাত্র মনুষ্যের উদ্ভব হইয়াছে, এবং আর কয়েক বৎসর পরে মনুষ্যের আবার বিলোপ হইবে, এ বিষয়ে পণ্ডিতেরা সন্দেহ করেন না। বিশ্বজগতের কিছু সীমা পাওয়া যায় না, এবং কোন্ কাল হইতে জগৎ বিদ্যমান আছে, এবং কতকাল ধরিয়া জগৎ বিদ্যমান রহিবে, তাহারও আদি-অন্ত কিছু নিরূপণ হয় না। ক্ষুদ্র মাদি ও মাস্ত মনুষ্যের জন্তই এত বড় অনাদি অনন্ত কারখানাটা চলিতেছে, এইরূপ বিশ্বাস করা নিতামুই দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। পৃথিবীর ইতিহাসে মনুষ্য ছিল না, অথচ অস্ত্রান্ত্র জীবজন্তু বর্তমান ছিল, এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে, এবং আমাদের এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর বাহিরে অসীম আকাশে অবস্থিত অসংখ্য বৃহত্তর পৃথিবীতে জীবজন্তু যে বর্তমান নাই, তাহারও প্রমাণ নাই; এমন কি, পৃথিবীতে জীবের ধ্বংস হইলেও অস্ত্রান্ত্র গ্রহনকৃত্রে জীব বর্তমান থাকিবে, ইহাই সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। কাজেই জগৎটা মানুষের জন্ত নির্মিত, মানুষেরই একমাত্র ভোগ্য বস্তু, এইরূপ বলিতে সকল সময় সাহসে কুলায় না। জগৎটা জীবের জন্ত, চেতন সুখদুঃখভোগী জীবমাত্রেয়ই জন্ত সৃষ্ট হইয়াছে, এইরূপ নির্দেশই সঙ্গত হইয়া পড়ে।

এই বিচারে অধিক সময় নষ্ট করিবার দরকার নাই। মনুষ্য অথবা মনুষ্যের জীব, বাহার চেতনা আছে, বাহার সুখভোগের ও দুঃখভোগের ক্ষমতা আছে, তাহারই সুবিবার জন্ত, তাহাকেই বাচাইবার জন্ত ও আরামে রাখিবার জন্ত, জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। জগতের অস্তিত্বের উদ্দেশ্যই এই। যে ব্যাপার এই



উদ্দেশ্যের অমূল্য, তাহা মঙ্গল ও বাহা ইহার প্রতিকূল, তাহা অমঙ্গল।

মঙ্গলের উৎপত্তি বেশ বুঝা যায় ; কেন না, সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্যই তাহাই। কিন্তু অমঙ্গলের উৎপত্তি কেন হইল, তাহা ঠিক বুঝিতে পারা যায় না ; এবং ইহা বুঝিবার জন্য মনুষ্যের জ্ঞানেতিহাসের আরম্ভ হইতে আজি পর্য্যন্ত পণ্ডগোল চলিতেছে।

জীবকে সুখে রাখিবার জন্য ঈশ্বর জগৎ উৎপাদন করিয়াছেন, অর্থাৎ অমঙ্গল সেই সুখের বিষ উৎপাদন করে। তবে অমঙ্গলের উৎপত্তি কেন হইল ?

ইহার প্রচলিত উত্তর নানাবিধ। একে একে উল্লেখ করা বাইতেছে।

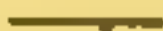
প্রথম, ঈশ্বর ইচ্ছাক্রমেই মঙ্গল ও অমঙ্গল উভয়েরই সৃষ্টি করিয়াছেন। জীবকে সুখ দেওয়া ও দুঃখ দেওয়া উভয়ই তাঁহার অভিপ্রায়। জীবকে সুখ ও দুঃখ দিয়াই তাঁহার আমোদ। এই তাঁহার লীলা। ইহাতে তাঁহার লাভ কি, তিনিই জানেন। তিনি রাজার উপর রাজা, বাদশার উপর বাদশা ; তাঁহার অভিক্রুর উপর কাহারও হাত নাই। তাঁহার খেলার ও তাঁহার খেলার অর্থ তিনিই জানেন।

এইরূপ নির্দেশে তৎকালীন কোনও দোষ দেখে না। কিন্তু ইহাতে ঈশ্বরের চরিত্রে নিতান্ত দোষ আবিষ্কার পড়ে। পরম-কারুণিক, মঙ্গলময় প্রকৃতি কতকগুলি বিশেষণ, বাহা ঈশ্বরের পক্ষে নিজস্ব গ্রহণাচ্ছে, সেইগুলির আর প্রয়োজ্যতা থাকে না। কাজেই এইরূপ উত্তর অগ্রাহ্য করিতে হইবে।



কাজেই বলিতে হয়, ঈশ্বর যজ্ঞলার্থে সমুদ্র সৃষ্টি করিয়াছেন ; তবে কি কারণে জানি না, যজ্ঞের সঙ্গে সঙ্গে অমঙ্গলও আসিয়া পড়িয়াছে। অমঙ্গল ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে ; ঈশ্বর হইতে অমঙ্গলের উৎপত্তি হইতে পারে না। অমঙ্গলের উৎপত্তির কারণ অন্যত্র অনুসন্ধান করিতে হইবে। অমঙ্গল ঈশ্বরের অনভিপ্রেত, এবং ইহার উদ্‌মূলনের জন্তই ঈশ্বরের সর্বদা প্রয়াস ; কাজেই ইহার মূল অন্যত্র সন্ধান করিতে হইবে।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ।





সেকালের সুখদুঃখ

নবাব সিরাজদ্দৌলার নাম সকলের কাছেই চিরপরিচিত। তিনি অতি অল্পদিন মাত্র বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার সিংহাসনে বসিয়াছিলেন ; কিন্তু সেই অল্পদিনের মধ্যেই স্বদেশে এবং বিদেশে আপন নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন।

ইংরাজেরা একবার তাহাদের দেশের একজন হতভাগ্য নরপতিকে নব-বলি দিয়াছিল, ঘাতকের শাণিত কুঠার যখন সেই রাজমুণ্ড বিখণ্ডিত করে, শোণিত-লোলুপ জনসাধারণ তখন উন্মত্ত পিশাচের মত তৈরব-মৃত্যু করতালি দিয়া কিছু দিনের জন্য প্রজাতন্ত্র সংস্থাপিত করিয়াছিল ! কিন্তু তখনও তাহাদের দেশের কুটীরে-কুটীরে, দুর্গে-দুর্গে, প্রাসাদে-প্রাসাদে কত কৃষক, কত লৈনিক, কত সম্ভ্রান্ত পরিবার দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়াছিল ! বাঙ্গালী যখন বড়বয়স করিয়া সিরাজদ্দৌলাকে গৃহতাড়িত করে, মীরনের নৃশংস আদেশে সিরাজ মুণ্ড যখন দেহ-বিচ্যুত হয়, দেশের রাজা-প্রজা তখন সকলে মিলিয়া বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরকে সিংহাসনে বসাইয়া তাঁহার কৃপাকটাকের প্রতীক্ষায় করযোড়ে দাঁড়াইয়াছিলেন ;—সিরাজের শোচনীয় পরিণামে তাঁহার জন্য কেহই একবিন্দু অশ্রুমোচনের অবসর পান নাই।

এসকল এখন পুরাতন কথা। দেশের আর সে অবস্থা নাই, লোকের আর সে তীব্র প্রতিহিংসা নাই, সিরাজ এবং তাঁহার সমসাময়িক রাজা-প্রজা সকলেই ইহলোক হইতে অবসর গ্রহণ



করিয়াছেন। এখন বোধ হয়, বাঙ্গালী বথার্থ নিরপেক্ষভাবে সিরাজ-চরিত্র আলোচনা করিবার অবসর পাইবেন।

সিরাজদৌলা নাই। তাঁহার সময়ে যে বাঙ্গালা দেশ ছিল, সে বাঙ্গালা দেশও নাই। মোগল বাদশাহেরা • “সমুদয় মানব জাতির স্বর্গভূলা বঙ্গভূমি” বলিয়া অমুশাসনপত্রে বাহার উল্লেখ করিতেন, সে স্বর্গ এখন গৌরবচ্যুত দ্রুত-সর্বস্ব কাঙ্গাল-ভূমি। সে শির নাই, সে বাণিজ্য নাই, বাঙ্গালীর সে রাজপদ, মন্ত্রিপদ, জমিদারদিগের সে জীবন-মরণের বিচারক্ষমতা নাই;—সে বাহুবল, সে রণকৌশল—সকলই এখন ইতিহাসগত অতীত কাহিনীতে পর্যাবসিত হইয়াছে। সিরাজদৌলা যে সময়ের লোক, সে সময় এখন বহুদূরে সরিয়া পড়িয়াছে।

এক সময়ে এ দেশে মুসলমানের নামগন্ধ ছিল না। হিন্দুস্থান কেবল হিন্দু অধিবাসীর শত্ব-ঘটাংগে প্রতিপন্নিত হইত। কিন্তু সে বহুদিনের কথা। সেকালের সকল চিত্রই এত পুরাতন, এত জরাজীর্ণ, এত অস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, এখন আর ভাল করিয়া তাহার সৌন্দর্য্য বিচার করিবার উপায় নাই। বহুদিন হইতে এ দেশ হিন্দু-মুসলমানের জন্মভূমি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে; গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে বহুদিন হইতে হিন্দু-মুসলমান বাহতে বাহতে মিলিত হইয়া জীবন সংগ্রামে জন্মভূমির রণপতাকা বহন করিতেছে। সিরাজদৌলার সময়ে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বর্ষগত পার্থক্য ছিল; কিন্তু ক্রমভাগত, পনগোরবগত কোনই পার্থক্য ছিল না। মুসলমানের শিষ্টাচার, মুসলমানের প্রয়োজনাতীত-সৌজন্ত-পরিপুত, স্নেহ-বিস্তৃত, প্রতিশ্রুত, সুমার্জিত বাবনিক



ভাষা এবং পদবিজ্ঞাপক যাবনিক উপাধি গৌরবের সঙ্গে হিন্দু-মুসলমান সমভাবে ব্যবহার করিতেন।

দিল্লীর বাদশাহ নামমাত্র বাদশাহ; বাঙ্গালার নবাবই বাঙ্গালা দেশের প্রকৃত “মা-বাপ” হইয়া উঠিয়াছিলেন। সেই নবাব-দরবারে হিন্দু-মুসলমানের কোনরূপ আসনগত পার্থক্য বা ক্ষমতাগত তারতম্য ছিল না, বরং অনেকাংশে হিন্দুদিগেরই বিশেষ প্রাধান্ত জন্মিয়াছিল। বিলাসলোলুপ মুসলমান ওমরাহগণ আহার-বিহার লইয়াই সমধিক বাস্তু থাকিতেন; কর্মকুশল হিন্দু অধিবাসিগণ, কেহ রাজা, কেহ মন্ত্রী, কেহ কোষাধ্যক্ষ, কেহ বা সেনানায়ক হইয়া বুদ্ধিবলে, শাসনকৌশলে, বাহুবিক্রমে বাঙ্গালা দেশের ভাগা-বিবর্তন করিতেন।

মুসলমান নবাব আপনাকে বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করিতেন না। বাঙ্গালা দেশই তাঁহার স্বদেশ, এবং বাঙ্গালী জাতিই তাঁহার স্বজাতি হইয়া উঠিয়াছিল। রাজকোষের ধনরত্ন বাঙ্গালা দেশেই সঞ্চিত থাকিত; বাহা ব্যয় হইত, তাহাও বাঙ্গালীগণ কেহ দ্রব্য-বিনিময়ে, কেহ শ্রম-বিনিময়ে কড়ায়-গড়ায় বুঝিয়া লইতে পারিত। দেশের টাকা দেশেই থাকিত, তাহা সাত সমুদ্র তের নদীর পারে চির-নিরক্ষাসিত হইত না।

সেই একদিন আর এই একদিন। আজ সে দিনের বিলুপ্ত কাহিনীর আলোচনা করিতে হইলে অতীতের স্বপ্ন-সমুদ্র সন্তরণ করিয়া বাস্তব রাজ্যের, বাস্তব চিত্রপটের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে হইবে; সেকালের চক্ষু লইয়া, সেকালের প্রাণ লইয়া সেকালের ইতিহাস অধ্যয়ন করিতে হইবে। সে ইতিহাস কেবল হতভাগ্য



সিরাজদ্দৌলার স্বর্ণ-বেদনার ইতিহাস নহে,—তাহা আমাদের পূজনীয় পিতৃপিতামহের সুখদুঃখের ইতিহাস।

সিরাজদ্দৌলার সময়ে বাঙ্গালা দেশ ১৩ চাক্‌লায় এবং ১,৬৬০ পরগনায় বিভক্ত ছিল * পরগনাগুলি কোন না কোন জমীদারের অধিকারভুক্ত ছিল। তাঁহারা বাচবলে আপন আপন রাজ্য রক্ষা করিয়া, বিচারবলে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিয়া, যথাকালে নবাব-সরকারে রাজস্ব দিতে পারিলে তাঁহাদের স্বাধীন শক্তির প্রবল প্রত্যাপে কেহই বাধা দিতে চাহিত না। চাক্‌লায় চাক্‌লায় এক একজন হিন্দু অথবা মুসলমান “ফৌজদার” অর্থাৎ শাসনকর্তা থাকিতেন; তাঁহারা যথাকালে রাজস্ব সংগ্রহের সাহায্য করা ভিন্ন আভ্যন্তরীণ শাসনকার্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না। গঙ্গা, ভাগীরথী, ব্রহ্মপুত্র বাঙ্গালীর বাণিজ্য-ভাণ্ডার বহন করিত; সে বাণিজ্যে দ্রুত-বিজিত বলিয়া শুকদানের কোনরূপ ভারতম্য ছিল না। মুসলমান নবাব কোন কোন নির্দিষ্ট সময়ে পাত্রমিত্র লইয়া দরবার করিতেন, কিন্তু আভ্যন্তরীণ শাসনকার্যে প্রায়ই মনোনিবেশ করিবার অবসর পাইতেন না। জগৎ শেঠের ইতিহাস-বিখ্যাত বিস্মৃত প্রাচণ্ডে বাদশাহের নামে স্বর্ণ ও রৌপ্য-মুদ্রা মুদ্রিত হইত; পরগনাধিপতি জমীদারগণ জগৎ শেঠের কোষাগারে রাজস্ব ঢালিয়া দিয়া মুক্তিপত্র গ্রহণ করিতেন, এবং কখন কখন শিষ্টাচারের অনুরোধে রাজধানীতে আসিয়া কাবা-চাপকান পরিয়া উক্ষোষ বাধিয়া, জামু পাতিয়া মুসলমানী প্রণাম নবাব দরবারে সমাধীন হইতেন।

দেশে যে অত্যাচার-অবিচার ছিল না তাহা নহে; বরং অনেক সময়েই দেশে ভয়ানক অরাজকতা উপস্থিত হইত। কিন্তু সে



অরাজকতার জমীদার ও মহাজন বতই উৎপীড়িত হন না কেন, কুবক-কুটীরে তাহার ছায়াস্পর্শ হইত না। কুবক যথাকালে হল চালনা করিয়া, যথা-প্রাপ্য শস্ত সঞ্চয় করিয়া, স্ত্রীপুত্র লইয়া যথাসম্ভব নিকরেষেই কালযাপন করিত। দেশে দস্যু-তরুরের উৎপীড়নের অভাব ছিল না, কিন্তু দেশের লোকের অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারেও কোনরূপ নিষেধ ছিল না। সম্রাট বংশের যুবকেরাও লাঠি তরবারি চালনা করিতে জানিতেন। দস্যু-তরুরের উপদ্রব হইলে গ্রামের লোকে দল দাঁদিয়া, রাত্রি জাগিয়া, লাঠি ঘুরাইয়া, মশাল জ্বলাইয়া, তরবারি ভাঁজিয়া, বর্শা চালাইয়া আত্মরক্ষা করিত। দস্যু-তরুর ধরা পড়িলে গ্রামবাসীরাই দশজনে মিলিয়া প্রয়োজনাতীত উত্তম-মধ্যম দিয়া সংক্ষেপে বিচার-কার্য সমাধা করিয়া ফেলিত।

ইহাতে যেমন দুঃখ ছিল, সেইরূপ সুখও ছিল। আত্মকাল দস্যু-তরুরে উপদ্রব করিলে কেহ কাহারও সাহায্য করিতে বাহির হয় না, অসহায় গৃহস্থ ঘরে পড়িয়া আত্মনাশ করিতে থাকে। দস্যুদল সর্বত্র লুটিয়া, মানসম্মত পদদলিত করিয়া, হেলিতে ছলিতে ধীরে ধীরে বহুদূরে চলিয়া গেলে গৃহস্থ পক্ষাঘ্নে ডাকিয়া থানায় গিয়া পুলিশে সংবাদ দিয়া আসে দারোগা, বকসী, কনেষ্টবল এবং চৌকীদার মহাশয় অবসর-অনুসারে একে একে শুভাগমন করিলে গৃহস্থ ব্যস্তসমস্ত হইয়া একহাতে চোখের জল মুছিতে মুছিতে, আর একহাতে তাঁহাদের বধাযোগ্য মর্যাদা-রক্ষার জন্য ঋণ-গ্রহণে বাহির হয়। দস্যু-তরুর ধরা পড়ুক বা না পড়ুক, সন্দেহে পড়িয়া অনেক গরীবকে নির্যাতন সহ করিতে হয়; হুই-এক স্থলে মিথ্যা অভিযোগ বলিয়া গৃহস্থকে রাজদ্বারে বিলক্ষণ



বিভবনা ভোগ করিতে হয়। সেকালে সুবিচারের সুস্বয়ম্ব ছিল না, সুতরাং কাহাকেও বিচার-বিভবনা ভোগ করিতে হইত না।

অনেক বিষয়ে অসুবিধা ছিল, কিন্তু অনেক বিষয়ে সুবিধাও ছিল। পথ-ঘাট ছিল না, দূরিত গমনের সজ্জায় ছিল না, দাতব্য-চিকিৎসালয় এবং বিনামূল্যে বিতরণীয় ঔষধালয় ছিল না;—কিন্তু লোকের ধনধান্ত ছিল, স্বাস্থ্য ও বাহুবল ছিল; হা অন্ন! হা অন্ন! করিয়া দেশে দেশে ছুটিয়া বেড়াইবার বিশেষ প্রয়োজন হইত না। লোকে ঘরে বসিয়া হাতে-লেখা তুলট-কাগজের রামায়ণ মহাভারত পড়িত, অবসর সময়ে কবিকঙ্কণের চণ্ডীর গান গাহিত, এবং আপন আপন বাসস্থলে নিপুণভাবে, প্রসন্নচিত্তে আপন কার্যে নিযুক্ত থাকিত। অভাব অল্প হইলে দুঃখও অল্প হইয়া থাকে। সভ্যতাবিরোধী সূচিকণ সুস্ব-বস্ত্রের জন্ত সকলেই লালায়িত হইত না; দেশের মোটা ভাত মোটা কাপড়েই অধিকাংশ লোকের এক রকম দিন চলিয়া যাইত। পাঠশালায় শুক্রমহাশয়ের অথবা তাঁহার বেরদণ্ডের মহিমায় বধাসম্ভব বিজ্ঞানভ্যাস করিয়া বালকেরা অবসর-সময়ে মাঠে মাঠে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইত; কখনও বা ঘোড়া ধরিয়া তাহার অনাবৃত পৃষ্ঠে নিতান্ত অসঙ্গতরূপে এক জনের স্থানে দুই তিন জন চাপিয়া বসিত; কখনও বা বর্ষার জলে—নদ, নদী, খাল, বিলে কাঁপাকাঁপি করিয়া সাতার কাটিত; সময়ে-অসময়ে গৃহস্থের গরু-বাছুর চরাইয়া, হাট-বাজার বহিয়া, দিনশেষে ঠাকুরমার উপকণ্ঠায় হঁ দিতে দিতে স্নেহের কোলে ঘুমাইয়া পড়িত। যুবকদল দিবসে তাস-পাশা খেলিয়া, দাবা-বড়ে টিপিয়া বৈকালে লাঠি-তরবারি ভাঁজিত; সন্ধ্যা-সমাগমে সবুজ-বিজ্ঞপ্ত লম্বা



কোঁচা দোলাইয়া, অনাবৃত দেহ-সৌষ্ঠবের গৌরব বাড়াইবার জন্ত কাঁধের উপর রঙ্গিন গামছা ছড়াইয়া দিয়া, বাবুরী-চুলে চিক্রনৌ গুঁজিয়া, শুক-সারি অথবা নিতান্ত অভাবপক্ষে একটা পোষা বুলবুল হাতে লইয়া তাদুল-রাগ-রঞ্জিত অধরোষ্ঠে মৃদুমন্দ শিশু দিতে দিতে পাড়ায় বেড়াইতে বাহির হইত। বৃদ্ধেরা গৃহকর্ম সারিয়া, পর্যাপ্ত ভোজনের পর তৈলাক্ত সিঁদ্বতলু দিবা-নিদ্রায় সমাহিত করিয়া, সাঘাছে তামাক সেবনের জন্ত চণ্ডীমণ্ডপে, নদী-সৈকতে অথবা বৃক্ষতলে সমবেত হইয়া দেশের কথা, দেশের কথা, কত কি আবগুক-অनावগুক বিষয়ের মীমাংসা করিয়া সন্ধ্যার পর হরিসকীর্ণনে অথবা পুরাণপ্রবণে ভক্তি-গদ্যদ-জুড়য়ে নিমগ্ন হইতেন। সমাজের ঐহারা লক্ষীকপিণী অক্ষাপিনী, তাহারা দেবতা, ব্রাহ্মণ, অতিথি ও পোষ্যবর্গের সেবা করিয়া, সময়ে-অসময়ে ছেলে তৈলাইয়া, নথ নাড়িয়া, চুল খুলিয়া সন্ধ্যার শান্তল বাতাসে পুকুর-ঘাট আলো করিয়া বসিতেন; কত কথা, কত রঙ্গরস—তাহার সঙ্গে প্রোটার সগর্ভ-হস্তসঞ্চালন, নবীনীর অবগুষ্ঠন-জড়িত অশ্রুট সখী-সন্তাষণ, এবং স্থবিরার আলদ্বচনে শিবমহিমন্তোত্তের বিকৃত আবৃত্তি সাক্ষা সন্মিলনকে কতই যধুময় করিয়া ফুলিত।

সেদিন আর নাই; এখন আমরা সভ্য হইয়াছি। বালকেরা দস্তোদামের পূর্বেই ক, খ ধরিয়া পাঁচ ঘণ্টা কুলের কঠিন কাষ্ঠাসনে কখন দাড়াইয়া, কখনও বা বসিয়া, বৈকালে গৃহশিক্ষকের তীব্র তাড়না সহ করিয়া আহার না করিতেই ঘুমাইয়া পড়ে; যুবারা হা অন্ন! হা অন্ন! করিয়া চাকরীর আশায়, উমেদারীর আশায়, কখনও বা শুধু একখানি প্রশংসাপত্র পাইবার আশায়



দেশে-দেশে ছুটাছুটি করিয়া অল্প দিনেই অধ্যয়নক্লিষ্ট হৃৎকল দেহে নিভাস্ত অসময়েই স্ববিরত লাভ করে ; বুকেরা অনাবশ্যক উৎসাহে সেকালের জীর্ণ খুঁটার সঙ্গে উড্ডীয়মান জাতীয় জীবনকে বাধিয়া রাখিবার জন্য পাড়ার-পাড়ার দলাদলির বৈঠক করিয়া ক্ষুধাবৃদ্ধি করেন , আর সমাজের যাহারা লক্ষ্মীকপিলী, সেই অর্দ্ধাঙ্গিনীগণ অর্দ্ধ-অবগুণ্ঠনে স্বামিপুত্রের সঙ্গে দেশে দেশে ফিরিয়া কেবল অনাবশ্যকরূপে চিকিৎসকের এবং স্বর্ণকারের গুণজালে জড়িত হইয়া পড়েন । এ সকল যদি একালের সুখের চিত্র বলিয়া গর্ব করিতে পারি, তবে সেকালে দেশের লোকের সুখশাস্তির একেবারেই অভাব ছিল বলিয়া উপহাস করা শোভা পায় না ।

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ।



বিশ্বামিত্রের পতন

১

বিশ্বামিত্র অপ্রতিহতপ্রভাবে ও অপত্যনির্কিংশেবে নিজ নূতন সৃষ্টি পালন করিতে লাগিলেন। বাহাতে লোকের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি হয়, বাহাতে লোকে জীবনকাল পরম সুখে কাটাইয়া রাইতে পারে, একটুকুও কষ্ট না হয়, তাহার জন্য তাঁহার প্রাণপণ বদ্ধ, কিন্তু তাঁহার নিজের কি? বত দিন সৃষ্টি-উৎসাহে ছিলেন, নিজের কথা মনে হয় নাই। নিজে তিনি সৃষ্টির ঈশ্বর। বখন মানুষের সঙ্গ না পায়, বখন প্রাণ খুলিয়া কথা কহিতে না পায়, তখন সামান্ত মানুষ কেপিয়া যায়। এই প্রকাণ্ড পুরুষ, প্রধান মহারাজ বিশ্বামিত্র নূতন পৃথিবীতে সর্বোচ্চ পদে আরোহণ করিয়া আপনার এককথ বুদ্ধিতে পারিলেন। সব হইল, কিন্তু সুখ কৈ? নিজের কি হইল? তিনি নিজ সৃষ্টিত্ব মানুষের সঙ্গে মিণিলেন; কিন্তু বাহাদের সঙ্গে চিরদিন কাটাইয়া আসিয়াছেন, বাহারা তাঁহার নিজস্ব সুখ দুঃখ বুঝে, তাহারা কৈ? ইহারা ত সুখী, বিশ্বামিত্র ত মানুষ। দুঃখ-ভোগ ত তাঁহার অদৃষ্টলিপি। তিনি দুঃখিত হইলে, উন্নয়ন হইলে তাঁহার মুখপানে তাকায়, এমন লোক কৈ? তিনি মনে মনে বড়ই দুঃখ পাইতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুদিন যায়, শেষে তাঁহার ইচ্ছা হইল যে, কতকগুলি পৃথিবীর লোক আনিয়া রাখিতে হইবে। এই



বলিয়া তিনি কান্তকূজ নগরট উঠাইয়া আনিবার জন্ত প্রকাণ্ড নগর নির্মাণ করিলেন। এ সৃষ্টিতে ত শত্রুভয় নাই, নগরে গড়-প্রাচীর কিছুই রহিল না। স্বরম্য হর্ম্মো, প্রকাণ্ড প্রাসাদে নগর পরিপূর্ণ হইল। তখন বিশ্বামিত্র পৃথিবীতে উপস্থিত হইলেন। কান্তকূজ নগরে গেলেন। মন্ত্রী সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। পরিবারগণের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; দেখিলেন, এই সমস্ত আপন লোকের মধ্যে বড় সুখ, সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে মানুষ যদি ঈশ্বর হয়, তথাপি একাকী তাহার তত সুখ হয় না, একবার ইচ্ছা হইল, পৃথিবীতে থাকি, আবার সেখানকার কর্তৃত্ব ও এখানকার কর্তৃত্ব ও এখানকার ব্রাহ্মণদিগের কথা মনে পড়িল; তিনি স্বজনবর্গকে আপন সৃষ্টিতে লইয়া বাইবার জন্ত উদ্যোগ করিলেন।

সমস্ত কান্তকূজ নগর শুদ্ধ উঠিতে লাগিল। আন্তে আন্তে উঠিতে লাগিল, পৃথিবীর লোক আশ্চর্য্য হইয়া এই অদৃত দৃশ্য দেখিতে লাগিল। উদ্ভীর্ণমান নগরমধ্যে নানারূপ সুন্দর বাগ্গধ্বনি হইতে লাগিল। সকলে নৃত্য করিতে লাগিল। কিন্তু কিছুদূর গিয়াই তাহাদিগের সুখ দুঃখরূপে পরিণত হইয়া দাঁড়াইল। তাহাদের নিশ্বাস বহে না, সল! ফুলিয়া উঠিল। বিশ্বামিত্র পৃথিবী-বায়ু আকর্ষণ করিলেন। তাহা আসিল না। বিশ্বামিত্র মহা বিনাটে পড়িলেন। পৃথিবী-বায়ু সৃষ্টি করিতে গেলেন, তাহা হইল না। ব্রহ্মাকে শ্রবণ করিলেন। ব্রহ্মা আসিলে তিনি বলিলেন, “তুমি এখনও আমার সঙ্গে বিবাদ করিতে চাহ ? আমি এই আপন স্বজন সঙ্গে নিজ সৃষ্টিতে বাইব, তুমি বাধা দিতেছ কেন ?” ব্রহ্মা বলিলেন, “তুমি বে তপের বলে সৃষ্টি



করিয়াছ, সে কেবল তাহাতেই ক্ষয় হইয়াছে,—তোমার আর তপোবল নাই যে, তুমি কোন নূতন কাজ কর। নূতন কাজ করিতে গেলেই তোমার সৃষ্টি নশ হইবে। আমি তোমায় বলি, তুমি এখনও দ্বির হও, বুঝিয়া চল।” “শাবও, যত বড় মুখ, তত বড় কপা।” আমরা বল কি না, বুঝিয়া চল। এই দেখ, নিজ পৃথিবী হইতে বায়ু আনিয়া ইহাদিগকে লইয়া যাইব” বলিয়া বিখ্যামিত্র বেগে প্রস্থান করিলেন। কান্তকূজ তথা হইতে বেগে পড়িতে লাগিল। ত্রুক্ষা দেখিলেন, তাতা হইলে নিজ সৃষ্টিই নশ হইবে। নিজে ধীরে ধীরে তাহাকে নামাইয়া যথাস্থানে স্থাপিত করিলেন। বিখ্যামিত্রের অমুচরবর্গ ব্রাহ্মণদিগের উপর ভয়ানক অত্যাচার আরম্ভ করিল। রাক্ষসদিগের সহিত যোগ দিয়া নানাপ্রকার উপদ্রব আরম্ভ করিল।

২

বিখ্যামিত্র আপন পৃথিবীর বায়ু শূন্যপথে চালাইয়া আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; পারিলেন না। তখন ক্রোধে অধীর হইয়া ত্রুক্ষার স্মরণ করিলেন। আবার ত্রুক্ষা আসিলে বলিলেন, “আমার বায়ু শূন্যপথে যাইবার পথ ছাড়িয়া দাও” ত্রুক্ষা বলিলেন, “সে তপোবল তোমার নাই, আর, তোমার তপোবল না থাকিলে আমার দ্বিবারও ক্ষমতা নাই।” বিখ্যামিত্র ক্রোধে অন্ধ হইয়া ত্রুক্ষাকে কারাগারে বন্ধ করিতে গেলেন; পারিলেন না। তখন ক্রোধে অন্ধ হইয়া গলা তুলিয়া বক্ষার সৃষ্টিনাশে কৃতসংকল্প হইলেন। ত্রুক্ষা বলিলেন, “সে ভাবে আছ. সেই ভাবেই থাক, নূতন কার্য করিতে গেলেই তোমার সৃষ্টি নশ



হইবে।" বিশ্বামিত্র গালি দিয়া ব্রহ্মাকে দূর করিয়া দিলেন। পরে গদা তুলিলেন। গদা এক বার হাত হইতে পড়িয়া গেল। দ্বিতীয় বার মহাবেগে গদা উর্দ্ধে উখিত হইল; ওদিকেও তাঁহার পৃথিবীতে ফাট ধরিল। তিনি গদা ঘূর্ণিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার পৃথিবীর সন্ধি বিগ্নিষ্ট হইতে লাগিল। তাঁহার ইচ্ছা, ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র লক্ষ্য করিয়া গদা প্রহার করেন। এই ক্ষুদ্র লক্ষ্য করিতেছেন, আর গদা ঘুরাইতেছেন। তাঁহার পৃথিবীর সন্ধি-সকল আরও বিগ্নিষ্ট হইতে লাগিল, ক্রমে গদা বড় ঘূর্ণিতে লাগিল, সমস্ত বিশ্বামিত্রের ব্রহ্মাণ্ডমূর্টি নীহারিকারূপে পরিণত হইল।

বিশ্বামিত্র গদা ছাড়িলেন, আর তাঁহার সংগৃহীত নীহারিকা-সমূহ যে যে দিক্ হইতে আসিয়াছিল, ভীমবেগে সেই সেই দিকে চলিয়া গেল। অনন্ত-গর্ভ গহ্বর যেমন ক্ষীণালোকময় ছিল, তেমনি ক্ষীণালোকময়ই রহিল। আর নীহারিকাকুল যে সকল নক্ষত্রাদি টানিয়া লইয়া গিয়াছিল, তাঁহারা স্ব স্ব স্থানে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল। মুহূর্ত্তমধ্যে নূতন পৃথিবী 'জলের বিষ জলের' জায় শূন্যে মিশাইয়া গেল। যে ঈশানকোণ পৃথিবী হইতে নক্ষত্র-রাশিতে ভরা-ভরা দেখা বাইত, তাহা আবার শূন্যময় হইয়া গেল। বিশ্বামিত্র-পৃথিবীতে নূতন মহাশূন্যের যে সুখস্বাচ্ছন্দ্য ছিল, তাহা আর রহিল না। মাহুঘও সব আবার অগঠিতপদার্থরাশিমধ্যে বিলীন হইল। সে সুন্দর পাহাড়-পর্বত-সৌধ-প্রাকার-রাজপথ-সমবেত সমস্ত পৃথিবী আবার অগঠিতপদার্থরাশিরূপে পরিণত হইল। যে সমাজবন্ধনে অত্যাচার ছিল না, ছোটবড় ছিল না, বাহাতে কেবল প্রেম আর ঐক্য আর মায়া, তাহাও অনন্তগর্ভে নিহিত হইল।



আর বিশ্বামিত্র গদা ছুড়িয়াই মূর্ছিত। কোথায়? স্থান আছে কি? শূন্যমধ্যে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার নিজ পৃথিবীর আকর্ষণ এতক্ষণ ছিল, এখন তাঁহার মৃতপ্রায় দেহপিণ্ড আমাদের পৃথিবী আকর্ষণ করিতে লাগিল। তিনি ঘুরিতে ঘুরিতে পড়িতে লাগিলেন। ব্রহ্মা বিশ্বামিত্রকে বড় ভালবাসিতেন, এই জন্তই বারংবার তিরস্কৃত হইয়াও তাঁহার নিকট বারংবার যাইতেন এবং তাঁহাকে ব্রাহ্মণ করিবার জন্ত বারংবার উদ্যোগও করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি দেখিলেন, বায়ু-অভাবে অচিরেই বিশ্বামিত্রের প্রাণনাশ হয়। এ জন্ত নিজে পৃথিবী-বায়ু আনিয়া তাঁহার নিকট ধরিলেন। বিশ্বামিত্রের প্রাণবিয়োগ হইল না, কিন্তু তিনি ঘুরিতে ঘুরিতে শূন্য-পথে মূর্ছিতভাবে পড়িতে লাগিলেন। মুখে রক্তবমন হইতে লাগিল। শরীর ফুলিয়া উঠিল। আর তিনি পড়িতে লাগিলেন, কে জানে, কত কাল ধরিয়া তিনি পড়িয়াছিলেন?

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।



স্বদেশ-মন্ত্র

হে ভারত । তুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী ; তুলিও না—তোমার উপাশ্রু উমানাথ সর্বভাগী শঙ্কর ; তুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন, ইন্দ্রিয় সুখের—নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্ত নহে ; তুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই “মায়ের” জন্ত বলিপ্রদত্ত ; তুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র ; তুলিও না—নীচ জাতি, মূর্থ, দরিদ্র, অন্ধ, মুচি, মেধব তোমার রক্ত, তোমার ভাই ।

হে বীর । সাহস অবলম্বন কর । সদপে বল আমি ভারত-বাসী, ভারতবাসী আমার ভাই ; বল—মূর্থ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী, আমার ভাই ; তুমিও কটিমাত্র-বস্ত্রাবৃত হইয়া সদপে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ—আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বান্ধকের বারানসী ; বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ ; আর বল দিনরাত, “হে গৌরীনাথ, হে জগদেধে, আমার মলুষ্যত্ব দাও ; মা, আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর ।”

স্বামী বিবেকানন্দ ।



গঙ্গা-সাগর-সঙ্গমে

হৃদয়কে পেরে গঙ্গা যেনে আছে ? সেই নির্মল নীলাভ জল—
 যার মধ্যে দশ হাত গভীরের মাছের পাখুরা গোনা যায়, সেই
 অপূর্ব স্বাদু হিমশীতল “গাঙ্গা বারি মনোহারি” আর সেই
 অকৃত “হব্ হব্ হব্” তরঙ্গোৎ খনি, সামনে গিরিনিখরের “হব্
 হব্” প্রতিধ্বনি, সেই বিপিনে বাস, মাধুকরী ভিঙ্গা, গঙ্গাগর্ভে
 কুঙ্গ ঘোপাকার-শিলাখণ্ডে ভোজন, করপুটে অঞ্জলি অঞ্জলি সেই
 জল পান, চারিদিকে কণপ্রভাণ মৎস্যকুলের নির্ভয় বিচরণ ?
 সে গঙ্গাজল-প্ৰীতি, গঙ্গার মহিমা, সে গাঙ্গা বারির বৈরাগ্যপ্রদ
 স্পর্শ, সে হিমালয়বাহিনী গঙ্গা, শ্রীনগর, টিহরি, উত্তরকাশী,
 গঙ্গোত্রী, তোমানের কেউ কেউ গোমুখী পণাস্ত দেখেচ ; কিন্তু
 আমাদের কদমাবিলা, হরগাঙ্গ-বিদগ্ধলতা, সহস্রপোতবকা এ
 কলিকাতার গঙ্গায় কি এক টান আছে, তা ভোলবার নয়। সে
 কি স্বদেশপ্রিয়তা বা বাল্যসংস্কার—কে জানে ? হিন্দুর সঙ্গে
 মায়ের সঙ্গে এ কি সম্বন্ধ ? -কুসংস্কার কি ? হবে, গঙ্গা গঙ্গা
 কোরে জন্ম কাটায়ে, গঙ্গাজলে মরে, দূর-দূরান্তরের লোক গঙ্গাজল
 নিয়ে যায়, তাম্রপাত্রে বহু কোরে রাখে, পালপাক্ষণে বিন্দু-বিন্দু
 পান করে। রাজারাজড়ারা ঘড়া পুরে রাখে, কত অর্থব্যয় কোরে
 গঙ্গোত্রীর জল রামেশ্বরের উপর নিয়ে গিয়ে চড়ায় ; হিন্দু বিদেশে
 যায়—রেসুন, জাভা, হংকং, জাক্সীবর, মাডাগাস্কার, সুয়েজ, এডেন,
 মান্‌টা—সঙ্গে গঙ্গাজল, সঙ্গে বাঁতা। গীতা-গঙ্গা—হিন্দুর



হি ছয়ানি। গেল ষারে আমিও একটু নিরেছিলুম—কি জানি
বাগে পেনেই এক-আধ বিন্দু পান কর্তাম। পান করলেই
কিন্তু সে পাশ্চাত্য জনশ্রোতের মধ্যে, সভ্যতার কল্লোলের মধ্যে,
সে কোটা কোটা মানবের উন্নতপ্রায় ক্ষুণ্ণপদসঞ্চারের মধ্যে
মন বেন স্থির হয়ে যেত। সে জনশ্রোত, সে রজ্জোগুণের
আচ্ছাদন, সে পদে পদে প্রতিবন্দিসংঘর্ষ, সে বিলাসক্ষেত্র,
অমরাবতীসম পারিস, লণ্ডন, নিউইয়র্ক, বার্লিন, রোম—সব লোপ
হয়ে যেত, আর শুভ্রতাম—সেই “হর্ হর্ হর্”, দেখ্তাম—
সেই হিমালয়ক্রোড়স্থ বিজন বিপিন, আর কল্লোলিনী সুরতরঙ্গিনী
বেন হৃদয়ে মন্তকে শিরায়-শিরায় সঞ্চার কর্তেন, আর গর্জে
গর্জে ডাক্তেন—“হর্ হর্ হর্!!”

আপনার লোকের একটি রূপ থাকে, তেমন আর কোথাও
দেখা যায় না। নিজের খাদ্য-বৌচা ভাই-বোন-ছেলে-মেয়ের
চেরে গন্ধর্বলোকেও সুন্দর পাওয়া বাবে না সত্য। কিন্তু
গন্ধর্বলোক বেড়িয়েও যদি আপনার লোককে যথার্থ সুন্দর পাওয়া
যায়, সে আহ্লাদ রাখবার কি আর জায়গা থাকে? এই
অনন্তশম্প্রদায়ী সহস্রশ্রোতস্বতীমালাধারিণী বাঙ্গাল্য দেশের একটি
রূপ আছে। সে রূপ—কিছু আছে বলয়ালমে (মালাবার),
আর কিছু কান্দীয়ে। জলে কি আর রূপ নাই? জলে জলগয়,
মুহলধারে বৃষ্টি কচুর পাতার উপর দিয়ে গড়িয়ে থাকে, রাশি রাশি
তাল-নারিকেল-খেজুরের ঝাণা একটু অবনত হয়ে সে ধারাসম্পাত
বইচে, চারিদিকে ভেকের ঘর্ঘর আওয়াজ,—এতে কি রূপ নাই?
আর আমাদের গঙ্গার কিনারা, বিদেশ থেকে না এলে, ডায়মণ্ড-

হারবারের মুখ দিয়ে না গঙ্গার প্রবেশ করলে, সে বোঝা যায় না। সে নীল নীল আকাশ, তার কোলে কালো মেঘ, তার কোলে সাদাটে মেঘ, সোণালি কিনারাধার, তার নীচে ঝোপ ঝোপ তাল-নারিকেল-খেজুরের মাথা বাতাসে যেন লফ লফ চামরের মত হেল্চে, তার নীচে কিকে, ঘন, ঈষৎ পীতভ একটু কালো-মেশানো, ইত্যাদি হরেক রকম সবুজের কাঁড়ী ঢালা আব-নীচু-জাম-কাঁটাল,—পাতাই পাতা—গাছ ডাল পালা আর দেখা যাচ্ছে না, আশে পাশে ঝাড়-ঝাড় বাশ হেল্চে তুল্চে, আর সকলের নীচে—যার কাছে ইয়ারকান্দি ইরানি তুর্কিস্তানি গাল্চে-তুল্চে কোথার হার যেনে যার—সেই ঘাস, বতদূর চাও সেই শ্রাম-শ্রাম ঘাস, কে বেন ছেঁটে-ছুঁটে ঠিক কোরে রেখেচে ; জলের কিনারা পর্য্যন্ত সেই ঘাস ; গঙ্গার মূহমুহ হিরোল বে অবধি জমিকে ঢেকেচে, বে অবধি অর অর লীলাময় থাক্কা দিচ্ছে, সে অবধি ঘাসে-জাঁটা। আবার তার নীচে আমাদের গঙ্গাজল। আবার পাবের নীচে থেকে দেখ, ক্রমে উপরে বাও, উপর উপর মাথার উপর পর্য্যন্ত, একটি রেখার মধ্যে এত রঙের খেলা, একটি রঙে এত রকমারি, আর কোথাও দেখেচ ? বলি, রঙের নেশা ধরেচে কখন কি—বে রঙের নেশায় পতঙ্গ আঙুনে পুড়ে মরে, মৌমাছি ফুলের গারদে অনাহারে মরে ? হ, বলি—এই বেলা এ গঙ্গা-যার শোভা যা দেখবার দেখে নাও, আর বড়একটা কিছু থাক্চে না। দৈত্য-দানবের হাতে পড়ে এ-সব বাবে। ঐ ঘাসের ঝারগার উঠবেন—ইটের পাঁজা, আর নাবুবেন—ইটখোলার গর্তকুল। যেখানে গঙ্গার ছোট ছোট ঢেউগুলি ঘাসের সঙ্গে



খেলা করচে, সেখানে দাঁড়াবেন—পাট-বোঝাই ফ্যাটি, আর সেই
গাধাবোট ; আর ঐ তাল-তমাল-আব-নীচুর রঙ, ঐ নীল
আকাশ, মেঘের বাহার, ও-সব কি আর দেখতে পাবে ?
দেখবে—পাথুরে কয়লার দোয়া আর তার মাঝে মাঝে ভূতের
মত অস্পষ্ট দাঁড়িয়ে আছেন কলের চিমনি ।।

* * * * *

কি সুন্দর । সামনে যতদূর দৃষ্টি যায়, ঘন নীলজল তরঙ্গায়িত—
ফেনিল, বায়ুর সঙ্গে তালে তালে নাচে । পেছনে আমাদের
গঙ্গাজল, সেই বিভূতিভূষণা—সেই “গঙ্গাফেনসিতা জটা
পশুপতঃ ।” সে জল অপেক্ষাকৃত হ্রিৎ, সামনে মধ্যবর্তী রেখা ।
জাহাজ এক বার সাদা জলের এক বার কালো জলের উপর
উঠে । ঐ সাদা জল শেষ হয়ে গেল । এবার খালি নীলাধু,
সামনে-পেছনে আশে-পাশে খালি নীল নীল নীল জল, খালি
তরঙ্গতরঙ্গ । নীলকেশ, নীলকাস্ত অঙ্গ-আভা, নীল-পটবাস-পরিধান ।
কোটা কোটা অশ্বর দেবভয়ে সমুদ্রের তলার লুকিয়েছিল ; আজ
তাদের স্বযোগ, আজ তাদের বক্রণ সহায়, পবনদেব সাথী ;
মহা গর্জন, বিকট-হুকার, ফেনময়-অটুহাস দৈত্যকুল আজ
মহোদধির উপর রণতাপ্তবে মত্ত হয়েছে । তার মাঝে আমাদের
অর্ণবপোত ; পোতমধ্যে যে জাতি সঙ্গাগর ধরাপতি, সেই জাতির
নরনারী—বিচিত্র বেশভূষা, সিংহ চক্রেয় জায় বর্ণ, মৃতিমান আত্ম-
নিষ্ঠর, আত্মপ্রত্যয়, কৃষ্ণবর্ণের নিকট দর্প ও দস্তের ছবির জায়
প্রতীক্ষমান—সগর্ভ পাদচারণ করিতেছে । উপরে বর্ষার মেঘাজ্বর
আকাশের জীমূতমন্ড, চারিদিকে শুভ্রশির তরঙ্গকূলের লক্ষ-
বাক্ষ গুরুগর্জন, পোতশ্রেষ্ঠের সমুদ্র-বল-উপেক্ষাকারী মহাযন্ত্রের



হহকার—সে এক বিরাট সন্মিলন—তন্দ্ৰাচ্ছন্নের গায় বিশ্বয়রসে
 আপ্ত হইয়া ইহাই গুণিতেছি ; সহসা এ সমস্ত বেন ভেদ
 করিয়া বহু স্ত্রীপুরুষকণ্ঠের মিশ্রগোংগর গভীরনাদ ও তার-
 সন্মিলিত “কল ব্রিটানিয়া কল দি ওয়েভস্” মহাগীতধ্বনি কর্ণকুহরে
 প্রবেশ করিল ।

স্বামী বিবেকানন্দ ।



শুভ উৎসব

পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সংঘর্ষে আর যাহাই হউক, আমাদের পুরাতন বিচিত্র উৎসবকলা যে ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। দোল ছুগৌৎসবই কি, বার ব্রত অমুষ্ঠানাদিই কি, আর জাতকর্ম্ম অন্নপ্রাশন বিবাহাদি সংস্কারগুলিই বা কি, অন্ন দিন-মধ্যে আমাদের সকল ক্রিয়াকর্মেই যেন কি একটি পরিবর্তন সূত্র হইয়াছে—প্রাচীনকালে ইহার মধ্যে যে শুভ আনন্দটুকু ছিল তাহা বৃষ্টি আর ধাকে না, ইহার ব্যাপক সার্বজনীন ভাব সঙ্কুচিত হইয়া গিয়া ক্রমশঃ ইহা ব্যক্তিবিশেষের সমারোহময়ী তামসিকতামাত্রে আসিয়া না পরিণত হয়! কারণ, আমাদের দেশে, সমাজবন্ধনগুণেই হউক বা লোকের প্রকৃতিগুণেই হউক, উৎসবমাত্রেই চতুষ্পার্শ্বের সর্বসাধারণের যেন একটি চিরন্তন অধিকার ছিল; আমার গৃহের পূজাপার্বণে, আমার পারিবারিক সকল শুভকর্মে কেবলমাত্র আমি এবং আমার গৃহিণীর নিকটসম্পর্কীয়গণ নহে, কিন্তু নিকটস্থ সমস্ত গ্রামের, চতুষ্পার্শ্বস্থ সমস্ত পল্লীর অন্তরে উৎসব ঘনীভূত হইয়া আসিত, এবং সকলেরই মনে হইত যেন তাহার নিজের বাড়ীর কাজ। এক্ষণে নবগত সভ্যতা ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যরক্ষাচ্ছলে আত্মপরের মধ্যে ব্যবধান ক্রমশঃই হ্রাসক্রমণীয় করিয়া তুলিতেছে—আমরা সকল অধিকার আইনের পাকা মাপকাঠির সাহায্যে নূতন করিয়া বৃদ্ধিতেছি; স্মরণ্য হৃদয়ের



কাঁচা সরস সধক অক্ষুধ রাধা অনেক স্থলেই অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিতেছে। ফলে, যে সকল উৎসবকলা হৃদয়ের তাপে এতদিন সজীব ও নবীন ছিল, জ্বলন্ত রক্তপ্রবাহ হইতে বঞ্চিত হইয়া সেগুলি ক্রমশঃ মৃত্যুর মত হিমশীত হইয়া আসিতেছে, এবং এই মৃত্যুহিম বিষণ্ণতাটুকু ঢাকিবার জন্তই বাহিরের সাজসজ্জা ও সমারোহ-বাহুল্য অনিবার্য হইয়া উঠিতেছে।

কিন্তু মুখরাগলেপনে স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের তপ্ত লাবণ্য-সফার-চেষ্টার মত উৎসব-শ্রীসম্পাদনে এই সমারোহাভাস সম্পূর্ণ নিষ্ফল। উৎসবের সহস্র চকল আলোকরশ্মি জনতার চিত্তাক্লিষ্ট ললাটে ও উৎসাহহীন দ্বন্দ্বমুখে প্রতিফলিত হইয়া আমাদের শীর্ণ মূর্তিখানিই ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশ করিয়া দেয়। পূর্বে হৃদয়ের সধকাধিকারে যখন আইনের এত চুলচেরা সূত্র বিভাগ ছিল না, একের উৎসব তখন দেশের হইয়া উঠিত। উদ্যোগপক্ষের ভারও তখন পাঁচজনের মধ্যে স্বেচ্ছায় বণ্টন করিয়া দেওয়া হইত এবং উত্তরা-কাণ্ডেও সকলের সমবেত বহু চেষ্টা উৎসাহ আনন্দে উৎসবকলা সর্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ হইয়া উঠিত। নব্যত্বের নাগরিক অধিকার-অনধিকার-বিধি তখনও হয় নাই—সুতরাং আমার কাছে খাটিয়া দিতে পাঁচজনের অনধিকার সঙ্কোচও বোধ হইত না এবং নিজের কাজের ভার পাঁচজনের উপর চালাইয়া দিতে এ পক্ষেরও কোনরূপ বিধা মনে আসিত না। কেহ আটচালা নির্মাণ-কার্য পরিদর্শনে নিযুক্ত হইত, কেহ দীপ জ্বালিবার ব্যবস্থা করিত, কেহ কদলীপত্র সংগ্রহ করিয়া আনিত, কেহ কটিবন্ধ দৃঢ়রূপে জড়িয়া পরিবেষণে লাগিয়া বাইত, কেহ বা ক্রমাগত ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইত, কেহ বসিয়া বসিয়া কেবল পরামর্শ সরবরাহ



করিত, নিত্যই কোন কাজ না পাইলে ডাক্তার ও যোড়লী করিয়া লোকে নিজের একটা কর্ম গড়িয়াও লইত। এইরূপে নিশ্চেষ্ট ঐদাস্তভরে দেখিবার অবসর না পাওয়ায় এবং উৎসব-সৌষ্ঠব-সম্পাদন-বিষয়ে কথঞ্চিৎ নিজহস্ত উপলব্ধি করিয়া সকলেই আপনাকে ইহার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে অনুভব করিতে পারিত; এবং ইহা হইতেই একের উৎসব সাধারণের হইয়া সমধিক সরস ও সজীব হইয়া উঠিত, এবং বৃহৎ সমাজের সর্বত্র একটি অখণ্ড সৌষ্টবলাভে সমধিক মনোজ্ঞ মৌল্য প্রতিষ্ঠাত হইত।

এখনকার উৎসবগুলি কিন্তু ক্রমশঃই যেন আপিসী ছাচে গঠিত হইয়া উঠিতেছে—তাহার মধ্যে দেনাপাওনা হিসাবপত্রের হাজায় যত অধিক, আনন্দ আর সে পরিমাণে নাই। পূর্বে যে দেনাপাওনার সম্বন্ধ আদৌ ছিল না তাহা নহে, এবং হয়ত সূক্ষ্ম-রূপে বিচার করিয়া দেখিলে আর্থিক সম্বন্ধ তখনও এখনকার যত প্রবল ছিল, কিন্তু অন্য প্রকার সম্বন্ধের আবরণে এই হিসাবী সম্বন্ধটা তখন কোথাও বড় প্রবল হইয়া আত্মপ্রকাশ করিবার অবসর পাইয়া উঠে নাই। ব্রাহ্মণ ফলাহারের পর দক্ষিণা না লইয়া বাড়ী ফিরিতেন না, কিন্তু দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে এমন একটি মধুর সম্বন্ধ ছিল যে, দক্ষিণার আধিক্য তাহার মধ্যে স্থান পাইত না। নাপিত ক্ষৌরকাণ্ডা সারিয়া যে রিক্তহস্তে গৃহে ফিরিত তাহা নহে, সেকালে বরঞ্চ পাওনাগুণ্ডা এখনকার অপেক্ষা অনেক বেশীই ছিল, কিন্তু নাপিতের সহিত সম্বন্ধ এমনি যেন সে বিনা অর্থও ক্ষৌরকাণ্ডা সম্পাদন করিয়া ঘাইত এবং উক্ত কাণ্ডা না করিলেও কর্তা তাহাকে অর্থসাহায্য করিতেন। কুস্তকার



শুভ কার্যের দিনে শুটকতক চিত্রিত নূতন ভাণ্ড আনিয়া না দিলে যেন কর্ণই বরু হইয়া থাকে, পরমা দিয়া বাজার হইতে কিনিয়া আনিলে উৎসবের অঙ্গহানি হয়। সকলেরই সঙ্গে আমাদের এইরূপ একপ্রকার আত্মীয়তাবন্ধন—এবং উৎসবাদিতে এই আত্মীয়তাটুকু যেন সম্যক সুদীর্ঘায়তের অবসর পায়। সেই ক্ষণই ময়ূরপাঠের ব্রাহ্মণ হইতে শুরু করিয়া কামার কুমোর ধোলা নাপিত হাড়ি ডোম পর্য্যন্ত যে যেখানে আছে, সকলেরই নিজ নিজ মর্যাদায়ুসারে উৎসবক্ষে স্থান নির্দিষ্ট আছে—কাহাকেও বাদ দিলে চলে না।

কিন্তু এখন ইংরাজী পণ্যশালার অঙ্গুগ্রহে যান্ত্রিক ভাবেই অনেক কার্য নিঃশব্দে সমাধা হইয়া উঠে। এক কলমের আঁচড়ে হারিসন হাথাওয়ে, হোয়াইটাওয়ে লেড্‌ল, অস্‌লর, লাজারাসের ভবন হইতে যাহা কিছু আবশ্যক আনাইয়া লওয়া যায়; এমন কি, নাপিত, পাচক, পরিবেষকাদিও সংগ্রহ করিতে বিলম্ব হয় না। কিন্তু আমাদের পণ্যক্রিয়ার মধ্যে সজীব সজ্জদয় মনুষ্যত্বের মধুর সংস্পর্শ যে একটি নিগূঢ় আনন্দ ছিল, ইহাতে সেটুকু দিতে পারে না স্বীকার করিতে হয়।—তখনকার দিনে বড়লোকের বাড়ীতে কোন ক্রিয়াকর্মোপলক্ষে মাসেক কাল পূর্ব হইতে নানাবিধ পণ্যভার লইয়া দোকানী পসারীরা গতিবিধি শুরু করিত। শালগুয়াল ভাল ভাল কাশ্মীরী শাল ও রুমাল লইয়া আসিত, মুর্শিদাবাদ ও ঘাটাল অঞ্চলের বণিকেরা নানাবিধ গরদ তসর ও রেশমী বস্ত্র আমদানি করিত, ঢাকা শান্তিপুর করাসডাঙ্গা সিমলার বেপারীরা কত প্রকারের সুন্দর ও বিচিত্রপাড় কার্পাসবস্ত্র এবং পশ্চিমী ফেজীরী বেনারসী ও



চেলির জোড় লইয়া উপস্থিত হইত। এতদ্বিধ, স্বর্ণকার কৰ্ম্মকার মালাকার ময়রা গোহালা পাখরওয়াল কাংশ-পিতল-বিক্রেতা—নানানু জনে নানাবিধ কৰ্ম্মমাসে নিত্য গতাগত করিত। এমন কি, বেদানার বস্তা লইয়া বিদেশী কাবুলীওয়াল পর্যন্ত বাদ বাইত না। কিন্তু এ গতিবিধি নিত্যই বাহিরের লোকের মত ছিল না, এবং এই খরিদ-বিক্রয়টুকুর মধ্যেই তাহাদের সমস্ত সম্বন্ধ শেষ হইয়া বাইত না। সকলেই উৎসাহসহকারে উৎসবের নানাবিধ অনুষ্ঠান-বিষয়ে পাঁচটা প্রসঙ্গ উত্থাপন করিত, মন্তব্য দিত, প্রশ্ন করিত, কোথায় কি হইবে না-হইবে দেখিয়া শুনিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত, কাজের দিনে বাড়ীর ছোট ছোট ছেলেপুলেগুলিকে লইয়া উৎসব দেখিতে আসিত, এবং পুরাতন কাবুলীওয়াল তাহার সখের জরীর কোঠা গায়ে দিয়া প্রসঙ্গমুখে বারমুখে আসিয়া প্রহরী হইয়া দাঁড়াইত। নিত্যই জড়-বিনিময় মাত্র না হইয়া আমরা তাহাদের পণ্যসামগ্রীর সহিত অন্তরের শুভ প্রীতিও অনেকখানি করিয়া লাভ করিতাম, এবং মূদ্রাখণ্ডের সহিত উৎসবের ভাগও কতক পরিমাণে দিতাম। এই যে অন্তরে অন্তরে “ফাউ” আদান-প্রদানটুকু ইহাতেই বিশেষ আনন্দ, এবং এইটুকুর জন্তই আমাদের মধ্যে আর্থিক সম্বন্ধে হীনতা সহজে দেখা যায় না।

কেবলি যে বাহিরে বাহিরে এইরূপ গতিবিধি ও আদান-প্রদান ছিল তাহাও নহে। অন্তঃপুরে কুস্তকারশ্রমী নুতন বরণডালা সাজাইয়া আনিয়া দিত, মালিনী নিত্য নবনব ফুলভার বোগাইত এবং ফুলসজ্জার জন্ত নুতন নুতন ফুলের গহনা প্রস্তুতের ব্যবস্থা করিত, নাপিতানী দিদিঠাকুরাণী ও বধূঠাকুরাণীদিগের কোমল পদপল্লবে স্ফায়া ঘষিয়া আনুতা পরাইয়া দিয়া বাইত, তাঁতিনী



নূতন নূতন পাড়ের মনোহারিণী নীলাবরী ও বিচিত্র বর্ণের পাটকা লইয়া আসিত। গোয়ালিনী মধ্যাহ্নভোজনাগ্রে, আর কিছু না হউক, গোয়ালাপাড়ার ছইটা মস্তব্য শুনাইয়া বাইত, এবং পাড়ার বৃদ্ধা ব্রাহ্মণ-ঠাকুরাণী সহস্রকণ্ঠিত করগাছি পৈতাম্বর সূতা আনিয়া দিয়া পা ছড়াইয়া গল্প করিতে বসিতেন। এই এতগুলি বর্ষায়সী ও যুবতী-সমাগম যে নিতান্ত যান্ত্রিকভাবে সাধিত হইত না, সে কথা বলাই বাহুল্য। হস্তপরিহাস গল্পশুভ্রন সমালোচনা বিধিব্যবস্থা-নির্ধারণ ও নানা অনাবশ্যক উপদেশ পরামর্শ ও বিচার-প্রসঙ্গে বয়স ও অবস্থার তারতম্য ঘুচিয়া গিয়া সকলের মধ্যে সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ ও সরস হইয়া উঠিত—দেনা-পাওনার সম্বন্ধটুকু আদৌ প্রকাশ পাইত না। সকলেই যেন আত্মীয়-পরিজনবর্গের মধ্যে—যেন একটি বৃহৎ একায়বর্তী পরিবারের নানা অঙ্গ।

এইরূপে আমাদের প্রত্যেকের কোন শুভাহুষ্ঠানের মধ্যে অলক্ষিতে এই এতগুলি লোকের শুভ কামনা কার্য্য করে, এবং ইহাতেই আমাদের সামান্য ক্রিয়াকর্ম্মও বৃহৎ উৎসবে পরিণত হয়। নব্যতন্ত্র রক্ষতচক্রকে ঘেরূপ সকল সম্বন্ধের মধ্য-বিন্দু করিয়া তুলিতে চাহে, তখন তাহা ছিল না। ধনের পদমর্যাদা বধেষ্টে থাকিলেও কুলের গৌরবকে প্রীতির সম্বন্ধকে সে লঙ্ঘন করিতে পারিত না। এমন কি, বেতনভুক সামান্য দাসদাসীদিগকেও সংসারের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে দেখা হইত, এবং সুগৃহিণী ইহাদের কেহ ক্ষুধিত থাকিতে নিজের মুখে অন্ন তুলিয়া দিতে কুন্তিত হইতেন। এই যে হৃদয়তাটুকু—এই যে ব্যথার ব্যথী ভাব—ইহা আর কিছুতেই থাকে না। পরিজনবর্গের সহিত পূর্বের মত এক-সংসারভুক্ত অবশ্য-পোষ্য-সম্বন্ধ



যুটিয়া গিরা বিদেশী ইংরাজের দৃষ্টান্তে কেবলমাত্র কাজ আদায় ও বেতনদানের সম্বন্ধই দিনে দিনে বদল হইয়া উঠিতেছে। এমন কি, পাকা নব্যতন্ত্রিগণের নিকট সেকালের মাঠাকুরাণী দিদিঠাকুরাণী প্রভৃতি সম্বন্ধসূচক সম্বোধনগুলি পর্যন্ত বিরক্তিকর হইয়া উঠিয়াছে।

এই সকল সামান্য পরিবর্তন হয়ত আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অতি তুচ্ছ ঘটনা, এবং উৎসবপ্রসঙ্গে এ সকল তুচ্ছ বিষয়ের উত্থাপন না করিলেও চলিত, কিন্তু ইহাতে এইটুকু অন্ততঃ বুঝা যায় যে, পূর্বে যেখানে প্রীতিসূচক আত্মীয়তাই স্বাভাবিক ছিল, এক্ষণে সেখানে নিকট-সম্বন্ধস্থাপনই অনেক সময় অত্যন্ত অশোভন ও অসঙ্গত বলিয়া ঠেকে। আশ্রিতজন এক্ষণে পূর্বের স্বায় হৃদয়ের আশ্রয় আর বড় পায় না, এবং আশ্রয়দাতাও তাহাদের হৃদয়ের অধীশ্বর হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। অন্তরে অন্তরে কাহারও সহিত কাহারও কোনরূপ অনিবার্য যোগ নাই।

আমাদের উৎসবে এই অন্তরেরই প্রথম প্রতিষ্ঠা। সমারোহ-সহকারে আমোদ-প্রমোদ করায় আমাদের উৎসবকলা কিছুমাত্র চরিতার্থ হয় না, কিন্তু তাহার মধ্যে সর্বজননের আন্তরিক প্রসঙ্গতা ও শুভ ইচ্ছাটুকু না থাকিলে নয়। উৎসবপ্রাপ্ত হইতে সামান্য ভিক্ষুকও যদি দ্বানমুখে ফিরিয়া যায়, শুভ উৎসব ধেন একান্ত ক্ষুণ্ণ হয়। যাত্রা হউক, কথ্য হউক, রামায়ণগান হউক বা চণ্ডীপাঠ হউক, যখন বাহা হয় উন্মুক্ত গৃহপ্রাপ্তি আসিয়া সর্বসাধারণে তাহাতে অকাতরে যোগদান করে, এবং সকলের সহিত একত্র হইয়া গৃহকর্তা তাহা উপভোগ করেন।

কেবলি যে বড়বড় পূজাপার্বণে এই বিধি তাহা নহে, ছোটখাট বার বার, যে কোন অনুষ্ঠানেই এই শুভ ভাবটি রক্ষণীয় ;

এবং অমুষ্ঠানের সংখ্যাও নিতান্ত কম নহে। আজ পূজা, কাল ত্রত, পরমঃ গঙ্গাদ্বারানের যোগ, অল্পদিন কোন শুভতিথি বা বার-মাহাত্ম্য, কখনও নবান্ন, কখনও পৌষপার্বণ, কোন দিন বা অরুণ, জ্যৈষ্ঠে জামাতৃ-পূজন, কার্তিকে ভ্রাতৃবিতীয়া, মধ্যো রাশিযজ্ঞ, কোন মাসে পুনের বিবাহ, কোন দিন শোভের জাতকর্ম্য তাহার পর জন্মতিথি, হাতেখড়ি, সাধ, সৌমস্তোরয়ন, পঞ্চাবৃত্ত—যেন একটির পর একটি শুভ অমুষ্ঠান ও আনন্দ-প্রবাহের অন্ত নাই। প্রচলিত প্রবচনে বারো মাসে তের পার্বণ মাত্র স্থান পাইয়াছে, কিন্তু গণনায বোধ করি প্রতিমাসে ত্রয়োদশ সংখ্যা দাঁড়াইয়া যায়, এবং ধর্ম্ম-কার্য্যের সহিত জড়িত হইয়া সকলগুলিই আমাদের শুভকর্ম্ম। দান, ধ্যান, সন্মুষ্ঠান ও দশজনের সহিত আত্মীয়তা-প্রকাশ ও সকলের আনন্দবর্দ্ধন করাই উদ্দেশ্য, একটা উপলক্ষ পাইলেই হয়।

যাহাতে আমার নিজের কিছুমাত্র আনন্দ আছে, সেই আনন্দটুকু যখন দশজনের মধ্যে বিতরণ করিতে চাহি, তখন উপলক্ষের অভাব ঘটিবার কোনও কারণ দেখা যায় না। আমার আনন্দে সকলের আনন্দ হউক, আমার শুভে সকলের শুভ হউক, আমি বাহা পাই তাহা পাঁচজনের সহিত মিলিত হইয়া উপভোগ করি—এই কল্যাণী ইচ্ছাই উৎসবের প্রাণ। অনেক ছোটখাট বিষয়েও আমি হয়ত এতটুকু আনন্দ পাই, নিজের বাড়ীখানি হইলে সুখী হই, পুকুরিনীটি থাকিলে লাগে ভাল, গোকগুলির কল্যাণকামনা করি—গৃহপ্রবেশ, জলাশয়-প্রতিষ্ঠা, গোষ্ঠাষ্টমী এইরূপ এক একটি উৎসব উপলক্ষে পাঁচজন ব্রাহ্মণপণ্ডিত, আত্মীয়স্বজন, পাড়াপ্রতিবেশী, পোস্তপরিজন, দীন-হুঃখীকে আহ্বান করিয়া যথাসাধ্য সংকারে আমার গৃহের ভাগী



করিতে চাহি। আমি যে আজ একজন গৃহহীনকে আশ্রয় দিতে পারি, তৃষ্ণার্তের পিপাসা নিবারণ করিতে পারি, অবোলা জীবের কিছুমাত্র সুখবিধান করিতে সমর্থ হই, আমার এ সৌভাগ্য অন্তর যেন সকলের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দিতে চাহে। সাবিত্রীত্রত, ভ্রাতৃষিঠীয়া, জামাতৃষষ্ঠী উপলক্ষে আপন প্রিয়জন ও স্নেহাস্পদগণকে যথাযোগ্য সংস্কার করিয়া নিজেকে ধন্ত মনে হয়, বিধাতা আমাকে যে এত সৌভাগ্যসুখ দিয়াছেন, ইহা সকলের সহিত বণ্টন করিয়া না লইলে ইহার সফলতা কোথায় ? উৎসব ইহারই উপলক্ষ। সেইজন্য আমাদের উৎসবে ভাবেরই প্রাধান্ত—বাহিরের সমারোহ তাহার প্রধান অঙ্গ নহে। পতি-ত্রতা স্ত্রীর হাতের সামান্য লোহা ও মাথার সিন্দূর যেমন আমাদের মনে একটি অনির্কচনীয় লক্ষ্মীশ্রী সৃষ্টি করিয়া দেয়, নেত্রবলসী অলঙ্কাররাজি তাহা পারে না,—প্রীতি-বিকশিত উৎসবের সামান্য মঙ্গলঘট ও চূত-পল্লবগুচ্ছ সেইরূপ আমাদের অন্তরে একটি শিব-সুন্দর ভাব সঞ্চারিত করিয়া তুলে, সহস্র তাড়িতালোক ও বিলাস-উৎসে সে শুভ কমনীয়তা সঞ্চার করিতে পারে না। বিলাসের মণিমুক্তা আমাদের বাহিরের ঐর্ষ্যের পরিচায়ক মাত্র, কিন্তু উৎসবের ধাতুদূর্ব্যমুষ্টি অন্তরের অকৃত্রিম শুভ কামনার বাহ্য চিহ্ন। ইহার সহিত ধনীর রত্নভাণ্ডারেরও তুলনা সম্ভব নহে। ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীতের মত ইহার মধ্যে যেন কেমন একটি অক্ষুর শুচিতা আছে—বাহ্যভূষণ-বাহ্যল্যের সহিত তাহার কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর।



অশ্রুজল

জীবনের সুখ-দুঃখের স্মৃতিতে সুখ লুকাইয়া একবারও কাঁদে নাহি, সংসারে একরূপ লোক দেখা যায় না। সকল যশুঘোরই হৃদয়তন্ত্রীতে এক একটি সুর কেমন লাগিয়া থাকে, সেই সুরে যেদিন আঘাত পড়ে সেইদিন মহসা যেন তাহার জীবনে কি পরিবর্তন সাধিত হয়, তাহার হৃদয়ের মর্মে মর্মে কি যেন তড়িৎ-প্রোত ছুটিয়া বেড়ায়; আপনাকে কোথায় যেন ধরিতে পাইয়া সে একবার পশ্চাতে ফিরিয়া দেখে, তাহার নয়ন বাহিয়া অশ্রুজল ধরিতে থাকে। কিন্তু কোন্‌খানে কবে কি আঘাত লাগিয়া তাহার হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠে, সে কি তাহা বুঝিতে পারে? সে আপনার মনে কাঁদিয়া যায়—না কাঁদিয়া সে থাকিতে পারে না—কিন্তু তাহার সেই হৃদয়মণ্ডিত অশ্রুবিন্দুতে কত দিনের হয়ত গভীর সুখ-দুঃখের স্মৃতি আছে, সে তাহা জানেও না। প্রথম উদ্ভাস বখন সংঘত হইয়া আসে, তখন যদি সে ভাবিয়া দেখে, তবে হয়ত দেখিতে পায়, বিন্দুর মধ্যে হারাইয়া যাওয়া যায় এমন কিছু আছে—সেখানে সকলই শূন্য নহে।

অশ্রুজল ত আর কিছু নহে, হৃদয়ের নীরব ভাষা। হৃদয় উধলিয়া উঠিয়া আপনাতে আর থাকিতে পারে না, বাহির হইয়া পড়ে। স্মৃতরাং অশ্রুবিন্দুর মধ্যে হৃদয় কতখানি লুকাইয়া আছে বলিতে হইবে না। কিন্তু হৃদয়ের এই অশ্রুভাষায় কি ভাব ব্যক্ত হয়? হৃদয়ের ভাষা ত আরও আছে। নৈরাশ্রের বিজন কাননে



যখন আত্মহারা দীর্ঘনিশ্বাস শিহরিয়া উঠিয়া মিলাইয়া যায়, তখন সেও ত সেই হৃদয়ের ভাষা ; আসন্ন নিক্রান্তের বিবর্ণ অধরে যখন কীণ দীপনিধার মত একটি স্নান অশ্রুতে রক্ত-সৌন্দর্য্য বিকশিয়া উঠে, তখন সেও ত সেই অবসর হৃদয়ের নীরব ভাষা । তাই বলিয়া এসব ভাষাই ত আর সম্পূর্ণ এক নহে—ভাবের সাদৃশ্য থাকিতে পারে যাহ, কিন্তু একভাব হওয়ার সম্ভাবনা বিরল । অশ্রুজলের মর্ম্মের ভাব দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত এক নর -বেশ একটু তফাৎ আছে ।

নয়নে অশ্রু বহে কখন ? অভিমান, অশ্রুতাপ, হৃদয়ের সুগভীর বেদনাতেই ত অশ্রুজলের উচ্ছ্বাস । আনন্দেও অশ্রু ধরে । সুখের শুধু অশ্রু নাই । দীর্ঘনিশ্বাসও হৃদয়ের বেদনা উচ্ছ্বাস কিন্তু হৃদের মধ্যে ভাবের তারতম্য কি ? দীর্ঘনিশ্বাসে অতৃপ্তির ভাব কিছু বিশেষরূপে অভিযুক্ত, অশ্রুজলে শাস্তির ভাব । হৃদয় যখন বঞ্চিত হইয়া আপনার মধ্যে মিলাইয়া থাকিতে চায়, একা একা আপনার মধ্যে যখন সে অজ্ঞাতবাস করে, তখন তাহার গ্রহিতে গ্রহিতে দীর্ঘনিশ্বাস হাহাকার করিয়া ধরে । দীর্ঘনিশ্বাসে হৃদয়ের ভয়ানক অহুর্দাহ হয়, হৃদয় জলিয়া পুড়িয়া থাকে হইয়া যায় । অশ্রুজলে এ দাবানল ভাব নাই, হৃদয় যেন গলিয়া গিয়া অশ্রুরূপে ঝরিয়া যায় ; বেদনার অনেকটা উপশম হয় । দীর্ঘনিশ্বাসে অশ্রুজলের এ তৃপ্তি কোথায় ? হৃদয় গুমরিয়া গুমরিয়া প্রতিদিন অবসন্ন হইয়া আসে, প্রাণে যে শেল বিধিয়া থাকে, তাহার আলা আরও বৃদ্ধি পায়, কিন্তু সে শেল ধুচে না । এই দীর্ঘনিশ্বাস যখন বুকে আসিয়া আটকাইয়া যায়, সহসা আসিতে আসিতে আর আসিতে পারে না, তখন লোকে উন্মাদ-হাসি হাসিয়া উঠে । তখন সে এক দারুণ যন্ত্রণার অবস্থা—ভাবিতে



করনা শিহরিয়া উঠে। সহসা উধলিয়া উচ্ছ্বাস রুদ্ধ হইয়া গিয়া হৃদয় পাষাণের মত বেন হিম হইয়া যায়। অশ্রু যখন ঝরিতে পায় না, হৃদয়েই লুকাইয়া আসে, তখন উদ্গাদ-হাসি দেখা দেয় না, অধরে হাসি মিলাইয়া যায়—জ্ঞান, ক্ষীণ, নিভ নিভ। সে বাতনায় শান্তি আছে,—দীর্ঘনিশ্বাসের রৌদ্রতপ্ত মরুভূমিভাব নাই।

অভিমান যখন চোখের জল মুহুরিতে থাকে, তখন নৈরাশ্রের মধোও কিছু আশা আছে—তখন অভিমানকে শাস্ত করা যাইতে পারে, পুরাতন স্মৃতির উপর একটা আবরণ টানিয়া দেওয়া যায়। কিন্তু অভিমানের চোখে যখন জল নাই, হৃদয়ে শুধু দীর্ঘনিশ্বাস উঠিয়া মিলাইয়া যায়, তখন তাহাকে শাস্ত করা দায়, তখন অবস্থা বড় ভাল নয়। অহুতাপও চোখের জল ফেলিলে, ভরসা হয়, পুরাতন স্মৃতি ভুলিয়া এইবারে সে বৃষ্টি নব-উত্তমে কাজে লাগে। আর অহুতাপের হৃদয়ে যখন কেবলই দীর্ঘনিশ্বাস উধলিয়া উঠে, তখন স্মৃতির দংশনে দংশনে সে কাতর, তাহার অবস্থা মৃত্যুর সন্নিকট।

কিন্তু হৃৎকের গভীরতা কোথায়—অশ্রুজলে কি দীর্ঘনিশ্বাসে ? এ কথা বলা কিছু কঠিন। দীর্ঘনিশ্বাসের মধোও যেমন, অশ্রুজলের হৃদয়েও সেইরূপ হৃৎক লুকাইয়া থাকিতে পারে। স্বতন্ত্র ভাবের হৃদয়ে স্বতন্ত্র ভাবের উচ্ছ্বাস। তবে রুদ্ধ প্রবাহ, রুদ্ধ উচ্ছ্বাস-যন্ত্রণাই যে অধিক কষ্টদায়ক সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যেখানে হৃদয় বড়ই গভীর সেখানে উচ্ছ্বাস ততই কম বলিয়া উপলব্ধি হয়, যন্ত্রণাও সেখানে অধিক বলিয়া বোধ হয় না, কিন্তু বাস্তবিক সেখানে যন্ত্রণার অবসান নাই। লঘু হৃদয় সহজেই



ঝরিয়া যায়, যন্ত্রণা সেখানে আকুড়িয়া থাকিতে পারে না। গভীর হৃৎথের দীর্ঘনিশ্বাসে বড়ই কষ্ট—চোখে জল আসিলে কষ্টের কতকটা উপশম হয়।

দীর্ঘনিশ্বাসে প্রাণ কাঁপিয়া উঠে—হৃদয়ের মধ্যে এমন একটা উলটুপালটু হয় যে, কিছুই বেন ধরিয়া ছুঁইয়া পাওয়া যায় না। দীর্ঘনিশ্বাসে সাধনা পায় না। অশ্রুজলে কতকটা তবু সাধনা আছে—আপনাকে ব্যস্ত করিয়া তৃপ্তি হয়। সমুদ্রখীর নিকট কাঁদিয়া অনেক সময় সুখ আছে, কিন্তু দীর্ঘনিশ্বাস আপনার বাহিরে প্রায় বাহির হয় না। দীর্ঘনিশ্বাসে জীবন বেন বাহির হইতে চায়, কিন্তু পারে না, প্রতি উন্মত্তে আঘাত খাইয়া ফিরিয়া আসে।

অশ্রুজলে প্রেমের মধুর ভাবটী বড় পরিদুট—নৈরাশ্র নয়, হাহাকার নয়, প্রেমের মধ্যে যে একটা পবিত্র সৌন্দর্য চিরবিকশিত—সেই ভাবটী। সে ভাবে উগ্রভাবের একেবারে অভাব; তাহা বড়ই কোমল, মধুর, পবিত্র। তাহার তুলনায় দীর্ঘনিশ্বাসের কতকটা রোদ্র ভাব বলা হইতে পারে। অশ্রুজলের এই মধুর ভাবেই প্রধান সৌন্দর্য। এ ভাবে যতই ডুবা যায় ততই তাহার গভীরতার উপলব্ধি হয়। সমস্ত জগৎকে আপনার মধ্যে আনিয়া আমরা এই ভাবে ডুবিয়া যাই, যত ডুবি আপনাকে ততই ভুলিতে থাকি। এমন আত্মবিস্মৃতি আর বুঝি কোথাও নাই।

দীর্ঘনিশ্বাসে আপনাতে আর আপনি থাকি না, কিন্তু আপনাকে পাঁচজনের মধ্যে হারাইয়া ফেলি না। দীর্ঘনিশ্বাসে আত্মহত্যা; অশ্রুজলে আত্মবিসর্জন। দীর্ঘনিশ্বাসে হৃদয় ছারখার হইয়া গিয়াছে, প্রতীকারাশা বিরল; অশ্রুজলে হৃদয়ের মোহ



ধুইয়া গিয়াছে, কিন্তু হৃদয় যায় নাই। অশ্রুজলে জগৎ ডুবিতে পারে; দীর্ঘনিশ্বাসের কাছে জগৎ যেঁসিতে পারে না—তাপ বড় প্রবল।

কিন্তু এ ছলনার সংসারে স্বর্গের অশ্রুজল ত প্রায় মিলে না। এখানে সকল বিষয়েই প্রতারণা আছে, হৃদয়ের ভাষায় ভান না থাকিবে কেন? হৃদয়হীন লোকে হৃদয় লইয়া উপহাস করে, হৃদয়ের বিরুদ্ধে সারি সারি শাপিত মন্ত ও নিষ্ঠুর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ খাড়া করিয়া দিয়া তামাসা দেখে। এই কৃত্ত হৃদয়ের অশ্রুজল বিজ্ঞান অরণ্যের শাস্তিনিকেতনেই ঝরিয়া যায়। আর লোকালয়ে তার কণ্ঠ-স্ফীত-বদন চোখ মিটিমিটি করিয়া ছ'এক ফোঁটা নীরস জল বাহির করে; তাহার চারিদিকে পরহৃদয়চ্ছিন্নাঙ্গুসন্ধিৎসুর আইনবদ্ধ বাহবাগুলি চাটুকারের মত ঘিরিয়া বসে, ইহাই তাহার অভিলাষ। কিন্তু যেমন লোকই হোক, তাহার হৃদয়ে স্বর্গের অশ্রুজল একদিন না একদিন দেখা দিবেই।

অশ্রুজলের মন্ত আমাদের বন্ধু কেহ নাই। এই অসৌম্য সংসার-সমুদ্র মন্বন করিয়া অমৃত বাহা উঠে—অশ্রুজল। দীর্ঘনিশ্বাসের তীব্র দংশন সেখানে নাই—সেখানে কি শ্লগভীর ঘেঁহু, শাস্তিময় প্রেম! রোষে, ক্ষোভে, অভিমানে আমরা বধন আপনাকে ছাড়িয়া দি, তখন অশ্রুজল যদি দেখা না দেয়, তাহা হইলে প্রাণ কি বাঁচে? আমরা পদে পদে হৃদয়ে অনন্ত নরককুণ্ড রচনা করিতে বসি, কিন্তু এ সংসারে নাকি অশ্রুজল আজিও শুকায় নাই, তাই নরকযন্ত্রণার মধ্যে স্বর্গের সোপান দেখিয়া বিস্মিত হই। অশ্রুজলে যে কি পবিত্রতা আছে তাহা বলিরা শেষ করা যায় না।



বুকে যাহার দীর্ঘনিশ্বাস বিবিধা আছে, তাহার জীবন শেষ হইয়া গিয়াছে। তাহার আশা-ভরসা কিছুই নাই। অশ্রুজলে দলিত হৃদয় নবজীবন লাভ করে। অশ্রুজল সম্পদে সুখ, বিপদে বন্ধ, রোগে আরাম, শোকে শান্তি। অশ্রুধোত হৃদয় ঐবলোকের ছায়া।

হে অশ্রুজল ! নিশ্বাস-তপ্ত হৃদয়ে তুমি চিরদিন শান্তি বর্ষণ কর, সেখান হইতে নিশ্চয় হাহাকার ঘুচিয়া যাক। সংসারের শোক-তাপ-ভয়ে জরজর প্রাণে তুমি সেই অভয়পদের প্রতিষ্ঠা কর, ধরণীর পাপভার লবু হোক। তুমি এস, এই ক্ষুদ্র মানব-শিশুর মলিন হৃদয়ে একবার এস, এ মকভূমি ঘুচিয়া যাইবে। একবার শুধু এস, তুমি এস।

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর।



জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি

“নানান্ দেশের নানান্ ভাষা,

বিনা স্বদেশের ভাষা পূরে কি আশা ?”

বঙ্গভাষা আজ আর উপেক্ষিত নহে,—বাঙ্গালী বলিয়া ঘাহারা গর্ব করেন, তাঁহাদের নিকট বঙ্গভাষা বরং অপেক্ষিত। যখন বাঙ্গালীর ছেলে, বঙ্গভূমির বকের উপর দাঁড়াইয়া বাঙ্গালা ভাষায় কথা বলা, বা বাঙ্গালা ভাষার গ্রন্থ অধ্যয়ন করাকে লজ্জাজনক, কতকটা বা প্রতাবাদজনক মনে করিতেন, সে দুর্দিন কাটিয়া গিয়াছে, সে যোহ ভাগ্নিগাছে।

মহাকবি কৃত্তিবাস হইতে কবিবর রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বহু মনসী বঙ্গসম্মান বঙ্গবালীর স্বর্ণমন্দির-রচনার সাহায্য করিয়াছেন; রাজা রামমোহন, প্রাচঃসরলীর বিজ্ঞানাগর, অমর বঙ্কিমচন্দ্র, চিন্তাশীল অক্ষয়কুমার প্রভৃতি বহু প্রতিভাশালী সারস্বতগণ সেই মন্দির-গাত্র নানাবিধ শিরসোন্দর্যো খচিত করিয়াছেন। বঙ্গভাষা এখন বাঙ্গালীর একটা প্রকৃত স্পর্ধার সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

যে জাতির নিজের পরিচয়যোগ্য ভাষা নাই, বা নিজের জাতীয় সাহিত্য নাই, সে জাতি বড়ই দুর্ভাগ্য। বাঙ্গালী ভারতের যে প্রাচীন মহা-বংশের ভগ্নাংশ, সেই প্রাচীন আৰ্য্য জাতির ভাষা এবং সাহিত্য-ভাণ্ডার অনন্ত ও অমূল্য রত্ন-রাজিতে পরিপূর্ণ। সুতরাং বাঙ্গালীকে নিজের জাতীয় সাহিত্য-প্ৰাণে সম্পূর্ণরূপে পরের প্রত্যাশী হইতে হয় নাই। জগতের অপর অপর শিক্ষিত



ও সমুন্নত জাতির সমক্ষে, নিজের জাতীয় সাহিত্য লইয়া দাঁড়াইবার যোগ্যতায় বাক্যলৌ এখন বঞ্চিত নহে,—এ কথা সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া বর্তমানে বঙ্গভাষার বতটা শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে, ইহাই যে বাক্ষি বঙ্গবাসীর পক্ষে পর্যাপ্ত, এ কথা আমি কদাচ স্বীকার করিতে পারি না।

ক্ষেত্র-কর্ষণ পরিশ্রম-সাধ্য কার্য্য হইলেও, সেই কর্ষিত ক্ষেত্রে বীজ-বপন ও উপযুক্ত সেচনাদির দ্বারা অকুরিত বীজের রক্ষণ এবং পরিবর্তন অধিকতর পরিশ্রম-সাধ্য ও বিবেচনা-সাপেক্ষ। অকুরিত শস্যের আপদ অনেক। সেই সমস্ত আপদ হইতে রক্ষা করিয়া শস্যকে ফলোন্মুখ করিয়া তোলা বড়ই দক্ষতা-সাপেক্ষ। যে সময়ে জল-সেচনের প্রয়োজন তখন জল, যখন আতপ-নিবারণের প্রয়োজন তখন ছায়ায় ব্যবস্থা আবশ্যক। এই সমুদয়ের কোন একটির অভাবেই কর্ষিত ভূমি শস্যশালিনী হইতে পারে না। বর্তমান সময়ে আমাদের বঙ্গভাষার সমক্ষেও ঐ রীতির অনুসরণ বিধেয়। বহুকাল, বহুশত বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম-সহকারে কৃষ্টিবাস প্রভৃতি সাধকগণ তাঁহাদের আরাধ্য বঙ্গভাষার ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়া গিয়াছেন। পরবর্তী অনেক প্রতিভালব্ধ ব্যক্তি সেই কর্ষিত ভূমির উর্বরতা-বর্দ্ধনের নিমিত্ত নানা আয়াস করিয়াছেন। এখন দেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলের সেই ভূমির প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে; সকলেই স্নেহের আশায় সেই ভূমির দিকে লোলুপ নয়নে চাহিতেছেন; কত উচ্চ আশায় উৎকুল হইয়া নিজের মাতৃভাষার প্রতি ভক্তি ও আদর-সহকারে দৃষ্টিপাত করিতেছেন; এমন সময়ে—দেশবাসীর এই আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ, উৎকণ্ঠাপূর্ণ সময়ে—ঐ কর্ষিত ভূমিতে বীজ বপন

করিতে হইবে। স্মৃতরাং তাহাতে যে কত সতর্কতার প্রয়োজন, কত পূর্বাপর বিবেচনার প্রয়োজন, তাহা বঙ্গবাসিমাত্রেই বিশেষ বিবেচ্য। এত দিনের চেষ্টায় যে বঙ্গসাহিত্যের ক্ষেত্র পরিপাটী-রূপে প্রস্তুত হইয়াছে, আমাদের এবং আমাদের ভবিষ্যৎ-বংশধরগণের অবিবেচনার ফলে তাহা যেন নষ্ট না হয়,—তাহার উৎসাহিতা যেন কতকগুলি আবর্জনারাজনিক কারণদ্বারা দখলীভূত না হয়, ইহাই আমার অভিলাষ।

“বিশেষ বিবেচ্য” কেন বলিলাম, তাহাই বিবৃত করিতেছি। এত কাল অর্থাৎ প্রায় গত সার্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া বঙ্গভাষা যে ভাবে, যে গতিতে বঙ্গীয় জনসমাজে প্রসার লাভ করিতেছিল, এখন বঙ্গভাষার সেই গতির কিপ্রভা ক্রমেই বাড়িতেছে। পূর্বে ছিল, যাহারা শিক্ষিত—কি প্রভাচ্য, কি প্রাচ্য এই উভয়বিধ শিক্ষার কোন একটিতে যাহারা সম্পন্ন—বঙ্গভাষার কতিপয় কমনীয় গ্রন্থ কেবল তাহাদের—সেই অল্প সংখ্যক ব্যক্তিদের—অবসর বিনোদনের উপাদান মাত্র হইত। কার্যাস্তরবাবৃত্ত চিত্তকে কদাচিত্ প্রসন্ন করিবার ক্ষমতা তাহারা বঙ্গভাষার গ্রন্থাবলী পাঠ করিতেন। প্রকৃত পক্ষে তাহাদের লইয়া বঙ্গদেশ, যাহাদিগকে বাদ দিলে বাঙ্গালা দেশের প্রায় সমস্তই বাদ পড়ে, সেই বঙ্গের আপামর সাধারণের মধ্যে বঙ্গভাষার আদর কতটা ছিল? একপ্রকার ছিলই না বলিলেও অত্যাধিক হয় না। কৃত্তিবাস-কাশীদাস ব্যতীত অপর কয়জন বঙ্গসাহিত্য রচকের নাম বঙ্গের জনসাধারণের মধ্যে সুপরিচিত? শিক্ষিত জনসংখ্যার সংখ্যা সাত কোটি বঙ্গবাসীর তুলনায় মুঠিমের বলিলেও অতিরঞ্জিত হয় না। এই মুঠিমের সমাজে যে বঙ্গভাষা এত দিন আবদ্ধ ছিল,

এখন সেই বঙ্গভাষা অতি কি প্রগতিতে বাঙ্গালার সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রসার লাভ করিতেছে। সুতরাং এই সময়ে ভাষা বাহাতে সংযত-চরণে চলে, বাহাতে উজ্জ্বল না হয়, সে পক্ষে বঙ্গের জাতীয় জীবনের উদ্বোধন-কর্তাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আর সেই সঙ্গেই, আমাদের সুন্দরী মাহুভাষা কি উপায়ে সুন্দরীতমা হইতে পারে, তাহাও ভাবিতে হইবে। (কেবল গীতিকাব্য, মহাকাব্য বা গল্পগুচ্ছে জাতীয় সাহিত্য পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে না। জাতীয় সাহিত্যের বিরাট সৌধের চক্রে শিল্প, বিজ্ঞান, বাস্তবশাস্ত্র, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, ধর্মনীতি,—সর্ব প্রকার রঙ্গের সমাবেশ আবশ্যক। সর্ববিধ কলার বিলাসে জাতীয় সাহিত্য-মন্দির বিলসিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। অতএব তাহাকে অসঙ্কোচে ‘জাতীয় সাহিত্য’ বলিতে পারা যায় না। বর্তমান কালে, যখন বঙ্গভাষার প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি অরবিন্দুর নিপতিত হইবার উপক্রম হইয়াছে, তখন বিশেষ বিবেচনাপূর্বক ঐ ভাষার গতিকে বঙ্গবাসীর ভবিষ্যৎ অভ্যুদয়ের অমুকুল ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়া লইতে হইবে। (জাতীয়তা গঠন করিতে হইলে জাতীয় সাহিত্য-গঠন সর্বাগ্রে আবশ্যক।) সেই জাতীয় সাহিত্য কিরূপ ভাবে গঠিত হইলে আমাদের মঙ্গল হইবে, কি প্রকারে, কোন্ দিকে জাতীয় সাহিত্যের গতি নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিলে ভবিষ্যতে আমাদের ত্রিবৃদ্ধি সাধিত হইবে, সেই সম্বন্ধেই আমি ছই-একটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি।

আমাদের দেশে “শিক্ষিত” বলিতে আমরা কি বুঝি? সর্ব-সাধারণে কোন্ সম্প্রদায়কে “শিক্ষিত” বলিয়া স্বীকার করে? বর্তমান কালে আমাদের দেশে শিক্ষার কেন্দ্র যাত্র বিশ্ববিদ্যালয়।

ঘাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন, দেশবাসিগণ অসঙ্কোচে তাঁহাদিগকেই শিক্ষিত আখ্যা এবং শিক্ষিতের প্রাপ্য সম্মান প্রদান করেন। ভারতবর্ষের নানা বিপ্লবের মধ্যেও ঘাহারা পরম যত্নে বুক বুক রাখিয়া আমাদের প্রাচীন শাস্ত্ররাজি রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, সেই সংস্কৃতব্যবসায়ী অধ্যাপকবর্গের আসন দেশবাসী এখনও অনেক উচ্চে প্রদান করিয়া থাকেন ; যদি অধ্যাপকবৃন্দ আত্মমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারেন, তবে উত্তর-কালেও তাঁহারা সে উচ্চাসনের অধিকারী থাকিবেন সত্য ; কিন্তু সংখ্যাগত হিসাব ধরিলে, বঙ্গের প্রায় প্রতিপল্লীতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তির সম্ভাব পরিদৃষ্ট হয়। যে স্থানে হয়ত পূর্বে পাশ্চাত্য শিক্ষার আদৌ প্রচার ছিল না, বর্তমানে সে স্থানেও উক্ত শিক্ষার প্রতি লোকের আদর দেখা যাইতেছে। বেকরূপ ভাবে গত কতিপয় বৎসরের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষার ভূয়ঃপ্রচার ঘটিয়াছে, তাহাতে মনে হয়, অদূরবর্তী সময়ে যেখানে ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তির অভাব, এমন পল্লী বঙ্গে থাকিবে না। সুতরাং বঙ্গের ভবিষ্যৎ জন-মত পরিচালনের এবং জনসাধারণের মত-গঠনের ভার উক্ত শিক্ষিতগণের হস্তেই ক্রমে স্তম্ভ হইবে।

- ঘাহারা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া স্ব স্ব জন্মভূমিতে প্রত্যাবৃত্ত হইবেন, যদি অকপট ভাবে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহারা তাঁহাদের প্রতিবেশীদিগের চতুর্পার্শ্ববর্তী পল্লীসমূহের অনেক শ্রীবৃদ্ধি-সাধন করিতে পারিবেন। তাঁহাদের পল্লীবাসিগণ তাঁহাদিগের নিকটে অনেক আশা করেন। যে যে পল্লীতে তাহাদের বাস, সেই সেই পল্লীতে এবং তৎ তৎ সমাজের সর্ববিধ উৎকর্ষাপকর্ষের জন্য তাঁহারাই অনেকটা দায়ী। আর্থিক,



সামাজিক, নৈতিক এবং স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত উন্নতির জন্য দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় অনেকটা দায়ী, কেননা লোকের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস—যে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস বাদ দিলে মানুষের আর কিছুই থাকে না—সেই শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আকর্ষণপূর্বক, যদি তাঁহারা বিবেচনা-সহকারে লোক-মত পরিচালনা করিতে পারেন, তবে তাঁহাদের প্রতিবেশীরা অজ্ঞান মনে, তাঁহাদের প্রদর্শিত পথে চলিবে। যে যে স্থান থাকিলে মানুষের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের ভাজন হওয়া যায়, শিক্ষা-সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিতগণকে সেই সেই স্থানে সম্পন্ন হইতে হইবে। দয়া, সমবেদনা, পরহিংসাকাতরতা, সত্য-প্রিয়তা, বিনীতভাব প্রভৃতি খর্গীয় সম্পদে ছন্দস্বকে সম্পন্ন করিতে পারিলেই প্রকৃত পক্ষে শিক্ষার ফল ফলিরাছে, বলা যাইতে পারে। অন্যথা কেবল পরীক্ষায় কৃতকার্যতাকেই শিক্ষার চরমফলপ্রাপ্তি বলিতে পারি না।

স্বজাতিকে আয়ত্তের অধুকুল করিতে হইলে সর্বোপায় স্বজাতির শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আকর্ষণ আবশ্যিক, এ কথা আমি পূর্বেই বলিয়াছি। কেবল সামাজিক বা কেবল রাজনৈতিক আন্দোলনে সমাজের প্রকৃত মঙ্গল-সাধন হয় না। প্রাত্যহিক কার্যের যেমন একটা তালিকা অন্ততঃ মনে মনে থাকিলেও কার্যের শৃঙ্খলা হয়,—সময়ের সদ্যবহার হয়, তদ্রূপ জাতীয় সাহিত্য যদি সুগঠিত হয়, তবে সেই সাহিত্যের দ্বারা জাতীয়তা-গঠনের পক্ষেও বিশেষ সহায়তা ঘটে। এই জাতীয় সাহিত্য-গঠনের প্রকৃত ভার এখন ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের হস্তেই স্তম্ভ হইতেছে। অবকাশ যত কোন ভাবুক ভাবের স্রোতে ভাসিয়া দু'একটি কবিতা রচনা করিলেন, বা চিন্তাপূর্ণ দু'একটা



প্রবন্ধ পাঠ করিলেন, তাহাতে জাতীয় সাহিত্যের প্রকৃত গঠন হইবে না। তৎপস্থায় ভাষা একাগ্রতাপূর্ণ চেষ্টায় ঐ সাহিত্যের ত্রীভুজ-সাধন করিতে হইবে। বর্তমান সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষায়ও বঙ্গভাষার অধ্যাপনা হইতেছে। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যাহারা শিক্ষালাভ করিতেছেন, তাহারা উভয়বিধ শিক্ষায় শিক্ষিত হইতেছেন। বঙ্গভাষায়ও তাহারা পাণ্ডিত্যসম্পন্ন হইতেছেন। এই ইংরাজী ভাষায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণের হস্তে বঙ্গভাষার ভবিষ্যৎ উন্নতির ভার নিহিত। সুতরাং তাহাদের এ সম্বন্ধে কি কষ্টব্য, তাহা নিয়ে হু'একটি কথা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

এই ইংরাজী শিক্ষিতগণ যদি একটু আদরের সহিত স্ব স্ব মাতৃভাষার আলোচনা করেন, মাতৃভাষাই হিতকরে মাতৃভাষার আলোচনা করেন, তবে তাহাতে সফলের আশা অনেক। দেশের যাহারা উচ্চশিক্ষাবঞ্চিত, সেই জনসাধারণকে তাহারা অতি অল্প আয়াদেই মাতৃভাষার প্রতি অধিকতর আগ্রহ-সম্পন্ন করিতে পারিবেন। কেন-না, তাহারাই প্রকৃত পক্ষে সাধারণ মত-গঠনের ও সাধারণ সমসুষ্ঠানের প্রধান উদ্যোক্তা বা এক হিসাবে কর্তা হইবেন। সুতরাং বাঙ্গালা ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করা এবং সেই সঙ্গে ঐ মাতৃভাষাকে সর্বসাধারণের মধ্যে বরণ্য করিয়া তোলা ইংরাজী শিক্ষিতগণের সর্ব-প্রথম কষ্টব্য। কেন-না, তাহারা প্রতীচ্য ভাষায় পারদর্শী হইয়া সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন; লোকসমাজের স্পৃহণীয় আসনে উপবেশন করিবার যোগ্যতা অর্জন করিতেছেন,—তাহাদের কথার, তাহাদের আচার-ব্যবহারের, তাহাদের আচরিত রীতি-নীতির উপর জন-সাধারণের মঙ্গলামঙ্গল নিহিত। তাহারা ইচ্ছা করিলে অতি



সহজেই সাধারণকে স্ব স্ব মতের বশবত্তা করিতে পারিবেন। সুতরাং তাঁহাদের কর্তব্য বড়ই গুরুতর। (তাঁহাদের সামান্য খলনে, সামান্য উপেক্ষায়, একটি মহতী জাতির—উদীয়মান জাতিরও—খলন বা অধঃপতন হইতে পারে।

“বদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠভুক্তদেবেতরো জনঃ।”

এই মহাবাক্য স্মরণপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে পদক্ষেপ করিতে হইবে। তরুণীর কর্ণধারের অনেক সতর্কতা আবশ্যক, অন্ত্রধা নিয়ন্ত্রণের আশঙ্কা বলবতী।

যাঁহারা বন্ধের অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষাপ্রাপ্ত, তাহারা যে ইংরাজী শিক্ষা করিয়া পরে আবার বঙ্গভাষা শিক্ষা করিবে, এরূপ আশা কদাচ করা বাহ্য না। তাহাদিগকে—সেই mass অর্থাৎ সাধারণ জনসত্ত্বকে—সংপথে পরিচালিত করিতে যেমন দেশের শিক্ষিতগণই একমাত্র সমর্থ, সেইরূপ তাহাদিগকে অসংপথে—উৎসর্গের পথে—অধঃপাতিত করিবার ক্ষমতাও তাঁহাদেরই হস্তে। সরলবিশ্বাস-সম্পন্ন জনসত্ত্বের চিত্ত শিক্ষিতগণ শিক্ষার চাকচিক্যে বশীভূত করিয়া যে দিকে ইচ্ছা প্রবৃত্তিত করিতে পারেন। সুতরাং শিক্ষিতগণের হস্তে দেশের প্রকৃত সম্পদ এবং বিপদ—এই দুই-এরই হেতু নিহিত রহিয়াছে। এক হিসাবে ইহাও এক মহা আতঙ্কের কথা, চিন্তার কথা! যাঁহাদের উপর দেশের সম্পদ-বিপদ উভয়ই নির্ভর করিতেছে, তাঁহাদের কর্তব্য যে কত গুরুতর, তাহার উল্লেখ নিম্নপ্রয়োজন।

দেশের জনসত্ত্বকে যদি সং পথেই লইয়া বাইতে হয়—মামুষ করিয়া তুলিতে হয়—বাদ্দালী জাতিকে একটা মহাজাতিতে

পরিণত করিতে হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের মনের সম্পদ বাহাতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তাহা করিতে হইবে। পাশ্চাত্ত্য ভাষায় অনিপুণ থাকিয়াও বাহাতে বঙ্গের ইতর-সাধারণ, পাশ্চাত্ত্য প্রেমণের বাহা উত্তম, বাহা উদার এবং নির্মল, তাহা শিখিতে পারে এবং শিখিয়া আত্মজীবনের ও আত্মসমাজের কল্যাণসাধন করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার মধ্যে বাহা নির্দোষ,—আমাদের পক্ষে বাহা পরম উপকারক, যে সমুদয় গুণগ্রাম অর্জন করিতে পারিলে আমাদের সুন্দর সমাজদেহ ও দেশাত্মবোধ আরও সুন্দরতর, সুন্দরতর হইবে, সেই সকল বিষয় আমাদের মাতৃভাষার সাহায্যে বঙ্গের সর্বসাধারণের গোচরীভূত করিতে হইবে। ক্রমেই যে ভয়ঙ্কর কাল আসিতেছে, সেই কালের সহিত প্রতিদ্বন্দিতার দেশবাসীদিগকে জয়ী হইতে হইলে, কেবল এ দেশীয় নহে, পাশ্চাত্ত্য আয়ুধেও সম্পন্ন হইতে হইবে। হ'একটা নৃষ্টাঙ্গের সাহায্যে বিদ্যুটী বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক।

প্রথমতঃ ইউরোপের ইতিহাস। ইতিহাস অল্পবিস্তর প্রায় সকল জাতিরই কিছু-না-কিছু আছে। বর্তমান কালে ইউরোপ জগতের অভ্যাদিত দেশসমূহের শীর্ষস্থানীয়। সুতরাং ইউরোপের ইতিহাস আলোচনাপূর্বক দেখিতে হইবে যে, কেমন করিয়া, কোন্ শক্তির বলে, বা কোন্ গুঢ় কারণে ইউরোপের কোন্ জাতির অভ্যাদয় ঘটিয়াছে; কোন্ পথে পরিচালিত হওয়ায় কোন্ জাতির কি উন্নতি হইয়াছে,—সেই উন্নতির কারণ এবং পথ, আমাদের এ দেশীয়গণের পক্ষে প্রযোজ্য কি না, তাহার প্রয়োগে আমাদের এ দেশে কতটা মঙ্গলের সম্ভাবনা,—ইত্যাদি বিষয় বিশেষ বিবেচনার সহিত আলোচনা করিয়া, যদি সঙ্গত মনে হয়,



এ দেশের পক্ষে হানিজনক না হয়, তবে সেই পক্ষে আমাদের জাতিকে ধীরে ধীরে প্রবর্তিত করিতে হইবে। সেই প্রবর্তনের একমাত্র সহজ পথ,—ঐ সকল কারণ, ঐ সকল উপায়-প্রণালী অতি বিশদরূপে আমাদের মাতৃভাষার দ্বারা সাধারণের মধ্যে প্রচার করা, এই প্রচারের একমাত্র কর্তা যাহারা ইংরাজী ভাষায় দক্ষতা লাভ করিয়াছেন, এবং সেই সঙ্গে বাঙ্গালা ভাষায়ও যাহাদের বিশেষ অধিকার জন্মিয়াছে, মাত্র তাঁহারা—অন্তে নহে।

দেশের কল্যাণ-কামনায় এবং স্ব মাতৃভাষার পরিপুষ্টিবাসনায় যাহারা এই মহাত্মতে দীক্ষিত হইবেন, তাঁহাদের সর্ব্বপ্রথম কর্তব্য ইউরোপীয় ইতিহাসের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা। মনে রাখা কর্তব্য যে, প্রচারকর্তাদের সামান্ত ক্রতীতে আমাদের অভ্যুদয়োন্মুখ জাতির মহা অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। সুতরাং দেশের শিক্ষিত-গণের প্রতিপদবিক্ষেপেই বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন

যেমন এই অভ্যুদয়ের কথা বলিলাম, তেমনই এই সঙ্গে দেখিতে হইবে, কোন্ পক্ষে বাঙরার, কোন্ দুর্নীতির আশ্রয়-বশতঃ ইউরোপীয় জাতির অধঃপাত ঘটয়াছে, বা ঘটতেছে—সর্ব্বনাশ হইয়াছে। কোন্ জাতি উন্নতির উচ্চতম শিখরে আকৃষ্ট হইয়াও কোন্ কর্ণের দোহে অধঃপাতের অন্তলতলে নিপতিত হইয়াছে—পতনের সেই সেই কারণনিচয় অতি সুস্পষ্টরূপে প্রদর্শন করিয়া সেই সেই সর্ব্বনাশের হেতুগুলি পরিহার করিতে হইবে। আমাদের মাতৃভাষার স্বচ্ছ দর্পণে এই ভাবে দোষগুলির প্রতিবিম্বনপূর্ব্বক দোষ-পরিহার ও গুণ-গ্রহণের প্রতি দেশবাসীর আগ্রহ এবং ঐক্যসূচক জন্মাইতে হইবে।



ইহকালই জীবনের সর্বস্ব নহে। এই ইহ কালকেই একমাত্র সার ভাবিয়া কার্য করার কলে, ঐহিকবাদী ইউরোপীয়দিগের মধ্যে ধর্মভাব আদৌ নাই বলিলেই হয়। ধর্মভাবের অভ্যস্ত অভাবের ফলেই বর্তমান শোণিত-তরঙ্গিনী রণভূমিতে ইউরোপ বিপর্যস্ত। ইউরোপের ঐ অসম্ভাবের অর্থাৎ ঐহিকবাদিতার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া বরং যতটা সম্ভব, উহা হইতে দূরে সরিয়া বাইয়া আমাদের জাতীয়তা ও চিরস্মৃহণীয় ধর্মভাবকে জাগ্রত রাখিতে হইবে। আমাদের জাতীয় সাহিত্যের ভিত্তি ধর্মভাবের উপর স্থাপিত করিয়া, উহাতে পশ্চিমের গ্রহণযোগ্য বিষয়ের সমাবেশপূর্বক সাহিত্যের অঙ্গপুষ্টি করিতে হইবে। বাহা আছে, মাত্র তাহা লইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। ৭ দুদিনে জাতীয় সম্পদের বাহাতে বৃদ্ধি হয়, সর্বপ্রকারে তাহা করিতে হইবে।

সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।



তাজমহল

সন্ধ্যাটের নিবাস-ভগ্নের অভ্যন্তরস্থ দর্শনীয় স্থানগুলি দেখিতে দেখিতে যখন গাইডের সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম, তখন এক সময়ে সে আমাকে এক আলোকহীন নির্ঝাঁপ স্তূপের মধ্যে অনেকদূর পর্য্যন্ত লইয়া গিয়াছিল; কিছুদূর পর্য্যন্ত সিঁড়ি দিয়া নাগিয়া যাইতে হয়, তাহার পর পথ ক্রমে অপ্রশস্ত হইয়া আসিয়াছে এবং উহা এমন সূচিভেদ্য অন্ধকারে আবৃত যে, সে অন্ধকারে অল্পক্ষণ থাকিলেই সূর্য্য-প্রালোকিত ধরণীর বক্ষোবিহারী জীবের খাঁস বন্ধ হইয়া আসিবার উপক্রম হয়। বৃহৎ একটি মশাল জ্বলাইয়া আমাদের সঙ্গে এক ব্যক্তি সেই স্তূপপথে পথ দেখাইয়া যাইতেছিল, আমি এবং আমার গাইড যীর খাঁর তৎকালীন মনোভাব কি ছিল জানি না; আমি স্বীকার করিতেছি যে যতদূর আমি সেই স্তূপপথে নাগিয়া গিয়াছিলাম, ভয়লেশশূন্য বিদাহীন চিত্তে যাই নাই। কিছুদূর গিয়া যখন অন্ধকার ক্রমে গাঢ় হইয়া আসিতে লাগিল এবং বায়ুহীন স্তূপের আদ্রমৃদ্ধিকা আমার পায়ে ঠেকিতে লাগিল, আমি আর অগ্রসর না হইয়া যীর খাঁকে জিজ্ঞাসা করিলাম, বাতালোকবর্জিত এই পাতালপুরীর স্তূপপথ যোগল বানশাহগণের কি প্রয়োজনে লাগিত, জান? সে আমার প্রশ্নের রকম শুনিয়া হাসিয়া যাহা বলিল তাহার মর্ম্মার্থ এই:— মুসলমান বানশাহগণের একাধিক বেগম থাকিতই। যদি কখনও কোন বেগমের স্নেহ মমতা প্রেম ও সতীত্বের প্রতি

বাদশাহের সন্ধেহ জন্মিত, তাহার প্রাণদণ্ডের বিধান হইত। কিন্তু বাদশাহই সাধারণ জনগণের মৃত্যু-ব্যবহার সহিত বেগম-গণের মৃত্যু-ব্যবস্থা এক হইতে পারে না এবং প্রকাশ্য স্থানেও তাহাদের বধকার্য্য সমাধা হইতে পারে না, সেই জন্য রক্তমহলের মধ্যে এই অন্ধকার মৃত্যুপুরী নির্মিত হইয়াছিল। বাহাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইত, তাহাকে এই আলোকহীন বায়ুশূন্য পাতাল-পুরীতে রাখিয়া তাহার প্রত্যাধর্ষনের পথ রুদ্ধ করিয়া দেওয়া হইত। অল্পকাল মধ্যেই সে হতভাগিনী এই অন্ধকার হইতে আর কোন গাঢ়তর অন্ধকারের মধ্যে নিমজ্জিত হইত কি না কে জানে? এইরূপে নিরুদ্বেগে বেগমের জীবনলীলা সাজ হইয়া যাইত, বাহিরের কাকপ্রাণীতেও জানিতে পারিত না।

সুচিভেদ্য অন্ধকারাবৃত বাতবিরজিত মৃত্যুপুরীর সুড়ঙ্গপথে দাঁড়াইয়া মীর খাঁর মুখে এই কথা শুনিয়া আমার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। আমি আর অগ্রসর হইলাম না। তাহাকে কহিলাম, “ফিরিয়া চল।” এই বলিয়া আমি সর্ব্বাঙ্গে ফিরিয়া দাঁড়াইলাম। মীর খাঁর ইচ্ছা ছিল যে আরও কিছুদূর আমরা যাই; সে বারংবার বলিতে লাগিল যে আর একটু অগ্রসর হইলেই যেখানে বেগম সাহেবাদিগের বধকার্য্য শেষ করা হইত, সে অন্ধকার মৃত্যুগহ্বর দেখা যাইবে। আমি তাহার কথার কর্ণপাত না করিয়া, যে ব্যক্তি মশাল লইয়া গিয়াছিল তাহাকে ফিরিতে বলিলাম এবং এক তিলও অপেক্ষা না করিয়া দ্রুতপদে, যে পথে সুড়ঙ্গে প্রবেশ করিয়াছিলাম সেই পথে, ফিরিয়া আসিতে লাগিলাম। অগত্যা মীর খাঁ এবং মশালটীও আমার সঙ্গে ফিরিল। সুড়ঙ্গপথ এমনই বায়ুহীন যে, যে সময়টুকু আমরা



সেখানে ছিলাম সেই অল্পকাল মধ্যেই আমাদের মশাল দুই তিন বার নিবিয়া যাইবার উপক্রম করিয়াছিল, জানি না কি কোশলে মশালটী একেবারে উহা নির্ঝাপিত হইতে দেয় নাই। যদি সেই বাতালোক-বিবর্জিত রসাতলপথে আমাদের মশালটি নিবিয়া যাইত, তাহা হইলে আমি যে ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিতাম, সে কথা স্বীকার করিতে আমার কিছুমাত্র কুষ্ঠাবোধ হইতেছে না। ঐহারা আগ্রাহর্গের এই রসাতলপুরীর অন্ধকার সুড়ঙ্গপথ দেখিয়াছেন, তাহারা সকলেই যে আমার সহিত একমত হইবেন, সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

সত্য সত্যই কিংবা ভয়ে জানি না, যখন সেই সূচিভেদ্য অন্ধকার সুড়ঙ্গপথে দাঁড়াইয়া অভাগিনী বেগমগণের শোচনীয় মৃত্যুগর খাঁ সাহেবের মুখে শুনিতেছিলাম, আমার বোধ হইতে লাগিল যেন শ্বাসক্রিয়া-রোধ হইয়া আসিতেছে। তাহার উপরে সেই বায়ুহীন রসাতলের আর্দ্রমৃত্তিকার স্পর্শ যখন শব্দতলে অনুভব করিলাম তখন মনে হইতেছিল, সত্য সত্যই বুঝি যমপুরীতে আসিয়াছি এবং আর কিছুক্ষণ এখানে বিলম্ব করিলে ভূতপূর্ব বেগমগণের সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভও বুঝি অসম্ভব নহে। মীর খাঁ তাহার গাইডগিরি ব্যবসায় আরম্ভ করিবার পর হইতে বহু লোককে এই যমদ্বার দেখাইয়া আনিয়াছে; সুতরাং তাহার মনে কোন আশঙ্কা জাগিবার কোন কারণই হয়ত ছিল না। কিন্তু বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমও যাহার পূর্ণ হয় নাই, সেজন্য বঙ্গ-সম্রাটের মনোভাব সে সময়ে কিরূপ হইরাছিল, তাহা বুঝিতে আমার পাঠক-পাঠিকাগণকে বিশেষ আয়াস করিতে হইবে না। যাহা হউক, সেই যমপুরীর অন্ধকার দ্বারদেশ হইতে উদ্ধারলাভ



করিয়া আর বলিষ করি নাই এবং সন্ধ্যার পূর্বেই ভাঙ্গগঞ্জে পৌঁছিতে হইবে বলিয়া সেই সময়েই তদভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলাম।

আগ্রাহর্গের ফটক হইতে ভাঙ্গের বারদেহ পর্য্যন্ত পথ নিত্যন্ত কম নহে ; এই দীর্ঘপথ একাকী গাড়ীতে বসিয়া অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল এবং তখন মনের মধ্যে কত কি যে উদয় হইতেছিল তাহা আজ বিশ্লেষণ করিয়া বলিবার উপায় নাই। তবে এইটুকু মনে আছে যে, যে রাজাধিরাজের অকৃত্রিম নিবিড় প্রেম এবং দুঃসহ বিরহ-বেদনার মূর্ত্যুবি পৃথিবীর নানা দিশ্বেশাগত বিরহবিধুর নরনারীর হৃদয়ের ধন হইয়া রহিয়াছে, সেই প্রেমিক-প্রধান শাজাহানের নিবাস-ভূর্গে নারীবধের নিঃশ্বাস আয়োজনের সামঞ্জস্য আমি নিজ মনে রক্ষা করিতে পারিতে-ছিলাম না,—কেবলই আমার মনে হইতেছিল যে ঐ অন্ধকার বায়ুবিহীন মৃত্যুপুরী শাজাহানের পূর্বগত বা পরবর্তী কোন সন্ধ্যাটের কীর্তি ; শাজাহানের আচ্ছাদিত উহা কখনই নির্মিত হয় নাই। কিংবা সেই অন্ধকার ভূ-গৃহ অস্ত্র কোনও প্রয়োজন-সাধনের জন্য নির্মিত হইয়াছিল, নিঃশ্বাস নারীর নিধনকল্পে নির্মিত হইবার কথা মীর খাঁর কল্পিত কাহিনী। প্রিয়-বিয়োগের দিন হইতে মৃত্যু-মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বাহার অশ্রুজলের বিরাম ছিল না, যে বাদশাহের মৃত্যুচ্ছায়াচ্ছন্ন, নিঃশব্দ, উজ্জ-তার লোচন প্রিয়দয়িতার সমাধি-মন্দিরের স্বর্ণশীর্ষ নিরীক্ষণ করিতে করিতে চিরদিনের জন্য নিম্নলিত হইয়া গিয়াছে, চির-বিরহের দুঃসহ দুঃখে উচ্ছ্বসিত বাহার দীর্ঘশ্বাস আজও বুঝি ভাঙ্গের মধ্যে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, একটু নারীর শেষ-শয়ন রচনা করিতে রাজকোষ শূন্য করিয়া যে প্রেমিক সপ্তসাগরের মণিমাণিকা পরম যত্নে

আহরণ করিয়াছেন, নারীবধের অমানুষিক নির্ধম অহুষ্ঠান তাঁহার অহুজায় অহুষ্ঠিত হইতে পারে, ইহা আমার অন্তরাত্মা কিছুতেই মানিতে চাহিল না, এবং শাজাহানের উপরে আমার সাময়িক সন্দেহ সেদিনে ক্ষণকালের জন্যও যে গিরা পড়িয়াছিল, সেজন্য আমি সেই লোকান্তরিত প্রেমসর্বস্ব সম্রাটের উদ্দেশে ঘোড়করে বারংবার ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলাম।

নিজ মনে এইরূপ কত কি চিন্তা কতক্ষণ ধরিয়া করিতে-ছিলাম, তাহা ঠিক বনে নাই। এক সময়ে দেখিলাম আমাদের গাড়ী কতকগুলি পাথরের দোকানের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। কোচবদ্বয় হইতে মীর খাঁ নামিয়া আসিয়া সেলাম করিয়া গাড়ীর দরজা খুলিয়া দাঁড়াইল, এবং আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া সসন্ত্রমে কহিল, “হুজুর, গাড়ী তাজগর পহুছ গেয়ো।” আমি স্তম্ভোচ্ছিতের মত চমকিয়া উঠিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলাম।

এ যে দিনের কথা বলিতেছি, সে দিনে ম্যাকডোনাল্ড পার্ক রচিত হয় নাই, পত্র-পুষ্প-পল্লব-সমাকুলিত বৃক্ষবল্লরী-সমাকীর্ণ উজ্জানের মধ্য দিয়া নতোরত প্রশস্ত রাজপথ তাজ-তোরণের সম্মুখে গিয়া শেষ হয় নাই। সে দিনে আগ্রা সহর হইতে যে পথে তাজের দ্বারদেশে পহুছিতে হইত সে পথ ধূলিমলিন, অমেধ্য-সমাকীর্ণ, সংস্কারবিহীন এক প্রকার দুর্গম পথই ছিল। তাজ-দর্শনার্থিগণ নানাবিধ যান-বাহনের সহায়তায় কোনমতে তাজের দ্বারদেশে গিরা পহুছিত। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ তাজ-তোরণের সম্মুখে কতকগুলি প্রস্তর-বিক্রেতার দোকান থাকায় ক্রেতা-বিক্রেতার সমবেত সোঁর-হাজামার সমাধি-মন্দিরের শব্দবিহীন শুক মহিয়া এবং শান্তির সম্যক ব্যাঘাত চম্বাইত। গাড়ী হইতে যেমন



নাথিরাছি, মুহূর্তের মধ্যে দেখিলাম প্রায় ত্রিশজন পাথরওয়ালা তাহাদের নানাবিধ কারুখচিত পাথরের থালা, রেকাবী, গেলাস, বাটি লইয়া আমার চতুর্দিক্ বেঠেন করিয়া ধরিয়াছে এবং কে কত সম্ভাষ্য সে সকল দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারিবে, তাহা আমাকে বুঝাইয়া দিবার প্রাণপাত চেষ্টায় লাগিয়া গিয়াছে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম সম্রাটের প্রাণপ্রিয়তমা মহিষীর অশানশয্যার দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া ক্রয়-বিক্রয়ের এই কর্ণভেনী শব্দ আমার সমস্ত হৃদয়-মনকে যেন বেজোখাত করিতে লাগিল। আমি সে স্থান ত্যাগ করিয়া যথাসম্ভব সম্ভরতার সহিত তাজমহলরীর তোরণদ্বারের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলাম।

তাজ-তোরণের বিরাট্ মহিমা এবং তাহার শিল্প-নৈপুণ্যের কথা বহু পুস্তকে পড়িয়াছিলাম এবং লোকমুখে সে কথা বহুবার শুনিয়াছি। কিন্তু সে দিকে আমার মন ছিল না এবং সেই তোরণদ্বারের দিকে দৃষ্টি দিয়া সময় নষ্ট করিবার ইচ্ছাও আমার ছিল না। ব্যাধিত রাজরাজের বিরোগবেদনা মহিত করিয়া ধরণীর যে অষ্টম বিশ্বয়ের জন্ম সম্ভব হইয়াছে, সেই পাবাগম্ভরীকে কখন দেখিব সেই আগ্রহে আমি পরিপূর্ণ হইয়া বসিয়া ছিলাম।

তাজগঞ্জে পহুঁছিয়াই একেবারে তোরণদ্বার পার হইয়া গিয়া সেই অমল ধবল পাবাগনির্ধিত শোকমূর্তির সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইলাম। প্রথম দর্শনে মনের মধ্যে কোন ভাবের উদয় হইয়াছিল কি না এবং হইয়া থাকিলে কি ভাব তখন মনে আসিয়াছিল, কর্ণ বাহা শুনিয়াছিল চক্ষু তাহা দেখিল কি না, কিংবা বাহা দেখিল, কোটিকল্প ধরিয়া কীভিত্ত মহিমা তাহার তুল্য হইতে পারিত কি না, এ সকল কোন কথাই আজ বলিতে



পারিষ না। কেবল এই মাত্র মনে আছে যে, পৃথিবীর সেই শ্রেষ্ঠতম বিশ্বব্দের সম্মুখে বিস্থিত ও নিমেষহত হইয়া দাঁড়াইয়া-ছিলাম এবং কেবলই মনে হইতেছিল যে ইহাকে না দেখিলে এবারের যানবজ্জনটী নিতান্তই নিফল হইত।

এ ভাবে কতক্ষণ দাঁড়াইয়া ছিলাম তাহা মনে নাই, বোধ হয় বহু ক্ষণই হইবে। এক সময়ে মীর খাঁ আমার নিকটে আসিয়া মুহূর্ত্তে কহিল, “হুজুর চলিয়ে, ভিতর যাকে দেখিয়ে।” তাহার কথায় মস্তচালিতের মত চলিলাম। তোরণ হইতে তাকের রক্তপাষণ-নিস্থিত আসনপীঠ পৰ্য্যন্ত যে সকল ধারা-যন্ত সারি সারি সাজান রহিয়াছে, সে দিকে এবং চতুর্দিক্স্থ কুঞ্জবনের বৃক্ষবল্লরীর দিকে মীর খাঁ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার অনেক চেষ্টা করিয়াছিল, আমি নীরবে হস্তধারা তাহাকে সে চেষ্টায় বিরত হইতে ইঙ্গিতে বলিরা, আমার নিনিমেষ নয়ন তাজমহলের দিকে একাগ্রভাবে নিবদ্ধ রাখিয়া মস্তমুগ্ধের মত সেই রক্তপাষণ-বেদিকার নিম্নে গিয়া দাঁড়াইলাম এবং পাহুকা উন্মোচন করিয়া খেত-প্রান্তরের সিঁড়ি বাহিয়া তাজ-যোগিনীর মর্মর-যোগাসনের সম্মিহিত হইলাম। গঙ্গাস্নান উপলক্ষে তীরস্থ হইয়া ভক্ত যেমন পাদস্পর্শ জনিত পাপের ক্ষয়-কামনায় সুরেশ্বরীর উদ্দেশে “অন্তঃস্পৃশামি পাদাভ্যাং পাপং যে হর জাহবি” বলিরা মস্তোচ্চারণ করে, জানি না কেন সে দিনে সেই শুভ নিফলক খেতমর্মর-বেদিকার উপরে দাঁড়াইবার পূর্বে আমারও অন্তরাখ্যা পাদস্পর্শ-জনিত প্রত্যাবারের ক্ষমার জন্য পরলোকবাসিনী সম্রাজ্ঞী বাহু-বেগমের উদ্দেশে তদ্রূপ কোন মস্তোচ্চারণের জন্য অতিমাত্রায় ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল। যদিও ঘোড়করে অমুঠুভ হ্রদের

কোন সংস্কৃত শ্লোক সশব্দে উচ্চারণ করি নাই, কিন্তু ‘ময়ূর-সিংহাসনে’ সমাসীন রাজাধিরাজের হৃদি-সিংহাসনের একাধিষ্টাত্রীর উদ্দেশে তাঁহার শেষ-শয়ন-সন্নিধানে উপনীত হইবার ক্ষণ মর্ম্মরপীঠে অপরিহার্য্য পাদম্পর্শ-পাপের অপরাধ-ভঞ্জনকরে অন্তরোখিত যন্ত্র যে অন্তরে-অন্তরেই উচ্চারিত হইয়াছিল, তাহা আজও আমি বিস্মৃত হই নাই।

গতপ্রায় ষসত্ত-দিবসের অন্তগামী সূর্যালোকে তাজের অভ্যন্তরের কারশোভা দেখানে বাহা দেখিবার ছিল, তাহা দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। গাইড যৌর খাঁ কোন্ মূল্যবান প্রস্তর কোথা হইতে কত মূল্যে আসিয়াছে এবং কোন্ শিল্পী কোথা হইতে আসিয়া কত দিনে কতটুকু শিল্পচাতুর্য্য দেখাইয়া গিয়াছে, তাহার বিস্মৃত তালিকা আমাকে শুনাইতে লাগিল সত্য, কিন্তু সে দিকে আমার কিছুমাত্র মনোযোগ ছিল না। আমি আমার সকল মন এবং সমস্ত ইঞ্জিয়গ্রাম দিয়া এই স্বতিমন্দিরের দেহহীন সৌন্দর্য্যটুকু ধরিবার প্রাণপাত চেষ্টা করিতেছিলাম। ইহার প্রতি প্রস্তর-সন্নিবেশের মধ্যে বিবিধ বর্ণানুরঞ্জিত-প্রস্তরখচিত ভিত্তিগাত্রের এবং শবাধারের আচ্ছাদন-শিলার শিল্পকৌশলের মধ্যে বাদশাহের বিপুল প্রেম এবং বিরহীর বিরাত্বে বেদনা কেমন করিয়া বিকাশ লাভ করিয়াছে, তাহাই বুঝিবার চেষ্টায় আমার সকল মন-প্রাণের শক্তি প্রয়োগ করিতেছিলাম। সেই দিন হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত জীবনে আমি শতাধিকবার তাজ দেখিয়াছি—যখনই পশ্চিমে গিয়াছি, টুওলা টেলনের নিকট দিয়া বাইতে হইলেই একবার তাজ দেখিয়া তবে আমার গন্তব্য স্থানে যাইতে মন অগ্রসর হইয়াছে।

স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে আগ্রায় আমি কিছুকাল বাস করিয়া-
 ছিলাম। সে সময়ে প্রতিদিন অপরাহ্নে বায়ুসেবনের ছলে তাজ
 দেখিতে গিয়াছি; প্রথম যৌবনের প্রারম্ভ হইতে আজ পর্য্যন্ত
 নানা বয়সে—কত সুখ কত দুঃখের দিনে, কত শোক ও
 আনন্দের মুহূর্ত্তে, কত মিলন ও বিরহের হর্ষ-বিবাদে, বারবার
 করিয়া দেখিতে দেখিতে তাজের সম্বন্ধে যে ভাব আমার হৃদয়ে
 আজ জাগ্রতমূল হইয়া গিয়াছে, প্রথম দর্শনের মুহূর্ত্তেই আমার
 হৃদয়ে সেই ভাব পরিপূর্ণরূপে আসিয়াছিল এ কথা বলিলে ঠিক
 বলা হইবে না; এবং তাজ সম্বন্ধে আজ বাহা বলিতেছি,
 তাহা ঠিক সেই প্রথম দর্শন-দিনের কথা, ইহাও ঠিক নহে।
 প্রথম দর্শন-মুহূর্ত্তে যেন হইয়াছিল ইহা অপূর্বদর্শন, ইহাকে
 না দেখিলে দর্শনোক্তির সার্থক হয় না—এই মাত্র। তাই ইহাকে
 বারবার করিয়া দেখিয়াছি এবং বারংবার দেখিতে দেখিতে
 আজ বুঝিয়াছি যে, পরিণত জীবনে বিশ্ব-ভুবনের সকল-বাড়া
 জীবনসর্ব্বস্ব ধনটিকে চক্ষুর সম্মুখ হইতে বিদায় দিয়া সেই অসঙ্গ
 বিরহের বিপুল দুঃখে উচ্ছলিত অশ্রুসমাকুল নয়নে তাজহৃন্দরীর
 দিকে না চাহিলে শাজাহানের সুনিবিড় প্রেম ও সুদুঃসহ বেদনার
 কোন পরিমাপই পাওয়া যায় না।

তাজের অভ্যন্তরভাগ দেখিয়া যখন পুনরায় বাহিরে আসিলাম
 তখন গোবুলিলখ প্রায় সমাগত। অন্তঃগমনোন্মুখ দিননারক
 পশ্চিম-শিখরীর উপর ঢলিয়া পড়িতেছেন। দিনশেষের স্নানোন্নত
 রবিরশ্মি কয়টি বাই বাই করিয়াও যেন বাইতে পারিতেছে না।
 শাজাহানের অক্ষুরম্ব প্রেমের পরম ধনটি যেখানে তাহার শেষ-
 শয়ন বিছাইয়া চিরদিনের জন্য চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইয়াছে, সেই

প্রেমমন্দিরের তল্লীর্ষে এবং তাহার স্বর্ণচূড়ার পরম স্নেহভরে
 কিয়ৎকাল অপেক্ষা না করিয়া তাহাদের যেন বাইবার উপায়
 নাই। কিন্তু সাক্ষ্য রবির কিরণ কয়টি কবর-চূড়ায় পড়িয়া
 তাহাকে যে কি শোভাই দিয়াছিল, তাহা না দেখিলে বলিয়া
 বুঝাইবার ভাষা কি আছে? নীল নির্মল বসন্তাকাশের নিবিড়
 নীলিমার নিম্নে পদতলবাহিনী নৃত্যপর্য নীল যমুনার উর্দ্ধে,
 কালিন্দীর তটসংলগ্ন নিকুঞ্জের শ্রাম মহোৎসবের মধ্যে ত্তমস্বর-
 বিনিমিত গম্বুজের খেতাম্বুজের উপরে রবিকিরণ-সম্পাতে শোভা
 যে স্বচক্ষে না দেখিয়াছে, কোন বর্ণনা দ্বারাই তাহাকে সে
 সৌন্দর্যের স্বরূপ বুঝান যায় কি না জানি না—বোধ হয়, না।
 সে দিনে পূর্ণিমা ছিল, কি প্রতিপদ, তাহা আজ ঠিক মনে নাই—
 ফলতঃ সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই সম্পূর্ণ গৌরবে পূর্ণপ্রায় চন্দ্রমার
 বিকাশের দিন, তাহা মনে আছে। চন্দ্রকরমাতা তাজশূন্দরীর
 অপরূপ লাবণ্য দেখিবার জন্য উত্থানমধ্যস্থ খেতমস্বরের 'চবুতরা'র
 উপরে বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। হঠাৎ এক সময়ে
 মনে হইল, অপূর্ণ আলোকে তাজের মস্বর-গম্বুজ উদ্ভাসিত হইয়া
 উঠিয়াছে। সম্মুখের দিকে চাহিয়া দেখি কোমল জ্যোৎস্নাধারা
 পাষাণশূন্দরীর অঙ্গ হইতে বিচ্ছুরিত হইয়া চতুর্দিকের কালো
 আকাশ আলো করিয়া দিয়াছে। মনে হইল যেন বিচ্ছুরিত
 চন্দ্ররশ্মিগুলি কোমল আলোকের রজ্জুরূপে চাঁদ এবং তাজকে
 একগ্রন্থিবন্ধনে বাঁধিয়া দিয়াছে। প্রাণহীন কঠিন পাষাণের
 উপরে সূর্য্যচন্দ্রের কিরণসম্পাতে তাহাকে এমন কোমল করিয়া
 তুলিতে পারে, এত সৌন্দর্য্য তাহাকে দান করিতে পারে, ইহা
 আমি জীবনে এই প্রথম দেখিলাম; এবং ইহাই শেষ, কারণ



তাজ ব্যতীত অন্য কোন মন্দির, মীনার, মসজীদ, কবর, পুরী, প্রাসাদের কথা শুনি নাই বা পুস্তকে পড়ি নাই, যাহাকে অন্তরীক্ষ-চারী রবি-চন্দ্র-তারকা প্রভৃতি গ্রহ-উপগ্রহের রশ্মিরেখা প্রতিদিন নব নব সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিয়া মানবের নয়ন-মনের সম্মুখে আনিয়া দাঁড় করাইতে পারে। অন্তঃগমনোন্মুখ রক্তরবির রক্তিম রশ্মিরেখায় মণ্ডিত তাজের সম্মুখে যখন দাঁড়াইলাম, তখন সেই দিনের কথা মনে আসিল, যে দিন সেলিম-নন্দন শাজাহান 'খুসরোজের মীনাবাজারে' আসফুন্নিদী অনুভূত বাহুর বিপণির সম্মুখে মুগ্ধনেত্রে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। পরিপূর্ণপ্রাণ চক্ৰালোকে পরিণত তাজের সম্মুখে দাঁড়াইয়া যখন তাহাকে অনিমেষ নয়নে নিরীক্ষণ করিয়াছি, তখন এই মর্মর-মন্দিরকে স্মৃতিসোধ বলিয়া মনে হয় নাই। মনে হইয়াছে, রাজাধিরাজের পরিপূর্ণ প্রেমে পরম পরিতৃপ্তা প্রিয়রাণী তাঁহার অনিন্দা প্রোঢ় সৌন্দর্য্যে রাজপুরী আলো করিয়া যেন অধিষ্ঠিতা রহিয়াছেন। যে দিন বালসূর্য্যের অরুণিমায় পরি-ভূষিতাঙ্গী পাষাণশূন্যরীকে দেখিয়াছি, সে দিনে মনে হইয়াছে, যেন প্রাতঃস্নাতা পূজার্থিনী দেবমন্দিরে আত্মনিবেদনার্থ প্রস্তুত হইয়া মন্দিরপথ আলো করিয়া বাত্মা করিয়াছে ; দিবা দ্বিপ্রহরের ঋত-রোদ্ৰতাপ-স্তরু বিমল বমুনার তীর-পুলিনে তাজশূন্যরীকে যে দিন বাক্যহীন মহামোহনতার মধ্যে সমাহিত দেখিয়াছি, সে দিন এই পাষাণশূন্যরী আমার মনচ্ছুর সম্মুখে প্রিয়-প্রেম প্রার্থিনী পঞ্চতপা পার্শ্বতীর পরিপূর্ণ গোরবে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

হৃৎ-শোক বহন-বেদনায় জর্জরিত মানবজীবনে প্রেমের মত একান্ত প্রার্থনার সামগ্রী হয়ত দ্বিতীয় আর নাই। অসীম সম্পদের মধ্যে আকর্ষণ নিষিদ্ধতই থাকুক, কিংবা দারিদ্র্যের সহিত



দৈনিক যুদ্ধে সর্বদা শ্রমজলের বস্তা বহিতেই থাকুক, একজনের
 একনিষ্ঠ প্রেমের স্মৃতিবিড় বাহবেষ্টনের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবার
 ইচ্ছা মানবহৃদয়ের একান্ত স্বাভাবিক ইচ্ছা। বাহার আগমন-
 প্রতীকার আকুল দুইটি আঁখি দিনান্তে দ্বারপ্রান্ত হইতে পথের দিকে
 সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে না, প্রজ্বলিত সাদা দীপালোকে রজনীর
 বিশ্রামার্থ শয্যারচনা যাহার জন্ত হয় না, ব্যাধি-পীড়ার দিনে দুই
 খানি শ্রান্তিহীন সেবাহস্তের সন্নেহ স্তম্ভশা দিতে এ সংসারে যাহার
 কেহ নাই, তাহার জীবনের সহিত তুলনায় আরবের বালুবেলা এবং
 সাহারার মরুক্ষেত্রকেও সরস বলিতে হইবে। শাজাহান বাহা
 পাইয়াছিলেন, তাহা মানবজীবনে দুঃপ্রাণ্য এবং রাজজীবনে
 অপ্রাণ্য বলিলেও বোধ করি অতুক্তি হয় না। সুন্দরী-প্রধানা
 নূরজাহানের ত্রাহুপুত্রী বাহুবেগমের সৌন্দর্য্যের সুবগান ইতিহাস
 চিরকাল ধরিয়া গাহিয়া আসিতেছে; যে দিল্লীর রঙমহলে
 দিল্লীখরের বিলাস-বাসনা-পরিভূষির নিমিত্ত পৃথিবীর নানা
 দিগ্দেশ হইতে সমাহৃত নারীসৌন্দর্য্যের লীলাভরঙ্গ নিরন্ত উচ্ছলিত
 থাকিত, সেই শুভাঙ্গের সম্রাজ্ঞী যে সুন্দরী হইবেন ইহা বিশেষ
 বড় কথা নহে। কিন্তু বহুবল্লভ নৃপতির হৃদিসিংহাসনে
 সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিয়া তাহার প্রেমরাজ্যে একাধিপত্য বিস্তার
 করিতে পারা অতিবড় সৌভাগ্যের কথা, এবং যমতাজের অদৃষ্টে
 জীবনান্তের পরেও সে শরম সৌভাগ্য অটুট এবং অক্ষয় হইয়াই
 রহিয়াছিল। বাদশাহের সকলগুলি পুত্রকন্তার একমাত্র জননী
 হইবার সৌভাগ্য কেবল যমতাজের অদৃষ্টেই ঘটিয়াছিল এবং ইহা
 যে দিল্লীর রঙমহলের রাজ্ঞী-জীবনের কি অপার গৌরবের সামগ্রী
 তাহা তাহারাই জানিতেন, যাহারা সেই হত্যা-হলাহলে ভীষণ,



হিংসাঘেবে কলুষিত, একান্ত ভয়াবহ ঐশ্বর্য-নরকের মধ্যে নৃপতির নর্যসহচরী হইয়া প্রবেশ করিতে বাধ্য হইতেন। কিশোরী বাম্বর সৌন্দর্য্যমুগ্ধ শাহজাদা শাজাহান যে দিন এই নারী-রত্নকে জীবনসঙ্গিনীরূপে অন্তঃপুরের একান্তে বরণ করিয়া লন, সেই দিন হৃদয়ের নিভৃত-নন্দনজাত প্রেমমন্ডারদামে যে অমূল্য অর্ঘ্য তাঁহার জন্ত রচিত হইয়াছিল, তাহার একটিমাত্র পরাগকেশরও জীবনে পরিদ্রাণ বা ধূলিমলিন হইতে পারে নাই। নারী-জীবনে ইহার অধিক সৌভাগ্য আর কি আছে জানি না, এবং এ সৌভাগ্য বাম্বু বেগম কেবল মাত্র তাঁহার জন্মকালীন গ্রহনক্ষত্রের সংস্থানবলে লাভ করেন নাই। তাঁহার রাজদায়িত্ব তাঁহাকে যে অমূল্য, অপার্থিব, অনন্ত-দুর্লভ, পরম বাঞ্ছনীয় প্রেমের পুষ্পাগনে রাজরাজেশ্বরীরূপে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন, জীবনের প্রতি মুহূর্তে, প্রতি কার্য্যে, প্রতিপাদক্ষেপের মধ্যে সেই প্রেমের প্রতিদান দিয়া আজ তিনি অমর হইয়া উভয়ের এই প্রেমকে অমরত্ব দান করিয়া গিয়াছেন। যৌবনারম্ভের প্রথম দর্শনের মাহেস্ত্র মুহূর্ত হইতে যে প্রেম ইহাদিগকে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিল, কোনও প্রতিকূল ঘটনাতেই সে প্রেমের সার্থকতা হইতে ইহাদিগকে বঞ্চিত হইতে হয় নাই; কোন অকারণ আত্মীয় বা আত্মীয়্যর অকারণ মনোরঞ্জনার্থ এই প্রেমিক যুগলকে পরস্পরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ব্যর্থজীবন যাপন করিবার হুঃসহ বেদনায় জর্জরিত হইতে হয় নাই। সৌভাগ্য বা সঙ্কটে, কিংবা রণে বনে দুর্গমে যখন যে অবস্থায় পড়িয়াছেন, এই রাজদম্পতীকে একদিনের জন্তও পরস্পরের বাহুবন্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে কেহই পারে নাই। যখন

সর্বত্রাসী কাল আসিয়া সেই অখণ্ড মিলনের মধ্যে বিয়োগের
 দুঃখ্য প্রাচীর রচনা করিয়া দিল, শাজাহানের সে দিনের বেদনা
 কেবল তিনিই জানিয়াছিলেন এবং তাঁহার সে দিনের সেই
 উচ্ছ্বসিত শোকের হাহাকার ধ্বনিতে আকাশতল নিত্যকাল
 ধ্বনিত করিয়া রাখিবার নিমিত্ত এই মৌন মর্দর-মন্দিরের প্রতি-
 প্রস্তর-সন্নিবেশের মধ্যে যে নিদারুণ দীর্ঘশ্বাস রাখিয়া গিয়াছেন,
 প্রিয়-বিরহী আসিয়া এইখানে দাঁড়াইলে সে বকোবিদারী দীর্ঘশ্বাস
 আজও শুনিতে পায়। তাই তাকে সে আর কেবল প্রাণহীন
 মৃত্যুসৌধ বলিয়া মনেই করিতে পারে না।

জগদিস্ত্রনাথ রায় ।



ডিরোজিয়ো ও তৎকালীন শিক্ষা

ডিরোজিয়োর নাম এখনকার ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে অনেকেই অপরিচিত। কিন্তু এক সময়ে তিনি বঙ্গের ইংরাজী-শিক্ষিত নব্য সম্প্রদায়ের, বিশেষতঃ হিন্দু-কলেজের ছাত্রদিগের হৃদয়ে যে কিরূপ রাজত্ব করিয়াছিলেন, এখন তাহা অনুমান করা দুঃসাধ্য। পাশ্চাত্য সাহিত্যে ও দর্শনে ডিরোজিয়োর অসাধারণ অধিকার ছিল। তেইশ বৎসর মাত্র বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়; কিন্তু সেই অল্প বয়সে তিনি যে বিজ্ঞাবুদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা অনেক প্রাচীন ব্যক্তিতেও দুর্লভ। তাঁহার অষ্টাদশবর্ষ বয়সের কবিতা অনেক প্রবীণ কবিকেও লজ্জিত করিবে। কিন্তু কবি-শক্তির অথবা বিজ্ঞাবুদ্ধির জন্য ডিরোজিয়োর প্রশংসা নয়; ছাত্রদিগের মনোবৃত্তির উন্মেষ করিবার জন্য তিনি যে আন্তরিক যত্ন করিতেন, তাহারই জন্য তাঁহার প্রশংসা। বোধ হয়, এ সম্বন্ধে, বঙ্গদেশের আর কোন বৈদেশিক শিক্ষকই তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। ছাত্রদিগকে কেবল বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিয়াই তিনি পরিতৃপ্ত থাকিতেন না; তাঁহাদিগের মধ্যে অনেককে নিজের বাড়ীতেও লইয়া গিয়া শিক্ষা দিতেন। পাশ্চাত্য কবিগণের কাব্যের উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট অংশ, রোম, গ্রীস প্রভৃতি দেশের পুরাবৃত্ত হইতে তত্তদদেশীর মহাপুরুষদিগের স্বদেশ-প্রেম, সত্যনিষ্ঠা এবং আত্ম-বিসর্জন প্রভৃতি তিনি ছাত্রদিগকে পাঠ করিয়া শুনাইতেন। তাঁহার অধ্যাপনার ও কথোপকথনের এমনই আকর্ষণ ছিল যে, তাঁহার ছাত্রদিগের মধ্যে অনেকে, কলিকাতার অতি দূরবর্তী স্থান হইতেও, ঋটিকা, বৃষ্টি ভেদ



করিয়া, এমন কি গুরুজনদিগের নিষেধ অবহেলা করিয়া, তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইতেন। কি যেন এক ঐচ্ছালিক শক্তিতে তিনি তাঁহার ছাত্রদিগকে মুগ্ধ করিতেন। তিনি নিজে অতি সুমধুর কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। তাঁহার “ফকৌর অব্ জঙ্গিরা” নামক খণ্ডকাব্য এবং নানাবিধমিষ্টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতাগুলি সে সময়ে, অতি আদরের সহিত পঠিত হইত। কলেজে থাকিতে তিনি “হেস্পেরাস” (Hesperus) এবং কলেজ পরিত্যাগ করিয়া “ইষ্ট ইণ্ডিয়ান” (East Indian) নামক একখানি পত্র সম্পাদন করিতেন। তাঁহার ছাত্রদিগকে তিনি এই সকল পত্রে লিখিবার জন্য সর্বদা উৎসাহ দিতেন। তাঁহার উৎসাহদানের ফলে ও প্রদত্ত শিক্ষার গুণে তাঁহার ছাত্রদিগের মধ্যে অনেকে ইংরাজী ভাষায় অসাধারণ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন, এবং পরিণামে সাহিত্যের সেবা করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের “এনকোয়ারার” (Enquirer) এবং রসিককৃষ্ণ মল্লিকের “জ্ঞানাবেষণ” ডিরোজিয়োরই প্রভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। কোন সুলেখক বলিয়াছেন, উপযুক্ত ছাত্রেরই সঙ্গুরুর পরিচয়; ডিরোজিয়োর ছাত্রদিগের জীবন পর্যালোচনা করিলেও একথা সপ্রমাণ হইতে পারে। তাঁহার প্রদত্ত শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহার ছাত্রদিগের মধ্যে অনেকেই কর্মশীল ও বশোভাজন হইয়াছিলেন। সুপ্রতিষ্ঠ রামগোপাল ঘোষ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক এবং রামতনু লাহিড়ী প্রভৃতি অনেক প্রতিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি ডিরোজিয়োর শিষ্য। বঙ্গীয় সমাজের অনেক শুভজনক কার্য ইহাদিগের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছে।



ডিরোজিয়ো তাঁহার ছাত্রদিগকে কেবল ইংরাজী ভাষার অধিকারলাভে সাহায্য করিয়া নিরন্তর থাকিতেন না। বাহ্যতে তাঁহার সত্যনিষ্ঠ, স্বদেশপ্রেমিক, এবং চিন্তানীল হইয়া, স্বদেশের ও স্বজাতির কল্যাণ সাধন করিতে পারেন, তজ্জন্তও উপযুক্ত শিক্ষা দিতেন। তিনি জাতিতে ফিরিঙ্গি ছিলেন বটে, কিন্তু সাধারণ ফিরিঙ্গি-সম্প্রদায়ের জায় তিনি ভারতবাসীদিগকে পর এবং ভারত-বর্ষকে তাঁহার বিদেশ বলিয়া মনে করিতেন না। তিনি ভারত-বর্ষকেই তাঁহার স্বদেশ এবং ভারতবাসীদিগকেই তাঁহার স্বজাতি বলিয়া বিবেচনা করিতেন। ভারতের অতীত গৌরব ও বর্তমান দুঃবস্থা স্মরণ করিয়া তাঁহার হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইত। কবিতায়, ছাত্র-দিগকে প্রদত্ত উপদেশে এবং সংবাদপত্রের স্তম্ভে—নানাপ্রকারে তিনি ভারত-ভূমির সখকে তাঁহার অনুরাগ প্রকাশ করিতেন। তাঁহার প্রণীত “ফকির অব্ জঙ্গিরা” নামক কাব্যের উৎসর্গপত্র পাঠ করিলে ভারতভূমির প্রতি তাঁহার যে কিরূপ আন্তরিক অনুরাগ ছিল, তাহা সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারা যায়। ডিরোজিয়ো এদেশে সাধারণতঃ শিক্ষক নামেই পরিচিত ; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি সংস্কারকের কার্য্যই করিয়া গিয়াছেন। তিনি যে সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সে সময়ও তাঁহার উদ্দেশ্য-সাধনের পক্ষে বিশেষ অনুরূপ ছিল। রাজা রামমোহন রায়ের ধর্ম্মমত লইয়া তখন বঙ্গদেশের গৃহে গৃহে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল এবং কলিকাতার ও তাঁহার নিকটবর্ত্তী স্থানের মধ্যে বাহারা সমধিক প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার প্রায় সকলেই হয় ধর্ম্মসভা, না হয় ব্রহ্মসভা, উভয়ের একতর পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। সতীদাহ-প্রথা-নিবারণ লইয়া তখন ভারতের



এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত আলোড়িত হইতেছিল। ডিরোজিয়ো তাঁহার ছাত্রদিগকে এই সকল আন্দোলনে যোগদান করিতে উপদেশ দিতেন। ভারতের যঙ্গলজনক কোন অশুষ্ঠান দেখিলে তাঁহার আনন্দের সীমা থাকিত না। তাঁহার অধ্যাপনাগৃহ ছাত্রদিগের সমাজ, নীতি এবং ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ক্ষেত্রস্বরূপ ছিল। শিক্ষকের সহিত অসকোচে তর্কবিতর্ক করিয়া ছাত্রেরা প্রত্যেক বিষয়েরই যৌক্তিকতা অথবা অযৌক্তিকতা নির্ধারণ করিতে শিক্ষা করিতেন। স্বর্গীয় রেভারেণ্ড লালবিহারী দে ডিরোজিয়োর অধ্যাপনাগৃহকে প্রেটোর “একাডিমস” (Academus) অথবা আরিস্টটলের “লাইসিয়ম্” (Lyceum) এর ক্ষুদ্র অক্ষরূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বাহাতে তাঁহার ছাত্রদিগের চিন্তাশক্তির ও বিচারশক্তির উদ্বোধন হইতে পারে, তজ্জন্ত ডিরোজিয়ো, প্রেটোর “একাডেমি”র নামানুসারে, “একাডেমি” নামে ছাত্রদিগের এক সভা প্রতিষ্ঠিত করাইয়াছিলেন। মাণিক-তলায়, সিংহবানুদিগের উদ্ভানে, যেখানে বহুদিন ওয়ার্ডস্ ইন্সটিটিউশন ছিল, সেই খানে এই সভার অধিবেশন হইত। প্রতি-সপ্তাহে তাঁহার ছাত্রগণ সেখানে উপস্থিত হইয়া ধর্মনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি নানা বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিতেন। এই সভার প্রতিপত্তি এতদূর বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে, সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং গবর্নর জেনারেলের প্রাইভেট সেক্রেটারীর দ্বায় পদস্থ ব্যক্তিগণও তাহার কোন কোন অধিবেশনে উপস্থিত থাকিতেন। সভাস্থলেই হউক, বা বিদ্যালয়েই হউক, ডিরোজিয়োর শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য এই ছিল যে, তিনি তাঁহার ছাত্রদিগকে নিরপেক্ষ ও স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে

বলিতেন। যাহা পূর্বাঙ্গের চিন্তা আসিতেছে, তাহাই সত্য ও সম্মানার্থ, এবং যাহা নূতন তাহা অসত্য ও অবজ্ঞেয়, এই চির-বন্ধনুল বিশ্বাস দূর করিবার জন্য তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। চিরপ্রচলিত সংস্কারের ও শাস্ত্রাঙ্গশাসনের পরিবর্তে, যাহাতে তাঁহার ছাত্রেরা যুক্তি ও বিবেকবলে হিতাহিত নির্ণয় করিতে পারেন, তাহাই তাঁহার উপদেশের সার মর্ম ছিল। হিন্দুশাস্ত্র বা খ্রীষ্টীয়-শাস্ত্র, কোন দেশের কোন শাস্ত্রই, তিনি অত্রাস্ত বলিয়া মনে করিতেন না। শাস্ত্রাঙ্গশাসন যেখানে ব্যক্তিত্বের অথবা স্বাধীনতার ও সহজজ্ঞানের বিরোধী, সেখানে তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার জন্য তিনি ছাত্রদিগকে উপদেশ দিতেন এবং সেই সঙ্গে তাঁহার স্বসমাজের ও হিন্দুসমাজের যে সকল আচার, ব্যবহার তাঁহার বিবেচনায় স্বাধীনতার ও সহজ জ্ঞানের বিরোধী ছিল, তিনি তাহা নির্দেশ করিতেন। ডিরোজিয়োর শিক্ষাপ্রণে নব্য সম্প্রদায় এক অভিনব আলোক প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার একাডেমির অধিবেশনে এবং সংবাদপত্রের পৃষ্ঠে হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে দোরতর আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। ডিরোজিয়োর ভ্রাবধানে "পার্থিনন" (Parthenon) নামে ছাত্রদিগের একখানি সংবাদপত্র প্রকাশিত হইত; তাহাতে হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে একপ আপত্তিজনক বিষয়সকল লিখিত হইতে লাগিল যে, কলেজের কর্তৃপক্ষগণ অবশেষে তাহার প্রচার নিবারণের আজ্ঞা দিতে বাধ্য হইলেন।

ডিরোজিয়োর শিক্ষার যেমন অনেক প্রশংসনীয় গুণ ছিল, তেমনই কতকগুলি গুরুতর দোষও ছিল। তিনি ছাত্রদিগের হৃদয়ে যে পরিমাণে স্বাধীনতা-প্রিয়তার উন্মেষ করিয়াছিলেন, সে

পরিমাণে আত্মসংযমের ও ভক্তিভাবের সঞ্চার করিতে পারেন নাই। হিন্দুসম্প্রদায়গণ পুরুষানুক্রমে শাস্ত্রশাসন দ্বারা পরিচালিত ; সহসা তাঁহাদিগের নিকট যুক্তির দ্বার উন্মুক্ত করিতে যাইয়া তিনি তাঁহাদিগকে স্বাধীন করিবার পরিবর্তে স্বেচ্ছাচারী করিয়া তুলিয়াছিলেন। ডিরোজিয়ার হিন্দুশাস্ত্রে অধিকার ছিল না ; সুতরাং শাস্ত্রকারদিগের গূঢ় উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া, তিনি তাঁহাদিগের সকল মতই ভ্রমাত্মক ও হিন্দুজাতির সকল আচারই কুসংস্কারমূলক বলিয়া মনে করিতেন। বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ হইলেও প্রোঢ় বরসের গাভীরা ও অভিজ্ঞতা তাঁহার ছিল না। বুঝনোচিত ঐক্যতোর ও চপলতার সহিত তিনি অনেক বিষয়ের যৌমাংসা করিতেন। শাস্ত্রকারগণ বহুশত বৎসরের অভিজ্ঞতার ফলে যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, যুক্তির ও সহজ জ্ঞানের প্রাধান্য স্থাপন করিতে যাইয়া তিনি একেবারে তাঁহাদিগের সম্মুখোৎপাটন করিতে চাহিতেন।

এরূপ শিক্ষার ফল এই হইয়াছিল যে, ডিরোজিয়ার ছাত্রগণ ভ্রম ও কুসংস্কার-সংশোধনের নামে ঘোরতর উদ্ধৃদ্ধলতা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। স্বাধীনতা অর্থে স্বেচ্ছাচার ও সংস্কার অর্থে সম্মুখোৎপাটন এই তাঁহারা বুঝিয়া লইলেন। পুরাণোক্ত ত্রিংশ কোটি দেবতার উচ্ছেদ করিতে যাইয়া তাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও সন্নিহান হইলেন, এবং হিন্দুসমাজে সহমরণপ্রথার জ্বায়ে কুসংস্কার ছিল বলিয়া, সমাজ-প্রচলিত যে কোন প্রথাই তাঁহারা কুসংস্কারমূলক বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। স্মরণান, গোমাংস-ভক্ষণ এবং যবনার-গ্রহণ প্রভৃতি কার্য্য তাঁহারা সমাজ-সংস্কারের পরাকাষ্ঠা বলিয়া বুঝিয়া লইলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে



কাহারও কাহারও এই অদ্ভুত সংস্কার জন্মিয়াছিল যে, পৃথিবীতে যখন “গোখাদক” জাতিরাই অপর সকল জাতিকে পরাজিত করিয়া আসিতেছে, তখন বাঙ্গালী হিন্দুরাও “গোখাদক” না হইলে অপর জাতির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতার তাঁহাদিগের জয়লাভের আশা নাই। এই অদ্ভুত সংস্কার কার্য্যে পরিণত করিতেও তাঁহারা ক্রটি করিতেন না। সকলে দলবদ্ধ হইয়া গোমাংস-ভক্ষণপূর্ব্বক, কখন কখন প্রতিবাসীদিগের গৃহে ভুক্তাবশেষ নিক্ষেপ করিতেন, এবং যে সকল আচার-ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে সমাজবিরুদ্ধ, তাহারই অমুষ্ঠান করিয়া আপনাদিগের উদ্ধৃদ্ধলতার, তাঁহাদিগের মতে নৈতিক বলের, পরিচয় দিতেন। তাঁহাদিগের দৃষ্টান্ত অন্ত্যাত্ম স্কুল, কলেজেরও ছাত্রদিগের মধ্যে প্রচারিত হইতে লাগিল। কলিকাতার গৃহে গৃহে চলুপ পড়িয়া গেল এবং অনেক মাতা পিতা সন্তানদিগকে ইংরাজী শিক্ষা দিতে ভীত হইলেন।

ডিরোজিয়োর শিক্ষায় কলেজীয় ছাত্রদিগের মধ্যে যে বিপ্লব-তরঙ্গ উখিত হইয়াছিল, অমুকুল বায়ুবলে তাহা আরও বিশালাকার ধারণ করিল। ডিরোজিয়োর শিক্ষার সমকালেই বঙ্গদেশে ইংরাজী-শিক্ষা-প্রচারের পথ পরিষ্কৃত হইয়াছিল। এদেশে কিরূপ শিক্ষা প্রচলন করা কর্তব্য, এই লইয়া সে সময়কার রাজপুরুষদিগের মধ্যে কিছুদিন হইতে আন্দোলন চলিতেছিল। একদল বলিতে-ছিলেন, ইংরাজী ভাষার সাহায্যে পাশ্চাত্য দর্শনের ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রচার করা এদেশে গবর্নমেন্টের কর্তব্য; অপর দল বলিতেছিলেন, দেশীয় ভাষাসমূহের শ্রীবৃদ্ধি-সাধন ও এদেশীয়দিগকে তাঁহাদিগের জাতীয় সাহিত্যে সুশিক্ষিত করাই গবর্নমেন্টের পক্ষে সম্ভব। উভয় দলেই বহুসংখ্যক বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি বর্তমান

ছিলেন। খ্যাতনামা আলেকজান্ডার ডফ ও প্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ হোরেস হেয়ান উইলসন, যথাক্রমে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য ভাষা প্রচারার্থাদিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। এদেশীয়দিগের মধ্যে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় পাশ্চাত্য এবং সুপ্রতিষ্ঠ বাবু রামকমল সেন প্রাচ্যভাষা-প্রচারের পক্ষপাতী ছিলেন। উভয় পক্ষই দীর্ঘকাল ধরিয়া তর্ক ও যুক্তির দ্বারা আপন আপন পক্ষ-সমর্থনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। বিবাদের শেষাবস্থায় সুপ্রসিদ্ধ লর্ড যেকলে পাশ্চাত্যভাষা-প্রচারার্থাদিগের পক্ষ অবলম্বন করাতে তাঁহারই অবলম্বিত পক্ষ জয়লাভ করিল। মহাত্মা লর্ড উইলিংঘাম বেটিক ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ৭ই মার্চ দিবসের প্রসিদ্ধ অবধারণ দ্বারা স্থির করিলেন যে, ইংরাজী ভাষার সাহায্যে ভারতবাসীদিগের মধ্যে পাশ্চাত্য সাহিত্য ও বিজ্ঞান-প্রচারই গবর্নমেন্টের প্রধান কর্তব্য এবং শিক্ষা-সম্বন্ধীয় অধিকাংশ অর্থই সেই উদ্দেশ্যসাধনে ব্যয় করা হইবে।

মহাত্মা বেটিকের এই অবধারণ ভারত সমাজে কি যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে তাহা বর্ণনা করা অনাবশ্যক। মুসলমান রাজগণ ছয় সাত শত বৎসরের অত্যাচারে ও নির্যাতনেও যে পরিবর্তন করিতে পারেন নাই, বিন্দুমাত্র বলপ্রকাশ-ব্যতিরেকে এক ইংরাজী ভাষার প্রচার হইতে লোকের মানসিক ভাব ও প্রবণতা সম্বন্ধে তাহার অপেক্ষা শতগুণ অধিক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ডিরোজিয়ার শিক্ষা নব্য-শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের সাংসারিক আচার-ব্যবহারে পরিবর্তন ঘটাইয়াছিল; গবর্নমেন্টের অবধারণ তাঁহাদিগের চিন্তা ও মানসিক ভাব-সম্বন্ধে যুগান্তর উপস্থিত করিল। একেই ত দেশীয় শাস্ত্র ও গ্রন্থাগুলীলনে নব্য-শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের বিতৃষ্ণা ছিল, তাহার



উপর গবর্নমেন্টের এই অবধারণ প্রকাশিত হইবার পর সংস্কৃত গ্রন্থ স্পর্শ করিতেও আর তাঁহাদিগের প্রবৃত্তি রহিল না। গবর্নমেন্টের শিক্ষা-স্বাক্ষর অবধারণ প্রকাশিত হইবার কয়েক বৎসর পূর্বে, সতীদাহ-নিবারণ লইয়া ঘোরতর আন্দোলন উঠিয়াছিল। যাহারা সতীদাহ-নিবারণের পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁহারা প্রতিষেধীদিগের যুক্তি খণ্ডনের নিমিত্ত হিন্দুশাস্ত্রে যে সমস্ত ভ্রম-প্রমাদ আছে, তাহাদিগের উল্লেখ করিতে ক্রটি করেন নাই। তাঁহাদিগের স্থায় পাশ্চাত্যভাষা-প্রচারাদিগণও সংস্কৃত গ্রন্থসমূহে যে সকল অলৌকিক ও অতিরঞ্জিত ঘটনার উল্লেখ আছে, প্রতিবাদীদিগকে নিরস্ত ও অপদস্থ করিবার জন্য তাহাদিগের কঠোর সমালোচনা করিতে বিরত হইলেন না। তাঁহারা স্বপক্ষীয়দিগকে বুঝাইলেন যে, যে দেশের কাব্যো হনুমানের লাসুল এবং দধি, দুগ্ধ ও দ্রুত সমুদ্রের বর্ণনা স্থান প্রাপ্ত হয়, সে দেশের সাহিত্যের আলোচনা করা কেবল বিড়ম্বনামাত্র। সে সময়কার ইংরাজী-লিখিত সম্প্রদায়ের আদর্শ পুরুষ ইংরাজ ; এবং সেই ইংরাজের ইংরাজ মেকলে সাহেব যখন বলিলেন যে, সংস্কৃত সাহিত্য অতি অসার, তখন তাহাতে যে কিছু অমুকরণীয় বা জ্ঞাতব্য থাকিতে পারে তাহা চিন্তা করিবারও তাঁহাদিগের প্রবৃত্তি রহিল না। লর্ড মেকলে তাঁহার অভ্যাসামুসুপ অতিরঞ্জন বহুল ভাষায় বলিলেন "A single shelf of a good European library is worth the whole native literature of India and Arabia." অর্থাৎ কোন যুরোপীয় উৎকৃষ্ট পুস্তকালয়ের একটীয়াই আলমারিও সমগ্র আরব্য ও সংস্কৃত সাহিত্যের সমতুল্য। কেবল ইহাই নয় ; তিনি অসঙ্কুচিতচিত্তে বলিলেন :— "অন্ত ভাবার কথা দূরে থাকুক, সংস্কৃত সাহিত্য

নর্থান ও শ্যাক্সন সাহিত্যেরও সমতুল্য কিনা, তাহাও আমার সন্দেহ আছে। I doubt whether the Sanskrit literature be as valuable as that of our Saxon and Norman progenitors." লর্ড মেকলের একপ মন্তব্যের উপর কোন কথা বলা নিম্প্রয়োজন। সংস্কৃত ভাষার বাহার বিন্দুমাত্রও অধিকার ছিল না এবং যিনি সংস্কৃত ভাষার আলোচনা পণ্ডিত্যমাত্র জ্ঞান করিতেন, তাহার পক্ষে একপ মন্তব্য প্রকাশ করা যে কতদূর ধুইতার কার্য্য হইয়াছে তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। সুপ্রসিদ্ধ মুসলমান কবি ফর্দুসী গজ্জনী রাজসভা-সম্বন্ধে বিজ্ঞপ্তি করিয়া বলিয়াছিলেন—"গজ্জনী রাজসভা মহাসমুদ্রের তুল্য, কিন্তু কেহ কখন তাহা হইতে মুক্তা প্রাপ্ত হয় না।" আলেকজান্ডার ডফ ফর্দুসীর সেই কবিতার অনুকরণ করিয়া বলিলেন "প্রাচ্য-ভাষাসমূহও সমুদ্রের জায় মহান্, অন্তল এবং অকূল; কিন্তু বহুদিন অন্বেষণ করিয়াও আমি কখন ইহাতে মুক্তা দেখিতে পাইলাম না।" ডফের ও মেকলের এই সকল কথা নূতন ইংরাজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট বড়ই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হইল। তাহারা সত্য সত্যই মনে করিলেন, সংস্কৃত সাহিত্যে শিক্ষণীয় কিছুই নাই; ইহা কেবলই কূষ-ভূমির শুণাশুণে এবং ঘৃত, তৃণ ও লব্ধি-সমুদ্রের বর্ণনাতেই পরিপূর্ণ। এই বিশ্বাস অনুসারে তাহারা রামায়ণ মহাভারতের জায় মহাকাব্যে এবং অভিজ্ঞান-শকুন্তলের জায় নাটকে মুক্তা না পাইয়া, ইলিয়াডে, ইনিয়াডে এবং ফিড্রিংএর উপজ্ঞাসে মুক্তা-অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ অতি কৃপাপাত্র, এবং সংস্কৃত সাহিত্যের অনুশীলন নিতান্ত নির্লক্ষিতার পরিচায়ক, এই তাহাদিগের প্রতীতি



জন্মিল। স্বদেশীয় কাব্য, পুরাণাদিতে অভিজ্ঞতা-লাভের চেষ্টা করা দূরে থাকুক, সে সম্বন্ধে কোনরূপ জ্ঞান না থাকাই বেন তাঁহাদিগের পক্ষে গৌরবকর বোধ হইল। তাঁহারা আকিলিসের অথবা আগামেম্ননের উদ্ধতন মণ্ডম পুরুষের নাম বলিতে পারিতেন, কিন্তু মহারাজ স্বতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরের পিতৃব্য কি প্রপৌত্র জিজ্ঞাসা করিলে নির্বাক হইয়া থাকিতেন। সেক্সপিয়রের বা মিল্টনের গ্রন্থের কোন্ স্থলে কি আছে, তাহা তাঁহাদিগের জিহ্বাগ্রে বিরাজ করিত, কিন্তু বনপর্কে রামচন্দ্রের বনবাস কি যুধিষ্ঠিরের নির্বাসন লিখিত আছে, কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বিপদ বোধ করিতেন। বেদব্যাসের ও বাণীকির ভাষারই বচন এই দুর্দশা ঘটিল, তখন হুঃখিনী বাঙ্গালা ভাষার অবস্থা আর কি লিখিব। হিন্দু কলেজের অনেক খ্যাতনামা ছাত্র বাঙ্গালায় বিগুহরূপে আপন আপন নামও লিখিতে পারিতেন না। বাঙ্গালা ভাষা বলিয়া যে একটা স্বতন্ত্র ভাষার অস্তিত্ব আছে, বা থাকিতে পারে, তাহা তাঁহাদিগের মনে উদ্ভিত হইত না। দোকানদারদিগের ও অশিক্ষিত বৃদ্ধদিগের পাঠের জন্য রামায়ণ মহাভারত নামে ছুইখানি পত্রগ্রন্থ আছে, এই মাত্র তাঁহারা জানিতেন। গুপ্ত কবির “প্রভাকর” তখন বঙ্গসমাজের এক অংশে জ্যোতিঃ দান করিতেছিল বটে, কিন্তু নব্য-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট তাহার বড় সমাদর ছিল না। নব্যদিগের মধ্যে যাহারা অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত, তাঁহারাও তাহার সমাদর করিতেন। বাঙ্গালা গ্রন্থসমূহ নব্যদিগের পাঠাগার হইতে নির্বাসিত হইল; বাঙ্গালা ভাষার কথাবাস্তা কথা এবং বাঙ্গালায় পরস্পরকে পত্রলেখা অগৌরবকর বলিয়া তাঁহাদিগের ধারণা জন্মিল। আমরা বাহাকে বিপ্লবকাল বলিয়া বর্ণনা



করিয়াছি, তাহা এইরূপে গূর্ণ হইল। ডিরোজিয়োর শিকার ও পাশ্চাত্যসাহিত্যের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে নব্য-শিক্ষিত সম্প্রদায় স্বদেশীয় আচার ও স্বদেশীয় সাহিত্য উভয়ই সমভাবে নির্বাসিত করিতে প্রস্তুত হইলেন।

যোগীন্দ্রনাথ বসু।



বিলাতের স্মৃতি

আবার লগনে ফিরিয়া গেলাম। এবারে ডাক্তার স্কট নামে একজন ভদ্র গৃহস্থের ঘরে আমার আশ্রয় জুটল। একদিন সন্ধ্যার সময় বাক্স তোরঙ্গ লইয়া তাঁহাদের ঘরে প্রবেশ করিলাম। বাড়িতে কেবল পঞ্চকেশ ডাক্তার, তাঁহার গৃহিণী ও তাঁহাদের বড় মেয়েটি আছেন। ছোট দুইজন মেয়ে ভারতবর্ষীয় অতিথির আগমন-আশঙ্কায় অভিজ্ঞ হইয়া কোনো আত্মীয়ের বাড়ি পলায়ন করিয়াছেন। বোধ করি যখন তাঁহারা সংবাদ পাইলেন আমার দ্বারা কোনো সংঘাতিক বিপদের আশু সম্ভাবনা নাই, তখন তাঁহারা ফিরিয়া আসিলেন।

অতি অল্পদিনের মধ্যেই আমি ইহাদের ঘরের লোকের মত হইয়া গেলাম। মিসেস্ স্কট আমাকে আপন ছেলের মতই স্নেহ করিতেন। তাঁহার মেয়েরা আমাকে বেক্রপ মনের সঙ্গে যত্ন করিতেন, তাহা আত্মীয়দের কাছ হইতেও পাওয়া দুর্লভ।

এই পরিবারে বাস করিয়া একটি জিনিষ আমি লক্ষ্য করিয়াছি—মানুষের প্রকৃতি সব জায়গাতেই সমান। আমরা বলিয়া থাকি, এবং আমিও তাহা বিশ্বাস করিতাম, যে আমাদের দেশে পতিভক্তির একটি বিশিষ্টতা আছে, যুরোপে তাহা নাই। কিন্তু আমাদের দেশের সাক্ষী গৃহিণীর সঙ্গে মিসেস্ স্কটের আমি ত বিশেষ পার্থক্য দেখি নাই। স্বামীর সেবার তাঁহার সমস্ত মন ব্যাপ্ত ছিল। মধ্যবিত্ত গৃহস্থঘরে চাকরবাকরদের উপসর্গ নাই,



প্রায় সব কাজই নিজের হাতে করিতে হইত, এই জন্ত স্বামীর
 প্রত্যেক ছোটখাটো কাজটিও মিসেস্ স্কট নিজের হাতে করিতেন।
 সন্ধ্যার সময় স্বামী কাজ করিয়া ঘরে ফিরিবেন, তাহার পূর্বে
 আগুনের ধারে তিনি স্বামীর আরামকেদারা ও তাঁহার পশয়ের
 কুতাজোড়াটি স্বহস্তে শুছাইয়া রাখিতেন। ডাক্তার স্কটের কি
 ভাল লাগে আর না লাগে, কোন ব্যবহার তাঁহার কাছে প্রিয় বা
 অপ্রিয়, সে কথা মুহূর্তের জন্তও তাঁহার স্ত্রী ভুলিতেন না। প্রাতঃ-
 কালে একজনমাত্র দাসীকে লইয়া নিজে উপরের তলা হইতে
 নীচের রান্নাঘর, সিঁড়ি এবং দরজার গায়ে পিতলের কাজগুলিকে
 পর্য্যন্ত ধুইয়া মাজিয়া তক্তকে ঝক্‌ঝকে করিয়া রাখিয়া দিতেন।
 ইহার পরে লোকলৌকিকতার নানা কর্তব্য ত আছেই।
 গৃহস্থালীর সমস্ত কাজ সারিয়া সন্ধ্যার সময় আমাদের পড়াশুনা গান-
 বাজনায তিনি সম্পূর্ণ ষোগ দিতেন; অবকাশের কালে আয়োদ-
 প্রমোদকে জমাইয়া তোলা, সেটাও গৃহিণীর কঠব্যেরই অঙ্গ।

মেয়েদের লইয়া এক একদিন সন্ধ্যাবেলায় সেখানে টেবিল-
 চালা হইত। আমরা কয়েকজনে মিলিয়া একটা টিপাইয়ে হাত
 লাগাইয়া থাকিতাম, আর টিপাইটা ঘরময় উন্নতের যত দাপাদপি
 করিয়া বেড়াইত। ক্রমে এমন হইল আমরা বাহাতে হাত দিই
 তাহাই নড়িতে থাকে। মিসেস্ স্কটের এটা যে খুব ভাল লাগিত,
 তাহা নহে। তিনি মুখ গম্ভীর করিয়া এক একবার মাথা নাড়িয়া
 বলিতেন, আমার মনে হইবে এটা ঠিক বৈধ হইতেছে না। কিন্তু
 তবু তিনি আমাদের এই ছেলেমানুষীকাণ্ডে জোর করিয়া বাধা
 দিতেন না, এই অনাচার সহ করিয়া বাইতেন। একদিন ডাক্তার
 স্কটের লম্বা টুপি লইয়া সেটার উপর হাত রাখিয়া বখন চালিতে



গেলায়, তিনি ব্যাকুল হইয়া তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন—
না, না, ও টুপি চালাইতে পারিবে না। তাহার স্বামীর যাদার
টুপিতে যুহুর্তের জন্ত সমতানের সংস্কার ঘটে, ইহা তিনি সহিতে
পারিলেন না।

এই সমস্তের মধ্যে একটি জিনিষ দেখিতে পাইতাম, সেটি
স্বামীর প্রতি তাহার ভক্তি। তাহার সেই আত্মবিসর্জনপর মধুর
নয়না স্মরণ করিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারি, স্ত্রীলোকের প্রেমের স্বাভা-
বিক চরম পরিণাম ভক্তি। যেখানে তাহাদের প্রেম আপন
বিকাশে কোনো বাধা পায় নাই, সেখানে তাহা আপনিই পূজায়
আসিয়া ঠেকে। যেখানে ভোগবিলাসের আয়োজন প্রচুর, যেখানে
আমোদ-প্রমোদই দিনরাত্রিকে আবিল করিয়া রাখে, সেখানে এই
প্রেমের বিকৃতি ঘটে, সেখানে স্ত্রী-প্রকৃতি আপনার পূর্ণ আনন্দ
পায় না।

কয়েক মাস এখানে কাটিয়া গেল। মেজদাদাদের দেশে
ফিরিবার সময় উপস্থিত হইল। পিতা লিখিয়া পাঠাইলেন
আমাকেও তাহাদের সঙ্গে ফিরিতে হইবে। সে প্রস্তাবে আমি
খুসি হইয়া উঠিলাম। দেশের আলোক, দেশের আকাশ আমাকে
ভিতরে ভিতরে ডাক দিতেছিল। বিদায়গ্রহণকালে মিসেস্ স্কট
আমার দুই হাত ধরিয়া কাদিয়া কহিলেন, এমন করিয়াই যদি চলিয়া
যাইবে তবে এত অল্পদিনের জন্ত ভূমি কেন এখানে আসিলে?—
লওনে এই গৃহটি এখন আর নাই—এই ডাক্তার-পরিবারের
কেহ বা পরলোকে, কেহ বা ইহলোকে কে কোথায় চলিয়া
গিয়াছেন, তাহার কোনো সংবাদই জানি না; কিন্তু সেই গৃহটি
আমার মনের মধ্যে চিরপ্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে।



একবার শীতের সময় আমি টন্ট্রিজ্, ওয়েল্‌স্‌ সহরের রাস্তা দিয়া যাইবার সময় দেখিলাম, একজন লোক রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া আছে ; তাহার হেঁড়া জুতার ভিতর দিয়া পা দেখা যাইতেছে, পায়ে যোজা নাই বুকের খানিকটা খোলা। ভিক্ষা করা নিষিদ্ধ বলিয়া সে আমাকে কোন কথা বলিল না, কেবল মুহূর্তকালের জন্য আমার মুখের দিকে তাকাইল। আমি তাহাকে যে মুদ্রা দিলাম, তাহা তাহার পক্ষে প্রত্যাশার অতীত ছিল। আমি কিছু দূর চলিয়া আসিলে সে তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া কহিল, মহাশয় আপনি আমাকে ভ্রমক্রমে একটি স্বর্ণমুদ্রা দিয়াছেন, বলিয়া সেই মুদ্রাটি আমাকে ফিরাইয়া দিতে উদ্বৃত্ত হইল। এই ঘটনাটি হয় ত আমার মনে থাকিত না ; কিন্তু ইহার অনুরূপ আর একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। বোধ করি টর্কি ষ্টেশনে প্রথম বখন পৌছিলাম একজন মুটে আমার মোট লইয়া ঠিকাগাড়িতে তুলিয়া দিল। টাকার ধলি খুলিয়া পেনি জাতীয় কিছু পাইলাম না, একটি অর্ধক্রাউন ছিল সেইটিই তাহার হাতে দিয়া গাড়ি ছাড়িয়া দিলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখি সেই মুটে গাড়ির পিছনে ছুটিতে ছুটিতে গাড়োয়ানকে গাড়ি ধামাইতে বলিতেছে। আমি মনে ভাবিলাম, সে আমাকে নির্কোষ বিদেশী ঠাহরাইয়া আরো কিছু দাবী করিতে আসিতেছে। গাড়ি ধামিলে সে আমাকে বলিল, আপনি বোধ করি, শেনি মনে করিয়া আমাকে অর্ধক্রাউন দিয়াছেন।

যত দিন ইংলণ্ডে ছিলাম কেহ আমাকে বকনা করে নাই ; তাহা বলিতে পারি না—কিন্তু তাহা মনে করিয়া রাখিবার বিষয় নহে এবং তাহাকে বড় করিয়া দেখিলে অবিচার করা হইবে।



আমার মনে এই কথাটা খুব লাগিয়াছে যে, যাহারা নিজে বিশ্বাস নষ্ট করে না, তাহারাই অন্তকে বিশ্বাস করে। আমরা সম্পূর্ণ বিদেশী অপরিচিত, বখন খুসি কঁাকি দিয়া সোড় মারিতে পারি— তবু সেখানে দোকানে বাজারে কেহ আমাদেরকে কিছু সন্দেহ করে নাই।

যতদিন বিলাতে ছিলাম স্ক্রু হইতে শেষ পর্যন্ত একটি প্রহসন আমার প্রবাসবাসের সঙ্গে জড়িত হইয়াছিল। ভারত-বর্ষের একজন উচ্চ ইংরেজ কর্মচারীর বিধবা স্ত্রীর সহিত আমার আলাপ হইয়াছিল। তিনি রেহ করিয়া আমাকে কবি বলিয়া ডাকিতেন। তাঁহার স্বামীর মৃত্যু-উপলক্ষে তাঁহার ভারতবর্ষীয় এক বন্ধু ইংরেজিতে একটি বিলাপগান রচনা করিয়াছিলেন। তাহার ভাবটানুপূর্ণ ও কবিত্বশক্তিসম্বন্ধে অধিক বাক্যব্যয় করিতে ইচ্ছা করি না। আমার ছুঁড়াগ্যাক্রমে, সেই কবিতাটি বেহাগ-রাগিনীতে গাহিতে হইবে এমন একটা উল্লেখ ছিল। আমাকে একদিন তিনি ধরিলেন এই গানটা তুমি বেহাগরাগিনীতে গাহিয়া আমাকে শুন। আমি নিতান্ত ভালমাসুখী করিয়া তাঁহার কথাটা রক্ষা করিয়াছিলাম। সেই অদ্বিত কবিতার সঙ্গে বেহাগ সুরের সম্মিলনটা যে কিরূপ হাস্তকর হইয়াছিল, তাহা আমিছাড়া বুঝিবার দ্বিতীয় কোনো লোক সেখানে উপস্থিত ছিল না। মহিলাটি ভারতবর্ষীয় সুরে তাঁহার স্বামীর শোকগাথা শুনিয়া খুব খুসি হইলেন। আমি মনে করিলাম এইখানেই পালা শেষ হইল—কিন্তু হইল না।

সেই বিধবা রমণীর সঙ্গে নিমন্ত্রণসভায় প্রায়ই আমার দেখা হইত। আহা! সন্তোষ বৈঠকখানায় বখন নিমন্ত্রিত স্ত্রীপুরুষ সকলে একত্র



সমবেত হইতেন, তখন তিনি আমাকে সেই বেহাগ গান করিবার জন্ত অমুরোধ করিতেন। অল্প সকলে ভাবিতেন ভারতবর্ষীয় সঙ্গীতের একটা বৃদ্ধি আশ্চর্য্য নমুনা শুনিতে পাইবেন—তাহারা সকলে মিলিয়া সান্থনয় অমুরোধে যোগ দিতেন, মহিলাটির পকেট হইতে সেই ছাপান কাগজখানি বাহির হইত—আমার কর্ণমূল রক্তিম আভা ধারণ করিত। নতশিরে লজ্জিতকণ্ঠে গান ধরিতাম—স্পষ্টই বৃদ্ধিতে পারিতাম এই শোকগাধার ফল আমার পক্ষে ছাড়া আর কাহারো পক্ষে যথেষ্ট শোচনীয় হইত না। গানের শেষে চাপা হাসির মধ্য হইতে শুনিতে পাইতাম, “Thank you very much. How interesting!” তখন শীতের মধ্যও আমার শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইবার উপক্রম করিত। এই ভঙ্গলোকের মৃত্যু আমার পক্ষে বে এতবড় একটা দুর্ঘটনা হইয়া উঠিলে, তাহা আমার জন্মকালে বা তাহার মৃত্যুকালে কে মনে করিতে পারিত।

তাহার পরে আমি যখন ডাক্তার ঘরের বাড়িতে থাকিয়া লণ্ডন যুনিভার্সিটিতে পড়া আরম্ভ করিলাম, তখন কিছুদিন সেই মহিলাটির সঙ্গে আমার দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ ছিল। লণ্ডনের বাহিরে কিছু দূরে তাহার বাড়ি ছিল। সেই বাড়িতে বাইবার জন্ত, তিনি প্রায় আমাকে অমুরোধ করিয়া চিঠি লিখিতেন। আমি শোক-গাধার ভরে কোনোমতেই রাজি হইতাম না। অবশেষে একদিন তাহার সান্থনয় একটি টেলিগ্রাফ পাইলাম। টেলিগ্রাফ যখন পাইলাম, তখন কলেজে বাইতেছি। এদিকে তখন কলিকাতায় ফিরিবার সময়ও আসন্ন হইয়াছে। মনে করিলাম এখান হইতে চলিয়া বাইবার পূর্বে বিদবার অমুরোধটা পালন করিয়া যাইব।

কলেজ হইতে বাড়ি না গিয়া একেবারে ট্রেনে গেলাম।



সেদিন বড় দুর্ঘোষ খুব শীত, বরফ পড়িতেছে, কুরাশার আচ্ছন্ন। যেখানে ঘাইতে হইবে সেই ট্রেনেই এ লাইনের শেষ গম্যস্থান— তাই নিশ্চিত হইয়া বসিলাম। কখন গাড়ি হইতে নামিতে হইবে, তাহা সন্ধান লইবার প্রয়োজন বোধ করিলাম না।

দেখিলাম ট্রেনগুলি সব ডানদিকে আসিতেছে। তাই ডানদিকের জানলা বেসিয়া বসিয়া গাড়ির দীপালোকে একটা বই পড়িতে লাগিলাম। সকালসকাল সন্ধ্যা হইয়া অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে—বাহিরে কিছুই দেখা যায় না। লণ্ডন হইতে যে কয়জন যাত্রী আসিয়াছিল, তাহারা নিজ নিজ গম্যস্থানে একেএকে নামিয়া গেল।

গন্তব্য ট্রেনের পূর্বট্রেন ছাড়িয়া গাড়ি চলিল। এক জায়গায় একবার গাড়ি থামিল। জানলা হইতে মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম সমস্ত অন্ধকার। লোকজন নাই, আলো নাই, প্লাটফর্ম নাই, কিছুই নাই। ভিতরে বাহারা থাকে তাহারাই প্রকৃত ভবজানা হইতে বঞ্চিত—রেলগাড়ি কেন যে অস্থানে অসময়ে থামিয়া বসিয়া থাকে রেলের আরোহীদের তাহা বুঝিবার উপায় নাই, অতএব পুনরায় পড়ায় মন দিলাম। কিছুকণ বাদে গাড়ি পিছু হটিতে লাগিল—মনে ঠিক করিলাম রেলগাড়ির চরিত্র বুঝিবার চেষ্টা করা মিথ্যা। কিন্তু যখন দেখিলাম, যে ট্রেনটি ছাড়িয়া গিয়াছিল সে সেই ট্রেনে আসিয়া গাড়ি থামিল তখন উদাসীন থাকা আমার পক্ষে কঠিন হইল। ট্রেনের লোককে জিজ্ঞাসা করিলাম অমুক ট্রেন কখন পাওয়া বাইবে? সে কহিল, সেইখান হইতেই ত এ গাড়ী এইমাত্র আসিয়াছে। ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কোথায় বাইতেছে? সে কহিল, লণ্ডনে। বুঝিলাম এ



গাড়ি খেঁচাগাড়ি, পারাপার করে। ব্যতিব্যস্ত হইয়া হঠাৎ সেইখানে নাথিয়া পড়িলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, উত্তরের গাড়ি কখন পাওয়া যাইবে? সে কহিল, আজ রাত্রে নয়। জিজ্ঞাসা করিলাম, কাছাকাছির মধ্যে সরাই কোথাও আছে? সে বলিল, পাঁচ মাইলের মধ্যে না।

প্রাতে দশটার সময় আহাৰ করিয়া বাহির হইয়াছি, ইতিমধ্যে জলস্পর্শ করি নাই। কিন্তু বৈরাগ্য ছাড়া বখন বিত্তীয় কোনো পথ খোলা না থাকে, তখন নিবৃত্তিই সব চেয়ে সোজা। মোটা ওড়ারকোটের বোতাম গলা পর্যন্ত আঁটিয়া টেসনের দীপস্তম্ভের নীচে বেঞ্চের উপর বসিয়া বই পড়িতে লাগিলাম। বইটা ছিল স্পেন্সরের Data of Ethics, সেটি তখন সবেমাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। গতাস্তর বখন নাই, তখন এই জাতীয় বই মনোযোগ দিয়া পড়িবার এমন পরিপূর্ণ অবকাশ আর জুটিবে না, এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিলাম।

কিছুকাল পরে পোটার আসিয়া কহিল, আজ একটি স্পেশাল আছে—আধঘণ্টার মধ্যে আসিয়া পৌছিবে। শুনিয়া মনে এত ক্ষুণ্ণির সঞ্চার হইল যে, তাহার পর হইতে Data of Ethics-এ মনোযোগ করা আমার পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠিল।

সাতটার সময় যেখানে পৌছিবার কথা, সেখানে পৌছিতে সাড়ে নয়টা হইল। গৃহকর্ত্তা কহিলেন, একি কবি, ব্যাপারখানা কি? আমি আমার আশ্চর্য্য ভ্রমণবৃত্তান্তটি খুব যে সগর্বে বলিলাম, তাহা নয়।

তখন সেখানকার নিমন্ত্রিতগণ ডিনার শেষ করিয়াছেন। আমার মনে ধারণা ছিল যে, আমার অপরাধ বখন স্বৈচ্ছাকৃত নহে,



তখন গুরুতর দণ্ডভোগ করিতে হইবে না—বিশেষতঃ রমণী যখন বিধানকর্ত্রী। কিন্তু উচ্চপদস্থ ভারতকর্মচারীর বিধবা স্ত্রী আমাকে বলিলেন—এস রুবি, এক পেয়ালা চা খাইবে।

আমি কোনো দিন চা খাই না, কিন্তু স্বঠরানল নির্দোষের পক্ষে পেয়ালা ব্যতিক্রম সাহায্য করিতে পারে মনে করিয়া গোটাছুয়েক চক্রাকার বিস্কুটের সঙ্গে সেই কড়া চা গিলিয়া ফেলিলাম। বৈঠকখানা ঘরে আসিয়া দেখিলাম অনেকগুলি প্রাচীনা নারীর সমাগম হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে একজন সুন্দরী যুবতী ছিলেন, তিনি আমেরিকান এবং তিনি গৃহস্থায়ীর যুবক ভ্রাতৃপুত্রের সহিত বিবাহের পূর্বে পূর্বরাগের পালা উদ্ঘাপন করিতেছেন। ঘরের গৃহিণী বলিলেন, এবার তবে নৃত্য সুরু করা যাক। আমার নৃত্যের কোনো প্রয়োজন ছিল না, এবং শরীর-মনের অবস্থাও নৃত্যের অনুরূপ ছিল না। কিন্তু অত্যন্ত ভালমাহুয যাহারা, জগতে তাহারা অসাধ্যসাধন করে। সেই কারণে যদিচ এই নৃত্যসভাটি সেই যুবকযুবতীর জন্তই আহূত, তথাপি দশঘণ্টা উপবাসের পর দুইখণ্ড বিস্কুট খাইয়া তিনকালউত্তীর্ণ প্রাচীন রমণীদের সঙ্গে নৃত্য করিলাম।

এইখানেই হুঃখের অবধি হইল না। নিমন্ত্রণকর্ত্রী আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, রুবি আজ তুমি রাজিখাপন করিবে কোথায়? এ প্রশ্নের জন্ত আমি একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না। আমি হতবুদ্ধি হইয়া যখন তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলাম, তিনি কহিলেন রাজি দ্বিপ্রহরে এখানকার সরাই বন্ধ হইয়া যায়, অতএব আর বিলম্ব না করিয়া এখনি তোমার সেখানে যাওয়া কর্তব্য। সৌজন্তের একেবারে অভাব ছিল না—সরাই আমাকে নিজে



খুজিয়া লইতে হয় নাই। লণ্ডন ধরিয়া একজন ভৃত্য আমাকে সরাইয়ে পৌছাইয়া দিল।

মনে করিলাম, হয়ত শাপে বর হইল—হয়ত এখানে আহারের ব্যবস্থা আছে। জিজ্ঞাসা করিলাম আমিষ হউক, নিরামিষ হউক, তাজা হউক, বাসি হউক কিছু খাইতে পাইব কি? তাহারা কহিল, যত্ন যত চাও পাইবে, খাওয়া নয়। তখন ভাবিলাম নিদ্রা-দেবীর হৃদয় কোমল, তিনি আহার না দিন বিস্মৃতি দিবেন। কিন্তু তাঁহার জগৎজোড়া অঙ্কেও তিনি সে রাত্রে আমাকে স্থান দিলেন না। বেলেপাথরের যোজেওয়াল ঘর ঠাণ্ডা কনকন করিতেছে; একটি পুরাতন খাট ও একটি জীর্ণ মুখ ধুইবার টেবিল ঘরের আস্বাব।

সকাল বেলায় ইংল্যান্ডী বিধবাট প্রাতরাশ খাইবার জন্ত ডাকিয়া পাঠাইলেন। ইংরেজি দস্তরে যাহাকে ঠাণ্ডা খাবার বলে, তাহারই আয়োজন। অর্থাৎ গতরাত্রির ভোজের অবশেষ আঙ্গ ঠাণ্ডা অবস্থায় খাওয়া গেল। ইহারই অতি যৎসামান্য কিছু অংশ যদি উষ্ণ বা কবোষ্ণ আকারে কাল পাওয়া যাইত, তাহা হইলে পৃথিবীতে কাহারো কোনো গুরুতর ক্ষতি হইত না—অথচ আমার নৃত্যটা ডাঙায়তোলা কইমাছের নৃত্যের মত এমন শোকাবহ হইতে পারিত না।

আহারান্তে নিমন্ত্রণকর্ত্রী কহিলেন, যাহাকে গান শুনাইবার জন্ত তোমাকে ডাকিয়াছি তিনি অস্থায়ী, শয়্যাগত; তাঁহার শয়নগৃহের বাহিরে দাঁড়াইয়া তোমাকে গাহিতে হইবে। সিঁড়ির উপর আমাকে দাঁড় করাইয়া দেওয়া হইল। রুদ্ধদ্বারের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া গৃহিণী কহিলেন, ঐ ঘরে তিনি আছেন। আমি



সেই অদৃশ্য রহস্যের অভিমুখে দাঁড়াইয়া শোকের গান বেহাগ-রাগিণীতে গাহিলাম, তাহার পর রোগিণীর অবস্থা কি হইল সে সংবাদ লোকমুখে বা সংবাদপত্রে জানিতে পাই নাই।

লণ্ডনে ফিরিয়া আসিয়া দুই তিন দিন বিছানায় পড়িয়া নিরঙ্কুশ ভালগামুখীর প্রায়শ্চিত্ত করিলাম। ডাক্তারের যেরূপা कहিলেন, দোহাই তোমার, এই নিমন্ত্রণব্যাপারকে আমাদের দেশের অতিথোর নমুনা বলিয়া গ্রহণ করিও না। এ তোমাদের ভারত-বর্ষের নিমকের গুণ।

শ্রীবীজনাথ ঠাকুর।



বিশ্বদেশী সমাজ

“শুফলা শুফলা” বঙ্গভূমি ভূষিত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সে চাতকপক্ষীর মত উর্ধ্বে দিকে তাকাইয়া আছে—কর্তৃপক্ষীদের জলবর্ষণের ব্যবস্থা না করিলে তাহার আর গতি নাই।

গুরুগুরু মেঘগর্জনে শ্রুত হইয়াছে—গবর্গেণ্ট সাড়া দিয়াছেন—তৃষ্ণানিবারণের ষা-হয়-একটা উপায় হয় ত হইবে—অতএব আপাতত আমরা সেজন্ত উদ্বেগ প্রকাশ করিতে বসি নাই।

আমাদের চিন্তার বিষয় এই যে, পূর্বে আমাদের যে একটি ব্যবস্থা ছিল,—যাহাতে সমাজ অত্যন্ত সহজ নিয়মে আপনার সমস্ত অভাব আপনিই মিটাইয়া লইত—দেশে তাহার কি লেশমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে না ?

আমাদের যে সকল অভাব বিদেশীরা গড়িয়া তুলিয়াছে ও তুলিতেছে, সেইগুলাই না হয় বিদেশী পূরণ করুক। অগ্রক্ৰিষ্ট ভারতবর্ষের চায়ের তৃষ্ণা অস্বাইয়া দিবার জন্য কুর্জন্সাহেব উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছেন ; আচ্ছা, না হয় আণ্ড্রুয়ল্-সম্প্রদায় আমাদের চায়ের বাটি ভর্তি করিতে থাকুন ; এবং এই চায়ের চেয়েও যে জালায়দ তরলরসের তৃষ্ণা—যাহা প্রায়কালের সূর্যাস্তচ্ছটার স্থায় বিচিত্র উজ্জল দীপ্তিতে উত্তরোত্তর আমাদের কাছে প্রলুব্ধ করিয়া তুলিতেছে—তাহা পশ্চিমের সামগ্রী এবং পশ্চিম-দিশেবী তাহার পরিবেষণের ভার লইলে অসম্ভব হয় না—কিন্তু জলের তৃষ্ণা ত স্বদেশের খাটি সনাতন জিনিষ।—ব্রিটিশ



গবর্নেন্ট আসিবার পূর্বে আমাদের জলপিণাসা ছিল এবং এতকাল তাহার নিবৃত্তির উপায় বেশ ভালরূপেই হইয়া আসিয়াছে—এজন্ত শাসনকর্তাদের রাজদণ্ডকে কোনো দিন ত চঞ্চল হইয়া উঠিতে হয় নাই।

আমাদের দেশে যুদ্ধবিগ্রহ, রাজ্যরক্ষা এবং বিচারকার্য্য রাজা করিয়াছেন, কিন্তু বিদ্যাদান হইতে জলদান পর্য্যন্ত সমস্তই সমাজ এমন সহজভাবে সম্পন্ন করিয়াছে যে, এত নব নব শতাব্দীতে এত নব নব রাজার রাজত্ব আমাদের দেশের উপর দিয়া বস্তার মত বহিয়া গেল, তবু আমাদের ধর্ম্ম নষ্ট করিয়া আমাদের পুত্র মৃত করিতে পারে নাই, সমাজ নষ্ট করিয়া আমাদের একেবারে লক্ষীছাড়া করিয়া দেয় নাই। রাজার রাজার লড়াইয়ের অন্ত নাই—কিন্তু আমাদের মর্ম্মরায়মাণ বেণুকুলে, আমাদের আমকাঠালের বনচ্ছায়ায় দেবারতন উঠিতেছে, অতিথি-শালা স্থাপিত হইতেছে, পুষ্করিণী-খনন চলিতেছে, গুরুমহাশয় শুভকরী কসাইতেছেন, টোলে শাস্ত্র-অধ্যাপনা বন্ধ নাই, চণ্ডী-মণ্ডপে রামায়ণপাঠ হইতেছে এবং কৌতুকের আরাবে পল্লীর প্রাঙ্গণ মুখরিত। সমাজ বাহিরের সাহায্যের অপেক্ষা রাখে নাই এবং বাহিরের উপদ্রবে আঁতট্ট হয় নাই।

দেশে এই যে সমস্ত লোকহিতকর মঙ্গলকন্ড ও আনন্দ-উৎসব এতকাল অব্যাহতভাবে সমস্ত ধনিদরিদ্রকে ধন্য করিয়া আসিয়াছে, এজন্ত কি চাঁদার খাতা কুফিগত করিয়া উৎসাহী লোকদিগকে ঘারে ঘারে মাথা খুঁড়িয়া মরিতে হইতেছে, না, রাজ-পুরুষদিগকে শূন্য মস্তব্যসহ পরোয়ানা বাহির করিতে হইয়াছে ! নিরাস লইতে যেমন আমাদের কাহাকেও হাতে-পায়ে ধরিতে



হয় না, রক্ত-চলাচলের জন্ত যেমন টৌনহল্-বীটিং অনাবশ্যক—
সমাজের সমস্ত অত্যাৱশ্যক হিতকর ব্যাপার সমাজে তেমনি অত্যাৱশ্য
স্বাভাবিক নিয়মে ঘটয়া আসিয়াছে।

আজ আমাদের দেশে জল নাই বলিয়া যে আমরা আক্ষেপ
করিতেছি, সেটা সামান্ত কথা। সকলের চেয়ে গুরুতর শোকের
বিষয় হইয়াছে—তাহার মূল কারণটা। আজ সমাজের মনটা
সমাজের মধ্যে নাই। আমাদের সমস্ত মনোবোগ বাহিরের দিকে
গিয়াছে।

কোনো নদী যে গ্রামের পার্শ্ব দিয়া বরাবর বহিয়া আসিয়াছে,
সে যদি একদিন সে গ্রামকে ছাড়িয়া অন্তত তাহার স্রোতের
পথ লইয়া যায়, তবে সে গ্রামের জল নষ্ট হয়, ফল নষ্ট হয়,
স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, বাণিজ্য নষ্ট হয়, তাহার বাগান জ্বল হইয়া
পড়ে, তাহার পূর্বসমৃদ্ধির ভগ্নাবশেষ আপন দীর্ঘভিত্তির ফাটলে
ফাটলে বট-অশ্বথকে প্রেশয় দিয়া পেচকবাহুড়ের বিহারস্থল
হইয়া উঠে।

মানুষের চিত্তস্রোত নদীর চেয়ে সামান্ত জিনিষ নহে। সেই
চিত্তপ্রবাহ চিরকাল বাংলার ছায়ামিতল গ্রামগুলিকে অনাময়
ও আনন্দিত করিয়া রাখিয়াছিল—এখন বাংলার সেই পল্লীকোড়
হইতে বাঙ্গালীর চিত্তধারা বিক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছে। তাই তাহার
দেবালয় জীর্ণপ্রায়—সংস্কার করিবার দিবার কেহ নাই, তাহার
জলাশয়গুলি দূষিত—পঙ্কোদ্ধার করিবার কেহ নাই, সমৃদ্ধঘরের
অট্টালিকাগুলি পরিত্যক্ত—সেখানে উৎসবের আনন্দধ্বনি উঠে
না। কাজেই এখন জলদানের কর্তা সরকারবাহাদুর, স্বাস্থ্যদানের
কর্তা সরকারবাহাদুর, বিদ্যাদানের ব্যবস্থার জন্তও সরকার-



বাহাদুরের ঘারে গলবস্ত্র হইয়া ফিরিতে হয়। বে গাঁছ আপনার ফুল আপনি ফুটাইত, সে আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টির স্তম্ভ তাহার সমস্ত শীর্ণ শাখাপ্রশাখা উপরে তুলিয়া দরখাস্ত জারি করিতেছে। না হয়, তাহার দরখাস্ত মঞ্জুর হইল, কিন্তু এই সমস্ত আকাশ-কুসুম লইয়া তাহার সার্থকতা কি ?

ইংরাজিতে বাহাকে ষ্টেট্ বলে, আমাদের দেশে আধুনিক ভাষায় তাহাকে বলে সরকার। এই সরকার প্রাচীন ভারতবর্ষে রাজশক্তি-আকারে ছিল। কিন্তু বিলাতের ষ্টেটের সঙ্গে আমাদের রাজশক্তির প্রভেদ আছে। বিলাত, দেশের সমস্ত কল্যাণকর্মের ভার ষ্টেটের হাতে সমর্পণ করিয়াছে—ভারতবর্ষ তাহা আংশিকভাবে বাত্ব করিয়াছিল।

দেশের যাহারা গুরুস্থানীয় ছিলেন, যাহারা সমস্ত দেশকে বিনা বেতনে বিজ্ঞানশিক্ষা, ধর্মশিক্ষা দিয়া আসিয়াছেন, তাহাদিগকে পালন করা, পুরস্কৃত করা যে রাজার কর্তব্য ছিল না, তাহা নহে—কিন্তু কেবল আংশিকভাবে বস্ত্রত সাধারণত সে কর্তব্য প্রত্যেক গৃহীত। রাজা যদি সাহায্য বন্ধ করেন, হঠাৎ যদি দেশ অরাজক হইয়া আসে, তথাপি সমাজের বিজ্ঞানশিক্ষা, ধর্মশিক্ষা একান্ত ব্যাঘাতপ্রাপ্ত হয় না। রাজা যে প্রজাদের ক্ষুদ্র দীঘিকা খনন করিয়া দিতেন না, তাহা নহে—কিন্তু সমাজের সম্পদ ব্যক্তিমান্রই যেমন দিত, তিনিও তেমনি দিতেন। রাজা অমনোযোগী হইলেই 'দেশের জলপাত্র রিক্ত হইয়া বাইত না।

বিলাতে প্রত্যেকে আপন আরাম-আমোদ ও স্বার্থসাধনে স্বাধীন—তাহারা কর্তব্যভারে আক্রান্ত নহে—তাহাদের সমস্ত

বড় বড় কর্তব্যভার রাজশক্তির উপর স্থাপিত। আমাদের দেশে রাজশক্তি অপেক্ষাকৃত স্বাধীন—প্রজাসাধারণ সামাজিক কর্তব্যদ্বারা আবদ্ধ। রাজা যুক্ত করিতে যান, শিকার করিতে যান, রাজকাৰ্য্য করুন বা আয়োজ করিয়া দিন কাটান, সেজন্য ধর্মের বিচারে তিনি দায়ী হইবেন,—কিন্তু জনসাধারণ নিজের মঙ্গলের জন্য তাঁহার উপরে নিতান্ত নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকে না—সমাজের কাজ সমাজের প্রত্যেকের উপরেই আশ্চর্য্যরূপে, বিচিত্ররূপে ভাগ করা রহিয়াছে।

এইরূপ থাকিতে আমরা ধর্ম বলিতে বাহা বুঝি, তাহা সমাজের সর্বত্র সঞ্চারিত হইয়া আছে। আমাদের প্রত্যেকেই স্বার্থ-সংঘর্ষ ও আত্ম-ত্যাগ চর্চা করিতে হইয়াছে। আমরা প্রত্যেকেই ধর্মপালন করিতে বাধ্য।

ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে, ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতার প্রাণশক্তি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত। সাধারণের কল্যাণভার যেখানেই পুঞ্জিত হয়, সেইখানেই দেশের ধর্মস্থান। সেইখানে আঘাত করিলেই সমস্ত দেশ সাংঘাতিকরূপে আহত হয়। বিলাতে রাজশক্তি যদি বিপর্য্যস্ত হয়, তবে সমস্ত দেশের বিনাশ উপস্থিত হয়—এইজন্যই যুরোপে পলিটিক্স্ এত অধিক গুরুতর ব্যাপার। আমাদের দেশে সমাজ যদি পতন হয়, তবেই স্বার্থভাবে দেশের সঙ্কটাবস্থা উপস্থিত হয়। এইজন্য আমরা এতকাল রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণ করি নাই, কিন্তু সামাজিক স্বাধীনতা সর্বতোভাবে বাঁচাইয়া আসিয়াছি। নিঃস্বকে ভিক্ষাদান হইতে সাধারণকে ধর্মশিক্ষাদান, এ সমস্ত বিষয়েই বিলাতে স্টেটের উপর নির্ভর—আমাদের দেশে ইহা জনসাধারণের ধর্মব্যবস্থার



উপরে প্রতিষ্টিত—এহজন্ত ইংরাজ চেটুকে বাঁচাইলেই বাঁচে, আমরা ধন্যব্যবস্থাকে বাঁচাইলেই বাঁচিব, যাই।

ইংলণ্ডে স্বভাবতই চেটুকে জাখত রাখিতে, সচেষ্টে রাখিতে জনসাধারণ সঙ্কলনাই নিযুক্ত। সম্প্রতি আমরা ইংরাজের পাঠশালার পাঠ্য্য গ্রন্থ করিয়াছি, অবস্থানিকিচায়ে গবমেণ্টকে কোচা মর্গিরা মনোযোগ করাই জনসাধারণের সঙ্গ প্রদান কর্তব্য। হো বুদ্ধিলাস না যে, পরের শরীরে নিদ্রিত হইলে লাগাইতে পারিলে নিদ্রের বাণীর চাকসো করা হয় না।

আমরা তক করিতে ভালবাসি, অতএব এ তক এখানে হো অনাবদ্য না যে, সাধারণের বুদ্ধির সাধারণের সঙ্কাজেই সঙ্কাজিত হইয়া থাকে ভাল, না তাহা বশেষভাবে সরকার নামক একটা জাঙ্গাল নিদিষ্ট হইয়া ভাল। আমার বক্তব্য এই যে, এ তক বিহীনভাবে চিত্তের দ্বাবে করা বাঁহতে পারে, কিন্তু আপাতত এ তক আমাদের কোনো কাজে লাগিবে না।

কারণ এ কথা আনানিগকে বুঝিতেই হইবে—বিলাতগাজে র চেষ্টা সমস্ত সমাজের সমাজের উপরে অবিস্মরণকপে প্রতিষ্টিত—তাহা সেখানকার স্বাভাবিক নিয়মেই অভিব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। শুকমাত্র তকের দ্বারা আমরা তাহা লাভ করিতে পারিব না—অতান্ত ভাল হইলেও তাহা আমাদের অনধিগম্য !

আমাদের দেশে সরকারবাহাদুর সমাজের কেহই নন, সরকার সমাজের বাহিরে। অতএব যে কোনো বিষয় তাঁহার কাছ হইতে প্রত্যাশা করিব, তাহা স্বাধীনতার মূল্য দিয়া লাভ করিতে হইবে। যে কর্ম সমাজ সরকারের দ্বারা করাইয়া লইবে, সেই কর্মসম্বন্ধে সমাজ নিজেকে অকর্মণ্য করিয়া তুলিবে। অতএব এই অকর্মণ্যতা

আমাদের দেশের স্বভাববিরুদ্ধ ছিল না। আমরা নানা জাতির, নানা রাজ্যের অধীনতাপাশ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি, কিন্তু সমাজ চিরদিন আপনায় সমস্ত কাজ আপনি নিষ্পন্ন করিয়া আসিয়াছে, ক্ষুদ্রবৃহৎ কোনো বিষয়েই বাহিরের অস্ত্র কাছাকাড় হস্তক্ষেপ করিতে দেখে নাই। সেইজন্য রাজশ্রী যখন দেশ হহতে নিষ্পাসিত, সমাজলক্ষ্মী তখনো বিনারগ্রহণ করেন নাই, সেইজন্যই আজও আমাদের মাপা একেবারে মাটিতে গিয়া লোকিতে পায় নাই।

আজ আমরা সমাজের সমস্ত কড়বা নিজের চেষ্টায় একে একে সমাজবাহিনীতে ঠেটের হাতে তুলিয়া দিবার জন্য উদ্যত হইয়াছি। এমনকি, আমাদের সামাজিক প্রত্যেকেই ইংরাজের আইনের ছায়ায় আমরা অপরিবর্তনীয়রূপে আটকোঁঠে বাধিতে দিয়াছি—কোনো আপত্তি কার নাই। এ পর্যন্ত হিন্দুসমাজের চিত্তের দাকিরা নব নব সম্প্রদায় আপনাদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ আচারাবচারের প্রবর্তন করিয়াছে, হিন্দুসমাজ তাকানিকে তিরস্কৃত করে নাই। আজ হহতে সমস্তই ইংরাজের আইনে বাধিয়া গেছে,—পরিবর্তনমাত্রই আজ নিজেকে অহিন্দু বলিয়া ঘোষণা করিতে বাধ্য হইয়াছে। ইহাতে বুঝা বাইতেছে, যেখানে আমাদের মন্দির—বে মন্দিরকে আমরা নিজের অন্তরের মধ্যে লয়ছে রক্ষা করিয়া এতদিন বাঁচিয়া আসিয়াছি, সেই আমাদের অন্তরতম মন্দির আজ অনাবৃত-অবারিত হইয়া পড়িয়াছে, সেখানে আজ বিকলতা আক্রমণ করিয়াছে। ইহাই বিপদ, জলকষ্টে বিপদ নহে।

পূর্বে যাহারা বাদশাহের দরবারে রায়রায়ী হইয়াছেন, নবাবেরা যাহাদের মন্ত্রণা ও সহায়তার জন্য অপেক্ষা করিতেন,



তাহারা এই রাজপ্রসাদকে যথেষ্ট জ্ঞান করিতেন না—স্বর্ষাজের প্রসাদ রাজপ্রসাদের চেয়ে তাহাদের কাছে উচ্চ ছিল। তাহারা প্রতিপত্তি-লাভের জন্য নিজের সমাজের দিকে তাকাইতেন। রাজরাজেশ্বরের রাজধানী দিল্লী তাহাদিগকে যে সম্মান দিতে পারে নাই, সেই চরম সম্মানের জন্য তাহাদিগকে অধ্যাত জন্ম-পল্লীর কুটারখারে আসিয়া দাঁড়াইতে হইত। দেশের সামান্য লোকেও বলিবে মহাদেশব ব্যক্তি, ইহা সরকারদত্ত রাজ্য মহারাজা উপাধির চেয়ে তাহাদের কাছে বড় ছিল। জন্মভূমির সম্মান ইহারা অন্তরের সহিত বুঝিয়াছিলেন—রাজধানীর মাহাত্ম্য, রাজসভার গৌরব ইহাদের চিত্তকে নিজের পল্লী হইতে বিক্ষিপ্ত করিতে পারে নাই। এইজন্য দেশের গণগ্রামেও কোনো দিন জলের কষ্ট হয় নাই, এবং মহুদ্যচ্চর্চার সমস্ত ব্যবস্থা পল্লীতে পল্লীতে সর্বত্রই রক্ষিত হইত।

দেশের লোক ধন্ত বলিবে, ইহাতে আজ আমাদের সুখ নাই, কাজেই দেশের দিকে আমাদের চেষ্টার স্বাভাবিক গতি নহে। সুস্থ অবস্থায় শারীরিক ক্রিয়ার প্রবর্তক অব্যবহিত উত্তেজনা শরীরের মধ্যেই থাকে—যখন মৃগনাভি, অ্যামোনিয়া, সাপের বিষ দিয়া শরীরকে সক্রিয় করিতে হয়, তখন অবস্থাটা নিতান্ত সংশয়াপন্ন। আজকাল আমাদের সমাজ-শরীরের আভ্যন্তরিক উত্তেজনা ইহাকে কোনো কাজেই প্রবৃত্ত করিতে পারিতেছে না—বৈজ্ঞান্যমহাশয়ের বড়ি না হইলে একেবারে অচল। এখন সরকারের নিকট হইতে হয় ভিক্ষা, নয় ভাগিদ দরকার হইয়া পড়িয়াছে। এখন দেশের জলকষ্টনিবারণের জন্য গবর্নমেন্ট দেশের লোককে ভাগিদ দিতেছেন—স্বাভাবিক ভাগিদগুলা সব



বন্ধ হইয়া গিয়াছে। দেশের লোকের নিকটে খ্যাতি, তাহাও
রোচে না। আমাদের হৃদয় যে গোরার কাছে দাসধন লিখিয়া
দিয়াছে, আমাদের রুচি যে সাহেবের দোকানে বিকাইয়া গেল।

কে বলে, জলকষ্টনিবারণের সামর্থ্য আমাদের নাই? একদা
দেশের যে অর্থ দেশের কল্যাণকর্য সাধন করিয়া চরম সার্থিকতা
লাভ করিত, আজ সেই অর্থ অজস্রধারায় মিল্টনের আড়ালতা,
ডাইটকের গাড়িখানা, ল্যাক্সারসের আসবাবশালা, হার্মানকোম্পানির
দর্জির দোকানকে অভিযুক্ত করিয়া দিতেছে। স্বদেশের শুক
ভালুতে জলবিদ্যু দিবার বেলায় টানাটানি না পড়িবে কেন?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।



বিশ্ববিদ্যালয়

মধ্য এসিয়ার মরুভূমিতে যে সব পর্যটক প্রাচীন যুগের চিহ্ন সন্ধান করেছেন তাঁরা দেখেছেন সেখানে কত স্নেহ জনপদ আজ বালি চাপা পড়ে হারিয়ে গেছে। এককালে সে সব জায়গায় জলের সঞ্চয় ছিল, নদীর রেখাও পাওয়া যায়। কখন রস এল শুকিয়ে, এক পা এক পা করে এগিয়ে এল মরু, শুক রসনা খেলে লেচন করে নিল প্রাণ, লোকালয়ের শেষ স্বাক্ষর মিলিয়ে গেল অসীম পাণ্ডুবস্তুর মতো। বিপুল সংখ্যক গাভ নিয়ে আমাদের বে-দেশ, সেই দেশের মনোভূমিতেও রসের ভোগান আজ অবসিত। যে-রস অনেক কাল থেকে নিঃসৃত হয়ে বাষ্প হয়ে আছে তাও দিনে দিনে শুক বাতাসের উষ্ণ নিঃশ্বাসে উবে যাবে, অবশেষে প্রাণনাশ। মরু অগ্রসর হয়ে তৃষ্ণার অজগর সাপের মতো পাকে পাকে গ্রাস করতে থাকবে আমাদের এই গ্রাম-গাঁও দেশকে। এই মরুর আক্রমণটা আমাদের চোখে পড়তে না, কেননা বিশেষ শিক্ষার গতিকেই দেশ-দেখা চোখ আমরা হারিয়েছি, গণাকলঙ্কের আলোর মতো আমাদের সমস্ত দৃষ্টির লক্ষ্য কেন্দ্রীভূত শিক্ষিত সমাজের দিকে।

আমি একদিন দীর্ঘকাল ছিলাম বাংলা দেশের গ্রামের নিকট-সংস্রবে। গ্রামের সময়ে একটা ছাখের দৃষ্টি পড়ত চোখে। নদীর জল গিয়েচে নেমে, তীরের মাটি গিয়েচে কেটে, বেরিয়ে পড়েচে পাড়ার পুকুরের পঙ্কস্তর, ধু ধু করচে তপ্ত বাল। মেয়েরা



বহু দূর পথ থেকে ঘড়ায় করে নদীর জল বয়ে আনচে, সেই জল বাংলাদেশের অশুভ্রলমিশ্রিত। গ্রামে আগুন লাগলে নিবোবার উপায় পাওয়া যায় না, ওলাউঠো দেখা দিলে নিবারণ করা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে।

এই গেল এক, আর এক ভাংখের বেদনা আমার মনে বেড়েছিল। সকল হয়ে এসেচে, সমস্ত দিনের কাজ শেষ করে চাবোবা ফিরেচে ঘরে। একদিকে বিকৃত মাঠের উপর নিভৃত অন্ধকার, আর একদিকে বাঁশকাড়েব মাদা এক একটু গ্রাম যেন রাত্রির ব্যাঘ্র মধ্যে ভেগে আছে ঘনতর অন্ধকারের স্বপ্নের মধ্যে। সেই দিক থেকে শোনা যায় খোলের শব্দ, আর তারি সঙ্গে একটানা সুরে কীওনের কোনো একটা পনের হাজারবার তারতরবে আবৃত্তি। শুনে মনে হোত এখানেও চিহ্ন-জলাশয়ের জল শুলায় এসে পড়েচে। তাপ বাড়চে, কিন্তু ঠান্ডা কববার উপায় কতটুকুই বা। বছরের পর বছর যে অবস্ফোটনের মতো দিন কাটে তাতে কী করে প্রাণ বাঁচবে ব'র মাঝে মাঝে এটা অনুভব না করা যায় যে হাড়ভাঙা মজুরীর উপরেও মন ব'লে মানুষের একটা কিছু আছে যেখানে তার অপমানের উপশম, ভভাগ্যের দাসত্ব এড়িয়ে যেখানে ঈশ ছাড়বার জাবগা পাওয়া যায়। তাহলে সেই তৃপ্তি দেবার জন্তে একদিন সমস্ত সমাজ প্রভূত আয়োজন করেছিল। তার কারণ, সমাজ এই বিপুল জনসাধারণকে স্বীকার করে নিবেছিল আপন লোক ব'লে। জানত, এরা নোম গেলে সমস্ত দেশ যায় নেমে। আজ মনের উপবাস ঘোচাবার জন্তে কেউ তাদের কিছুবাত্র সাহায্য করে না। তাদের আত্মীয় নেই, তারা নিজে নিজেই আগেকার দিনের তলানি নিয়ে কোনোমতে



একটু সাবনা পাবার চেষ্টা করে। আর কিছু দিন পরে এটুকুও যাবে শেষ হয়ে; সমস্ত দিনের ছুঃখধন্দার রিক্ত প্রান্তে নিরানন্দ ঘরে আলো জলবে না, সেখানে গান উঠবে না আকাশে। খিল্লী ডাকবে বাণবনে, ঝোপঝাড়ের মধ্য থেকে শেরালের ডাক উঠবে প্রহরে প্রহরে, আর সেই সময়ে সহরে শিকাজিমানীর দল বৈহ্যত আলোর সিনেমা দেখতে ভিড় করবে।

একদিকে আমাদের দেশে সনাতন শিকার ব্যাপ্তি রুদ্ধ হয়ে জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানের অনাবৃত্তি চিরকালীন হুঃয় দাঁড়াল, অতীতকে আধুনিক কালের নতুন বিজ্ঞান যে আবির্ভাব হোলো তারো প্রবাহ বহেল না সর্বজনীন দেশের অভিমুখে। পাথরে গাধা কুণ্ডের মতো স্থানে স্থানে সে আবদ্ধ হয়ে রইল, তীর্থের পাণ্ডাকে দর্শন দিবে দূর থেকে এসে গন্তব্য ভিত্তি করতে হয়, নানা নিয়মে তার আটঘাট বাধা। মন্টাকিনী থাকেন শিবের ঘোরালো জটাজুটের মধ্যে বিশেষ ভাবে, তবুও দেব-ললাট থেকে তিনি তাঁর ধারা নামিয়ে দেন, বহু বান সাধারণভাবে ঘাটে ঘাটে মর্ত্যজনের ধারের সম্মুখ দিবে, ঘটে ঘটে করে দেন আপন প্রসাদ। কিন্তু আমাদের দেশে প্রবাসিনী আধুনিকী বিজ্ঞা তেমন নয়। তার আছে বিশিষ্ট রূপ, সাধারণ রূপ নেই। সেইজন্তে ইংরেজি শিখে ধারা বিশিষ্টতা পেয়েচেন তাঁদের মনের মিল হয় না সর্বসাধারণের সঙ্গে। দেশে সকলের চেয়ে বড়ো জাতিভেদ এইখানেই, শ্রেণীতে শ্রেণীতে অস্পৃশ্যতা।

ইংরেজি ভাষার অবগুপ্তিত বিজ্ঞা স্বভাবতই আমাদের মনের সহবর্তিনী হয়ে চলতে পারে না। সেইজন্তেই আমরা অনেকেই যে পরিমাণে শিক্ষা পাই সে পরিমাণে বিজ্ঞা পাইনে। চারদিকের



আবহাওয়ার থেকে এ বিজ্ঞা বিচ্ছিন্ন, আমাদের ঘর আর ইস্কুলের মধ্যে ঐক্য চলে, মন চলে না। ইস্কুলের বাইরে পড়ে আছে আমাদের দেশ, সেই দেশে ইস্কুলের প্রতিবাদ রয়েছে বিস্তর, সহযোগিতা নেই বললেই হয়। সেই বিচ্ছেদে আমাদের ভাষা ও চিন্তা অধিকাংশ স্থলেই ইস্কুলের ছেলের মতোই। খুচল না আমাদের নোট বইয়ের শাসন, আমাদের বিচার বুদ্ধিতে নেই সাহস, আছে মজির মিমিরে অতি সাবধানে পা ফেলে চলা। শিকার সঙ্গে দেশের মনের সহজ মিলন ঘটাবার আয়োজন আজ পর্যন্ত হোলো না। যেন কনে রইল বাণের বাড়ীর অস্তঃপুরে, স্বত্তরবাড়ি নদীর ওপারে বালির চর পেরিয়ে। খেদা নৌকাট্টা গেল কোথায় ?

পারাপারের একখানা জোড়া দেখিয়ে দেওয়া হয় তাকে বলে সাহিত্য। এ কথা মানতেই হবে আধুনিক বঙ্গসাহিত্য বর্তমান যুগের অঙ্গে বসে যাহুঁষ। এই সাহিত্য আমাদের মনে লাগিয়েছে একালের ছোঁওয়া, কিন্তু খাওয়া তো ওপার থেকে পুরোপুরি বহন করে আনছে না। যে-বিজ্ঞা বর্তমান যুগের চিন্তাশক্তিকে বিচিত্র আকারে প্রকাশ করছে, উদ্ঘাটন করছে বিশ্বরহস্যের নব নব প্রবেশদ্বার, বাংলা সাহিত্যের পাড়ায় তার যাওয়া আসা নেই বললেই হয়। চিন্তা করে যে-মন, যে-মন বিচার করে, বুদ্ধির সঙ্গে ব্যবহারের যোগ সাধন করে যে, সে পড়ে আছে পূর্ব-মুহুর্তে, আর যে-মন রস সন্তোষ করে সে যাতায়াত শুরু করেছে আধুনিক ভোজের নিমন্ত্রণ-শালার আঙিনায়। স্বভাবতই তার যৌক পড়েছে সেই দিকটাতে যে-দিকে চলেছে মনের পরিবেষণ, যেখানে ঝাঁঝালো গন্ধে বাতাস হয়েছে যাতাল।



গল্প কবিতা নাটক নিয়ে বাংলা সাহিত্যের পনেরো আনা আয়োজন। অর্থাৎ ভোজের আয়োজন, শক্তির আয়োজন নয়। পাশ্চাত্য দেশের চিত্রোৎকর্ষ বিচিত্র চিত্রশক্তির প্রবল সমবায় নিয়ে। যদুঘাট সেখানে দেহ মন প্রাণের সকল দিকেই ব্যাপ্ত। তাই সেখানে যদি ক্রুট থাকে তো পুষ্টিও আছে। বটগাছের কোনো ডাল-বা ঝড়ে ভাঙল, কোনোখানে-বা পোকায় ছিদ্র করেছে, কোনো বসন্ত-বা বৃষ্টির কার্পণ, কিন্তু সবগুণ জড়িয়ে বনস্পতি জমিয়ে রেখেছে আপন স্বাস্থ্য আপন বশিষ্ঠতা। তেমনি পাশ্চাত্য দেশের যনকে ক্রিয়াবানু করে রেখেছে তার বিত্ত তার শিক্ষা তার সাহিত্য সমস্ত মিলে, তার কল্পশক্তির অক্লান্ত উৎকর্ষ ঘটিয়েছে এই সমস্তের উৎকর্ষ।

আমাদের সাহিত্যে রসেরই পাবাতি। সেইজন্যে যখন কোনো অসংযম, কোনো চিত্তবিকার, অসুকরণের নীলা দেয়ে এই সাহিত্যে প্রবেশ করে তখন সেটাই একান্ত হয়ে ওঠে, কল্পনাকে কণ বিলাসিতার লিকে গাঁড়িয়ে তোলে। প্রবল প্রাণশক্তি আগ্রহ না থাকলে দেশের ক্ষুদ্র বিকার কথায় কথায় বিবকোড়া হয়ে রাগিয়ে ওঠে। আমাদের দেশে সেই আশঙ্কা। এ নিয়ে দোষ দিলে অগার্নিঙ্গির দেখাই পাশ্চাত্য সমাজের, বলি এটাই তো সভ্যতার আধুনিকতম পরিণতি। কিন্তু সেই সঙ্গে সকল দিকে আধুনিক সভ্যতার যে সচিস্ত সচল প্রবল বৃহৎ সমগ্রতা আছে, সেটার কথা চাপা রাখি।

একদা পাড়ারীয়ে যখন বাস করতুম তখন সাধুসাঁধকের বেশধারী কেউ কেউ আমার কাছে আসত, তারা সাধনার নামে উজ্জ্বল ইন্দ্রিয়চর্চার সংবাদ আমাকে জানিয়েছে। তাতে ধর্মের



প্রশয় ছিল। তাদেরই কাছে কখনও এই প্রশয় স্বরূপে সত্তর পর্য্যন্ত গোপনে শিল্পে প্রশিক্ষে শাখারিত। এই পৌরুষনারী মর্ষ্যনাথদারী লালসার লোলতা ব্যাপ্ত হবার প্রধান কারণ এই যে, আমাদের সাহিত্যে সমাজে সেই সমস্ত উপাদানের অভাব যাতে বড়ো বড়ো চিন্তাকে বুদ্ধির সাধনাকে আশ্রয় ক'রে কঠিন গবেষণার দিকে মনের ঐশ্বর্য্য জাগিয়ে রাখতে পারে।

এ ক্ষেত্রে অদ্বিত বাঙালী সাহিত্যিকদের দোষ দেওয়া যায় না। আমাদের সাহিত্যে সাধারণত নয় বলে এ'কে নিন্দা করা সহজ, কিন্তু কী কথলে এ'কে সাবালো করা যায় তার পড়া নিশ্চয় করা তত সহজ নয়। কঠির সম্বন্ধে লোকে বেপরোয়া, কেননা ও'দিকে কোনো শাসন নেই। অশিক্ষিত কঠিও রসের সাধনায় থেকে বা হোক কোনো একটা আদর্শ পায় আর যদি সে মনে করে তারই বোধ রসবোধের চরম আদর্শ, তবে তা নিয়ে তর্ক তুললে লোকদ্বারা পর্য্যন্ত পৌত্ততে পাবে। কবিতা গল্প নাটকের বাজারের দিকে যারা সমজদারের রাজপদটা পাবনি, অদ্বিত তারা আনাড়ি-পাড়ার মাঠ নিয়েও চলতে পারে, কোনো মাড়ল দিতে হয় না কোথাও। কিন্তু যে বিজ্ঞা মননের, সেখানে কড়া পাহারার সিংহদার পেরিয়ে যেতে হয়, মাঠ পেরিয়ে নয়। যে-সব দেশের পরে লক্ষী প্রসন্ন এবং সরস্বতী, তারা সেই বিজ্ঞার দিকে নতুন নতুন পথ পাকা করছে প্রত্যাহ, পণোর আদর্শপ্রদান চলছে দূরে নিকটে, ঘরে বাইরে। আমাদের দেশেও তা বিলম্ব করলে চলবে না।

বাংলার আকাশে দুর্দিন এসেছে চারদিক থেকে ঘন ঘোর ক'রে। একদা রাজদ্রবারে বাঙালীর প্রতিপত্তি ছিল যদেই,



ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে বাঙালী কর্মে পেয়েচে খ্যাতি, শিক্ষা-প্রসারণে হয়েছে অগ্রণী। সেদিন সেখানকার লোকের কাছে সে শ্রদ্ধা পেয়েচে, পেয়েচে অকুণ্ঠিত কৃতজ্ঞতা। আজ রাজপুরুষ তার প্রতি অপ্রসন্ন, অন্যান্য প্রদেশে তার সম্বন্ধে আতিথ্য সঙ্কুচিত, ষাণ্ম অবরুদ্ধ। এদিকে বাংলার আর্থিক দুর্গতিও চরমে এলো।

অবস্থার দৈন্ত্রে অশিক্ষার আশ্রয়ানিতে বেন বাঙালী নীচে তলিয়ে না যায়, বেন তার মন মাথা তুলতে পারে দুর্ভাগ্যের উর্ধ্বে, এই দিকে আমাদের সমস্ত চেষ্টা জাগাতে হবে তো। মানুষের মন যখন ছোটো হয়ে যায় তখন ক্ষুদ্রতার নখচকুর আঘাতে সকল উন্মোগকেই সে ক্ষুণ্ণ করে। বাংলাদেশে এই ভাঙন-ধরানো জৈবী নিকা দলদলি এবং হুয়ো দেবার উত্তেজনা তো বরাবরই আছে, তার উপরে চিন্তের আলো যতই দান হবে আসবে ততই নিজের পরে অশ্রদ্ধাশতই অন্ত সকলকে খর্ব করবার অহৈতুক প্রয়াস আরো উঠবে বিবাক্ত হয়ে। আজ হিন্দু মুসলমানে বে একটা লজ্জাজনক আড়াআড়ি দেশকে আশ্রয়তে প্রবৃত্ত করচে তার মূলেও আছে সর্বদেশব্যাপী অবুদ্ধি। অলসী সেই অশিক্ষিত অবুদ্ধির সাহায্যেই আমাদের ভাগ্যের ভিত্তি ভাঙবার কাজে চর লাগিয়েচে, আত্মীয়কে তুলচে শক ক'রে, বিধাতাকে করচে আমাদের বিপক্ষ। শেষকালে নিজের সর্বনাশ করবার জেদ এতদূর পর্যন্ত আজ এগোলো যে বাঙালী হয়ে বাংলা ভাষার মধ্যেও কাটল ধরাবার চেষ্টা আজ সম্ভবপর হয়েছে; শিক্ষার ও সাহিত্যের বে উদার ক্ষেত্রে সকল মতভেদ সম্বন্ধে এক-রাষ্ট্রীয় মানুষের মেলবার জায়গা, সেখানেও স্বহস্তে কাটাগাছ রোপণ করবার উৎসাহ ব্যথা পেল না, লজ্জা পেল না। হুঃখ পাই তাতে



ধিকার নেই কিন্তু দেশছোড়া অশিক্ষাগ্রস্ত তেজতা আমাদের যাথা হেঁটে করে দিল, ব্যর্থ করে দিল আমাদের সকল মহৎ উদ্ভাস। রাষ্ট্রিক হাটে রাষ্ট্রাধিকার নিয়ে দরদস্তুর ক'রে হট্টগোল যতই পাকানো যাক, সেখানে গোলটেবিলের চক্রবাত্যায় প্রতিকারের চরম উপায় মিলবে না, তরীর তলায় যেখানে বাধন আঁলগা সেইখানে অবিলম্বে হাত লাগাতে হবে।

সকলের গোড়ায় চাই শিক্ষিত মন। ইন্সুল কলেজের বাইরে শিক্ষা বিহিয়ে দেবার উপায় সাহিত্য। কিন্তু সেই সাহিত্যকে সর্কাস্ট্রীকরূপে শিক্ষার আধার করতে হবে, দেখতে হবে তাকে গ্রহণ করবার পথ সর্বত্র সুগম হয়েছে। এজন্যে কোন্ বন্ধকে ডাকব, বন্ধ যে আজ দুর্লভ হোলো। তাই বাংলা দেশের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দ্বারেই আবেদন উপস্থিত করছি।

মস্তিষ্কের সঙ্গে শ্বাসযন্ত্রের অবিচ্ছিন্ন যোগ সমস্ত দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে। বিশ্ববিদ্যালয়কে সেই মস্তিষ্কের স্থান নিয়ে শ্বাসযন্ত্র প্রেরণ করতে হবে দেশের সর্বদেহে। প্রথম এই কেমন করে করা যেতে পারে। তার উত্তরে আমার প্রস্তাব এই যে, একটা পরীক্ষার বেড়াঙ্কাল দেশ জুড়ে পাতা হোক। এমন সহস্র ও স্বাপকভাবে তার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে ইন্সুল কলেজের বাইরে থেকেও দেশে পরীক্ষাপাঠ্য বইগুলি স্বেচ্ছায় আয়ত্ত করবার উৎসাহ জন্মে। অস্তঃপুরের মেয়েরা কিংবা পুরুষদের দ্বারা নানা বাধায় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারে না, তারা অবকাশকালে নিজের চেষ্টায় অশিক্ষার লজ্জা নিবারণ করতে এইটি দেখবার উদ্দেশে বিশ্ববিদ্যালয় জেলায় জেলায় পরীক্ষার কেন্দ্র স্থাপন করতে পারে। বহু বিষয় একত্র জড়িত ক'রে বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রি দেওয়া হয়,

এ ক্ষেত্রে উপাধি দেবার উপলক্ষে সে প্রকম বহুলতার প্রয়োজন
নেই। প্রায়ই ব্যক্তি বিশেষের মনের প্রবণতা থাকে যিব্যবিশেষে।
সেই বিষয়েই আপন বিষয় অধিকারের পরিচয় দিতে পারলে
সমাজে সে আপন বিষয় স্থান পাবার অধিকারী হন। সেটুকু
অধিকার থেকে ভাঙে ব্যক্তি করবার কোনো কারণ নেই।

বিশ্ববিদ্যালয় আপন পাঠ্যপুস্তকের ব্যতিক্রম যদি বাণিক উপায়ে
আপন সূত্র প্রসারণ করে, তবেই বাংলা ভাষার বর্ণমালা পরিমাণে
শিক্ষার্থীরা ৩২-৪৫নং সূত্রবর্ণন হবে। এখন কোনো কালেই
বাংলা সাহিত্যে বর্ণমালার বৈচিত্র্য ঘুচেছে পাঠ্য না। যে-সব
শিক্ষার্থী বিব্রত হইয়া বর্ণমালার আত্মশুদ্ধি বর্ণনা তা তার ক্ষেত্রে
অসম্ভব বর্ণন হইয়াছে বর্ণমালা বর্ণন হইতে হয়, তবে সেই অক্ষি-
কণ্ঠের মাধ্যমেই বর্ণমালা বর্ণন করিতে পারা যাবে। বাংলা
মাধ্যম বাংলাভাষারই জানে শিক্ষিত সমাজে তারা কি চিরদিন
চলিয়াছে শ্রেণীতেই গণ্য হইবে থাকবে এমনো এক সময় ছিল
যখন বর্ণমালা বর্ণমালার পদার্থ বর্ণমালার ছাড়াই বাংলা জানিবে বলতে
অসম্ভব বর্ণন করিতে না, বর্ণমালার লোকেরাও সমস্তই তাদের
চোখ আগুয়ে দিচ্ছে। সেদিন আর আর নেহ বটে কিন্তু
বর্ণমালার ছেলেকে মাধ্যম হেঁট করতে হয় শুধু কেবল বাংলা ভাষা
জানি বলতে, এদিকে রাষ্ট্রক্ষেত্রে স্বরাজ পাবার ক্ষেত্রে প্রাণপণ
জীবন স্বীকার করি কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বরাজ পাবার উৎসাহ
আমাদের জাগেনি বললে কয় বলা হয়। এমন মানুষ আজও
দেশে আছে যারা তার বিকল্পতা করতে প্রস্তুত, যারা মনে করে
শিক্ষাকে বাংলাভাষার আসনে বসালে তার মূল্য হবে কমে।
বিলাতে স্বাভাৱ্যত্বের প্রথম যুগে ইংল্যান্ডে নেশা যখন উৎকট ছিল

তখন সেই মহলে স্নাত্তি পরালে প্রেষ্টিজ হানি হোত। শিক্ষাসরস্বতীকে স্নাত্তি পরালে আজও অনেক বাঙালী বিজ্ঞান মানহানি করনা করে, অর্থাৎ এটা জানা কথা যে, স্নাত্তি পরা বেশে দেবী আমাদের ঘরের মতো চলাফেরা করতে আরম্ভ পাবেন, খুদখুদালা বুড়ুতোয় পারে পারে বাবা পাবার কথা।

একদিন অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সে যখন আমার শান্তি ছিল তখন কখনো কখনো ইংরেজি সা হত নুখে নুখে বাংলা করে উনিরোচি। আমার প্রোত্তারা ইংরেজি জানিতেন সবাই। তবু তাঁরা স্বাকার করতেন ইংরেজি সাহিত্যের বাংলা বাংলাভাষার তাঁদের মনে সহজে সাত্তা পোনেত। বস্তুত আধুনিক শিক্ষা ইংরেজি ভাষাবাহিনী ব'লেই আমাদের মনের প্রবেশপথে তাঁর অনেকখানি যারা যায়। ইংরেজি খানার ঢেঁবিতে আত্মবের জাটল পদ্ধতি বার অভ্যস্ত নয় এমন বাঙালীর ছেলে বিলেতে পাড়ি দেবার পথে পি এত ও কোম্পানীর ডিনার কামরাগ যখন যেতে বসে, তখন ভোজ্য ও রসনার সব পথে কটা ছুরির দোতা তাঁর পক্ষে বাধাওস্ত ব'লেই ভরপূর ভোজের মাকখানেও সুবিত জঠরের দাবী সম্পূর্ণ মিটেতে চায় না। আমাদের শিক্ষার ভোজ্যও সেই দশা,—আছে সবই অর্থাৎ মাঝপথে অনেকখানি অপচয় হবে যায়। এ ব'লিচি এ'কলেজি যজ্ঞের কথা, আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় এ নিয়ে নয়, আমাদের বিষয়টা সর্বসাধারণের শিক্ষা নিয়ে। শিক্ষার জলের কল চালানোর কথা নয়, পাইপ যেখানে পৌছয় না সেখানে পানীয়ের ব্যবহার কথা। মাহুভাষায় সেই ব্যবস্থা যদি গোম্পদের চেয়ে প্রশস্ত না হয় তবে এই বিজ্ঞানহারা দেশের মরুভাসী মনের উপায় হবে কী।



বাংলা বার ভাষা সেই আমার ভূষিত মাহুতুমির হয়ে বাংলার
বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে চাতকের মতো উৎকণ্ঠিত বেদনায় আবেদন
জানাচ্ছি—তোমার অত্রভেদী শিখর চূড়া বেঁটন ক’রে পুঞ্জ পুঞ্জ
শ্রামল মেঘের প্রসঙ্গ আজ বর্ষিত হোক ফলে শান্ত, সুন্দর হোক
পুষ্পে পল্লবে, মাতৃভাষার অপমান দূর হোক, যুগশিক্ষার উদ্বেল
ধারা বাঙালীশিক্ষার শুক নদীর সিক্ত পথে বান ডাকিয়ে বয়ে
যাক, ছই কূল জাগুক পূর্ণ চেতনায়, ঘাটে ঘাটে উঠুক
আনন্দধ্বনি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।



লক্ষ্মণ

বালকাণ্ডে লিখিত হইয়াছে, লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের “প্রাণ হৈবাণরঃ”—অপর প্রাণের স্থায়। ভরত ছাড়া আমরা রামকে কল্পনা করিতে পারি, এমন কি সীতা ছাড়া রামচরিত্র কল্পনা করিবার সুবিধাও কবিগুরু দিয়াছেন, কিন্তু লক্ষ্মণ ছাড়া রামচরিত্র একান্ত অসম্পূর্ণ।

লক্ষ্মণের ভ্রাতৃত্বস্তি কতকটা মোন এবং ছায়ায় স্থায় অশুগামী ! লক্ষ্মণ রামের প্রতি ভালবাসা কথায় জানাইবার জন্ত ব্যাকুল ছিলেন না, নিতান্ত কোনরূপ অবহার সঙ্কটে না পড়িলে তিনি তাঁহার হৃদয়ের সুগভীর স্নেহের আভাস দিতে ইচ্ছুক হইতেন না ; বাধ্য হইয়া চাই এক স্থলে তিনি ইচ্ছিতমাত্রে তাঁহার হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার অপরিসীম রামপ্রেম মোনভাবেই আমাদের নিকট সর্বত্র ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে।

ভরত, সীতা এবং রামচন্দ্রও মনের আবেগ সংবরণ করিতে জানিতেন না ; কিন্তু লক্ষ্মণ স্নেহসধকে সংযমী—যে স্নেহ পরিপূর্ণ, অথচ বাহ্য আবেগে উদ্ভূসিত হইয়া উঠে নাই ; এই মোন স্নেহ-চিত্র আমাদের সর্বত্যাগী কষ্টসহিষ্ণু ভ্রাতৃত্বস্তির অশেষ কথা জানাইতেছে।

লক্ষ্মণ আজন্ম ছায়ায় স্থায় রামচন্দ্রের অশুগামী।

“ন চ তেন বিনা নিদ্রাং লভতে পুরুষোত্তমঃ ।

মৃষ্টমরুপানীতযগ্নাতি ন হি তং বিনা ॥”



—রামের কাছে না গইলে তাঁহার কাছে ঘুম হয় না, রামের প্রসাদ ভিন্ন কোন উপায়ের খাণ্ডে তাঁহার তৃপ্তি হয় না।

“বদা হি হয়মাক্রতো যুগয়াং য়াতি রামবঃ ।

অধৈনং পৃষ্ঠতোহভ্যোতি সধমুঃ পরিপালয়ন্ ॥”

—রাম যখন অশ্বারোহণে যুগয়ার যাত্রা করেন, অমনি ধমুহুস্তে তাঁহার শরীর রক্ষা করিয়া বিবস্ত্র অমুচর তাঁহার অনুগমন করেন। যে দিন বিধামিত্রের সঙ্গে রাম রাক্ষসবধকরে নিবিড় বনপথে যাইতেছিলেন, সে দিনও কাকপক্ষধর লক্ষ্মণ সঙ্গে সঙ্গে। শৈশবদৃষ্টাবলীর এই সকল চিত্রের মধ্যে আশ্বহারা লক্ষ্মণের ভ্রাতৃত্বকির ছবি যৌনভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

রামের অভিষেক-সংবাদে সকলেই কত সন্তোষ প্রকাশের জন্ত যান্ত্র হইলেন, কিন্তু লক্ষ্মণের মুখে আশ্চর্য্যমুচক কথা নাই, নীরবে রামের ছায়ার জায় লক্ষ্মণ পশ্চাৎবর্তী। কিন্তু রাম স্বল্পভাষী ভ্রাতার হৃদয় জানিতেন, অভিষেক-সংবাদে সুখী হইয়া সর্বপ্রথমেই লক্ষ্মণের কণ্ঠলগ্ন হইয়া বলিলেন,—

“জীবিতকালি রাজ্যক ভবর্মমভিকাময়ে ।”

—আমি জীবন ও রাজ্য তোমার জন্তই কামনা করি। ভ্রাতার এইরূপ দুই একটী কথাই লক্ষ্মণের অপূৰ্ণ হৃদয়ের একমাত্র পূরকার ও পরম পরিতৃপ্তি। আমরা কল্পনানয়নে দেখিতে পাই, রামের এই বিন্দু আদরে “সুবর্ণচ্ছবি” লক্ষ্মণের গণ্ডঘর নীরব প্রকুলতায় রক্তিমাত হইয়া উঠিয়াছে।



কিন্তু এই মৌন স্বরভাষী যুবক, রামের প্রতি কেহ অত্যাঘ করিলে, তাহা ক্ষমা করিতে জানিতেন না। যে দিন কৈকেয়ী অভিষেক-ব্রতোচ্ছল প্রকুর রামচন্দ্রকে মৃত্যুভূল্য বনবাসাসক্তা করাইলেন, রামের মূর্তি সহসা বৈরাগ্যের শ্রীতে ভূষিত হইয়া উঠিল, ইনি অধিবৎ নির্লিপ্তভাবে শুক্লতর বনবাসাসক্তা মাধব তুলিয়া লইলেন, অভিষেক-সম্ভারের সমস্ত আয়োজন যেন তাঁহাকে ব্যস্ত করিতে লাগিল ; সেই দিন সেই উৎকট মূহুর্তেও তাঁহার আর কোন সঙ্গী ছিল না, তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে চিরস্বচ্ছ ভক্ত ক্লর হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, বান্দ্যকি দুইটা ছত্রে সেই মৌন চিত্রটা আঁকিয়াছেন—

“তং বাঙ্গপরিপূর্ণাকঃ পৃষ্ঠতোহমুজ্জগাম হ ।

লক্ষণঃ পরমক্লুঃ সুমিত্রানন্দবর্ধনঃ ॥”

—লক্ষণ অতিমাত্র ক্লু হইয়া বাঙ্গপূর্ণচক্ষে ভ্রাতার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘাইতে লাগিলেন ।

এই অত্যাঘ আদেশ তিনি সহ্য করিতে পারেন নাই । রামচন্দ্র বাহাদিগকে অকুণ্ঠিতচিত্তে ক্ষমা করিয়াছেন, লক্ষণ তাঁহাদিগকে ক্ষমা করিতে পারেন নাই । রামের বনবাস লইয়া তিনি কোশল্যার সম্মুখে অনেক ব্যথিতত্তা করিয়াছিলেন, ক্লু হইয়া তিনি সমস্ত অযোধ্যাপুরী নষ্ট করিতে চাহিয়াছিলেন । তিনি রামের কঠব্য-বুদ্ধির প্রশংসা করেন নাই—এই গহিত আদেশপালন ধর্মসঙ্গত নহে, ইহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন । এই ভেজখী যুবক যখন দেখিতে পাইলেন, রামচন্দ্র একান্তই বনবাসে বাইবেন, তখন কোথা হইতে এক অপূর্ণ কোমলতা তাঁহাকে অধিকার করিয়া



বসিল, তিনি বালকের হার রামের পদযুগ্মে লুপ্তিত হইয়া কাদিতে লাগিলেন—

“ঐশ্বর্য্যাকাপি লোকানাং কাময়ে ন ভয়া বিনা ।”

—অমরত্ব কিংবা ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্যও আমি ভোমাভিন্ন আকাঙ্ক্ষা করি না । রামের পাদপীড়নপূর্ব্বক—উহা অশ্রুসিক্ত করিয়া নববধূটির হার সেই ক্ষান্তভ্রোদীপিত মূর্ত্তি ফুলসম সুকোমল হইয়া সঙ্গে যাইবার অশ্রুমতি প্রার্থনা করিল । এই ভিক্ষা স্নেহসূচক দীর্ঘ বহুতায় অভিব্যক্ত হয় নাই, অতি অল্প কথায় তিনি রামের সঙ্গী হইবার জন্ত অশ্রুমতি চাহিলেন, কিন্তু সেই অল্প কথায় স্নেহ-গভীর আত্মত্যাগী জনয়ের ছায়া পড়িয়াছে । রাম হাতে ধরিয়া তাঁহাকে তুলিয়া লইলেন, “প্রাণসম প্রিয়,” “বশু,” “সখা” প্রভৃতি স্নেহমধুর সম্ভাষণে তাঁহাকে সঙ্কষ্ট করিয়া বনযাত্রা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু লক্ষণ ছই একটি দৃঢ় কথায় তাঁহার অটল সঙ্কল্প জ্ঞাপন করিলেন, “আপনি শৈশব হইতে আমার নিকট প্রতিশ্রুত, আমি আপনার আশ্রয় সহচর, আজ তাহার ব্যতিক্রম করিতে চাহিতেছেন কেন ?”

লক্ষণ সঙ্গে চলিলেন । এই আত্মত্যাগী দেবতার জন্ত কেহ বিলাপ করিল না । যে দিন বিখ্যামিত্র রামকে লইয়া যাইবার জন্ত দশরথের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সে দিন—

“উনষোড়শবর্ষো যে রামো রাজীবলোচনঃ ।”

বলিয়া বৃদ্ধ রাজা ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু তৎকনিষ্ঠ আর একটি রাজীবলোচন যে দুরন্তরাক্ষসবধকল্পে ত্রাতার অশ্রুবর্ত্তী হইয়া



চলিলেন, তজ্জন্ত কেহ আক্ষেপ করেন নাই। আজ রাম, লক্ষ্মণ, সীতা বনে চলিয়াছেন, অযোধ্যার যত নন্দনাশ রহিয়া রহিয়া রামসীতার জন্ত বর্ষিত হইতেছে। কিন্তু লক্ষ্মণের জন্ত কেহ আক্ষেপ করেন নাই; এমন কি, সুমিত্রাও বিদায়কালে পুত্রের কণ্ঠলগ্ন হইয়া ক্রন্দন করেন নাই, তিনি দৃঢ় অথচ স্নেহাভ্রুকণ্ঠে লক্ষ্মণকে বলিয়াছিলেন—

“রামঃ দশরথঃ বিদ্ধি, যাং বিদ্ধি জনকাস্বজাম্ ।

অযোধ্যামটবীং বিদ্ধি, গচ্ছ তাত যথাসুখম্ ॥”

—যাও বৎস, স্বচ্ছন্দমনে বনে যাও—রামকে দশরথের জায় দেখিও, সীতাকে আমার জায় মনে করিও এবং বনকে অযোধ্যা বলিয়া গণ্য করিও। যাতার চকুর অশ্রুবিন্দু লক্ষ্মণ পাইলেন না, বরং সুমিত্রা তাঁহাকে বেন কর্তব্যপালনের জন্ত আগ্রহসহকারে ত্বরান্বিত করিয়া দিলেন—

“সুমিত্রা গচ্ছ গচ্ছেতি পুনঃ পুনরুবাচ তম্ ॥”

—সুমিত্রা তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ “যাও যাও” এই কৃপা বলিতে লাগিলেন।

মৌন সন্ন্যাসী আত্মীয় সুহৃদ্বর্গের উপেক্ষা পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহা তিনি মনেও করেন নাই, রামচন্দ্রের জন্ত বে শোকোচ্ছ্বাস, তাহার যথোই তিনি আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি কাহারও নিকটে বিলাপ প্রত্যাশা করেন নাই, রামপ্রেমে তাঁহার নিজের মত্তা লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল।

আরণ্য জীবনের বাহ্য কিছু কঠোরতা, তাহার সমধিক ভাগ



লক্ষণের উপর পড়িয়াছিল,—কিংবা তাহা তিনি আহ্লাদ-সহকারে মাথায় তুলিয়া লইয়াছিলেন। গিরি-সামুদ্রেশের পুষ্পিত বহুতরুস্বামী হইতে কুমুদচয়ন করিয়া রামচন্দ্র সীতার চূর্ণকুম্ভলে পরাইয়া দিতেন; গৈরিকরেণু-দ্বারা সীতার সুন্দর ললাটে তিলক রচনা করিয়া দিতেন; পদ্ম তুলিয়া সীতার সহিত যন্দাকিনী-তীরে অবগাহন করিতেন, কিংবা গোদাবরীতীরস্থ বেতসকুন্ডে সীতার উৎসঙ্গে মস্তক রক্ষা করিয়া সুখে নিদ্রা যাইতেন; আর এ দিকে মৌন সন্ন্যাসী খনিত্র-দ্বারা মৃত্তিকা খনন করিয়া পর্ণশালা নির্মাণ করিতেন, কখনও পরশুহস্তে শালশাখা কর্তন করিতেন, কখনও অস্ত্রশস্ত্র এবং সীতার পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারাদিতে পূর্ণ বিপুল বংশপেটিকা হস্তে লইয়া একস্থান হইতে স্থানান্তরে যাত্রা করিতেন, কখনও বা মহিষ ও বৃষের করৌষ সংগ্রহ করিয়া অগ্নি জালিবার ব্যৱস্থা করিতেন।

একদিন দেখিতে পাই, শীতকালের তুষারমলিন জ্যোৎস্নায় শেষরাত্রিতে যবগোধূমাক্ষর বনপহার নালশেব নলিনী-শোভিত সরসীতে কলস লইয়া তিনি জল তুলিতেছেন। অল্প একদিন দেখিতে পাই, চিত্রকূটপর্বতের পর্ণশালা হইতে সরসীতটে বাইবার পথটি চিহ্নিত করিবার জন্ত তিনি পথে পথে উচ্চ তরুশাখার চৌরথও বন্ধ করিয়া রাখিতেছেন। কখনও বা তিনি কোমল নর্ভাস্কুর ও বৃক্ষপর্ণ-দ্বারা রামের শয্যা প্রস্তুত করিয়া অপেক্ষা করিতেছেন, কখনও বা দেখিতে পাই, তিনি কালিন্দী উত্তীর্ণ হইবার জন্ত বৃহৎ কাষ্ঠগুলি তুচ্ছ ও বহু বেতসলতা-দ্বারা সুসংবদ্ধ করিয়া মধ্যভাগে ক্ষুদ্রশাখা-দ্বারা সীতার উপবেশন-জন্ত সুখাসন রচনা করিতেছেন। এই সংঘর্ষী স্নেহবীর ভ্রাতৃসেবার তাঁহার নিজ



সজ্জা হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। রামচন্দ্র শঙ্করটীতে উপস্থিত হইয়া লক্ষণকে বলিয়াছিলেন—“এই সুন্দর তরুরাজীপূর্ণ প্রদেশে পর্ণশালা রচনার জন্ত একটা স্থান খুঁজিয়া বাহির করিয়া লও।” লক্ষণ বলিলেন, “আপনি যে স্থানটী ভালবাসেন, তাহাই দেখাইয়া দিন, সেবকের উপর নির্ভাচনের ভার দিবেন না।” প্রভুসেবায় এরূপ আত্মহারা ভূতা,—এমন আর কোথায় দেখিয়াছেন? রামচন্দ্র স্থান নির্দেশ করিয়া দিলে লক্ষণ ভূমির সমতা সম্পাদন করিয়া খনিজহস্তে মৃত্তিকাখননে প্রবৃত্ত হইলেন।

আর এক দিনের দৃশ্য মনে পড়ে,—গভীর অরণ্যে চারিদিকে ক্লৃপসর্প বিচরণ করিতেছে, পথহারা বিপন্ন পথিকতরু রাত্রিবাসের জন্ত জঙ্গলের নিভৃতে বৃক্ষনিরে শুইয়া আছেন, সীতার সুন্দর মুখখানি অনশন ও পর্যটনে একটু হতশ্রী হইয়া পড়িয়াছে। রামচন্দ্রের এই দুঃখময়ী রজনীর কষ্ট অসহ্য হইল,—তিনি লক্ষণকে অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইবার জন্ত বার বার পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন, “এ কষ্ট আমার এবং সীতারই হউক, তুমি ফিরিয়া যাও; শোকের অবস্থায় সাধুনাদান করিয়া আমার মাতাদিগকে পালন করিও।” লক্ষণ স্বীয় স্নেহ-সম্বন্ধে বেশী কথা কহিতে জানিতেন না, রামের এবংবিধ কাতরোক্তিতে দুঃখিত হইয়া বলিলেন—

“ন হি তাতং ন শক্রয়ং ন সুমিত্রাং পরস্তপ।

দ্রষ্টুমিচ্ছামস্মাহং স্বর্গকাপি ত্বয়া বিনা ॥”

—আমি পিতা, সুমিত্রা, শক্রয়, এমন কি স্বর্গও তোমাকে ছাড়িয়া দেখিতে ইচ্ছা করি না।

কবন্ধ মরিল, জটায়ু মরিলেন; আমরা দেখিতে পাই, লক্ষণ



নিঃশব্দে সমাদিস্থল খনন করিয়া কাষ্ঠ আহরণপূর্ব্বক কবন্ধ ও জটায়ুর সংকার করিতেছেন। দিবারাত্র তাঁহার বিশ্রাম ছিল না—এই ব্রাহ্মসেবাই তাঁহার জীবনের পরম আকাজ্জক বিষয় ছিল। বনে আসিবার সময় তাহাই তিনি বলিয়া আসিয়াছিলেন—

“ভবাংস্ত্ব সহ বৈদেহ্যা গিরিসামুদ্রু য়ংস্তসে ।
অহং সৰ্ব্বং করিষ্যামি জাগ্রতঃ স্বপতশ্চ তে ।
ধনুৰাদায় সগুণং খনিত্রপিটকাধরঃ ॥”

—দেবী জানকীর সঙ্গে আপনি গিরি-সামুদ্রেশে বিহার করিবেন, জাগরিত বা নিদ্রিতই থাকুন, আপনার সকল কৰ্ম্ম আমিই করিয়া দিব। খনিত্র, পিটক এবং ধনু হস্তে আমি আপনার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিব।

বনবাসের শেষ বৎসর বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইল; রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গেল। সীতার শোকে রাম কিণ্ডপ্রায় হইয়া পড়িলেন, ভ্রাতার এই দারুণ কষ্ট দেখিয়া লক্ষ্মণও পাগলের মত সীতাকে ইতস্ততঃ খুজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। রামের অনুরোধে তিনি বার বার গোদাবরীর তীরভূমি খুজিয়া আসিলেন। এইমাত্র গোদাবরীতীর তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া আসিয়াছেন, রাম তখনই আবার বলিলেন—

“নীত্রং লক্ষ্মণ জানীহি গতা গোদাবরীং নদীম্ ।
অপি গোদাবরীং সীতা পদ্মান্তানরিতুং গতা ॥”

পুনরায় গোদাবরীর তটদেশে বাইয়া লক্ষ্মণ সীতাকে ডাকিতে



লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার সন্ধান না পাইয়া ভয়ে ভয়ে রামের নিকট উপস্থিত হইয়া আত্মবলে বলিলেন—

“কং সু মা দেশমাপরা বৈদেহী ক্লেশনাশিনী ।”

—কোন দেশে ক্লেশনাশিনী বৈদেহী গিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না ।—

“নৈতাং পশ্যামি তীর্থেষু, ক্রোশতো ন শৃণোতি মে ।”

—গোদাবরীর অবতরণ-স্থানসমূহের কোথাও তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না—ভাকিলাম, কোন উত্তর পাইলাম না ।

“লক্ষ্মণস্ত বচঃ শ্রদ্ধা দীনঃ সস্তাপমোহিতঃ ।

রামঃ সমভিচক্রাম স্বয়ং গোদাবরীং নদীম্ ॥”

—লক্ষ্মণের কথা শুনিয়া ত্রিযমাণচিত্তে রাম স্বয়ং সেই গোদাবরীর অভিমুখে ছুটিয়া গেলেন ।

ব্রাতার এই উদ্দাম শোক দেখিয়া লক্ষ্মণ বেক্রপ কষ্ট পাইতেছিলেন, তাহা অনমুভবনীয় । কত করিয়া তিনি রামকে সাহসনা দিবার চেষ্টা করিতেছেন, রাম কিছুতেই শাস্ত হইতেছেন না ; লক্ষ্মণের কণ্ঠলগ্ন হইয়া রাম বার বার বলিতেছেন—

“হা লক্ষ্মণ মহাবাহো পশ্যসি স্বং প্রিয়াং কচিৎ ।”

—লক্ষ্মণ, তুমি কি সীতাকে কোথাও দেখিতে পাইতেছ ? এই শোকাকুল কণ্ঠের আন্তিতে লক্ষ্মণের চক্ষু জলে ভরিয়া আসিত, তাঁহার মুখ শুকাইয়া যাইত ।



২৮২

লক্ষণ

দনু নামক শাপগ্রস্ত যকের নির্দেশানুসারে রাম লক্ষণের সহিত পম্পাতীরে সুগ্রীবের সকানে গেলেন। রাম কখনও বেগে পথ পর্যাটন করেন, কখনও মুচ্ছিত হইয়া বসিয়া পড়েন, কখনও “সীতা সীতা” বলিয়া আকুলকণ্ঠে ডাকিতে থাকেন, কখনও “হা দেবি, একবার এস, তোমার শূত্র পর্ণালায় অবস্থা দেখিয়া যাও” - এই বলিয়া কাদিতে কাদিতে বিলুপ্তসংজ্ঞ হইয়া পড়েন, কখনও পম্পানীরবর্দ্ধি-পদ্মকোষ-নিজ্জান্ন শবনস্পর্শে উল্লসিত হইয়া বলিয়া উঠেন,—

“নিঃশ্বাস ইব সীতায় বাতি বায়ুনোহরঃ ।”

সজ্জলনেত্রে চিরসুদৃং চিরসেবক লক্ষণ রামকে এই অবস্থায় যখন পম্পাতীরে লইয়া আসিলেন, তখন হনুমান্ সুগ্রীবকর্তৃক প্রেরিত হইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। হনুমান্ সন্ন্যাস ও আদরের সহিত বলিলেন, “আপনারা পৃথিবীজন্মের শক্তিসম্পন্ন, আপনারা চীর ও বকল ধারণ করিয়াছেন কেন? আপনাদের বৃত্তায়িত মহাবাহু সর্বভূষণে ভূষিত হইবার যোগ্য, সে বাহু ভূষণহীন কেন?” এই আদরের কণ্ঠস্বর শুনিয়া লক্ষণের চিরকক্ষ হৃৎক উজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। যিনি চিরদিন মোনভাবে মেহার্জ জন্ম বহন করিয়া আসিয়াছেন, আজ তিনি মেহের ছন্দ ও ভাষা রোধ করিতে পারিলেন না। পরিচয় প্রদানের পর তিনি বলিলেন—“দনুর নির্দেশে আজ আমরা সুগ্রীবের শরণাগত হইতে আসিয়াছি। যে রাম শরণাগতদিগকে অগণিত বিত্ত অকুণ্ঠিতচিত্তে দান করিয়াছেন, সেই জগৎপূজ্য রাম আজ বানরাধিপতির শরণ পাইবার জন্য এখানে উপস্থিত।



ত্রিলোকবিশ্রুতকীর্তি দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র আমার গুরু রামচন্দ্র স্বয়ং বানরাধিপতির শরণ লইবার জন্য এখানে আসিয়াছেন। সর্বলোক বাহার আশ্রয়লাভে কৃতার্থ হইত, যিনি প্রজাপুত্রের রক্ষক ও পালক ছিলেন, আজ তিনি আশ্রয়ভিক্ষা করিয়া স্ত্রীীবের নিকট উপস্থিত। তিনি শোকাভিভূত ও আর্ত, স্ত্রীীব অবশ্যই প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে শরণ দান করিবেন।”—বলিতে বলিতে লক্ষ্মণের চিরনিরুদ্ধ অশ্রু উজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল, তিনি কাঁদিয়া মৌন হইলেন। রামের হৃদবহাদর্শনে লক্ষ্মণ একান্তরূপে অভিভূত হইয়াছিলেন, তাঁহার দৃঢ়চরিত্র আশ্রয় ও করণ হইয়া পড়িয়াছিল।

এই নিত্য-দুঃখসহায় ভ্রাতা, সখা ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামের প্রাণপ্রিয় ছিলেন, তাহা বলা বাহুল্য। অশোকবনে হনুমানের নিকট সীতা বলিয়াছিলেন, “ভ্রাতা লক্ষ্মণ আমা অপেক্ষা রামের নিয়ত প্রিয়তর।” রাবণের শেলে বিদ্ধ লক্ষ্মণ যে দিন যুদ্ধক্ষেত্রে মৃতকর হইয়া পড়িয়াছিলেন, সে দিন আমরা দেখিতে পাই, আহত শাবককে ব্যাঘ্রী বেকম রক্ষা করে, রাম কনিষ্ঠকে সেইরূপ আগুলিয়া বসিয়া আছেন;—রাবণের অসংখ্য শর রামের পৃষ্ঠদেশ ছিন্ন ভিন্ন করিতেছিল, সে দিকে দৃকপাত না করিয়া রাম লক্ষ্মণের প্রতি সজল চক্ষু স্তম্ভ করিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতেছিলেন। বানরসৈন্য লক্ষ্মণের রক্ষাকার গ্রহণ করিলে রাম যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং রাবণ পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া চলিয়া গেলে মৃতকর ভ্রাতাকে অতি সুকোমলভাবে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—“তুমি বেকম আমাকে বনে অশ্রুগমন করিয়াছিলে, আজ আমিও তেমনি তোমাকে সমালয়ে অশ্রুগমন করিব, তোমাকে ছাড়িয়া আমি বাঁচিতে পারিব না। সীতার মত স্ত্রী ধূঁজিলে অনেক পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তোমার



যত ভাই, মজৌ ও সহায় পাওয়া যাইবে না। দেশে দেশে স্ত্রী ও বন্ধু পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু এমন দেশ দেখিতে পাই না, যেখানে তোমার যত ভাই জুটিবে। এখন উঠ, নয়ন উন্মোলন করিয়া আমায় একবার দেখ ; আমি পূর্বতে বা বন-মধ্যে শোকাক্ত, প্রমত্ত বা বিহ্বল হইলে, তুমিই প্রবোধবাক্যে আমায় সাহসনা দিতে, এখন কেন এরূপ নীরব হইয়া আছ ?”

রামের আজ্ঞাপালনে লক্ষ্মণ কোন কালে বিরুদ্ধি করেন নাই, শ্রাস্তসদৃশ হউক বা না হউক, লক্ষ্মণ সর্বদা যৌনভাবে তাহা পালন করিয়াছেন। রাম সীতাকে বিপুল সৈন্তসম্বল দিয়া শিবিকা ত্যাগ করিয়া পদব্রজে আসিতে আজ্ঞা করিলেন। শত শত দৃষ্টির গোচরীভূত হইয়া সীতা লক্ষ্মণ বেন মরিয়া যাইতেছিলেন, ব্রীড়া-ময়ীর সর্বদা কম্পিত হইতেছিল। লক্ষ্মণ এই দৃশ্য দেখিয়া ব্যথিত হইলেন, কিন্তু রামের কার্যের প্রতিবাদ করিলেন না। যখন সীতা অগ্নিতে প্রাণবিসর্জন দিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া লক্ষ্মণকে চিতা প্রস্তুত করিতে আদেশ করিলেন,—তখনও লক্ষ্মণ রামের অভিপ্রায় বুঝিয়া সজলচকে চিতা প্রস্তুত করিলেন, কিন্তু কোন প্রতিবাদ করিলেন না। ভ্রাতৃস্নেহে তিনি স্বীয় অস্তিত্বশূন্য হইয়া গিয়াছিলেন।

ভরতের, এমন কি সীতারও, মূহ অথচ তেজোব্যঞ্জক ব্যক্তিত্ব তাঁহাদের সুগভীর ভালবাসার মধ্যে আমরা উপলব্ধি করিতে পারি, কিন্তু রামের প্রতি লক্ষ্মণের স্নেহ সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধহারা। ভরত রামচন্দ্রের জন্ত যে সকল কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, তাহা আমাদের প্রাণে আঘাত দেয়—তাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে ঐরূপ আত্মত্যাগ আমাদের নিকট অপূর্ব পদার্থ বলিয়া বোধ হয় ; ভরত স্বর্গের দেবতার স্তায়, তাঁহার ক্রিয়াকলাপ ঠিক যেন পৃথিবীবাসীর নহে,

উহা সর্বদাই ভাবের এক উচ্চগ্রামে আমাদের মনোযোগ সবলে আকর্ষণ করিয়া রাখে। কিন্তু লক্ষণের আত্মতাগ এত সহজভাবে হইয়া আসিয়াছে, উহা বায়ু ও জলের মত এত সহজপ্রাপ্য যে, অনেক সময়ে ভরতের আত্মতাগের পার্শ্বে লক্ষণের খনিজ-দ্বারা মৃত্তিকাখনন প্রকৃতি সেবাবৃত্তির মধ্যে আমরা তাঁহার স্নগভীর প্রেমের গুরুত্ব অনুভব করিতে ভুলিয়া যাই। অত্যন্ত সহজে প্রাপ্ত বলিয়া যেন উহা উপেক্ষা পাইয়া থাকে। তথাপি ইহা হিরণ্য, লক্ষণ ভিন্ন রায়কে আমরা একেবারেই করুণা করিতে পারি না। তিনি রায়ের প্রাণ ও দেহের সহিত একীভূত হইয়া গিয়াছিলেন। দীর্ঘ রজনীর পরে অকস্মাৎ তরুণ অরুণালোকে যেরূপ অগৎ উদ্ভাসিত হইয়া উঠে,—দরাবাসিগণ সেই স্বর্ণদষ্ট আলোকচ্ছটায় পুলকে উদ্ভূত হইয়া উঠে, ভরতের ভ্রাতৃপ্রীতি কতকটা সেইরূপ,—কৈকেয়ীর বড়বন ও রামবনবাসাদির পরে ভরতের অচিন্তিতপূর্ব প্রীতি বিচ্ছুরিত হইয়া আমাদিগকে সহসা সেইরূপ চমৎকৃত করিয়া তুলে, আমরা ঠিক যেন ততটা প্রত্যাশা করি না। কিন্তু লক্ষণের প্রেম আমাদের নিত্য-প্রয়োজনীয় বায়ুপ্রবাহ,—এই বিশাল অপরিমিত স্নেহতরঙ্গ আমাদিগকে সম্বীৰিত রাখিয়াছে, অগত্যা প্রতিক্রমে আমরা ইহা ভুলিয়া যাইতেছি। লক্ষণ রায়কে বলিয়াছিলেন—“জল হইতে উদ্ধৃত মীনের কণ্ঠ আমি আপনাকে ছাড়িয়া এক মুহূর্তও বাঁচিতে পারিব না।” এই অসীম স্নেহের তিনি কোন মূল্য চান নাই, ইহা আপনিই আপনার পরম পরিতোষ, ইহা আপনাতেই আপনি সম্পূর্ণ,—ইহা প্রত্যাশী নহে, ইহা দাতা। কখন বহুকল্প সাধনে অবসর লক্ষণকে রাম একটা স্নেহের কথা বলিয়াছেন, কিংবা একবার আলিঙ্গন দিয়াছেন, লক্ষণের নেত্রপ্রান্তে



একটা পুলকাঞ্চ ফুটিয়া উঠিয়াছে ; কিন্তু তিনি রামের কাছে তাহা প্রত্যাশা করিয়া অপেক্ষা করেন নাই।

লক্ষণের চরিত্রের এক দিক্ যাত্র প্রদর্শিত হইল, কিন্তু তাঁহার চরিত্রের আর একটা দিক্ আছে। পূর্ববর্তী বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, লক্ষণ বিশেষ ভীকুখীসম্পন্ন ছিলেন না। তিনি অল্পমত ভ্রাতা ছিলেন সত্য, কিন্তু হুয়ত রাম ভিন্ন তাঁহার পক্ষে নিজেকে হারাইয়া ফেলিবার আশঙ্কা ছিল। চিরদিন রামের বুদ্ধি-দ্বারা পরিচালিত হইয়া আসিয়াছেন, সহসা একাকী সংসারের পথ পর্যটন করা তাঁহার পক্ষে দুঃক্লম হইত, এই জন্তই তিনি রামগতপ্রাণ হইয়া বনগমন করিয়াছিলেন। এ কথা ত মানিবই না, বরং ভাল করিয়া আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, লক্ষণই রামায়ণে পুরুষকারের একমাত্র জীবন্ত চিত্র। তাঁহার বুদ্ধির সঙ্গে রামের বুদ্ধির যে সর্বদাই ঐক্য হইয়াছে, তাহা নহে, পরন্তু যে স্থানে ঐক্য না হইত, সে স্থানে তিনি স্বীয় বুদ্ধিকে রামের প্রতিভার নিকট হতবল হইতে দেন নাই।

বনবাসীক্কা তাঁহার নিকট অত্যন্ত অজ্ঞান বলিয়া বোধ হইয়াছিল এবং রামের পিতৃ-আদেশ-পালন তিনি ধর্ম্মবিরুদ্ধ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। রাম লক্ষণকে বলিয়াছিলেন, “তুমি কি এই কার্য্য দৈবশক্তির ফল বলিয়া স্বীকার করিবে না ? আরক্ত কার্য্য নষ্ট করিয়া যদি কোন অসম্বলিত পথে কার্য্যপ্রবাহ প্রবর্তিত হয়, তবে তাহা দৈবের কর্ম্ম বলিয়া মনে করিবে। দেখ কৈকেয়ী চিরদিনই আমাকে ভারতের স্তায় ভালবাসিয়াছেন, তাঁহার স্তায় গুণশালিনী মহৎকুলজাতা রাহুপুত্রী আমাকে পীড়াদান করিবার

জন্ম ইত্যর ব্যক্তির জ্ঞায় এইরূপ প্রতিশ্রুতিতে রাজাকে কেনই বা আবদ্ধ করিবেন ? ইহা স্পষ্ট দৈবের কৰ্ম, ইহাতে মানুষের কোন হাত নাই।” লক্ষ্মণ উত্তরে বলিলেন, “অতি দীন ও অশক্ত ব্যক্তিরাই দৈবের দোহাই দিয়া থাকে, পুরুষকার-দ্বারা যাহারা দৈবের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হন, তাঁহারা আপনার জ্ঞায় অবসন্ন হইয়া পড়েন না। মুহু ব্যক্তিরাই সৰ্বদা নির্যাতন প্রাপ্ত হন—‘মুহুহি পরিত্রায়ে’। ধৰ্ম ও সত্যের ভান করিয়া পিতা যে ঘোরতর অত্যাচার করিতেছেন, তাহা কি আপনি বুঝিতে পারিতেছেন না ? আপনি দেবতুল্য, অক্ষু ও দাক্ষ এবং রিপূরাও আপনার প্রশংসা করিয়া থাকে। এমন পুত্রকে তিনি কি অপরাধে বনে তাড়াইয়া দিতেছেন ? আপনি বে ধৰ্ম পালন করিতে ব্যাকুল, ঐ ধৰ্ম আমার নিকটে নিতান্ত অধৰ্ম বলিয়া মনে হয়। ত্রীর বশীভূত হইয়া নিরপরাধ পুত্রকে বনবাস দেওয়া—ইহাই কি সত্য, ইহাই কি ধৰ্ম ? আমি আজই বাহুবলে আপনার অভিষেক সম্পাদন করিব। দেখি, কাহার সাধ্য আমার শক্তি প্রতিরোধ করে ? আজ পুরুষকারের অক্ষুণ দিয়া উদ্ধাম দৈবহস্তীকে আমি স্ববশে আনিব। যাহা আপনি দৈবসংজ্ঞায় অভিহিত করিতেছেন, তাহা আপনি অনাদ্যসে প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন, তবে কি নিমিত্ত তুচ্ছ অকিকিৎকার দৈবের প্রশংসা করিতেছেন ?” সাধুনেত্র লক্ষ্মণ এই সকল উক্তির পর—

“হনিষ্যে পিতরং বৃদ্ধং কৈকেয়াসক্তমানসম্।”

বলিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। রাম তখন হস্তধারণ করিয়া তাঁহার ক্রোধপ্রশমনের চেষ্টা পাইয়াছিলেন। এই গর্হিত আদেশ-পালন যে



ধর্মসঙ্গত, ইহা তিনি কোন ক্রমেই লক্ষণকে বুঝাইতে পারেন নাই। লঙ্কাকাণ্ডে মায়াসীতার মন্তক-দর্শনে শোকাবুল রামচন্দ্রকে লক্ষণ বলিয়াছিলেন—“হর্ষ, কাম, দর্প, ক্রোধ, শাস্তি ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ,— এই সমস্তই অর্থের আয়ত্ত। আমার এই মত, ইহাই ধর্ম; কিন্তু আপনি সেই অর্থমূলক ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া সমূলে ধর্মলোপ করিয়াছেন। আপনি পিতৃ-আজ্ঞা পিরোধার্য্য করিয়া বনবাসী হওয়াতেই আপনার প্রাণাধিকা পত্নীকে রাক্ষসেরা অপহরণ করিয়াছে।” এই প্রথর ব্যক্তিত্বশালী যুবক শুধু ব্রহ্মহত্যাতেই একান্ত রূপে ব্যক্তিত্বহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন।

ভরতের চরিত্র রমণীজনোচিত কোমল মধুরতার ভূষিত, উহা সাবিক কৃষ্টির উপর অধিষ্ঠিত। রামের মত বলশালী চরিত্র রামায়ণে আর নাই, কিন্তু সময়-বিশেষে রাম দুর্বল ও মৃদুভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। রামচরিত্র বড় জটিল। কিন্তু লক্ষণের চরিত্রে আশ্চর্য পুরুষকারের মহিমা দৃষ্ট হয়। উহাতে ভরতের মত করুণ রসের যিচ্ছতা ও স্ত্রীলোকসুলভ খেদমুখর কোমলতা নাই। উহা মতত দৃঢ়, পুরুষোচিত ও বিপদে নির্ভীক। লক্ষণ অবস্থার কোন বিপর্য্যেই নমিত হইয়া পড়েন নাই। বিরাট রাক্ষসের হস্তে সীতাকে নিঃসহায়ভাবে পতিত দেখিয়া রামচন্দ্র “হার, আজ মাতা কৈকেয়ীর আশা পূর্ণ হইল” বলিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। লক্ষণ এতাকে তদবস্থ দেখিয়া ক্রুদ্ধ সর্পের ছায় নিঃশ্বাসত্যাগ করিয়া বলিলেন, “ইন্দ্রজুলা-পরাক্রান্ত হইয়া আপনি কেন অনাধের ছায় পরিত্যাপ করিতেছেন? আশুন, আমরা রাক্ষসকে বধ করি।”

শেলবিন্দু লক্ষণ পুনর্জীবন লাভ করিয়া যখন দেখিতে পাইলেন, রাম তাঁহার শোকে অধীর হইয়া সঙ্কলচক্ষে স্ত্রীলোকের মত বিলাপ



করিতেছেন, তখন তিনি সেই কাতর অবস্থাতেই রামকে এইরূপ পৌকষহীন মোহ প্রাপ্তির জন্ত তিরস্কার করিয়াছিলেন। বিরাহের অবস্থায় রামের একান্ত বিহ্বলতা দেখিয়া তিনি ব্যথিতচিত্তে রামকে কত উপদেশ দিরাছেন—তাহা একদিকে যেমন সুগভীর ভালবাসা-ব্যঞ্জক,—অপরদিকে সেইরূপ তাঁহার চরিত্রের দৃঢ়তাসূচক। “আপনি উৎসাহশূন্য হইবেন না,” “আপনার একরূপ দৌর্জল্য-প্রদর্শন উচিত নহে,” “পুরুষকার অবলম্বন করুন” ইত্যাদিরূপ নানাবিধ স্নেহের গঞ্জনা করিয়া তিনি একদিন বলিয়াছিলেন,— “দেবগণের অমৃতলাভের স্থায় বহু তপস্বী ও কৃচ্ছ সাধন করিয়া মহারাজ দশরথ আপনাকে লাভ করিয়াছিলেন, সে সকল কথা আমি ভারতের মুখে শুনিয়াছি—আপনি তপস্বীর ফলস্বরূপ। যদি আপনার স্থায় ধর্মাত্মা বিপদে পড়িয়া সহ্য করিতে না পারেন, তবে অগম্য ইতর ব্যক্তির কিস্তি কিস্তি করিবেন ?”

রামের প্রতি জ্ঞাতসারে হউক বা অজ্ঞাতসারে হউক, যে কেহ অস্তায় করিয়াছে, লক্ষণ তাহা কমা করেন নাই, এ কথা পূর্বেই বলিয়াছি। দশরথের শুণরাশি তাঁহার সমস্তই বিদিত ছিল, কোথের উত্তেজনায় তিনি বাহাই বনুন না কেন, দশরথ যে পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করিবেন, এ কথাও তিনি পূর্বেই অনুমান করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি দশরথকে মনে মনে কমা করেন নাই। সুমন্ত্র বিদায়কালে যখন লক্ষণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কুমার, পিতৃসকাশে আপনার কিছু বক্তব্য আছে কি ?” তখন লক্ষণ বলিলেন, “রাজাকে বলিও, রামকে তিনি কেন বনে পাঠাইলেন, নিরপরাধ জ্যেষ্ঠপুত্রকে কেন পরিত্যাগ করিলেন, তাহা আমি বহু চিন্তা করিয়াও বুঝিতে পারি নাই। আমি মহারাজের চরিত্রে



পিতৃহের কোন নিদর্শন দেখিতে পাইতেছি না। আমার ভ্রাতা, বন্ধু, ভর্তা ও পিতা সকলই রামচন্দ্র।—

“অহং তাবদ্ব্যহারাঙ্গে পিতৃহং নোপলক্ষয়ে।

ভ্রাতা ভর্তা চ বন্ধু চ পিতা চ মম রামবঃ।”

ভরতের প্রতি তাঁহার গভীর সন্দেহ ছিল। কৈকেয়ীর পুত্র ভরত যে যাতার ভাবে অমুপ্রাণিত হইবেন, এ সম্বন্ধে তাঁহার অটল ধারণা ছিল,—কেবল রামের ভৎসনার ভয়ে তিনি ভরতের প্রতি কঠোরবাক্য-প্রয়োগে নিবৃত্ত থাকিতেন। কিন্তু যখন অটাবন্ধকেশ-কলাপ অনশনক্লেশ ভরত রামের চরণপ্রান্তে পড়িয়া ধূলিলুপ্তিত হইলেন, তখন লক্ষণ তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া সলজ্জ য়েহ-পরিভাষে শ্রিয়মাণ হইলেন। একদিন শীতকালের রাত্রে বড় ছুবার পড়িতেছিল, শীতামিকো পক্ষিগণ কুলায়ে গুচ্ছিত হইয়াছিল, ভরতের জন্ত সেই সময় লক্ষণের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, তিনি রামকে বলিলেন—“এই তীব্র শীত সহ করিয়া ধর্ম্মায়া ভরত আপনার ভক্তির তপস্তা পালন করিতেছেন, রাজ্য, ভোগ, মান, বিলাস সমস্ত ত্যাগ করিয়া নিয়তাহারী ভরত এই বিবম শীতকালের রাত্রিতে মৃত্তিকায় শয়ন করিতেছেন। পারিত্রজ্যের নিয়ম পালন করিয়া প্রত্যহ শেষরাত্রিতে ভরত সরযুতে অবগাহন করিয়া থাকেন। চিরস্থখোচিত রাজকুমার শেষরাত্রে তীব্র শীতে কিরূপে সরযুতে স্নান করেন!” এই লক্ষণই পূর্বে—

“ভরতস্ত বধে দোষং নাসং পশ্যামি কখনং”

বলিয়া জোড় প্রকাশ করিয়াছিলেন। যে দিন বুঝিতে পারিলেন, তিনি বনে বনে ঘুরিয়া রামের যেরূপ সেবার নিরন্তর, অযোধ্যার



মহাসমুদ্রের মধ্যে বাস করিয়াও ভরত রামভক্তিতে সেইরূপ কৃচ্ছসাধন করিতেছেন, সেই দিন হইতে তাঁহার স্বর এইরূপ মেহাদি ও বিনম্র হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু তিনি কৈকেয়ীকে কখনই ক্ষমা করেন নাই; রামের নিকট একদিন বলিয়াছিলেন—“দশরথ ধাঁহার স্বামী, সাধু ভরত ধাঁহার পুত্র, সেই কৈকেয়ী এরূপ নিষ্ঠুর হইলেন কেন?”

রামায়ণে লক্ষণের মত পুরুষকারের উজ্জ্বল চিত্র আর দ্বিতীয় নাই। ইনি সতত নির্ভীক, বিপদে অকুণ্ঠিত, স্বীয় ক্ষুরধার তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্বন্ধে প্রাতঃস্নেহের বলবন্তী হইয়া একেবারে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন। নিত্যমু বিপদেও তাঁহার কণ্ঠস্বর দ্রোলকের জাহ কোমল হইয়া পড়ে নাই। যখন তিনি কবন্ধের বিশালহস্তের সম্পূর্ণরূপ আঘাত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন রামের প্রতি নৃষ্টি করিয়া এইমাত্র তিনি বলিয়াছিলেন—“দেখুন, আমি রাক্ষসের অধীন হইয়া পড়িতেছি, আপনি আমাকে বলিস্বরূপ রাক্ষসের হস্তে প্রদান করিয়া পলায়ন করুন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনি সীতাকে শীঘ্র ফিরিয়া পাইবেন। তাঁহাকে লাভ করিয়া পৈতৃক রাজ্যে পুনরধিষ্ঠিত হইয়া আমাকে স্মরণ রাখিবেন।” এই কথার বিলাপের ছন্দ নাই। ইহাতে রামের প্রতি অসীম প্রীতি ও স্বীয় আত্মোৎসর্গের অতুল্য ধৈর্য্য সূচিত হইয়াছে।

কালক্রান্তের এই জলন্ত মূর্তি, এই যৌন দাহভক্তির আদর্শ ভারতে চিরদিন পূজা পাইয়া আসিয়াছেন। “রাম-সীতা” এই কথা অপেক্ষাও বোধ হয় “রাম-লক্ষণ” এই কথা এতদধিক বেশী পরিচিত। সৌভ্রাতৃত্বের কথা মনে হইলে “লক্ষণ” অপেক্ষা প্রশংসার উপমা আমরা করনা করিতে পারি না। ভরত



ভ্রাতৃত্বভক্তির পলায়,—স্বকোমল ভাবের সমৃদ্ধ উল্লাসহরণ। কিন্তু লক্ষণ ভ্রাতৃত্বভক্তির অনব্যাহন,—জীবিকার সংস্থান। আজ আমরা স্বেচ্ছায় আমাদের গৃহগুলিকে লক্ষণ-মুক্ত করিতেছি। আজ বহুস্থানে সহধর্মিণীর স্থলে স্বার্থরূপিনী, অলঙ্কারপেটিকার বক্ষীগণ আমাদেরকে ঘিরিয়া গৃহে একাধিপত্য স্থাপন করিতেছে ; ঐহারা এক উদরে স্থান পাইয়াছিলেন, তাঁহারা আজ এক গৃহে স্থান পাইতেছেন না ! হায়, কি দৈববিড়ম্বনা, ঐহাদিগকে বিশ্বনিয়ন্তা মাতৃগর্ভ হইতে পরম স্নহদ্রুপে গড়িয়া দিয়া আমাদেরকে প্রকৃত সৌহার্দ্য শিখাইবেন, তাঁহাদিগকে বিদায় দিয়া পাঞ্জাব ও পুণা হইতে আমরা স্নহৎ সংগ্রহ করিব, এ কথা কি বিশ্বাস্ত ? আজ আমাদের রাম বনবাসী, লক্ষণ প্রাসাদশীর্ষ হইতে সেই দৃষ্ট উপভোগ করেন, আজ লক্ষণের অন্ন ছুটিতেছে না, রাম স্নর্গ-থালে উপাদেয় আহার করিতেছেন। আজ আমাদের কষ্ট, দৈন্ত, বনবাসের দুঃখ সমস্তই দ্বিগুণতর পীড়াদায়ক,—লক্ষণগণকে আমাদের দুঃখের সহায় ও চিরসঙ্গী মনে ভাবিতে তুলিয়া বাইতেছি। হে ভ্রাতৃবৎসল, মহর্ষি বাল্মীকি তোমাকে আঁকিয়া গিয়াছেন—চিত্র হিসাবে নহে ; হিন্দুর গৃহ-দেবতাস্বরূপ তুমি এ পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিলে। আবার তুমি হিন্দুর ঘরে ফিরিয়া এস,—সেই প্রিয়-প্রসঙ্গ-মুখরিত একগৃহে একত্র বসিয়া আহার করি, স্বর্গ হইতে আমাদের মাতারা সেই দৃষ্ট দেখিয়া আশিস্ বর্ষণ করিবেন। আমাদের দক্ষিণবাহু অভিনব-বলদৃপ্ত হইয়া উঠিবে—আমরা এ চক্ষুনের অস্ত দেখিতে পাইব।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

লাঠিয়াল আকুবর

বেণীর চতুর্থমণ্ডপ হইতে অনেকগুলি লোকের চাপা-গলায় আওয়াজ আসিতেছিল। আকাশে মেঘ কতকটা কাটিয়া গিয়া জয়োদয়ার অন্ধ্র ছোয়ায়া বারান্দার উপরে আসিয়া পড়িয়াছিল। সেইখানে খুঁটিতে ঠেস দিয়া একজন ভীষণাকৃতি প্রোড় মুসলমান চোখ বুজিয়া বসিয়া ছিল। তাহার সমস্ত মুখের উপর কাচা রক্ত জমাট বাধিয়া গিয়াছে—পরনের বস্ত্র রক্তে রাঙা; কিন্তু সে চূপ করিয়া আছে। বেণী চাপা-গলায় অহুসর করিতেছে,—“কথা শোন আকুবর, থানার চল। সাত বছর যদি না তাকে দিতে পারি, ত ঘোষালবংশের ছেলে নই আমি।” পিছনে চাহিয়া কহিল,—“রমা, তুমি একবার বল না, চূপ ক’রে রইলে কেন?” কিন্তু রমা তেমনি কাঠের মত বসিয়া রহিল। আকুবর আলি এবার চোখ খুলিয়া সোজা হইয়া বসিয়া বলিল,—“সাবাস! ইঁা, —মায়ের দুধ খেয়েছিলে বটে ছোটবাবু। লাঠি ধরলে বটে।” বেণী ব্যস্ত এবং কুদ্ধ হইয়া কহিল,—“সেই কথা বলতেই ত বলচি আকুবর কার লাঠিতে তুই জখম হলি? সেই ছোড়ার, না তার সেই হিন্দুস্থানী চাকরটার?” আকুবরের গুষ্ঠপ্রান্তে ঈষৎ হাসি প্রকাশ পাইল; কহিল,—“সেই বেটে হিন্দুস্থানীটার? সে ব্যাটা লাঠির জানে কি বড়বাবু? কি বলিস্ রে গহর, তোর পরলা চোটেই সে বসেছিল না রে?” আকুবরের দুই ছেলেই অদূরে জড়সড় হইয়া বসিয়াছিল। তাহারাও অনাহত ছিল না। গহর

১১৫
১১৬



মাথা নাড়িয়া সায় দিল, কথা কহিল না। আকবর কহিতে লাগিল, “আমার হাতের চোট পেলে সে ব্যাটা বাঁচত না। গহরের লাঠিতেই ‘বাপ’ ক’রে ব’সে পড়ুল বড়বাবু।” রমা উঠিয়া আসিয়া অনতিদূরে দাঁড়াইল। আকবর তাহাদের পিরপুরের প্রজা। সাবেক দিনে লাঠির জোরে অনেক বিষয় হস্তগত করিয়া দিয়াছে। তাই আজ সন্ধ্যার পরে ক্রোধে ও অভিমানে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া রমা তাহাকে ডাকাইয়া আনিয়া বাধ পাহারা দিবার জন্ত পাঠাইয়া দিয়াছিল, এবং ভাল করিয়া একবার দেখিতে চাহিয়াছিল, রমেশ শুধু সেই হিন্দুহানীটার গায়ের জোরে কেমন করিয়া কি করে। সে নিজেই যে কত বড় লাঠিয়াল, এ কথা রমা স্বপ্নেও কল্পনা করে নাই।

আকবর রমার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল,—“তখন ছোটবাবু সেই ব্যাটার লাঠি তুলে নিয়ে বাধ আটক ক’রে দাঁড়াল দিদি-ঠাকুরাণ, তিন বাপ-ব্যাটার মোরা হটাতে নারলাম। আধারে বাঘের মত তেনার চোখ জন্তি লাগল। কইলেন, ‘আকবর, বুড়োমানুষ তুই, সরে যা। বাধ কেটে না দিলে সারাগাঁয়ের লোক মারা পড়বে, তাই কাটতেই হবে। তোর আপনার গায়েও ত জমিজমা আছে, সম্মুখে দেখে, সব স্বরবাদ হ’য়ে গেলে তোর কামন লাগে?’ মুই সেলাম ক’রে কইলাম, ‘আমার কিরে ছোটবাবু, তুমি একটবার পথ ছাড়। তোমার আড়ালে দৌড়িয়ে ঐ যে ক’ সন্ধানি মুয়ে কাপড় জড়িয়ে ঝপাঝপ কোদাল মার্চে, ওদের মুহু ক’টা ফাঁক ক’রে দিয়ে যাই!’” বেনী রাগ সামলাইতে না পারিয়া কথার মাঝখানেই টেঁচাইয়া কহিল,—“বেইমান ব্যাটার! —তাকে সেলাম বাজিয়ে এসে এখানে চালাকি মারা হচ্ছে—”

তাহারা তিন বাপবেটাই একেবারে একসঙ্গে হাত তুলিয়া উঠিল। আকবর কর্কশকণ্ঠে কহিল,—“খবরদার বড়বাবু, বেইমান কোয়ো না ; মোরা মোহলমানের ছালে, সব সহিতে পারি,—ও পারি না।” কপালে হাত দিয়া খানিকটা রক্ত মুছিয়া ফেলিয়া রমাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল,—“কারে বেইমান কয় দিদি ? ঘরের মধ্য র’সে বেইমান কইচ, বড়বাবু, চোখে দেখলি জান্তি পাবতে ছোটবাবু কি !” বেলী মুখ বিকৃত করিয়া কহিল,—“ছোটবাবু কি ! তাই থানায় গিয়ে জানিয়ে আয় না ! বলবি, তুই বাধ পাহারা দিচ্ছিলি, ছোটবাবু চড়াও হ’য়ে তোরে মেরেচে।” আকবর জিত কাটিয়া বলিল,—“তোকা তোকা, দিনকে রাত কর্তি বল, বড়বাবু ?” বেলী কহিল, “না হয় আর কিছু বলবি। আজ গিয়ে জখম দেখিয়ে আয় না—কাল ওয়ারেন্ট বার ক’রে একেবারে হাজতে পূরব। রমা, তুমি ভাল ক’রে আর একবার বুঝিয়ে বল না।—এমন সুবিধে যে আর কখনো পাওয়া যাবে না।” রমা কথা কহিল না, শুধু আকবরের মুখের প্রতি একবার চাহিল। আকবর ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—“না দিদিঠাকুরাণ, ও পারব না।” বেলী ধমকু দিয়া কহিল,—“পারবিনে কেন ?” এবার আকবরও চোঁচাইয়া কহিল,—“কি কও বড়বাবু, সরম নেই মোর ?” খাঁচখানা গায়ের লোকে মোরে সঙ্গার কয় না ? দিদিঠাকুরাণ, (তুমি হুকুম করলে আসামী হ’য়ে জাল খাটতি পারি, কৈরিদি হব কোন্ কালানুয়ে ?)” রমা মুহূর্ত্তে একবারমাত্র কহিল,—“পারবে না আকবর ?” আকবর সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল,—“না দিদিঠাকুরাণ, আর সব পারি, সদরে গিয়ে গায়ের চোট দেখাতে না পারি।—ওঠরে গহর, এইবার ঘরকে যাই। মোরা



মালিশ কর্তি পার্‌ব না, বলিয়া তাহার উঠবার উপক্রম করিল।

বেশী ক্রুদ্ধ নিরাশার তাহাদের দিকে চাহিয়া ছই চোখে অগ্নি-বর্ষণ করিয়া মনে মনে অকথা গালিগালাজ করিতে লাগিল এবং রমার একান্ত নিরুপদ্য স্তম্ভতার কোন অর্থ বুঝিতে না পারিয়া ভূঁষের আগুনে পুড়িতে লাগিল। সর্বপ্রকার অমুনয় বিনয়, ভৎসনা, ক্রোধ উপেক্ষা করিয়া আক্‌বর আলি ছেলেদের লইয়া যখন বিদায় হইয়া গেল, তখন রমার বুক চিরিয়া একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া, অকারণে তাহার ছই চক্ষু অশ্রু-প্লাবিত হইয়া উঠিল, এবং আজিকার এত বড় অপমান তাহার সম্পূর্ণ পরাজিত ও নিফল হওয়া সবেও কেন যে, কেবলি মনে হইতে লাগিল, তাহার বকের উপর হইতে একটা অতি শুকতার পাখা নাড়িয়া গেল, তাহার কোন হেতুই সে বুঝিয়া পাইল না। সারারাত্রি তাহার ঘুম হইল না, সেই যে তারকেশ্বরে গুমুখে বসিয়া থাকিয়াইয়াছিল, নিরন্তর তাহাই চোখের উপর ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল; এবং যতই মনে হইতে লাগিল, সেই পুন্‌দর শুকুমার দেহের মধ্যে এত মায়া এবং এত তেজ কি করিয়া এমন স্বচ্ছন্দে শাস্ত হইয়াছিল, ততই তাহার চোখের জলে সমস্ত মুখ ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।



সুন্দাবনের পাঠশালা

সুন্দাবন লোকটি সেই প্রকৃতির মানুষ, যাহারা কোনো অবস্থাতেই বিচলিত হইয়া মাথা গরম করাকে অত্যন্ত লজ্জাকর বাপার বলিয়া ঘৃণা করে ইহারা হাজার রাগ হইলেও সামলাইতে পারে এবং কোনো কারণেই প্রতিপক্ষের রাগারাগি হাকাঠাকি বা উচ্চ তর্কে যোগ দিয়া লোক জড় করিতে চাহে না। তথাপি, সে দিন কুসুমের বারংবার নিষ্ঠুর ব্যবহারে ও অন্ত্যায় অভিযোগে উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া কতকগুলি নিরর্থক রুঢ় কথা বলিয়া আসিয়া তাহার মনস্তাপের অবধি ছিল না। তাই, পরদিন প্রভাতেই চরণকে আনিবার ছলে একজন দাসী, ভূতা ও গাড়ী পাঠাইয়া দিয়া যথার্থই আশা করিয়াছিল, বুদ্ধিমতী কুসুম এ ইঙ্গিত বুঝিতে পারিবে, এবং হয় ত আসিবেও। যদি সত্যই আসে, তাহা হইলে একটা দিনের জন্তও তাহাকে লইয়া যে কি উপায় হইবে, এ ছক্কা প্রব্লেম এই বলিয়া মীমাংসা করিয়া রাখিয়াছিল—যদি আসে, তখন মা আছেন। জননীকে কার্য-কুশলতার তাহার অগাধ বিশ্বাস ছিল। যত বড় অবস্থাসঙ্কটই হোক, কোন-না-কোনো উপায়ে তিনি সব দিক বজায় রাখিয়া যাহাতে মঙ্গল হয়, তাহা করিবেনই। এই বিশ্বাসের জোরেই যাকে একটি কথা না বলিয়াই গাড়ী পাঠাইয়া দিয়াছিল এবং আশায় আনন্দে লজ্জায় ভয়ে অধীর হইয়া পথ চাহিয়াছিল, অন্ততঃ মায়ের কাছে কমা-ভিক্ষার জন্তও আসা সে আসিবে।



দুপুর বেলা গাড়ী একা চরণকে লইয়া ফিরিয়া আসিল, বৃন্দাবন চণ্ডীমণ্ডপের ভিতর হইতে আড়চোখে চাহিয়া দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল।

কিছুদিন হইতে তাহার পাঠশালায় পূর্বের শৃঙ্খলা ছিল না। পণ্ডিত যশায়ের দারুণ অমনোযোগে অনেক পোড়ো কামাই করিতে শুরু করিয়াছিল, এবং যাহারা আসিত, তাহাদেরও পুকুরে তালপাতা ধুইয়া আনিতেই দিন কাটিয়া বাইত। শৃঙ্খলা অক্ষয় ছিল—শুধু ঠাকুরের আরতি-শেষে প্রসাদ-ভক্ষণে। এটা বোধ করি, অকৃত্রিম ভক্তি-বশতঃই—ছাত্রেরা এ সময়ে অমুপস্থিত থাকিবা গৌর-নিতাইয়ের অমর্যাদা করিতে পছন্দ করিত না।

এমনি সময়ে অকস্মাৎ এক দিন বৃন্দাবন তাহার পাঠশালায় সমুদয় চিত্ত নিযুক্ত করিয়া দিল। পোড়োদের তালপাতা ধুইয়া আনিবার সময় ছয় ঘণ্টা হইতে কমাইয়া পোনের মিনিট করিল এবং সারাদিন অনর্শনের পর শুধু আরতির সময়টায় গৌরান্দ্র-প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া, তাহারা পদ্মপালের স্তায় ঠাকুরদালান ছাইয়া না ফেলে, সে দিকেও খর দৃষ্টি রাখিল।

দিন দশেক পরে একদিন বৈকালে বৃন্দাবনের তত্ত্বাবধানে পোড়োর সারি দিয়া দাঁড়াইয়া, তারত্বরে গণিত-বিষ্ঠায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিতেছিল, একজন ভদ্রলোক প্রবেশ করিলেন। বৃন্দাবন সসম্মুখে উঠিয়া বসিতে আসন দিয়া চাহিয়া রহিল, চিনিতে পারিল না।

আগন্তুক তাহারই সমবয়সী। আসন গ্রহণ করিয়া হাসিয়া বলিলেন, কি ভায়া চিন্তে পারলে না?

বৃন্দাবন সলজে স্বীকার করিয়া বলিল, কৈ না।



তিনি বলিলেন, আমার কাঁধ আছে তা পরে জানাব।
মাগার চিঠিতে তোমার অনেক সুখ্যাতি শুনে বিদেশ বাবার
পূর্বে একবার দেখতে এলাম—আমি কেশব।

বৃন্দাবন লাফাইয়া উঠিয়া এই বাল্যসুহৃৎকে আলিঙ্গন করিল।
তাহার ছুতপূর্ব ইংরাজীশিক্ষক জর্জাদাসবাবুর ভাগিনেয় ইনি।
১৫।১৬ বৎসর পূর্বে এখানে পাঁচ ছয় মাস ছিলেন, সেই সময়
উভয়ের আশির্বাদ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। জর্জাদাসবাবুর স্বীয় মৃত্যু হইলে
কেশব চলিয়া যায়, সেই অবধি আর দেখা হয় নাই। তথাপি
কেহই কাহাকে বিস্মৃত হয় নাই এবং তাহার শিক্ষকের মুখে
বৃন্দাবন প্রায়ই এই বাল্য বন্ধুটির সংবাদ পাইতেছিল।

কেশব ৫৬ বৎসর হইল, এম. এ. পাশ করিয়া কলেজে
শিক্ষকতা করিতেছিল, সম্প্রতি সরকারী চাকরিতে বিদেশে
যাইতেছে।

কুশলাদি প্রশ্নের পর সে কহিল, আমার মাঝে মিথ্যে কথা শু
দূরের কথা, কখনো বাড়িয়েও বলেন না ; গতবারে তিনি চিঠিতে
লিখেছিলেন, জীবনে অনেক ছাত্রকেই পড়িয়েছেন ; কিন্তু, তুমি
ছাড়া আর কেউ বধার্থ মানুষ হয়েছে কি না তিনি জানেন না।
বধার্থ মানুষ কখনও চোখে দেখিনি ভাই, তাই দেশ ছেড়ে বাবার
আগে তোমাকে দেখতে এসেছি।

কথাগুলো বন্ধুর মুখ দিয়া বাহির হইলেও বৃন্দাবন লজ্জায় এতই
অভিভূত হইয়া পড়িল যে, কি জবাব দিবে তাহা খুঁজিয়া পাইল
না। সংসারে কোন মানুষই যে তাহার সম্বন্ধে এতবড় স্তুতিবাক্য
উচ্চারণ করিতে পারে, ইহা তাহার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।
বিশেষতঃ, এই স্তুতি, তাহারই পরম পুঙ্জনীয় শিক্ষকের মুখ দিয়া



প্রথম প্রচারিত হইবার সংবাদে ষষ্ঠার্থই সে হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কেশব বুঝিয়া বলিল, যাক্, যাতে লজ্জা পাও, আর তা বলব না, শুধু আমার মতটা তোমাকে জানিয়ে দিলাম। এখন কাষের কথা বলি। পাঠশালা খুলেচ, তুনি যাইনে নাও না, পোড়োদের বইটাই কাপড়চোপড় পর্য্যন্ত যোগাও—এতে আমিও রাজী ছিলাম, কিন্তু ছাত্র জোটাতে পারলাম না। বলি, এতগুলি ছেলে জোগাড় করলে কি করে বলত ভায়া?

বৃন্দাবন তাহার কথা বুঝিতে পারিল না, বিস্মিত মুখে চাহিয়া রহিল।

কেশব হাসিয়া বলিল, খুলে বল্চি—নইলে বুঝবে না। আমরা আজকাল সবাই টের পেয়েচি, যদি দেশের কোনো কাষ থাকে ত ইতর-সাধারণের ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া। শিক্ষা না দিয়ে আর যাই করি না কেন, নিছক পণ্ডিত্রম। অস্ততঃ, আমার শু এই মত বে লেখাপড়া শিখিয়ে দাও, তখন আপনার ভাবুনা তারা আপনি ভাববে। ইঞ্জিনে ষ্টিম হলে তবে গাড়ী চলে, নইলে, এত বড় জড় পদার্থটাকে জনকতক ভদ্রলোক মিলে গায়ের জোরে ঠেলা-ঠেলি করে একচুলও নাড়তে পারবে না। যাক্, তুমি এ সব জানই, নইলে গাঁটের পরসী খরচ করে পাঠশালা খুলতে না। আমি এই ক্ষণে বিয়ে পর্য্যন্ত করিনি হে, তোমাদের মত আমাদের গায়েও লেখাপড়া শেখাবার বালাই নেই, তাই, প্রথমে একটা পাঠশালা খুলে—শেষে একটা স্কুলে দাঁড় করাৰ মনে করি—তা আমার পাঠশালাই চল না—ছেলে জুটল না। আমাদের গায়ের ছোটলোকগুলো এমনি সয়তান যে, কোনো মতেই ছেলেদের



পড়তে দিতে চায় না। নিজের যানসম্বল নষ্ট করে দিনকতক ছোটলোকদের বাড়ী বাড়ী পর্য্যন্ত ঘুরেছিলাম,—না, তবুও না।

বৃন্দাবনের মুখ রাত্তা হইয়া উঠিল। কিন্তু শান্তভাবে বলিল, ছোটলোকদের ভাগ্য ভাল যে ভদ্রলোকের পাঠশালে ছেলে পাঠায়নি। কিন্তু, তোমারও ভাই, আমাদের যত ছোটলোকদের বাড়ী বাড়ী ঘুরে মান-ইচ্ছত নষ্ট করা উচিত হয়নি।

তাহার কথার খোঁচাটা কেশবকে সম্পূর্ণ বিধিল। সে ভারী অপ্রতিভ হইয়া বলিয়া উঠিল—না হে, না,—তোমাকে—তোমাদের সে কি কথা! হি হি! তা আমি বলিনি, সে কথা নয়—কি জানো—

বৃন্দাবন হাসিয়া উঠিল। বলিল, আমাকে বলনি তা বিলক্ষণ জানি। কিন্তু, আমার আত্মীয়-স্বজনকে বলেচ। আমরা সব তাঁতি কামার গয়লা চাষা—তাঁত বুনি, লাঙল ঠেলি, গরু চরাই—জামাজোড়া পরতে পাইনে, সরকারী আফিসের দোর-গোড়ায় যেতে পারিনে, কায়েই তোমরা আমাদের ছোটলোক বলে ডাকো—ভাল কাষেও আমাদের বাড়ীতে ঢুকলে তোমার যত উচ্চ শিক্ষিত সদাশয় লোকেরও সম্মান নষ্ট হয়ে যায়।

কেশব মাথা হেঁট করিয়া বলিল, বৃন্দাবন, সত্যি বল্চি ভাই, তোমাকে আমি চাষা-ভূষোর দল থেকে সম্পূর্ণ পৃথক্ মনে করেই অমন কথা বলে ফেলেচি। যদি জান্তাম, তুমি নিজেকে ওদের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে রাগ করবে, কক্ষণো এ কথা মুখ দিয়ে বার করতাম না।

বৃন্দাবন কহিল, তাও জানি। কিন্তু তুমি আলাদা করে নিলেই শু আলাদা হতে পারিনে ভাই। আমার সাতপুরুষ



এদেশের ছোটলোকদের সঙ্গেই মিশে রয়েছে! আমিও চাষা, আমিও নিজের হাতে চাষ-আবাদ করি। কেশব, এই কল্হেই তোমার পাঠশালায় ছেলে জোটেনি—আমার পাঠশালায় ছুটেচে। আমি দলের মধ্যে থেকেই বড়, দল-ছাড়া বড় নই, তাই তারা অসঙ্কোচে আমার কাছে এসেচে—তোমার কাছে যেতে ভরসা করেনি। আমরা অশিক্ষিত দরিদ্র, আমরা মুখে আমাদের অভিমান প্রকাশ করতে পারিনে, তোমরা ছোট লোক বলে ডাকো, আমরা নিঃশব্দে স্বীকার করি, কিন্তু আমাদের অন্তরঙ্গী স্বীকার করেন না,—তিনি তোমাদের ভাল কথাতেও সাড়া দিতে চান না।

কেশব লজ্জায় ও কোড়ে অবনতমুখে শুনিতে লাগিল।

বৃন্দাবন কহিল, জানি, এতে আমাদেরই সমূহ ক্ষতি হয়, তবুও আমরা তোমাদের আত্মীয় শুভাকাঙ্ক্ষী বলে যেনে নিতে ভয় পাই। দেখতে পাও না ভাই, আমাদের মধ্যে হাতুড়ে বণ্ডি হাতুড়ে পণ্ডিতই পসার-প্রতিপত্তি লাভ করে,—যেমন আমি করেছি, কিন্তু তোমাদের যত বড় বড় ডাক্তার প্রোফেসরও আমল পায় না। আমাদের বৃকের মধ্যেও দেবতা বাস করেন, তোমাদের এই অশ্রদ্ধার করুণা, এই উচুতে বসে নীচে ভিক্ষা দেওয়া তাঁর গায়ে বেধে, তিনি মুখ ফেরান।

এবার কেশব প্রতিবাদ করিয়া কহিল, কিন্তু মুখ ফেরানো অত্যাচার। আমরা বাস্তবিক তোমাদের ঘৃণা করিনে, সত্যিই মজল-কামনা করি। তোমাদের উচিত, আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা। কিসে ভালো হয় না হয়, শিক্ষার গুণে আমরা বেশী বুঝি, তোমরাও চোখে দেখতে পাচ্ছ আমরাই সব বিষয়ে উন্নত, তখন তোমাদের কর্তব্য আমাদের কথা শোনা।



বৃন্দাবন কহিল—দেখ কেশব, দেবতা কেন মুখ ফেরান্, তা দেবতাই জানেন। সে কথা থাক্। কিন্তু, তোমরা আত্মীয়ের মত আমাদের যত্নকামনা কর না, মনিবের মত কর। তাই, তোমাদের পোনের আনা লোকেই মনে করে, বাতে ভদ্রলোকের ছেলের ভাল হয়, বাতে চাষা-ভূবোর ছেলেরা অধঃপথে যায়। তোমাদের শংস্রবে লেখাপড়া শিখলে চাষার ছেলে যে বাবু হয়ে যায়, তখন অশিক্ষিত বাপ-দাদাকেও মানে না, শ্রদ্ধা করে না,— বিজ্ঞানশিক্ষার এই শেষ পরিণতির আশঙ্কা আমরা তোমাদের আচরণেই শিখি। কেশব, আগে আমাদের অর্থাৎ দেশের এই ছোটলোকদের আত্মীয় হতে শেখো, তার পরে তাদের যত্নকামনা কোরো, তাদের ছেলেপিলেদের লেখাপড়া শেখাতে বেরো। আগে নিজেদের আচার-ব্যবহারে দেখাও, তোমরা লেখাপড়া-শেখা ভদ্রলোকেরা একেবারে স্বতন্ত্র দল নও, লেখাপড়া শিখেও তোমরা দেশের অশিক্ষিত চাষা ভূমোকে নেহাৎ ছোটলোক মনে কর না, বরং শ্রদ্ধা কর, তবেই শুধু আমাদের ভয় ভাঙ্কে যে, আমাদেরও লেখাপড়া-শেখা ছেলেরা আমাদের আশঙ্কা করবে না এবং দল ছেড়ে, সমাজ ছেড়ে, জাতিগত ব্যবসা-বাণিজ্য কাযকর্ম সমস্ত বিসর্জন দিয়ে, পৃথক্ হবার জন্যে উদ্ভূত হয়ে উঠবে না। এ যতক্ষণ না কর্চ ভাই, ততক্ষণ, কন্যাজন্য অবিবাহিত থেকে হাজার জীবনের ব্রত কর না কেন, তোমার পাঠশালে ছোটলোকের ছেলে থাকে না। ছোটলোকেরা শিক্ষিত ভদ্রলোককে ভয় করবে, মান্ত করবে, ভক্তিও করবে, কিন্তু বিশ্বাস করবে না, কথা শুনে না। এ সংশয় তাদের মন থেকে কিছুতেই ঘুচবে না যে, তোমাদের ভালো এবং তাদের ভালো এক নয়।



কেশব ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিল, বৃন্দাবন, বোধ করি, তোমার কথাই সত্য। কিন্তু, জিজ্ঞাসা করি, যদি উভয়ের মধ্যে বিশ্বাসের বন্ধনই না থাকে, তাহলে আমাদের শত আত্মীয়তার প্রয়াসও ত কাষে লাগবে না? বিশ্বাস না করলে আমরা কি করে বোঝাবো, আমরা আত্মীয় কিংবা পর? তার উপায় কি?

বৃন্দাবন কহিল, ঐ যে বসুম আচার-ব্যবহারে। আমাদের মৌলো আনা সংস্কারই যদি তোমাদের শিক্ষিতের দল কুসংস্কার বলে বর্জন করে, আমাদের বাসস্থান, আমাদের সাংসারিক গতিবিধি, আমাদের জীবিকা-অর্জনের উপায়, যদি তোমাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিভিন্ন হয়, তাহলে কোন দিনই আমরা বৃক্তে পারব না, তোমাদের নির্দিষ্ট কল্যাণের পন্থায় যথার্থই আমাদের কল্যাণ হবে। আচ্ছা কেশব, তৈপতে হবার পর থেকে সফা-আলিফ কর?

না।

ছুতো পায়ে দিয়ে জল খাও?

খাই।

মুসলমানের হাতের রাগা?

গ্রেডুডিস নেই। খেতে পারি।

তাহলে আমিও বলতে পারি, ছোটলোকদের মধ্যে পাঠশালা খুলে তাদের ছেলেদের শিক্ষা দেবার সঙ্কল্প তোমার বিড়ম্বনা,— কিংবা আরও কিছু বেশী—সেটা বললে তুমি রাগ করবে।

ধুষ্টতা?

ঠিক তাই। কেশব, শুধু ইচ্ছা এবং হৃদয় থাকলেই পরের ভালো এবং দেশের কাণ্ড করা যায় না। যাদের ভালো করবে

তাদের সঙ্গে থাকার কষ্ট সহ করতে পারা চাই, বুদ্ধিবিবচনায় ধর্ম্মকর্ম্মে এত এগিয়ে গেলে তারাও তোমার নাগাল পাবে না, তুমিও তাদের নাগাল পাবে না। কিন্তু, আর না, সন্ধ্যা হয়, এবার একটু পাঠশালার কাজ করি।

কর, কাল সকালেই আবার আসব বলিয়া কেশব উঠিয়া দাঁড়াইতেই বৃন্দাবন ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া পায়ে ধূলি গ্রহণ করিল।

পাড়াগাঁয়ে বাড়ী হইলেও কেশব সহরের লোক। বন্ধুর নিকট এই ব্যবহারে মনে মনে অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ করিল। উভয়ে প্রাঙ্গণে নামিতেই, পোড়োর দল মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল।

বাল্য বন্ধুকে ঘর পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দিয়া বৃন্দাবন আস্তে আস্তে বলিল, তুমি বন্ধু হলেও ব্রাহ্মণ। তাই তোমাকে নিজের তরফ থেকেও প্রণাম করেচি, ছাত্রদের তরফ থেকেও করেচি, বুঝলে ত ?

কেশব সলজ্জ হাস্তে ‘বুঝেচি’ বলিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

পরদিন সকালেই কেশব হাজির হইয়া বলিল, বৃন্দাবন, তুমি যে বধার্থ ই একটা মানুষ, তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই।

বৃন্দাবন হাসিয়া বলিল, আমারও নেই। তার পরে—

কেশব কহিল, তোমাকে উপদেশ দিচ্চিনে, সে অহঙ্কার আমার কাল ভেঙে গেছে, শুধু বন্ধুর মত সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করছি,—এ গাঁয়ে তুমি যেন নিজের অর্থ এবং সময় নষ্ট করে ছেলেদের শিক্ষা দিচ্চ, কিন্তু আরও কত শত সহস্র গ্রাম রয়েছে, যেখানে ‘ক’ ‘খ’ শেখাবারও বন্দোবস্ত নেই। আচ্ছা, এ কাষ কি গভর্ম্মেন্টের করা উচিত নয় ?



বৃন্দাবন হাসিয়া উঠিল; বলিল, তোমার প্রব্রট ঠিক শুই পোড়োদের মত হ'ল। দোষের জন্ত রাধুকে মারতে যাও দিকি, সে তকনি দুই হাত তুলে বলবে --পণ্ডিত মশাই, মাধুও করেছে। অর্থাৎ মাধুর দোষ দেখিয়ে দিতে পারলে যেন রাধুর দোষ আর থাকে না। এই দেশ-জোড়া মূঢ়তার প্রায়শ্চিত্ত নিজে ত করি ভাই, তার পরে, দেখা যাবে গভর্নমেন্ট তাঁর কর্তব্য করেন কি না। নিজের কর্তব্য করার আগে, পরের কর্তব্য আলোচনা করলে পাপ হয়।

কিন্তু, তোমার আমার সামর্থ্য কতটুকু? এই ছোট্ট একটুখানি পাঠশালায় জনকতক ছাত্রকে পড়িয়ে কতটুকু প্রায়শ্চিত্ত হবে?

বৃন্দাবন বিস্মিতভাবে এক মুহূর্ত চাহিয়া থাকিয়া কহিল, কথটা ঠিক হ'ল না ভাই; আমার পাঠশালার একটি ছাত্রও যদি মাধুষের মত মাধু হয় ত এই ত্রিশ কোটি লোক উদ্ধার হয়ে যেতে পারে। নিউটন, ফ্যারাডে, রামমোহন, বিজ্ঞানাম্বর ঝাকে ঝাকে তৈরি হয় না কেশব, বরং আশীর্বাদ করো, যেন এই অতি ছোট্ট পাঠশালার একটি ছাত্রকেও মরণের পূর্বে মাধু দেখে মরতে পারি। আর এক কথা। আমার পাঠশালার একটি সর্ব আছে। কাল যদি তুমি সন্ধ্যার পর উপস্থিত থাকতে ত দেখতে পেতে, প্রতাহ বাড়ী যাবার পূর্বে প্রত্যেক ছাত্রই প্রতিজ্ঞা করে, বড় হয়ে তারা অন্ততঃ দুটি একটি ছেলেকেও লেখা-পড়া শেখাবে। আমার প্রতি পাঁচটি ছাত্রের একটি ছাত্রও যদি বড় হয়ে তাদের ছেলেবেলার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করে, তা হলে আমি হিসেব করে দেখেছি কেশব, বিশ বছর পরে এই বাঙলা দেশে একটি লোকও মূর্থ থাকবে না।



কেশব নিখাস ফেলিয়া বলিল, উঃ—কি ভয়ানক আশা !

বৃন্দাবন বলিল, সে বলতে পার বটে ! দুর্বল মুহুর্তে আমারও
ভয় হয় ছরাশা, কিন্তু, সবল মুহুর্তে মনে হয়, ভগবান্ মুখ তুলে
চাইলে পূর্ণ হতে কতক্ষণ ?

কেশব কহিল, বৃন্দাবন, আজ রাত্রেই দেশ ছেড়ে যেতে হবে,
আবার কবে দেখা হবে, ভগবান্ জানেন । চিঠি লিখলে জবাব
দেবে বল ?

এ আর বেশী কথা কি, কেশব ?

বেশী কথাও আছে, বল্চি । যদি কখন বকুর প্রয়োজন হয়,
স্মরণ করবে বল ?

তাও কোরব, বলিয়া বৃন্দাবন নত হইয়া কেশবের পদধূলি
মাথায় লইল ।

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ।



ক্ষমার আদর্শ

চন্দ্র ধীর গতিতে মেঘের কোলের ভিতর দিয়া বহিরা যাইতেছিল। নীচে নদী কুল কুল শব্দে বায়ুর সঙ্গে খুব মিশাইয়া নাচিতে নাচিতে বহিরা যাইতেছিল। আধ জোছনা আধ অন্ধকারে মিশিয়া পৃথিবীর সৌন্দর্য অপরূপ দেখাইতেছিল। চারিদিকে ঋষির আশ্রম। এক একটা আশ্রম নন্দনবনকে ধিকার প্রদান করিতেছিল। এক একখানি ঋষির কুটির তরু, গুল্ম ও বৃক্ষলতা শোভিত হইয়া অপরূপ স্ত্রী ধারণ করিয়াছিল। একদিন এইরূপ জ্যোৎস্নাপুলকিত রাত্রে ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠদেব সহধর্মিণী অরুন্ধতী দেবীকে বলিতেছিলেন, “দেবি, ঋষি বিশ্বামিত্রের নিকট হইতে একটু লবণ ভিক্ষা করিয়া আন।” এই প্রস্নে অরুন্ধতী দেবী বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “প্রভু, এ কি আজ্ঞা করিতেছেন, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। যে আমার শত পুত্র হইতে বঞ্চিত করিয়াছে —” এই কথা বলিতে বলিতে দেবীর সুর অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল, সমস্ত পূর্ব-স্মৃতি জাগিয়া উঠিল, সে অপরূপ শান্তির আলয় গভীর ছন্দে ব্যথিত হইল, তিনি বলিতে লাগিলেন— “আমার শত পুত্র এই জোছনা-শোভিত রাত্রে বেদ গান করিয়া বেড়াইত, শত পুত্রই আমার বেনক ও ব্রহ্মনিষ্ঠ, আমার এইরূপ শত পুত্রই সে বিনষ্ট করিয়াছে; তাহার আশ্রম হইতে লবণ ভিক্ষা করিয়া আনিতে বলিতেছেন? আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইরাছি।”



ধীরে ধীরে ঋষির মুখ জ্যোতিঃপূর্ণ হইয়া উঠিল, ধীরে ধীরে সাগরোপম হৃদয় হইতে এই করুণী বাক্য নিঃসৃত হইল,—“দেবি, আমি তাহাকে যে ভালবাসি।” অকরুণীর বিষয় আরও বর্দ্ধিত হইল; তিনি বলিলেন, “আপনি যদি তাহাকে ভালবাসেন ত তাহাকে ‘ব্রহ্মর্ষি’ বলিয়া সম্বোধন করিলেই ত জগ্গাল মিটিয়া যাইত, আমাকেও শত পুত্র হইতে বর্দ্ধিত হইতে হইত না।” ঋষির মুখ অপূর্ণ শ্রী ধারণ করিল; তিনি বলিলেন, “তাহাকে ভালবাসি বলিয়াই ত তাহাকে ব্রহ্মর্ষি বলি নাই; আমি তাহাকে ব্রহ্মর্ষি বলি নাই বলিয়াই তাহার ব্রহ্মর্ষি হইবার আশা আছে।”

আজ বিখ্যামিত্র কোণে জ্ঞানশূন্য। আজ আর তাঁহার তপস্তায় মনোনিবেশ হইতেছে না। তিনি সঙ্কল্প করিয়াছেন, আজ যদি বশিষ্ঠ তাঁহাকে ব্রহ্মর্ষি না বলেন তাহা হইলে তাঁহার প্রাণসংহার করিবেন। সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার জন্ত তিনি তরবারি-হস্তে কুটির হইতে বহির্গত হইলেন। ধীরে ধীরে বশিষ্ঠদেবের কুটির-পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বশিষ্ঠদেবের সমস্ত কথা শুনিলেন। মুষ্টিবদ্ধ তরবারি হস্তে শিথিল হইয়া পড়িল; ভাবিলেন, “কি করিয়াছি, না জানিয়া কি অজ্ঞায় কার্য্য করিয়াছি, না জানিয়া কাহার নির্জিকার চিন্তে ব্যথা দিতে চেষ্টা করিয়াছি।” হৃদয়ে শত-বৃশ্চিক-দংশন-যন্ত্রণা অহুভূত হইল। অহুতাপে হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। দৌড়িয়া গিয়া বশিষ্ঠের পদপ্রান্তে পতিত হইলেন। কিছুক্ষণ বাক্য-দুষ্টি হইল না, অণপরে বলিলেন,—“কথা করুন, কিন্তু আমি কথাত্তিকারও অযোগ্য।” গর্জিত হৃদয় অন্ত কিছু বলিতে পারিল না। কিন্তু বশিষ্ঠ কি করিলেন? বশিষ্ঠ দুই হাত দিয়া তাঁহাকে ধরিয়া বলিলেন, “উঠ,



ব্রহ্মর্ষি, উঠ ।” দ্বিগুণ লজ্জার বিশ্বামিত্র বলিলেন, “প্রভু, কেন লজ্জা দেন ।” বশিষ্ঠদেব উত্তর করিলেন, “আমি কখনও মিথ্যা বলি না -আজ তুমি ব্রহ্মর্ষি হইয়াছ, আজ তুমি অভিমান ত্যাগ করিয়াছ । আজ তুমি ব্রহ্মর্ষি-পদ লাভ করিয়াছ ।” বিশ্বামিত্র বলিলেন, “আমাকে আপনি ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দিন ।” বশিষ্ঠ উত্তর করিলেন, “অনন্তদেবের নিকট যাও, তিনিই তোমাকে ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দিবেন ।”

অনন্তদেব যেখানে পৃথিবী মন্তকে ধরিয়া আছেন, বিশ্বামিত্র সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । অনন্তদেব বলিলেন, “আমি তোমায় ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দিতে পারি, যদি তুমি এই পৃথিবী মন্তকে ধারণ করিতে পার ।” তপোবলে গর্জিত বিশ্বামিত্র বলিলেন, “আপনি পৃথিবী ত্যাগ করুন, আমি মন্তকে ধারণ করিতেছি ।” অনন্তদেব বলিলেন, “ধারণ কর, আমি ত্যাগ করিলাম ।” শূন্যে পৃথিবী ঘুরিতে ঘুরিতে পড়িতে লাগিল ।

বিশ্বামিত্র ডাকিয়া বলিতেছেন, “আমি সমস্ত তপস্তার ফল অর্পণ করিতেছি, পৃথিবী ধূত হউক—।” তথাপি পৃথিবী স্থির হইল না । উচ্চৈঃস্বরে অনন্তদেব বলিলেন, “বিশ্বামিত্র, এত তপস্তা কর নাই যে পৃথিবী ধারণ করিবে, কখনও কি সাধুসঙ্গ করিয়াছ ? তাহার ফল অর্পণ কর ।” বিশ্বামিত্র বলিলেন, “এক মুহূর্ত বশিষ্ঠের সঙ্গ করিয়াছি ।” অনন্তদেব বলিলেন, “তবে সেই ফল অর্পণ কর ।” বিশ্বামিত্র বলিলেন, “আমি সেই ফল অর্পণ করিতেছি ।” ধীরে ধীরে পৃথিবী স্থির হইল । তখন বিশ্বামিত্র বলিলেন, “এখন আমায় ব্রহ্মজ্ঞান দিন ।” অনন্তদেব বলিলেন, “মূর্খ বিশ্বামিত্র, ধীর এক মুহূর্ত সঙ্গফলে পৃথিবী ধূত হইল, তাঁহাকে



ছাড়িয়া আগার নিকট ব্রহ্মজ্ঞান চাহিতেছ ?” বিশ্বামিত্রের ক্রোধ হইল ; ভাবিলেন, বশিষ্ঠদেব তাঁহাকে তবে প্রতারণা করিয়াছেন। দ্রুত তাঁহার নিকট গমন করিয়া বলিলেন, “আপনি আমার কেন প্রতারণা করিলেন ?” বশিষ্ঠদেব অতি দীর্ঘ-সস্তীর্ণভাবে উত্তর দিলেন, “আমি যদি তখন তোমার ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দিতাম, তোমার তাহাতে বিশ্বাস হইত না, এখন তোমার বিশ্বাস হইবে।” বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের নিকট ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা করিলেন।

ভারতে এমন ঋষি ছিলেন, এমন সাধু ছিলেন, এমন ক্ষমার আদর্শ ছিল। এমন তপস্তার বল ছিল, যাহার দ্বারা পৃথিবী ধারণ করা যায়। ভারতে আবার সেইরূপ ঋষি জন্মগ্রহণ করিতেছেন, যাহাদের প্রভায় পূর্ক তন ঋষিদিগের জ্যোতি হীনপ্রভ হইয়া যাইবে, যাহারা আবার ভারতকে পূর্কগৌরব হইতে অধিকতর গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করিবেন।

শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ।



বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান

গত কর বৎসর বাঙ্গালা ভাষার যে সকল বিজ্ঞান-বিষয়ক পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার প্রায় সমস্তগুলিই পাঠ্যপুস্তকশ্রেণীভুক্ত। হই একখানি মাত্র সাধারণ পাঠোপযোগী। ইহা আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, আমাদের বর্তমান সাহিত্য হইতে বিজ্ঞান স্থানচ্যুত হইয়াছে। বিজ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ভারতবর্ষ হইতে নির্কাসিতা হইয়া ইউরোপমণ্ডলে ও আসিয়ার পূর্ব প্রান্তে আশ্রয় লইয়াছেন। বাস্তবিক ঘাট সত্ত্বেও বৎসর পূর্বেও বাঙ্গালা সাহিত্যের এ প্রকার দুর্গতি হয় নাই। বাঙ্গালা সাময়িক পত্রিকায় তখন বিজ্ঞান স্বীয় স্থান অধিকার করিয়াছিল। অক্ষয়কুমার 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র পদার্থবিজ্ঞান-বিষয়ক যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছিলেন, রাজেন্দ্রলাল 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' ভূতত্ত্ব, প্রাণিবিজ্ঞা ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান-বিষয়ক যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যের অস্থিমজ্জাগত হইয়া থাকিবে। বাঙ্গালা সাহিত্যে বিজ্ঞানের বাহা কিছু সমাবেশ হইয়াছে, তজ্জন্ত এই দুই মহাশয়ার নিকটে আমরা চিরঞ্জয় থাকিব। ইহাদের কিছু পূর্বে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় লর্ড হার্ডিঞ্জের আনুকূল্যে Encyclopaedia Bengalensis অথবা 'বিজ্ঞানকরঙ্গম' আখ্যা দিয়া কয়েক খণ্ড পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ করেন। ইহাতে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও দর্শনতত্ত্ব সকল প্রকাশিত হইত। রাজেন্দ্রলাল ও কৃষ্ণমোহন উভয়েই অশেষশাস্ত্রবিৎ ও নানাভাবাভিজ্ঞ ছিলেন।

যদিও তাঁহাদের রচনা অক্ষয়কুমারের রচনার দ্বারা স্থায়ী প্রচলিত সাহিত্যের (classics) মধ্যে গণ্য হইবে না, তথাপি তাঁহারা বঙ্গ-সাহিত্যের অভিন্ন পথপ্রদর্শক বলিয়া চিরকাল যাত্ৰ হইবেন। কিন্তু ইহাদের পূর্বেও বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি ও প্রসারের জন্য বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি হইয়াছিল। শ্রীরামপুরের মিশনারীগণকে বর্তমান বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের জনদাতা বলিলেও অত্যাক্তি হয় না; তাঁহারাষ্ট আবার বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান প্রচারেরও প্রথম প্রবর্তক। আমাদের জাতীয় অভিমান আঘাতপ্রাপ্ত হয় বলিয়া একথা আমাদের ভুলিয়া যাইলে, ‘খৃষ্টানী বাঙ্গালা’ বলিয়া তাঁহাদের কৃত কার্যকে উড়াইয়া দিলে চলিবে না; ঐতিহাসিক সত্যের ও সত্যের তুলনায় হস্তে করিয়া বাহার বে সম্মান প্রাপ্য, তাহাকে তাহা প্রদান করিতে হইবে।

১৮২৫ খৃঃ অব্দে উইলিয়ম ইয়েট্‌স্ প্রথমে ‘সার পদার্থ-বিজ্ঞান’ বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত করেন। ইহাতে পদার্থবিজ্ঞান ভিন্ন মৎস্য, পক্ষী, পক্ষী ও অন্যান্য জীবের বর্ণনা আছে। এতদ্ভিন্ন ‘কিমিয়া বিজ্ঞানসার’ নামক রসায়নবিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় গ্রন্থ শ্রীরামপুর হইতে প্রচারিত হয়। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র-সুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় এই পুস্তকের সমিতির সমালোচনা করিয়াছেন। ১৮১৮ খৃঃ অব্দে শ্রীরামপুরের মিশনারীগণ ‘সমাচার-দর্পণ’ নামে সর্বপ্রথম বাঙ্গালা সংবাদপত্র প্রকাশিত করেন, এবং তাঁহারাষ্ট আবার ‘দিগদর্শন’ নামক নানাতত্ত্ববিষয়িণী পত্রিকা পরিচালিত করিতেন। এই পত্রিকাতেই বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার প্রথম সূত্রপাত হয়।



ইহার পর ১৮২৮ খৃঃ অব্দে ‘বিজ্ঞান-অনুবাদ-সমিতি’ • নামে একটি সমিতি স্থাপিত হয়। প্রোফেসর উ’ নু এই সমিতির সভাপতি নিযুক্ত হন ও উক্ত সমিতির চেষ্ঠার ‘বিজ্ঞান-সেবধি’ নামক গ্রন্থের ১৫ খণ্ড প্রকাশিত হয়। ইহার পর ১৮৫১ খৃঃ অব্দে ‘বাক্সালা সাহিত্য-সমিতি’ † নামে আর এক সমিতি স্থাপিত হয়। বাক্সালা সাহিত্যের উন্নতি ও প্রসার এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য হইলেও বাহাতে বাক্সালীর অন্তঃপুরে জ্ঞানালোক প্রবেশ করিতে পারে তাহা ইহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। মহাত্মা বেথুন ও বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এই সভার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন; এতদ্বির গবর্নমেন্টে মাসিক ১৫০০ টাকা দিয়া ইহার আনুকূল্য করিতেন। এই সভার উদ্যোগেই ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র ‘বিবিধার্থ সংগ্রহ’ প্রকাশ করেন। মহামতি হড্‌সন্ প্র্যাট্ এই সমিতির স্থাপয়িতাদিগের মধ্যে অন্যতম উদ্যোগী সভ্য ছিলেন। তিনি উক্ত সমিতির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার মূল মর্ম্ম এই .—

“বাক্সালার অধিবাসীদিগকে ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা দিয়া পাশ্চাত্য বিজ্ঞানাদিতে ব্যুৎপন্ন করার আশা একেবারেই অসম্ভব। সুতরাং জাতীয় ভাষায় ইহাদিগের শিক্ষার পথ প্রসার্ত্তর করা কর্তব্য। এই নিমিত্ত বাক্সালা সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধন করা একান্ত প্রয়োজনীয়। • • ইহাদের নিমিত্ত সরল সুখপাঠ্য গ্রন্থ প্রচার করিয়া পাঠ-লিপ্সার সৃষ্টি করিতে হইবে। জ্ঞানার্জনের নিমিত্ত তৃষ্ণা বৃদ্ধি করিতে হইবে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে অন্ন মূল্যের গ্রন্থ প্রচার করিতে হইবে।

• Society for translating European Sciences.

† Vernacular Literary Society.



সেই সকল গ্রন্থে বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য ও মানবশরীরতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় সহজ ও চিত্তাকর্ষী প্রবন্ধ থাকিবে। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য-সম্বন্ধেও প্রবন্ধাদি লিখিয়া প্রচার করিতে হইবে। * * * * এই সকল প্রয়োজন-সাধনের নিমিত্ত সহজ ও সরল সাহিত্য-প্রচার অতি আবশ্যিক। এই সমিতিতে এই কার্যের ভার গ্রহণ করিতে হইবে। * * *

বিজ্ঞান প্রচার-সম্বন্ধে এই সমিতির আশা তাদৃশী ফলবতী হয় নাই। সতেরখানি পুস্তক প্রকাশের পর সমিতি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, গল্প ও আনন্দজনক পুস্তকই এদেশের পাঠক-সাধারণের অধিকতর প্রিয়। এতদ্ব্যতীত অপর শ্রেণীর পুস্তক আদৌ আদরে গৃহীত হয় না।

এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা উচিত যে, কলিকাতা, হুগলী ও ঢাকা—এই তিন স্থানে তিনটি ন্যাশ্যাল বিজ্ঞানীয় স্থাপিত হয়। এই সকল বিভাগয়ের ছাত্রদিগের ব্যবহারার্থ পদার্থবিজ্ঞা, প্রাণিবিজ্ঞা, জ্যামিতি, ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ক অনেকগুলি বাঙ্গালা পুস্তক প্রণীত হয়। ইহা ভিন্ন ছাত্রবৃত্তি ও মাইনর পরীক্ষার উপযোগী পদার্থবিজ্ঞা, উদ্ভিদবিজ্ঞা, ও রসায়নবিজ্ঞা-বিষয়ক অনেক পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। মেডিক্যাল স্কুলসমূহের পাঠ্য গ্রন্থবিজ্ঞা, শারীরবিজ্ঞা, রসায়নবিজ্ঞা-ঘটিত অনেকগুলি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থও বাঙ্গালা ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থ প্রচারেও যে বাঙ্গালা ভাষায় অনেকটা উন্নতি হইয়াছে তাহাষরে কোন সন্দেহ নাই।

এখন আলোচনার বিষয় এই যে, অষ্ট শতাব্দীর অধিককাল ধরিয়া বাঙ্গালা ভাষায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থসকল প্রচারিত হইতেছে,



কিন্তু ইহাতে বিশেষ কিছু ফললাভ হইয়াছে কি না। বিজ্ঞান-বিষয়ক যে সকল পুস্তকের কিছু কাঁটিয়া আছে, তাহা ‘পাঠ্যপুস্তক-নির্বাচন কমিটি’র • নির্বাচিত তালিকাভুক্ত, সুতরাং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার সোপান-স্বরূপ। একাদশ বা দ্বাদশ-বর্ষীয় বালক-দিগের গলাধঃকরণের জন্ত যে সকল বিজ্ঞানপাঠ প্রচারিত হইয়াছে, তদ্বারা প্রকৃত প্রস্তাবে দেশের ইষ্ট কি অনিষ্ট সাধিত হইতেছে তাহা সঠিক বলা যায় না। আসল কথা এই, আমাদের দেশ হইতে প্রকৃত জ্ঞানস্পৃহা চলিয়া গিয়াছে। জ্ঞানের প্রতি একটা আন্তরিক টান না থাকিলে কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই তিনটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার বিশেষ ফললাভ হয় না। যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত বিদ্যালয়সমূহে বহুকাল হইতে বিজ্ঞান-অধ্যাপনের ব্যবস্থা হইয়াছে, তথাপি এই জ্ঞান-স্পৃহার অভাবেই, বিজ্ঞানের প্রতি আন্তরিক অমুরাগসম্পন্ন ব্যুৎপন্ন ছাত্র আদৌ দেখিতে পাওয়া যায় না; কেননা ঘোড়াকে জলাশয়ের নিকটে আনিলে কি হইবে?—উহার যে তৃষ্ণা নাই! পরীক্ষাপাসই বেখানকার ছাত্রজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য, সেখানকার যুবকগণের দ্বারা অদীত বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞান-শাখা-প্রশাখাদির উন্নতি হইবে এরূপ প্রত্যাশা করা নিতান্তই বৃথা। সেই সকল মৃতকর, স্বাস্থ্যবিহীন যুবকগণের মধ্যে জাতীয় ভাষার উন্নতি-বিধান কিংবা যে কোনও প্রকার হ্রস্ব ও অধ্যবসায়-মূলক কার্যের সাফল্য-সম্পাদনের আশা নিতান্তই সুদূরপরাহত। বস্তুতঃ পরীক্ষা পাস করিবার নিমিত্ত এরূপ হাত্তোদীপক উন্নয়নতা পৃথিবীর অন্ত কুদ্বাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। পাস করিয়া সরস্বতীর নিকটে চিরবিদায়গ্রহণ,—শিক্ষিতের এরূপ জঘন্য প্রবৃত্তি



আর কোন দেশেই নাই। আমরা এদেশে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করিয়া জানী ও শুণী হইয়াছি বলিয়া আশ্বাদরে ক্ষীত হই, অপরাপর দেশে সেই সময়েই প্রকৃত জ্ঞানচর্চার কাল আরম্ভ হয়। কারণ, সে সকল দেশের লোকের জ্ঞানের প্রতি বৎসর অশ্রুগাণ আছে, তাহারা একথা সম্যক উপলব্ধি করিয়াছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার হইতে বাহির হইয়াই জ্ঞান-সমুদ্র-মগ্ননের প্রশস্ত সময়। আমরা দ্বারকেই গৃহ বলিয়া মনে করিয়াছি, সুতরাং জ্ঞানমন্দিরের দ্বারেই অবস্থান করি, অভ্যস্তরত্ন রত্নরাজি দৃষ্টিগোচর না করিয়াই ক্ষুণ্ণমনে প্রত্যাবর্তন করি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক পত্রিকা পরীক্ষোত্তীর্ণগণের নামে পরিপূর্ণ দেখিলে চক্ষু জুড়ায়। এক বৎসর হয়ত উদ্ভিদবিজ্ঞান দশজন প্রথম শ্রেণীতে এম্. এ. পাস হইলেন। কিন্তু অগ্নিফুলিদ এখানেই নির্দোষপ্রাপ্ত হইল; সে সমুদয় যুবকগণকে দুইএক বৎসর পর আর বিজ্ঞানমন্দিরের প্রাঙ্গণেও দেখিতে পাওয়া যায় না। পিপাসানুগ্ৰ জ্ঞানালোচনার এইত পরিণাম! আপানের জ্ঞানতৃষ্ণা আর আশ্বাদের যুবকগণের তৃষ্ণা দুই তুলনা করিলে অবাক হইতে হয়। সম্প্রতি সম্ভাবনীতে কোন বাঙ্গালী যুবক জাপানে পদার্পণ করিয়াই বাহা লিখিয়াছেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল:—

“জাপানীদের জ্ঞানতৃষ্ণা বেক্ষণ, অন্য কোন জাতির সেরূপ আছে কিনা সন্দেহ। কি ছোট, কি বড়, কি ধনী, কি নিধন, কি বিদ্বান, কি মুর্থ, সকলেই নূতন বিষয় জানিতে এতদূর আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে যে, ভাবিলে অবাক হইতে হয়। জাহাজ হইতে জাপানে পদার্পণ করিবার পূর্বে যে আভাস পাইয়াছিলাম, তাহাতেই মনে করিয়াছিলাম এরূপ জাতির উন্নতি অবশ্যস্তাবী। • •



চাকরানীগুলি পর্য্যন্ত বাহিরের বিষয় সম্বন্ধে যতটা খোঁজ রাখে, আমাদের দেশের অধিকাংশ ভদ্রমহিলাই তাহা জানেন না।”

এখন একবার ফ্রান্সের দিকে তাকাইয়া দেখা যাউক। ফরাসী-বিপ্লবের কিঞ্চিৎ পূর্বে এই জ্ঞানপিপাসা কি প্রকার বলবতী হইয়াছিল তাহা বাকুল্ (Buckle) সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন। যখন লাবোয়াসিয়ে, লাল্যও, বাকো প্রভৃতি মনীষিগণ প্রকৃতির নবতর সকল আবিষ্কার করিয়া সরল ও সরস ভাষায় জনসাধারণের নিকটে প্রচার করিতে লাগিলেন, তখন ফরাসী সমাজে ধনীর রম্য হর্ষো ও দরিদ্রের পর্ণকুটীরে ছলুহুল পড়িয়া গেল। ইহার পূর্বে বিজ্ঞান-সমিতিতে যে সকল বৈজ্ঞানিক বিষয় আলোচিত হইত, তাহা শুনিবার জন্য দুই চারিজন বিশেষজ্ঞ মাত্র উপস্থিত হইতেন। কিন্তু এই নূতন বারতা শুনিবার জন্য সকল শ্রেণীর লোক ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। যে সকল সম্ভ্রান্ত মহিলা ইতর লোকের সংস্পর্শে আসিলে নিজকে অপবিত্র জ্ঞান করিতেন তাহারাই পদযম্যাদা ছুলিয়া লেকচার শুনিবার জন্য নগণ্য লোকের সহিত যেসাদেশি করিয়া বসিবার একটু স্থান পাইলেই চরিতার্থ হইতেন।

সম্প্রতি এক ধৃষা উঠিয়াছে যে, বহু অর্থব্যয়ে যন্ত্রাগার (Laboratory) প্রস্তুত না হইলে বিজ্ঞান শিক্ষা হয় না। কিন্তু বাঙ্গালা দেশের গ্রামে ও নগরে, উদ্ভানে ও বনে, প্রান্তরে ও ভগ্নস্থপে, নদী ও সরোবরে, তরুকেটরে ও গিরিগহ্বরে, অনন্ত পরিবর্তনশীল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের অভ্যস্তরে জ্ঞানপিপাসুর যে কত প্রকার অমুস্কের বিষয় ছড়াইয়া রহিয়াছে, তাহা কে নির্ণয় করিবে? বাংলার দরেল, বাংলার পাণিয়া, বাংলার ছাতারের জীবনের কথা কে লিখিবে? বাংলার মশা, বাংলার সাপ, বাংলার নাছ, বাংলার



কুকুর, ইহাদের সম্বন্ধে কি আমাদের জানিবার কিছুই বাকী নাই ? এদেশের সোদাল, বেল, বাবুলা ও শ্বেতভার কাহিনী শুধু কি ইউরোপীয় লেখকদিগের কেতাব পড়িয়াই আমাদেরকে শিখিতে হইবে ? এদেশের ভিন্ন ভিন্ন কৃষিপ্রণালী, প্রাচীন ভিন্ন ভিন্ন ক্রীড়াপদ্ধতি এসবের ভিতরে কি আমাদের জ্ঞাতব্য কিছুই থাকিতে পারে না ?

রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞানি শাস্ত্র সম্বন্ধে যাহাই হউক না কেন, প্রাণিতত্ত্ব, উদ্ভিদবিজ্ঞান এবং ভূতত্ত্ববিজ্ঞান মৌলিক গবেষণা যে বিরাট যজ্ঞাগারের অভাবে কতক দূর চলিতে পারে, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

ছুরি, কাঁচি, অণুবীক্ষণ ইত্যাদি সরঞ্জাম কিনিতে ১০০ টাকার অধিক মূল্য লাগে না ; কিন্তু গোড়াতেই গলদ, জ্ঞানের পূণ্য পিণাসা কোথায় ? এদেশের প্রকৃতি-বিজ্ঞানী যুবক দেখিয়াছেন, এখন একবার ইউরোপের প্রকৃতি-বিজ্ঞানী যুবকের কথা শুনুন। বিজ্ঞাবিষয়ক উপকরণ আহরণের জন্য জ্ঞানপিপাসু ইউরোপীয় যুবক আফ্রিকার নিবিড় খাপদসম্মূল অরণ্যে প্রাণ হাতে করিয়া ভ্রমণ করিয়া বেড়ান, বৈজ্ঞানিক তথ্যসমূহের অহুস্কানের নিমিত্ত আহার-নিদ্রা তুলিয়া কার্য্য করিতে থাকেন। ভৌগোলিক কখন তাঁহাদিগকে বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না। জ্ঞানপিপাসা তাঁহাদের হৃদয়ের একমাত্র আসক্তি। আপনারা অনেকেই জানেন, উদ্ভিদনিচয়-আহরণের জন্য সার জোসেফ্ হকার ১৮৪৫ খৃঃ অব্দে কত বিপদ আলিঙ্গন করিয়া হিমালয় পর্ব্বতের বহু উচ্চদেশ পর্য্যন্ত আরোহণ করিয়াছিলেন। সে সময়ে দার্জিলিং-হিমালয় রেলপথ হয় নাই। কাজেই তখন হিমাচলারোহণ এখনকার



মত স্মরণ ছিল না। তুসারমণ্ডিত মেরুপ্রদেশের প্রাকৃতিক অবস্থা জানিবার জন্ত কত অর্থব্যয়ে কতবার অভিযান প্রেরণ করা হইয়াছে; কত বৈজ্ঞানিক তাহাতে প্রাণ বিসর্জন দিয়াছেন। পাশ্চাত্য দেশের কি অদম্য উৎসাহ! কি অতৃপ্ত জ্ঞানপিপাসা! বখন ন্যান্সেন (Nansen) ফিরিয়া আসিলেন, সমগ্র ইউরোপ ও আমেরিকা তাহার ভ্রমণকাহিনী শুনিবার জন্ত ব্যাকুল।

কল কথ্য এই যে, আমরা যত দিন স্বাধীনভাবে নূতন নূতন গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়া যাতৃভাষায় সেই সকল তথ্য প্রচার করিতে সক্ষম না হইব, ততদিন আমাদের ভাষার এই দারিদ্র্য ঘুচিবে না। প্রায় সহস্র বৎসর ধরিয়া হিন্দুজাতি একপ্রকার মৃতপ্রায় হইয়া রহিয়াছে। যেমন ধনীর সন্তান পৈতৃক বিষয়-বিভব হারাইয়া নিঃস্ব ভাবে কালাতিপাত করেন অথচ পূৰ্ব্ব-পুরুষগণের ঐশ্বর্যের দোহাই দিয়া গর্বে ক্ষৌভ হন, আমাদেরও দশা সেইরূপ। লোকি বলেন যে, খৃঃ অঃ ষাটশ শতাব্দী হইতে ইউরোপখণ্ডে স্বাধীন চিন্তার স্রোত প্রথম প্রবাহিত হয়; প্রায় সেই সময় হইতেই ভারতগগন তিমিরাচ্ছন্ন হইল। অধ্যাপক বেবর (Weber) যথার্থই বলিয়াছেন ভাষ্করাচার্য ভারত-গগনের শেষ নক্ষত্র। সত্য বটে আমরা নব্য-স্বৃতি ও নব্য-স্ত্রাবের দোহাই দিয়া বাল্যলৌ-মস্তিক্ষের প্রথরতার ল্লাঘা করিয়া থাকি; কিন্তু ইহা আমাদের শ্রবণ রাখিতে হইবে যে, যে সময়ে রবুনাথ, গদাধর ও জগদীশ প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায়গণ বিবিধ জটিল টীকা-টিপ্পনি রচনা করিয়া টোলের ছাত্রদিগের আতঙ্ক উৎপাদন করিতেছিলেন, যে সময়ে এখানকার জ্যোতির্বিদ্যাবৃন্দ প্রাতে দুই দণ্ড দশ পল গতে



নৈমিত্ত কোণে বায়স কা কা রব করিলে সে দিন কি প্রকার যাইবে ইত্যাদি বিষয় নির্ণয়-পূর্বক কাকচরিত্র রচনা করিতে-
ছিলেন, যে সময় এদেশের অধ্যাপকবৃন্দ “ভাল পড়িয়া টিপ করে,
কি টিপ করিয়া পড়ে” ইত্যাকার তর্কের মীমাংসায় সভাস্থলে
ভীতি উৎপাদন করিয়া সমবেত জনগণের অন্তরে শাস্তি-ভয়ের
আয়োজন করিতেছিলেন, সেই সময়ে ইউরোপখণ্ডে গ্যালিলিও,
কেপ্লার, নিউটন প্রভৃতি মনস্বিগণ উদীয়মান হইয়া প্রকৃতির নূতন
নূতন তত্ত্ব উদ্ঘাটন পূর্বক জ্ঞানজগতে যুগান্তর উপস্থিত করিতে-
ছিলেন ও মানবজীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছিলেন।

তাই বলি, আজ সহস্র বৎসর ধরিয়া হিন্দুজাতি নিস্পন্দ ও
অসাড় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। বাহা হউক বিধাতার কৃপায়
হাওয়া ফিরিয়াছে; মরা গাড়ে সত্য সত্যই বান ডাকিয়াছে; আজ
বঙ্গালী জাতি ও সমগ্র ভারত নূতন উৎসাহে, নূতন উদ্দীপনায়
অনুপ্রাণিত। যে দিন রাজা রামমোহন রায় বঙ্গালীর ঘরে
জন্মগ্রহণ করিয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সম্মিলনই ভবিষ্য ভারতের
সমৃদ্ধিসোপান বলিয়া নির্দেশ করিলেন, সেই দিনই বুদ্ধি বিধাতা
ভারতের প্রতি পুনরায় শুভ দৃষ্টিপাত করিলেন। জগতের
ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে সকল
জাতি পুরাতন আচার, ব্যবহার, জ্ঞান ও শিক্ষা বিষয়ে নিতান্তই
গোঁড়া, তাহারা প্রাচীন শিক্ষার ও প্রাচীন প্রথার নামে আত্মহারা
হন, তাহারা বর্তমান জগতের জীবন্তভাবে জাতীয় জীবনে সংবেশিত
করা হঠকারিতা বলিয়া মনে করেন, তাহারা বর্তমান কালের
ইতিহাসে নগণ্য ও মৃতপ্রায়; এমন কি এই সমস্ত জাতি নূতনের
প্রবল সংঘর্ষে লুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। এ বিষয়ে



কিছুমাত্রও সন্দেহ নাই যে, বর্তমান ইউরোপের শিক্ষা অত্যন্তকাল হইল আরম্ভ হইয়াছে ; কিন্তু আমরা ইহা যেন না ভুলি যে, বর্তমান অবস্থায় ইউরোপ আমাদেরকে যোজনাবিক পশ্চাতে ফেলিয়া বিজ্ঞান ও সাহিত্যের পূর্ণোন্নতির দিকে অগ্রসর হইয়াছে ।

আমার স্বতঃই মনে হয় আমাদের এই অধোগতির কারণ পুরাতনের প্রতি এক অস্বাভাবিক ও অনেক সময়ে অহৈতুক আসক্তি ও অপরাপর জাতির গুণাবলীর প্রতি বিদ্বেষ ও অগ্রাহ্যের ভাব । এ স্থানে অবশ্য স্বীকার্য যে, আমাদের পূর্বপুরুষগণের আচার-পদ্ধতি ও শিক্ষা অনেক সময়ে বর্তমান সভ্যজাতিগণের আচার-পদ্ধতি হইতেও শ্রেষ্ঠ ছিল এবং সে সমুদয়ের প্রতি ভক্তিবিহীন হওয়া যুটতার লক্ষণ সন্দেহ নাই । কিন্তু কালের পরিবর্তনে যেমন বাহ্য জগতে, তেমনই মানসিক রাজ্যে, অনেক বিষয়ের আমূল পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে ।

এ স্থানে প্রসঙ্গট একটু বিশদভাবে আলোচনা করা কৰ্তব্য । আমি থাকিত হইতোহু পাছে কাহারও মনে অপ্রীতি-স্ফূর্তি করিয়া ফেলি, কিন্তু যদি স্বাধীন চিন্তা মানব যাত্রেরই পৈতৃক সম্পত্তি হয় তাহা হইলে আমাদের বলিতেই হইবে যে, পরকীর শিক্ষা ও জ্ঞানের গ্রহণেচ্ছা আমাদের আদৌ নাই । যদি থাকিত, তাহা হইলে অন্ততঃ বিজ্ঞান বিষয়ে বর্তমান ইউরোপ ও আমেরিকা আমাদের অতিক্রমণীয় হইত । এই প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য শিক্ষার সংমিশ্রণের উপরেই আমার মতে ভারতের সমৃদ্ধি নির্ভর করিতেছে । যে জাপান ত্রিশ বর্ষ পূর্বে ঘোর তমসাক্ষর ছিল, জগতে বাহার অন্তিম (ঐতিহাসিক হিসাবে) সন্দেহের বিষয় ছিল, সেই জাপান পশ্চাত্য শিক্ষা জাতীয় শিক্ষার সহিত সংযোজন করিয়া আজ



কি এক অভিনব ক্ষমতামালী জাতি হইয়া এমিয়ার পূর্ক প্রাপ্তে
বিরাজ করিতেছে।

এখন জ্ঞানজগতে যেমন তুমুল সংগ্রাম, পাখিব জগতেও
ততোধিক। নূতনের দ্বারা পুরাতনের সংস্কার করিতেই হইবে;
নচেৎ ভয় হয় ভারতভাগ্যরবি প্রভাতাকাশে উঠিয়াই অন্তমিত
হইবে। •

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়।

—

• •



দুঃখ

দুঃখের কাহিনী লইয়া আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত হইতেছি, আপনারা ভিখারী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিবেন না। ত ? দুঃখের প্রকৃতি এই যে, সে হৃদয়ের অতি নিভৃততম প্রদেশকে স্পন্দিত করিয়া আমাদের অজ্ঞাতসারে নয়নোপান্তে সমবেদনার অশ্রুবিম্ব বহিয়া আসে। দুঃখকে শত চেষ্টা করিয়াও আমরা দূরে রাখিতে পারি না। সৃষ্টের আদি হইতে যে দুঃখের করুণ গীতি ধ্বনিত হইতেছে, তাহারই বিচিত্র তান-মূর্ত্তি-না মানবের কাব্য-দর্শন-ইতিহাসকে আচ্ছন্ন, বিপ্লুত ও মহিমাম্বিত করিয়া রাখিয়াছে।

সূর্যাস্তের স্নিগ্ধ করজাল কেমন সাক্ষ্য মেঘমালাকে বিদ্ধ, বিদীর্ণ ও পরিব্যাপ্ত করিয়া তাহাকে মানাবর্ণ-সমাবেশে বিচিত্র করিয়া তুলে, দুঃখ তেমনি মানবজীবনকে অসংখ্যভাবে ঘিরিয়া ঘিরিয়া তাহাকে স্নিগ্ধ, গম্ভীর ও করুণ করিয়া দেয়। তাহার চেতনা, তাহার কর্ম-প্রবণতা, তাহার বেদনা, তাহার প্রবন্ধ, তাহার মহিমা, তাহার উদারতা, তাহার আশাভরসা, তাহার হাহাকার—শতদিকে শতভাবে এই দুঃখের চিরপুরাতন অথচ চিরনূতন কাহিনী বহন করিতেছে।

তাই মানবের ভাবা এই এক দুঃখেরই অনন্ত অভিব্যক্তিতে পরিপূর্ণ না হইবে কেন ? দুঃখ হইতেই যে ভাবার জন্ম। শিশুর ক্রন্দন যে তাহার পরিশুদ্ধ ভাবার অগ্রদূত। ক্রৌঞ্চ-মিথুনের দুঃখে মুহমান হৃদয় হইতে যে শোক বা শ্লোকের জন্ম



হইয়াছিল, সেই বিশ্বব্যাপিনী সমবেদনাই কবিতার আদি জননী। সেই জন্তই বোধ হয় ভাষা তাহার জননীকে প্রায় ভুলিয়া থাকে না। সহস্র কর্ণে সহস্র রাগিনীতে ভাষা ও কাব্য হৃৎকের গীতি গাহিয়া সমস্ত চরাচর বিশ্বকে মুগ্ধ, স্তম্ভিত করিয়া রাখিয়াছে। তাই হৃৎক লইয়াই মানবের কাব্য। নির্দোষিত স্বর্কের বিলাপ, স্ত্রীরাধিকার বিরহ, ছায়ালেটের জীবনে বিম্পূহা, নিফলক ডেস্‌ডিমনার শোকারহ পরিণাম, পতিরতা ভ্রমরের লাঞ্ছনা—এ সকলই সেই বিশ্ব-বেদনার এক একটি মূর্ছনা। সমস্ত মানবের জীবনের মধ্য দিয়া হৃৎক যে অব্যাহত শ্রোতটি বহাইয়া দিয়াছে, তাহারই এক একটি ক্ষুদ্র বৃহৎ তরঙ্গ কবিতার ছন্দে ছুটিয়া উঠে, আর সেই বিশ্বব্যাপিনী বেদনার স্বাক্ষরে সমস্ত মানবজীবন পূর্ণ ও পরিব্যাপ্ত হইয়া যায়।

সমস্ত সৌরজগৎ যেমন সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া আবর্তিত হইতেছে, তেমনই অস্ত্র দিক্ দিয়া দেখিলে বোধ হয়, যেন মানব-জীবনকে কেন্দ্র করিয়া সমস্ত বিশ্ব-চরাচর দিবারাত্র ঘুরিতেছে। এই বিস্তৃত পরিধির মধ্যে বিন্দুমেয় মনুষ্য-জীবন আধ্যাত্মিক বলে সমগ্র বস্তুকে আকর্ষণ করিতেছে। সমগ্র ইহলোক ও পরলোক মানববুদ্ধির বিষয়ীভূত হইয়া প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে মানবের প্রয়োজন-সাধন করিতেছে। জড়বস্তু জড়ের কোনও প্রয়োজন-সাধন করে কি না সন্দেহহীন, কিন্তু ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, জগতের বাবস্তীয় বস্তু মানবের ভাগ্যের সহিত কোনও না কোনও প্রকারে জড়িত আছেই আছে।

এই যে এক বিপুল বিশ্বব্যাপী নিগূঢ় আকর্ষণ, ইহাকে এক হিসাবে বিশ্বের কেন্দ্রগামিনী শক্তি বলা যাইতে পারে। মানব



এই বহুধা বিভিন্ন শক্তি-সম্ভব অবিভ্রাম স্বাভাবিকভাবে সর্বদা স্পন্দিত, জাগ্রত ও প্রবুদ্ধ। এই যে এক অচেনা, অজানা, বিপুল ব্রহ্মাণ্ড-শক্তি-নিচয়ের মধ্যে আবিস্কৃত হইয়া মানব ধীরে ধীরে আপনার শক্তিসঞ্চয়-পূর্বক অল্প সকল শক্তিকে অভিভূত করিবার নিয়ন্ত্রণে কখনও উঠিতেছে, কখনও বা পড়িতেছে, ইহাই মানবের সংসার, ইহাই মানবের ভাগ্য। সুখ এবং দুঃখ এই ভাগ্যেরই অবস্থা-বিপর্যয়। কখনও সুখরবির খরকিরপে সে ভাগ্য প্রসন্ন, নির্মল, জ্বলন্তমান; আবার কখনও সে সুখ কেন্দ্রীয় উষ্ণতার জ্বালায় কৃত্রিম গ্লান আলোকে দুঃখের তমিস্র কথঞ্চিৎ অবসান করিয়া দেয়।

ব্যক্তিগত এবং জাতীয় জীবন এই ভাগ্যবিপর্যয়ের অতি আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত চকুর সমক্ষে উদ্ভূত করে। একদিকে যেমন বীণুর নিষ্ঠুর পরিণাম, সক্রান্তিসের অপ্রত্যাশিত বিধ্বন, রাজপুত্র সিদ্ধার্থের সংসার ত্যাগ, সিদ্ধার্থের হত্যা, নেপোলিয়নের নির্বাসন, অপরদিকে তেমনি পারস্তের পতন, উদ্ধার জ্বালা গ্রীসের উত্থান ও বিলয়, রোমের গৌরবান্বিত মধ্যাহ্নে সূর্যাস্ত—চিরাভিশাপগ্রস্ত ভারতের কথা আর তুলিয়া কাজ নাই—এ সকল ব্যক্তিগত ও জাতীয় দুঃখের কাহিনী বহন করিয়া ইতিহাস যুগযুগান্তর ধরিয়া শোকাঙ্কপূর্ণ ব্রতচারিণী বিধবার জ্বালা চলিয়াছে। তাহার প্রতিপন্ন দুঃখের তপস্বীত্বে ত্রিষ্মাণ। যেখানে কোনও ব্যক্তি বা জাতিবিশেষের আকস্মিক উন্নতি চকু খলসিয়া দিতেছে, সেইখানেই এক বিরাট অধঃপতনের বিপুল আয়োজনের আভাসও অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। যেখানে চরিত্রের মহিমায়, শৌর্য্যের গৌরবে হৃদয় আশাবিত্ত হইয়া উঠে,



সেইখানে আবার কলঙ্ককালিমার, ভগ্নহৃদয়ের হাহাকারে দিক্ আচ্ছন্ন হয়।

মানবের ইতিহাস আলোচনা করিলে দুঃখের বিশাল ছায়ায় শিহরিয়া উঠিতে হয়। মনে হয়, যেন দুঃখের বিরাটমূর্তি মহাকায় কলোসাসের মত পদবরের দ্বারা মানবের ভূত ও ভবিষ্যৎকে অধিকৃত করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। যতই আমরা উজ্জলতর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করি না কেন, দুঃখের ছায়া অজ্ঞাতসারে তাহাকে মলিন করিয়া দেয়। সুখবাদের (optimism) একটি প্রবল বাধা এই যে, সুখ বড় অনিশ্চিত, দুঃখের জ্বালা নিশ্চিত সংসারে আর কিছু আছে কি না সন্দেহ। সুখের সমষ্টি ও দুঃখের সমষ্টি মিলাইয়া দেখিলে সুখসমষ্টিরই আধিক্য দৃষ্ট হয়—এই ধারণাই সুখবাদের স্তম্ভ-স্বরূপ। কিন্তু সুখ ও দুঃখের “সমষ্টি” আদৌ করা যায় কি না, তাহা গভীর সন্দেহের বিষয়। অতীত সুখ এবং বর্তমান সুখ যখন একই মাপকাঠির দ্বারা স্থিরীকৃত হইতে পারে না, অবস্থা ও কালভেদে যখন সুখ-দুঃখের পরিমাণ ও প্রকৃতি অত্যন্ত পরিবর্তিত হইয়া যায়, তখন তাহাদের যোগফল তুলনা করা অসম্ভব বলিয়াই ত মনে হয়। আর একটি অতি গুরুতর কথা এই যে, সুখের অহুত্ব অথবা দুঃখের অহুত্ব বোধ হয় মানব-প্রকৃতিতে অত্যন্ত প্রবল। দুঃখ আমাদেরকে বড় পীড়িত, ব্যথিত ও অভিভূত করে, সুখ তেমন আনন্দ দান করিতে সমর্থ নহে। সুখের মাদকতা অথবা দুঃখের তীব্রতা আমরা সমধিক অনুভব করিয়া থাকি। সেই জন্য এক দিনের, এমন কি এক দণ্ডের দুঃখ সারাজীবনের হাসিরাশিকে ম্লান ও



অকিঞ্চিংকর করিয়া দিতে পারে। সুখ বড় হৃদয়, বিলাসের সামগ্রী; অনেক সাধনা করিয়া অল্প পরিমাণে সুখ লাভ করা যায়,—সে সুখও আবার অনেক সময়ে হুঃখের সংমিশ্রণে বিশ্বাদ হইয়া যায়। হুঃখ কিন্তু চিরস্থির, অনায়াসলব্ধ এবং অকৃত্রিম।

"The still sad music of humanity"—কুবির এই বর্ণস্পর্শী বাক্যটি একটি অতি নিষ্ঠুর সত্যের আভাসমাত্র। মানুষের জীবনের সহিত হুঃখ যে কি এক নিবিড় বন্ধনে বাঁধা আছে, তাহা, যে বিধাতার বিধানে উহা নিয়ন্ত্রিত, সেই বিধাতাই কেবল বলিতে পারেন। কোন্ অনাদি অনির্বচনীয় হুঃখে এই বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে, আর কোন্ হুঃখে সমগ্র জীবের ললাটে হুঃখ লিখিত হইয়াছিল, তাহা মানবের পক্ষে চিরাক্ষয়নিকায় আবৃত। অণিকের জন্তও যদি সে রহস্যময়ী যবনিকা অপসারিত হইত। কিন্তু তাহা হয় না। হুঃখের সহিত সংগ্রাম করিয়া করিয়া যখন মানব অবসন্ন হইয়া পড়ে, তখন হুঃখের নবীন মূর্তি মৃত্যু আসিয়া ক্লান্ত অকিপঙ্ক্তি চিরমুদিত করিয়া দেয়। জীবনের প্রভাতে দিগ্বলয়ের পার্শ্বে যে ক্ষুদ্র মেঘখণ্ড সঞ্চিত ছিল; যেন তাহাই প্রসারিত হইয়া দিনমানের দীপ্তিকে চিরাক্ষকারে পরিণত করিল।

হুঃখের সহিত সংগ্রামে পরাজিত হইয়া মানুষ কখনও বিচলিত, ক্লান্ত ও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে, আবার কখনও সংসারের এই ক্রুর নির্মম উপহাস দেখিয়া চিন্তার আশ্রয় গ্রহণ করে। চিন্তা মানবের স্বাধীন বৃত্তি—সেখানে সে অনেক পরিমাণে শান্তি লাভ করিতে পারে। সেইজন্য যখন বিশ্বের সহিত কোনও



রূপে মানবের বনিয়া উঠে না, চারিদিকেই যখন লাঞ্ছনা, বেদনা, অপমান আসিয়া হৃদয়কে মথিত ও প্রেপীড়িত করিয়া তুলে, তখন মানব আপনার মধ্যে সংকট হইয়া একটুখানি হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচে। মানুষের যদি কোথাও কিছুমাত্র স্বাধীনতা থাকে, তবে তাহা এইখানে। অবশ্য চিন্তার দ্বারা হৃৎকের অবসান হইতে পারে কিনা এবং স্রবণাতীত কাল হইতে চিন্তা করিয়া মানব হৃৎকের লাঘব করিতে পারিয়াছে কিনা, তাহা ভাবিবার বিষয়। কিন্তু ইহা সত্য যে, যতদিন হইতে মানুষ হৃৎকভোগ করিতেছে, সেই হৃদুর অতীত হইতেই মানুষের চিন্তা হৃৎকের স্বরূপ ও প্রতীকার-নিরূপণে নিযুক্ত রহিয়াছে। হৃৎকের সংজ্ঞা নির্দেশ করা কঠিন। কেননা হৃৎকের জ্ঞায় আর একটি জিনিষও পৃথিবীতে নাই। হৃৎককে চিনাইয়া দিবার দরকারও হয় না।

শ্রীধগেন্দ্রনাথ মিত্র।



বাংলা সাহিত্যে দেবেন্দ্রনাথের স্থান

আমাদের মধ্যে এই ধারণা প্রচলিত আছে যে, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং অক্ষয়কুমার মস্ত, এই দুজনেই সর্বপ্রথমে বাংলা গল্পের ভাষাকে কলাবন্ধনের দ্বারা সুন্দর ও সুশৃঙ্খল করিয়া গিয়াছেন। গল্পরচনারীতির ইহারাই প্রথম প্রবর্তক

এ ধারণার মূল আমাদের মনের মধ্যে বসতই গভীর হোক না কেন, ধারণাটি যে ভুল সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। কেন নাই, তাহা বলিতেছি।

বাংলা ভাষা সংস্কৃত ভাষা হইতে উদ্ভূত হইলেও তাহার গঠন এবং প্রকৃতি যে সংস্কৃতভাষা হইতে ভিন্ন, এ কথাটা চল্লিশ বছর পূর্বে ঘাহারা বাংলা লিখিতেন তাঁহারা স্বীকার না করিলেও, এখন সকলেই স্বীকার করেন। করেন না কেবল তাঁহারা, ঘাহারা বাংলা ভাষা লেখেন না।

অবশ্য বাংলার আধুনিক সভ্যতার ভাগীদার যিনি ভগীরথ, সেই রামমোহন রায় সর্বপ্রথমে বাংলা গল্প লিখিবার বেলায় এ ভাষার গঠন যে সংস্কৃতের মত নয়, তাহা মানিয়া গিয়াছেন। ভাষার স্বাভাব্য তার গঠনের উপর নির্ভর করে জানিয়াই রামমোহন রায় যেমন বাংলা গল্প-সাহিত্যের সৃচনা করিলেন, তেমনি গৌড়ীয় ব্যাকরণ লিখিতেও প্রবৃত্ত হইলেন। রামমোহন রায়ের বাংলা-রচনায় সন্ধি বা সমাসের শিকলগুলি রীতিমত খুলিয়া ফেলা হইয়াছে, দেখিতে পাই। সমাস সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন—



একপদ গৌড়ীয় ভাষাতে বাহুল্যমতে ব্যবহারে আসে না।
বিষ্ণুসাগর ও অক্ষয়কুমার বাংলাভাষার গঠনের এই স্বাতন্ত্র্য
সম্বন্ধে রায়মোহন রায়ের যত সচেতন ছিলেন না। তাঁহারা
সংস্কৃতের অলঙ্কারের বোঝা বাংলার গায়ে চাপাইলেন; সংস্কৃত
রচনারীতির পোষাক বাংলাভাষাকে পরাইলেন।

বিষ্ণুসাগর ও অক্ষয়কুমারের এই সংস্কৃত-বহুল ভাষা যে
তখনকার শিক্ষিতসাধারণের পছন্দসই হয় নাই, তাহার প্রধান
প্রমাণ তাঁহাদের রচনাপ্রকাশের সমকালেই টেকচাঁদ ঠাকুরের
“আলালের ঘরের দুলাল” এবং কালীসিংহের “হতোম পাঁচার
নক্সা,” এ দুখানি বই একেবারে চলিত সহজ সরস বাংলায় লিখিত
হইয়াছিল। বিগত সংস্কৃত রীতি ও গম্ভীর সাধু ভাষার প্রতি-
ক্রিয়ায় এই রুঢ় গ্রাম্যরীতি ও লঘু অসাধু ভাষা বাংলা সাহিত্যে
দেখা দিল। অক্ষয় বাবু যখন “বাহুবল্ল ও তাহার সহিত মানব-
প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার” লিখিবার সময়ে “জিগীষা” “জুগোপিতা”
“জিজীবিষা” প্রভৃতি বিলৌষিকাপূর্ণ শব্দের সৃষ্টি করিতেছিলেন,
তখন শুনা যায় যে, কলিকাতার শিক্ষিত লোকদের বাড়ীতে ঐ
সব শব্দের সঙ্গে ‘চিট্‌টীমিষা’ প্রভৃতি শব্দ যোগ করিয়া হাসাহাসি
হইত। প্যারীচাঁদ মিত্র (টেকচাঁদ ঠাকুর) রাধানাথ ঞ্শিকদারের
সঙ্গে মিলিয়া “মাসিক পত্রিকা” নাম দিয়া সহজ বাংলায় লিখিত
একখানি কাগজও বাহির করেন।

অতএব, বিষ্ণুসাগর ও অক্ষয়কুমারের সংস্কৃতবহুল ভাষার
প্রতিক্রিয়াতেই এই আলালী ভাষা দাঁড়ায়, একথা নিঃসংশয়ে
বলা যাইতে পারে। কোন প্রতিক্রিয়ারই লক্ষণ আপোষে হইতে
পারে না। সেই কারণে আলালী ভাষা সংস্কৃতের কোন ধার



ধারে নাই। সংস্কৃতকে যথাসম্ভব বাদ দিয়া চলিবার চেষ্টা করিয়াছে।

আলালী ভাষার সৃষ্টি হইবার পর পাঁচ ছয় বৎসরের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের অভ্যুদয় হইল। বঙ্কিমই কলাসৌষ্ঠবপূর্ণ বাংলা গদ্য রচনারীতির যতদূর সম্ভব উৎকর্ষ সাধন করিলেন। তিনি সংস্কৃত-রীতি বা গ্রাম্যরীতি কোনটাকেই অবলম্বন না করিয়া ছই-রীতিকে যিশাইয়া দিলেন। সংস্কৃত শব্দ প্রচুর পরিমাণে লইলেন, কিন্তু সংস্কৃত ভাষার গঠন অনুসারে বাংলাকে গড়িতে গেলেন না। বাংলার নিজস্ব গঠনটি বজায় রাখিয়া সকল রকমের ভাব অবশেষে প্রকাশের জন্য এবং ভাষার মধ্যে কলানৈপুণ্যের অবতারণার জন্য, সংস্কৃত শব্দ ও পদ বাংলা শব্দ ও পদের সঙ্গে মিলাইয়া দিয়া তিনি বাংলাভাষাকে ঐশ্বর্যশালিনী করিলেন। এই জন্য, দ্বারকানাথ বিদ্যাবূষণ “সোম প্রকাশ” ক্রাগজে এই নূতন সাহিত্যিক দলকে “শব্দপোড়া মড়াদাহের দল” নাম দিয়া বিদ্রোহ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ লোকে বলে শব্দদাহ কিংবা মড়াপোড়া,— শব্দপোড়া এবং মড়াদাহ কেহই বলে না। এই বিদ্রোহ হইতেই বঙ্কিমী রীতির দিব্য পরিচয় পাওয়া যায়।

কিন্তু বঙ্কিম এই নূতন রচনারীতির উৎকর্ষ সাধন করিলেও, তাঁহাকে ইহার প্রবর্তক বলা যায় না। এই রচনাপদ্ধতি প্রথম কবে কাহার দ্বারা প্রবর্তিত হইল তাহা দেখিলেই এই মত খাড়া করা শক্ত হইয়া ওঠে যে, সাধু ও অসাধু ভাষার রচনাপদ্ধতি বহুকাল ধরিয়া সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবেই চর্চা করা হইয়াছিল। অবশ্য সাধুভাষার রচনারীতির নমুনা যদি কেবলমাত্র বিজ্ঞানাসুর বা অক্ষয়কুমারের লেখা এবং অসাধুভাষার রচনারীতির নমুনা “হতোষ



প্যাঁচার নক্সা"র মত বই হইতে গ্রহণ করা হয়, তবেই ঐ মত লাড়াইতে পারে। কিন্তু এটা ভুলিলে চলিবে না যে, বিজ্ঞানসাগর এবং অক্ষয়কুমারের সংস্কৃত-বহুল ভাষা ও আলাপী ভাষার মাঝামাঝি একটা ভাষা ও রচনাপদ্ধতি বিজ্ঞানসাগর ও অক্ষয়-কুমারের বাংলা সাহিত্যে অভ্যাসের পূর্বেও ছিল এবং পরেও ছিল। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই মধ্যবর্তী ভাষা ও রচনাপদ্ধতির প্রথম প্রবর্তক। রামমোহন রায়ের গন্ত কোনমতেই আধুনিক গন্ত হইতে পারে না বলিয়া তাঁহাকে প্রবর্তক বলিলাম না; যদিচ তিনিই সর্বপ্রথমে সংস্কৃতভাষা হইতে মৌড়ীয় ভাষার গঠনের স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করেন। রামমোহন রায় তাঁহার রচনার সন্ধি বা সমাসের শিকল খুলিয়া ফেলিলেও প্রাচীন ভাষাকারদিগের রচনাপদ্ধতির অনুসরণ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার রচনারীতি সাহিত্যে অচল। তাঁহাকে ভাষার শিল্পী বলা যায় না। বাংলা গদ্যের প্রথম শিল্পী দেবেন্দ্রনাথ।

• • • • •

রামমোহন রায়ের পর দেবেন্দ্রনাথ নানা তরু সম্বন্ধে তাঁহার আলোচনা ও বিচার বাংলাভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন—
 “আত্মতত্ত্ববিজ্ঞা” “ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস” “ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান”
 পড়িলেই তাহা দেখা যায়। “জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি” বইটতে
 বিজ্ঞানের অনেক কথা তাঁহাকে ব্যবহার করিতে হইয়াছে।
 পশ্চিম মহাদেশের কত তত্ত্বকে তিনি আয়সাং করিয়াছেন,
 অথচ ইংরাজী কোন শব্দকে গ্রহণ করিতে তাঁহাকে দেখা যায়
 নাই। ইংরাজী হুরুহ কথাস্থলির পরিভাষা এমন সহজে তিনি



করিয়া গিয়াছেন যে, এ সম্বন্ধে তাঁহার যে কোন রকমের কৃতিত্ব আছে তাহা মনে করাই শক্ত।

ক্রম-অভিব্যক্তি (Evolution), আপেক্ষিক সত্য (Relative Truth) প্রভৃতি কত কথা আমরা এখন ব্যবহার করিতেছি, অথচ এগুলি প্রথম তাঁহার দ্বারাই উদ্ভাবিত হয়। সংস্কৃতভাষা খুব ভাল রকম জানার দরুন, নূতন নূতন শব্দ তৈরি করিতে গিয়া ইংরাজী শব্দের কষ্টকরিত ঘো-শো-গোচের তর্জমা করিয়া তাঁহাকে কাজে সাহায্য করিতে হয় নাই। অক্ষয় বাবুর যে সকল রচনা তত্ত্ববোধিনীতে বাহির হইত, তাহা আগাগোড়া দেবেন্দ্রনাথ সংশোধন করিয়া সরল করিয়া দিতেন। তবু যথেষ্ট সরল করিয়াও তিনি শেষ পর্য্যন্ত সন্তুষ্ট হইতে পারিতেন না শুনিয়াছি। রাজনারায়ণ বাবু যে সংস্কৃতের বন্ধন হইতে বাংলাকে মুক্ত করিয়া সহজ সরল বাংলায় সব ভাব প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেন, তাহার মূলেও দেবেন্দ্রনাথের প্রভাব স্পষ্টই রহিয়াছে। দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার লেখাও রীতিমত সংশোধন করিয়া দিতেন। তাঁহার পুত্রদের মধ্যে বাংলায় দর্শনের আলোচনা করিয়া যে মনোমী বিখ্যাত হইয়াছেন, সেই প্রবোধ সাহিত্যিক বিজ্ঞেন্দ্রনাথের প্রথম পুস্তক “তত্ত্ববিজ্ঞা” এখন বাহির হয়, তখন তাঁহার পিতা দেবেন্দ্রনাথ সে বই আগাগোড়া দেখিয়া শুনিয়া সংশোধন করিয়া দেন। বাংলা গল্প সাহিত্যে উৎকৃষ্ট রচনারীতির তিনি যেমন প্রবর্তক, তেমনি পথপ্রদর্শক।

তাঁহার সমস্ত রচনাবলীর মধ্যে ভাষা ও টাইলের উৎকর্ষের দিক হইতে দেখিতে গেলে তাঁহার “আত্মজীবনী” ও “ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান” সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। আত্মজীবনীতে তাঁহার নানা জায়গায়



এখানের যে সকল চমৎকার ছবি আছে, তাহাতে ছচারিটি রেখার ছবি আঁকিবার প্রতিভা যেমন ফুটিয়াছে, সমস্ত আশপাশ খুঁটিনাটি-গুলাকে চিত্রপটে পরিষ্কার দেখিয়া ঠিকমত সাজাইয়া তুলিবার নৈপুণ্যও কম প্রকাশ পায় নাই। ছবির রস এক “জীবনস্বৃতি” এবং “পালামৌ” ছাড়া অন্য কোন বাংলা বইরে এমন করিয়া জমিয়া ওঠে নাই। যেমন বাহিরের দৃশ্যছবি, তেমনি অন্তরের অদৃশ্য অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতার ছবি, ছুই ছবিরই রস তুল্যমাত্রায় আত্মজীবনীতে পূর্ণ হইয়া দেখা দিয়াছে।

“ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যানে” ব্যাখ্যান অংশই সব চেয়ে কম—উপলব্ধির কথাই বেশি। সেই উপলব্ধির পিছনে সুদীর্ঘকালের জ্ঞানের সাধনা ও তপস্বী আছে, নানা সঞ্চয় আছে। সেই পলিতা, তেল, দীপাধার, প্রভৃতি সঞ্চয় ও সংগ্রহের ঠিক মুখে জলিতেছে একটি শিখা, অধ্যাত্ম উপলব্ধির শিখা। সুতরাং তাহার আলোকে সমস্ত লেখা এমন অপূর্ণরূপে উদ্ভাসিত হইয়াছে যে, টাইল কোথাও টিম্টিমে বা নিম্নত বা দুর্বল হইতে পারে নাই। অধ্যাত্ম উপলব্ধি কোথাও নূতন ভাবের আকারে, কোথাও সৌন্দর্য-উপলব্ধির আকারে, কোথাও ভক্তির মধুর উচ্ছ্বাসের আকারে, কোথাও দেশপ্রীতি-উদ্বেলিত স্বদেশের কল্যাণপ্রার্থনার আকারে—নানা আকারে প্রকাশ পাইয়াছে।

অজিতকুমার চক্রবর্তী।



বাক্সলার রূপ

নমো নমো বঙ্গভূমি ;—কানন-কুণ্ডলা, নদীমেখলা, শত্ৰুাঞ্চলা
ভূমি । ভূষারধবল গিরিশৃঙ্গে তুমি মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছ ।
মহাসমুদ্র তোমার চরণতল ধোত করিয়া দিতেছে । অসংখ্য
নরকঙ্কালকে বুকে লইয়া তুমি আজ কি স্বপ্ন দেখিতেছ ?

দিক্ দিগন্ত হইতে নানা শ্রোত তোমার বুকে আসিয়া
পড়িতেছে । আঘাতের পর আঘাতে বেন তুমি এক একবার
চক্ষু মেলিতেছ, আবার তত্ক্ষণাত্বে চক্ষের পাতা মুদ্রিয়া আসিতেছে ।

সর্বো তুমি দীপ্তি পাও, চক্রে তুমি হাস, অন্ধকারে তুমি মুখ
লুকাও । সৃষ্টি শ্রোতের মত চলিয়াছে । এই শ্রোতাবর্তে তুমি
কোথায় ভাসিয়া চলিয়াছ ? বিশ্বের এ অনন্ত রূপে, এই অনন্ত
মূর্তি-শ্রোতে, কি তোমার বিশেষ রূপ, কি তোমার বিশিষ্ট মূর্তি ?
আমরা তোমার সেই রূপ দেখিতে চাই । সেই রূপে আমাদের
প্রাণ যন ডুবাইতে চাই । তোমার সেই অপরূপ রূপের বালাই
লইয়া আমরা মরিতে চাই । আমরা যে তোমার সন্তান ।

বাক্সলার একটা রূপ ছিল । সে রূপ কোথায় লুকাইল ?
চক্ষু মুদ্রিলে অন্ধকার দেখি । নিরাকার—আর সমস্ত একাকার ।
কেন এমন হইল ? বাক্সালীর এ সর্বনাশ কে করিল ? বাক্সালীর
ধানে বাক্সলার রূপ জাগে না কেন ?

বাক্সালীর মনে বাক্সলার মূর্তি ফুটে না কেন ? কিসে এমন
হইল ?

প্রাণের পরতে পরতে তোমার যে মূর্তি খোদা ছিল, সে মূর্তি ঢাকা পড়িল কিসের আবরণে ? এই কুহেলিকা কোথা হইতে আসিল ? এই কুস্মাটিকা কে সৃষ্টি করিল ? তুমি কোথায় ডুবিলে ? কোন্ পাপের এ শাস্তি ? প্রসূর-সুস্নেহে, গিরিগাত্রে তোমার পদচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছ, আর বাঙ্গালীর অন্তর কি পামাণ হইতেও পামাণ ? কোন্ পথে গেলে তোমার দেখা পাইব ? তোমাকে না পাইলে আমরা কি লইয়া বাঁচিব ? তোমাকে না পাইলে বাঁচিয়া লাভ কি ?

এ যে বাঁচা মরার সন্ধিক্ষণ । এ শু লুকাইয়া থাকিবার সময় নয় । জাগ মা চৈতন্যময়ী, তুমি জাগ । বাঙ্গালীকে জাগাও । দিকে দিকে তোমার রূপ ছড়াইয়া দাও । আমরা বহুদিন পরে আর একবার সেই রূপ নয়ন মন ভরিয়া দেখি । আমাদের মানব জন্ম সফল হউক ।

বর্ণরূপা তুমি । বর্ণে বর্ণে তোমার রূপ ফুটাইয়া তুল । বিচিত্র, অনন্ত রূপে তুমি আপনাকে প্রকট কর । বিশ্বের এই দুর্ভাগ্য শ্রোতে তুমি আর একবার তোমার রূপের তরঙ্গ তুলিয়া দেখাও ।

সর্বোজ্ঞ এ কি অশান চুল্লী প্রজ্জ্বলিত করিয়া বসিয়া আছে ? হৃভিক্ষ, মহামারী, ঝড়, ঝড়াবাত—একি মূর্তি ? কেন এ মূর্তি ? অমাবস্তার ঘনাকারে মুহূর্হঃ বিজ্ঞান হুঙ্কারে এই ঘন ঘোর হুর্ঘ্যোগে দুর্ভাগা বাঙ্গালীর অদৃষ্ট লইয়া একি নিষ্ঠুর পরিহাস ?

শিবে, সর্বার্থসাধিকে, মা বঙ্গলময়ী, বাঙ্গালী এত কি অপরাধ করিয়াছে, মা ?

এই কি তোমার রূপ ? অন্ধকারকে ঘিরিয়া অন্ধকার, ব্যোম



—মহাবোম্বে তোমার তাণ্ডব নর্তন, অণু পরমাণুতে প্রতি পলে তোমার উন্মাদ পদবিক্ষেপ, চক্র হ'তে চক্রান্তরে তোমার অশ্রান্ত ভ্রমণ।

কঙ্কালের উপর কেন এ খড়্গাঘাত? ভীমা প্রলয়ঙ্করী, কঙ্কালবাসিনী, এমনি করিয়াই কি একটা জাতির অদৃষ্টকে ভাঙ্গিয়া ফেলিবি, মা?

নমস্তস্মৈ নমো নমঃ, সংবরণ কর, এ রূপ সংবরণ কর। বিংশ শতাব্দীর প্রথম প্রহরে বাঙ্গালী তোমার আর এক রূপ ধ্যান করিতে চায়।

কি সে রূপ? একদিন বাঙ্গলার সেই রূপ বাঙ্গালীরই ধ্যানে মূর্তি পাইয়াছিল। আজ বাঙ্গালী তাহা ভুলিয়াছে। তুমি বাঙ্গালীকে আজ সেই রূপ দেখাও। ‘অলচ্ছিতামধ্যগতাং’—সমগ্র দেশবাসী এই অলস্ত চিত্তার মধ্যে দাঁড়াইয়া—‘ঘোরদংষ্ট্রা করালিনী’ যা,—তোমার মহা ভয়ঙ্করা লোলজিহ্বাকে সংযত কর। তুমি আয়ুঃ দাও, বশ দাও, সৌভাগ্য দাও, পুত্র দাও, ধন দাও, বাঙ্গলার সকল দুঃখ দূর কর, বাঙ্গালীর সকল অভীষ্ট পূর্ণ কর। মুক্তকেনী,—এই অন্ধকারে তোমার দক্ষিণ অঙ্গ ব্যাপিয়া আলুলায়িত কেশরাশি লবিত হইয়া পড়িয়াছে। বাঙ্গলার ভাগ্যে এ অন্ধকার কে ঢালিয়া দিয়াছে? সমস্ত পৃথিবী ব্যাপিয়া এক মহাপ্রলয় ঢুলিয়া উঠিয়াছে। উদ্বেলিত প্রলয় পয়োধি হইতে বাঙ্গলাকে রক্ষা কর। সহস্র সূর্যোর দীপ্তি লইয়া তুমি বাঙ্গলার আকাশে উদ্ভিত হও। আমরা অন্নহীন, বস্ত্রহীন,—“বিচিত্রবসনে দেবি অন্নদান-রক্তহনবে”—হে বিচিত্রবসনপরিধানে, অন্নদাননিরতে, তুমি ভবদুঃখ-বিনাশিনী,—বাঙ্গালীর দুঃখ দূর কর। হে দেবি অন্নপূর্ণে,



তুমি চন্দ্রকে নিরোত্ত্বরণ করিয়াছ, হে সর্বানন্দবিধায়িনি, হে সর্ব-
শাস্ত্রাজ্ঞাদায়িনি,—বাক্যলীকে একটা সাম্রাজ্য দাও।

ছিল একদিন,—বাক্যলী এমন একটা সাম্রাজ্য শাসন করিয়াছে,
যাহা কোন দেশের কোন সাম্রাজ্যের চেয়ে হীন নয়। অথচ,—
অন্তে দূরের কথা—বাক্যলী-প্রধানদের মধ্যেই বা কয়জন তা
জানে। বাক্যলার সৌভাগ্যস্বৰ্ণ্য বেদিন মধ্যসঙ্গনে,—সেদিন
বাক্যলী যে ভাষায় কথা বলিত,—বড়দর্শন ঋণন করিত,—নব
নব ধর্ম জগতে প্রচার করিত,—সে ভাষা আমরা জানি না। সে
বিরাট বাক্যলী সাহিত্যের একখানি ছিন্ন পত্র আজ নিতান্ত
অপরিচিতের মত আমাদের সম্মুখে বাতাসে উড়িয়া আসিয়াছে,
আমাদের বুদ্ধিমানেরা বুদ্ধিরা উঠিতে পারিতেছেন না,—এ
সাহিত্য কার ?

সহস্র বৎসর পূর্বে যে জাতির সাম্রাজ্য ছিল, সাহিত্য ছিল,
বাধীনতা ছিল, তার ছিল না কি ? তার শিল্প ছিল, কৃষি ছিল,
বাণিজ্য ছিল, অর্ণবপোত ছিল। তার অস্ত্র ছিল, সৈন্ত ছিল,
যুদ্ধ ছিল, দিগ্বিজয় ছিল। তার সিংহাসন ছিল, তপোবন
ছিল,—মন্দির ছিল, মঠ ছিল, নগর ছিল, গ্রাম ছিল। তার
জাতি ছিল—গণ ছিল, শ্রেণী ছিল, সংঘ ছিল। তাবু আচার
ছিল—ব্যবহার ছিল—প্রায়শ্চিত্ত ছিল। তার নিশান ছিল, ডকা
ছিল, হুকুম ছিল। একটা শক্তিমান্ মহান্ জাতি এই দেশে
সহস্রবৎসরব্যাপী কি বিরাট ইতিহাস পশ্চাতে রাখিয়া আজ এক
মুষ্টি অন্নের জন্য 'নিজ বাসভূমে পরবাসী হয়ে' বাক্যলার
সুদূর পল্লীর পথে ঘাটে মাঠে আধমরার মত পড়িয়া থাকিতেছে।
কোন পাপের এই পরিণাম ? কত বড় পাপ করিলে পৃথিবীর



এক অতি গৌরবশালী জাতিকে এই অবস্থার মধ্যে আসিয়া পড়িতে হয় ? সহস্র বৎসর পূর্বে সাম্রাজ্য ছিল, স্বাধীনতা ছিল যে জাতির, আমরা কি সেই জাতি ? এই বিশ্বের বিচিত্র প্রোতোধারার মধ্যে বাঙ্গালীর সভ্যতার কি একটা বিশেষ রূপ কুটিয়া উঠিয়াছিল ! যুগে যুগে সেই রূপের কি বিভিন্ন রূপান্তর দেখা দিয়াছিল । সেই বিশিষ্ট রূপকে আশ্রয় করিয়াই বাঙ্গলার হিন্দু, বৌদ্ধ, শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, একের পর আর ধর্মকে গড়িয়াছে—ভাঙিয়াছে—আবার গড়িয়াছে । সেই বিশিষ্ট রূপকে আশ্রয় করিয়াই বাঙ্গালী সৃতির আদেশ দিয়াছে,—নব্য দর্শনের উদ্ভাবন করিয়াছে,—গার্হস্থ্য, সমাজ ও সম্মানকে গুরে গুরে বিস্তৃত করিয়াছে ;—রাজস্বত্বকে নিয়মিত করিয়াছে, প্রজাপতিকে উদ্বোধিত করিয়াছে, ‘বাৎসল্য’ দূরীভূত করিয়াছে, সমগ্র ভূভারতে বাঙ্গলার প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, আর এক অতি অপূর্ব সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছে । আমরা কি সেই জাতি ? আমরা সেই জাতি । তবে বাঙ্গলার রূপ আবার আমাদের চক্ষের সম্মুখে কে তুলিয়া ধরিবে ? কোথায় সে জ্ঞানী গুপ্তী, কোথায় সে চিত্রকর জাহ্নবী, কোথায় সে শিল্পী কবি, কোথায় সে বাঙ্গলার রূপের জীবন্ত বিগ্রহ ?

মতাই যিনি বলিয়াছেন বাঙ্গালীর মত একটা “আত্মবিস্মৃত জাতি” পৃথিবীতে আর দুইট নাই, তিনি একেবারেই মিথ্যা কথা বলেন নাই ।

শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী ।



পঞ্চাংশ



পূর্বরাগ

রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা ।

বসিলা বিরলে থাকয়ে একলে

না শুনে কাহারো কথা ॥

সদাই ধ্যানে চাহে যেখ পানে

না চলে নয়ান-তার।

বিরতি আহারে রান্ধাবাস পরে

যেযতি যোগিনী পারা ॥

এলাইয়া বেণী ফুলের গাঁথনি

দেখয়ে খসায়ে ঢুলি ১ ।

হসিত ব্রানে চাহে যেখ পানে

কি কহে ছহাত ঢুলি ॥

একটি করি ময়ূর-ময়ূরী-

কণ্ঠ ২ করে নিরীকণে ।

চণ্ডীদাস কয় নব পরিচয়

কালিয়া-বধুর সনে ॥

চণ্ডীদাস ।

১। ঢুল

২। শ্রীকৃষ্ণের সহিত বর্ণসাদৃশ্য-হেতু

বিরহ

হরি গেও * মধুপুর * হাম কুলবালা ।
 বিশাথে শড়ল বৈছে মালতী-মালা ॥
 কি কহসি কি পুছসি শুন প্রিয় সখনি ।
 কৈছনে বকব ইহ দিন-রজনী ॥
 নয়নক নিন্দ * গেও বয়ানক হাস * ।
 সুখ গেও পিয়া সজ দুখ যবু * পাশ ॥
 ভগয়ে বিজ্ঞাপতি শুন বরনারি ।
 সজজনক কুদিন দিবস চই চারি ॥

বিজ্ঞাপতি ।

১। পিয়াছেন

২। মধুপুর

৩। চোখের নিন্দ্রা

৪। সুখের হাসি

৫। আমারে

গৌরচন্দ্রিকা

বিমল হেম জিনি তম্বু অম্বুশাম ২ রে
 তাহে শোভে নানা ফুলদায় ।
 কদম্ব-কেশর জিনি একটী পুলাক ৩ রে
 তার মাঝে বিন্দু বিন্দু ঘাম ॥
 চলিতে না পারে গোরা চাদ গোসাঞি রে
 বলিতে না পারে আধ বোল ।
 ভাবে অবশ হৈয়া হরি হরি বোলাইয়া
 আচণ্ডালে ধরি দেই কোল ॥
 গমন যন্ত্র-গতি জিনি যদমন্ত হাতী
 ভাবাবেশে ঢুলি ঢুলি যায় ।
 অরুণ-বসন-ছবি জিনি প্রভাতের রবি
 গোরা-অঙ্গে লহরী খেলায় ॥
 এ হেন সম্পদ কালে গোরা না ভজিহু হেলে
 তছু ৪ পদে না করিহু আল ।
 ত্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর ত্রিনিয়ানন্দ
 গুণ গায় বৃন্দাবনদাস ॥

বৃন্দাবনদাস ।



সমুদ্রমহানে শিব

সুরাসুর বক্ষ রক্ষ ভুজঙ্গ কিঙ্গর ।
 সতে মধিলেক সিদ্ধ না জানে শঙ্কর ॥
 দেখিয়া নারদ মুনি হইয়া চিস্তিত ।
 কৈলাস-শিখরে গিয়া হৈল উপনীত ॥
 প্রণমিয়া শিবদুর্গা দু হার চরণে ।
 আশীর্বাদ করি দেবী দিলেন আসনে ॥
 নারদ বলিল আছিলাম সুরপুরে ।
 তুলিল মধিলা সিদ্ধ বস সুরাসুরে ॥
 বিষ্ণু পাইলা কমলা কোস্তত মণি আদি ।
 হয় উঠৈঃ শ্রবা ঐরাবত গজনিধি ॥
 দেবে নানা রত্ন পাইল মেঘে পাইল জল ।
 অমৃত অমরবৃন্দ কর্ত্তকরবর ॥
 নানা ধাতু মহৌষধি পাইল নরলোকে ।
 এই হেতু হৃদয়ে জন্মিল বহু শোকে ॥
 স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে নিবসে বসন্তজনে ।
 সতে ভাগ পাইল কেবল তোমা বিনে ॥
 তে কারণে তব লইতে আইলাম হেথা ।
 সত্যার ঈশ্বর তুমি বিধাতার ধাতা ॥
 তোমাতে না দিয়া ভাগ বাটি সতে নিল
 এই হেতু মোর মন ধৈর্য্য না হইল ॥



এতেক নারদ মুনি বলিলা বচন ।
 তুমিহা উত্তর না করিল ত্রিলোচন ॥
 দেখি ক্রোধে কম্পিতা কহেন ত্রিলোচনা ।
 নাহদেহে কহে দেবী করি অন্ত্যর্থনা ॥
 কাহারে এতেক বাক্য কহিলে মুনিবর ।
 বৃক্ষে কহিলে বেন না পায় উত্তর ॥
 কঠোত্তে হাড়ের মালা বিভূষণ বার ।
 কৌন্তভের মণিরত্ন কিবা কাজ তার ॥
 কি কাজ চন্দনে বার বিভূষণ ধূলি ।
 অমৃত্তে কি কাজ বার ভক্ষ্য সিদ্ধিবুলী ॥
 মাতঙ্গ্যে কি কাজ বার বলদ বাহন ।
 পারিজাতে কিবা কাজ ধূলুর ভূষণ ॥
 সকল চিস্তিয়া মোর অজ জরজর ।
 পূর্বের বৃত্তান্ত সব জান মুনিবর ॥
 জানিয়া ইহা হার দক্ষ পূজা না করিল ।
 সেই অভিমানে আমি শরীর ত্যজিল
 দেবীর বচনে হাসি বলেন ভগবান্ ।
 যে বলিলা হৈমবতী কিছু নহে আন
 বাহন ভূষণ মোর কোন্ প্রয়োজন ।
 আমি লই বাহা নাহি লয় অন্তরজন ॥
 ভক্তিতে করিয়া বশ মাগি নিল দাস ।
 অন্নান অধর পট্টাধর দিব্যবাস ॥
 ঘৃণা করি ব্যাঘ্রচৰ্ম্ম কেহ না লইল ।
 তেঞি মোর বাঘাধর পরিতে হইল ॥



সমুদ্রমগ্নে শিব

অশ্রু চন্দন লইল কুসুম কঙ্করী ।
 বিহুতি না লর তেঁই বিহুষণ করি ॥
 যশিরঙ্গ সন্তে লইল মুকুতা প্রবাল ।
 কেহ না লইল তেঁই আছে হাড়মাল ॥
 বিরপত্র ধুসুতা-কুসুম ঘনঘসি ।
 কেহ না লইল তেঁই অঙ্গেতে বিহুষি ॥
 রথ গজ লইল বাহন পরিচ্ছদ ।
 কেহ না লইল তেঁই আছে বেলদ ॥
 কহিলা যে দক্ষ যোরে পূজা না করিল ।
 অজ্ঞান-তিমিরে দক্ষ মোহিত আছিল ॥
 তেঁই যোকে না জানিয়া পূজা না করিল ।
 তাহার উচিত ফল তৎক্ষণে পাইল ॥
 দেবী বলে দারাপুল গৃহী যেই জন ।
 তাহারে না হয় দুঃখ এসব বচন ॥
 বিভব বিহুতি আদি সঞ্চে যত জনে ।
 সংসারে বিমুখ ইথে আছে কেন্ জনে ॥
 সংসারেতে বিমুখ যেজন এ সকলে ।
 কাপুরুষ বলিরা তাহারে লোকে বলে ॥
 ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্রে তুমি যেমত পূজিত ।
 সাক্ষাতেতে সে সকল হৈতেছে বিদিত ॥
 রত্নাকর যথিয়া লভিল বরুগণ ।
 কেহ না পুছিল তোমা করিয়া হেলন ॥
 পার্শ্বতীর এই বাক্য শুনিয়া শঙ্কর ।
 ক্রোধেতে অবশ অঙ্গ কাঁপে ধরধর ॥



কাশীরাম দাস

৯

কাশীরাম কহে কাশীপতি ক্রোধমুখে ।

বৃষভ সাহিতে আজ্ঞা করিলা নন্দীকে

পার্বত্যের কটুভাব শুনি ক্রোধে সিংবাস

টানিয়া আনিলা বাঘবাস ।

বাহুকি নাগের দড়ি কাঁকালি বাধিল বেড়ি

তুলিয়া লৈল যুগপাশ ॥

কপালে কলকি-কলা কণ্ঠেতে হাড়ের মালা

করুণে করুকি ককণ ।

ভাহু বৃহদাহু শল্লী ত্রিবিধ প্রকার ভূষি

ক্রোধে বেন প্রলয়-কিরণ ॥

বেন গিরি হেমকূটে আকাশে লহরী উঠে

উধে মধ্যে গঙ্গা জটাজুটে ।

রক্ত-পঙ্কজ-আভা কোটি চন্দ্র-মুখ-শোভা

ফনি-মণি বিরাজে মুকূটে ॥

গলে দিল হার সাপ টঙ্কারি ফেলিল চাপ

ত্রিশূল ক্রকুটি লইলা করে ।

পদভরে ক্রিতি টলে চিৎকার ছাড়িয়া চলে

অতিশয় বেগে ভরহরে ॥

ডঙ্কের ডিমি ডিমি আকাশ পাতাল ভূমি

কম্প হইল ত্রৈলোক্য যতলে ।

অমর ঈশ্বর ভীত আর সবে সচিবিত

এ কোন্ প্রলয় হৈল বলে ॥

বৃষভ সাজিয়া বেগে নন্দী আনি দিল আগ্নে
নানা রত্ন করিয়া ভূষণ ।

ক্রোধে কাঁপে ভূতনাথ বেন কদলীর পাত
অতি শীঘ্র কৈলা আরোহণ ॥

আগ্ন-দলে সেনাপতি ময়ূর বাহনে গতি
শক্তি করে করি বড়ানন ।

প্রণেশ চড়িয়া যুগ করে ধরি পাশাঙ্কুশ
দক্ষিণ ভাগেতে ক্রোধ-মন ॥

বায়ে নন্দী মহাকাল করে শূল গলে মাল
পাছে অরাসুর বটু পড়ে ।

চলিলা দেবের রাজ দেখিয়া শিবের কাজ
তিন লোকে গণেন প্রমাদে ॥

অশেক অরোহ-কূলে উত্তরিল সখ দলে
যথায় যথনে অরাসুর ।

কান্দীরাম দাস কয় শীঘ্রগতি প্রণময়
সর্ব দেবে দেখিয়া ঠাকুর ॥

করজোড়ে দাড়াইলা সর্ব দেবগণ ।

শিব বলে যথ সিদ্ধ রহাইলে কেন ॥

ইন্দ্র বলে যখন হৈল দেব শেষ ।

নিবারিয়া আপনে গেলেন ছবীকেশ ॥

এক ক্রোধে আছিলেন দেব মহেশ্বর ।

দ্বিতীয় ইন্দের বাক্য কল্পে কলেশ্বর ॥

শিব বলে এত গর্ব তোমা সভাকার ।
 আমারে হেলন কর এত অহকার ॥
 রত্নাকর যদি সভে রত্ন লৈলে বাটি ।
 হেন চিন্তে না করিলে আছয়ে দুর্জটি ॥
 যে করিলে তাহা কিছু না করিয়ে মনে ।
 আমি মহিবারে কৈনু করহ হেলনে ॥
 এতেক বলিলা যদি দেব মহেশ্বর ।
 ভয়েতে দেবতা সব না করে উত্তর ॥
 নিঃশব্দে রহিলা সব দেবের সমাজ ।
 করজোড়ে বলয়ে কণ্ঠশ মুনিরাজ ॥
 অবধান কর দেব পার্শ্বতীর কান্দ ।
 কহিব কীরোদ সিদ্ধ-মণন-বৃন্দাস্ত ॥
 পারিজাত-মালা ছুর্কাসার গলে ছিল ।
 স্নেহেতে সেই পুষ্পমালা ইন্দ্র গলে দিল ॥
 গজরাজ আরোহণে ছিল পুরন্দর ।
 সেই মালা দিল তার দন্তের উপর ॥
 সহজে মাতঙ্গ অমুকণ মদে মস্ত ।
 পশুজাতি না জানিল মালার মহত্ব ॥
 তণ্ডে জড়াইয়া মালা ফেলিলা ভূতলে ।
 দেখিরা ছুর্কাসা ক্রোধে অগ্নি হেন জলে ॥
 অহকারে ইন্দ্র মোরে অবজ্ঞা করিল ।
 মোর দন্ত মালা ইন্দ্র ছিঁড়িয়া ফেলিল ॥
 সম্পদে হইয়া মন্ত গর্ব কৈল মোরে ।
 দিল শাপ হতলক্ষী হও পুরন্দরে ॥

ব্রহ্মশাপে লোকমাতা প্রবেশিল জলে ।
 লক্ষ্মী বিনা কষ্ট হৈল ত্রৈলোক্য মণ্ডলে ॥
 লোকের কারণ ব্রহ্মা ক্রোধে নিবেদিল ।
 সমুদ্র মণ্ডিতে আচ্ছা নারায়ণ কৈল ॥
 এই হেতু কীরোদ মণ্ডিল মহেশ্বর ।
 শেষ মণ্ডনের দড়ি যখন মন্দর ॥
 অনেক উৎপাত হৈল বক্রণের পুরে ।
 লক্ষ্মী দিয়া স্তুতি কৈল দেব বিশেষরে ॥
 নিবারি মণ্ডন হেঁই গেলা নারায়ণ ।
 পুনঃ তুমি আচ্ছা কর মণ্ডন কারণ
 বিষ্ণু বলে বলবান্ আছিল অমর ।
 হৈবে বিষ্ণু বিনা শ্রমযুক্ত কলেবর ॥
 দ্বিতীয় মণ্ডন-দড়ি নাগরাজ শেষ ।
 সাক্ষাতে আপনে প্রভু দেখ তার ক্রেশ ॥
 অস্ত্রের যতেক ছাড় সব হৈল চুর ।
 সহস্র মুখেতে লাল বহরে প্রচুর ॥
 বক্রণের যত কষ্ট না যায় কখন ।
 আর আচ্ছা নহে দেব মণ্ডন কারণ ॥
 শিব বলে আমি হেতু মণ্ড একবার ।
 আদিবার অকারণ না হয় আমার ॥
 হরবাক্য কার শক্তি লজ্জিবারে পারে ।
 পুনরপি মন্দর ধরিল দেবাসুরে ॥
 শ্রমেতে অশক্ত কলেবর সর্বজন্য ।
 ঘনঘাস বহে যেন আগুনের কণা ॥

অত্যন্ত ধৰ্ষণে পুনঃ মন্দর পৰ্জত ।
 তপত হইল বেন জলদগ্নিবৎ ॥
 ছি ড়ি খণ্ড খণ্ড হইল নাগের শরীর ।
 কীরোদ সাগরে সব বহিল রুধির ॥
 অত্যন্ত ধৰ্ষণ নাগ সহিতে নারিল ।
 সহস্র মুখের পথে গরল অবিল ॥
 সিকুর ধৰ্ষণ-অগ্নি সর্পের গরল ।
 দেবের নিদ্রাস আর মন্দর-অনল ॥
 চারি অগ্নি মিশ্রিত হইয়া এক হৈল ।
 সমুদ্র হৈতে আচর্ষিতে বাহিরিল ॥
 প্রাতঃ হৈতে বেন দিনকর তেজ বাড়ে
 দাবানল বাড়ে বে তক বন পোড়ে ॥
 যুগান্তের কালে বেন সমুদ্রের জল ।
 মুহূর্ত্তেকে ব্যাপিলেক সংসার সকল ॥
 দহিল সভার অঙ্গ বিষম জলনে ।
 সহিতে না পারি তক দিল সর্বজনে ॥
 পলায় সহস্রক্ষু কুবের বক্রণ ।
 পবন শমন অগ্নি পলায় অরুণ ॥
 অষ্টবসু নবগ্রহ অশ্বিনীকুমার ।
 অশুর কিরুর যক্ষ বত ছিল আর ॥
 পলাইয়া গেল বত ত্রৈলোক্যের জন
 বিষয় বদনে চাহে দেব ত্রিলোচন ॥
 দূর হৈতে দব দেবগণ করে স্তুতি ।
 রক্ষা কর ভূতনাথ অনাধের গতি



• • • • •
• • • • •

আপন অর্জিত সৃষ্টি বিধে করে নাশ ।

হৃদয়ে চিস্তিত আশু হৈলা কৃষ্টিবাস ॥

সমুদ্র জুড়িয়া বিধ আকাশ পরশে ।

আকর্ষণ করি হর করিল গণ্ড, যে ॥ •

দূর হৈতে সুরাসুর দেখয়ে কোড়ুকে ।

করিল গরল পান একই চুষকে ॥

অস্বাকৃত কারণ লৈল ধন্য দেখাবারে ।

কণ্ঠেতে রাখিলা বিধ না লৈলা উদরে ॥

নীলবর্ণকণ্ঠ অণ্যাপিহ বিশ্বনাথ ।

নীলকণ্ঠ নায় সেই হৈতে হৈল ব্যাভ ॥

কাশ্মীরায় দাস ।

স্বদেশ

জান না কি জীব তুমি, জননী জনমভূমি,

যে তোমার হৃদয়ে রেখেছে ।

ধাকিয়া মাথের কোলে, সন্তানে জননী ভোলে,

কে কোথায় এমন দেখেছে ?

ভূমিতে করিয়া বাস, ঘূমেতে পূরাও আশ,

জাগিলে না দিবা বিভাবরা ।

কত কাল হরিয়াছ, এই ধরা ধরিয়াছ,

জননী-জঠর পরিহারি ॥

যার বলে বলিতেছ, যার বলে চলিতেছ,

যার বলে চালিতেছ দেহ ।

যার বলে তুমি বলী, যার বলে আমি বাল,

ভক্তিভাবে কর তারে স্নেহ ॥

প্রসূতি তোমার ঘেহ, তাহার প্রসূতি এই,

বহুমাতা মাতা সবাধার ।

কে বুঝে ক্ষতির রীতি, তোমার জননী ক্ষতি,

জনকের জননী তোমার ॥

কত শস্ত ফলনুল, না হয় বাহার মূল,

হীরকাদি রজত কাকন ।

বাচাতে জীবের অশ্রু, বক্ষেতে বিপুল বহু,

বহুমতী করেন ধারণ ॥

সুগভীর ব্রহ্মাকর, ইইসায়ে ব্রহ্মাকর,
ব্রহ্মময়ী বসুধার করে ।

শূন্যে করি অবস্থান, করে করে কর-দান,
তরপি ধরণীবাসি-করে ॥

যদিও শব্দে পদ,পোয়ে শব্দ, নদী নদ,
জীবনে জীবন রক্ষা করে ।

যোহিনী মহোর যোহে, বহ্নি বারি বন্ধু দোহে,
প্রেমভাবে চরে চরাচরে ॥

প্রকৃতির পূজা ধর, স্নানকে প্রণাম কর,
 প্রেমময়ী পৃথিবীর নদে ।

বিশেষতঃ নিজদেশে, প্রীতি রাখ সবিশেষে,
মুগ্ধ জীব বার মোহমদে ॥

হৈন্দের অমরাবতী, ভোগেতে না হয় ব্যতি,
স্বর্ণভোগ উশসর্গ সার ।

শিবের কৈলাস-ধাম, শিবপূর্ণ ষটে নাম,
শিবধাম অদ্দেশ তোমার ।

মিছা বণি যুক্তা হেঁদ, স্বদেশের প্রিয় প্রেম,
 • • তার চেয়ে বড় নাই আর ।

সুধাকরে কত সুখা,
দূর করে তৃষ্ণা সুখা,
ব্রহ্মদেশের শুভ সমাচার ॥

প্রাতঃভাব ভাবি মনে, দেখ দেশবাসীগণে,
 প্রেমপূর্ণ নয়ন ফেলিয়া ।

কতরূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি,
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া ॥



স্বদেশের প্রেম যত, সেই মাত্র অবগত,
বিদেশেতে অধিবাস যার ।

ভাব-তুলি ধ্যানে ধরে, চিত্তপটে চিত্র করে,
স্বদেশের সকল ব্যাপার ॥

স্বদেশের শাস্ত্রমতে, চল সত্য, ধর্মপথে,
স্থখে কর জ্ঞান আলোচন ।

বৃদ্ধি কর মাতৃভাষা, পূরাও তাহার আশা,
দেশে কর বিস্তারিতরূপ ॥

দিন গন্ত হয় ক্রমে, কেন আর কল ভবে,
হির প্রেমে কর অবধান ।

বাস করি এই বর্ষে, এই ভাবে এই বর্ষে,
হর্ষে কর বিজুগুপ্তগান ॥

উপদেশ বাক্য ধর, দেশে কেন ঘেঁষ কর,
শেষ কর মিছে সুখ-আশা ।

তোমার যে ভাল বাসা, সে হোল না ভালবাসা,
আর কোথা পাবে ভাল বাসা ?

এ বাসা ছাড়িবে যবে, আর কি হে আশা রবে,
প্রাপ্ত হয়ে আশা-নাশা বাসা ।

কে বা আর পায় দেখা, এলে একা, যাবে একা,
পুনর্বার নাহি আর আসা ॥

বঙ্গভাষা

তে বঙ্গ ! ভাঙারে তব বিবিধ রতন :—
 তা সবে, (অযোগ্য আমি ।) অবহেলা করি,
 পর-ধন-লোভে মত্ত, করিহু ভ্রমণ
 পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কৃষ্ণে আচরি' ।
 কাটাইহু বহুদিন সুখ পরিহরি'
 অনিষ্টায়, অনাহারে সঁপি' কার, মনঃ,
 মজিহু বিকল ভূপে অবরোধে বরি' —
 কেলিহু শৈবালে, ভুলি' কমল-কানন ।
 স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী ক'রে দিলা পরে,—
 "ওরে বাছা মাতৃ-কোষে রতনের রাঙ্গি :
 এ ভিখারী-চল্য তবে কেন হোর আঙ্গি ?
 যা ফিরি, অঙ্গান তুই, যা রে ফিরি, ঘরে।"
 পালিলাম আঙ্গা হুখে ; পাইলাম কালে
 • "মাতৃ-ভাষারূপে খনি, পূর্ণ মণিভালে ।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত ।

প্রমীলার চিতারোহণ

গুলিল পশ্চিম-দ্বার অশনি-নির্নাশে ।
 বাহিরিল লক্ষ রক্ষঃ স্বর্ণ-দণ্ড করে,
 কোষিক পতাকা তাতে উড়িছে আকাশে ।
 রাজপথ-পার্শ্বদ্বয়ে চলে সারি সারি ।
 মৌরবে পতাকিকুল । সর্বাঙ্গে হুন্দুভি
 করিপৃষ্ঠে, পূরে দেশ গন্তীর আরাবে ।
 পদব্রজে পদাতিক কাতারে কাতারে ;
 বাজিরাঙ্গী সহ গজ ; রথিবৃন্দ রণে
 মৃতগতি, বাজে বাণ্ড সঙ্কল্প ধণে ।
 বস্ত্র দূর চলে দৃষ্টি, চলে সিন্ধুমুখে
 নিবানন্দে রক্ষোদল । ঝক ঝক ঝকে
 স্বর্ণ স্বর্ণ ধাঁধি আঁধি । রবিকর-ভেজে
 শোভে হৈমধ্বজদণ্ড ; শিরোমণি শিরে ;
 অসিকোষ সারসনে ; দীর্ঘ শূল তাতে ;—
 বিগলিত অশ্রুধারা, হায় রে, নয়নে ।

বাহিরিল বীরাসনা (প্রমীলার দাসী)

পরাক্রমে ভীমাসমা, রূপে বিজ্ঞাধরী,
 রণ-বেশে—কৃষ্ণ হরে নৃমুণ্ডমালিনী,—
 মলিন বদন, মরি শলিকলাভাবে
 নিশা বধা ! অবিরল ঝরে অশ্রুধারা,
 তিত্তি বস্ত্র, তিত্তি অশ্রু, তিত্তি বস্ত্রধারে !

উজ্জ্বলিছে কোন বামা ; কেহ বা কাদিছে
 নীরবে ; চাহিছে কেহ রথসৈন্তপানে
 অগ্নিময় আঁধি রোবে, বাধিনী যেমনি
 (জালাবৃত্ত) ব্যাধবর্ণে হেরিরা অদূরে !
 হায় রে কোথা সে হাসি—সৌদামিনী-ছটা ।

চেড়ীবৃন্দ মাঝারে বড়বা,
 শূভ্রপৃষ্ঠ, শোভাশূভ্র, কুমুম-বিহনে
 বৃত্ত বধা । ঢুলাইছে চামর চৌদিকে
 কিঙ্করী, চলিছে সঙ্গে বামাএক কাদি
 পদব্রজে ; কোলাহল উঠিছে গগনে ।
 প্রমীলার বীর-বেশ শোভে ঝলমলে
 বড়বার পৃষ্ঠে—অসি, চর্ম, তুণ, ধনুঃ,
 কিরীট-মণ্ডিত, মরি, অমূল্য রতনে ।
 সারসন মণিময় ; কবচ খচিত
 সুবর্ণে—মলিন দোহে ।

ছড়াইছে থই, কড়ি, বর্ণমুদ্রা-আদি
 অর্থ, দাসী ; সক্রমে গাইছে গায়কী,
 পেশল উরস্ হানি কাদিছে রাক্ষসী ।

(বাহিরিল মৃদুগতি রথবৃন্দ মাঝে
 রথবর ঘনবর্ণ, বিজলীর ছটা
 চক্রে ; ইন্দ্রচাপধরী ধ্বজচূড়দেশে ;—
 কিন্তু কান্তিশূভ্র আজি, শূভ্রকান্তি বধা
 প্রতিমাপঙ্কর, মরি, প্রতিমাবিহনে
 বিসর্জন-অস্ত্রে ! কাদে ঘোর কোলাহলে



রক্ষোবধী, অক্ষ বক্ষঃ হানি মহাক্ষেপে
হতজ্ঞান। রথযধ্যে শোভে ভীমধনুঃ,
তুণীর, ফলক, খড়্গা, শঙ্খ, চক্র, পদা-
আদি অস্ত্র ; স্র-কবচ ; সৌরকর-রাশি-
সদৃশ কিরীট , আর বীর-ভূবা যত ,
সকল গীতে গীতি গাইছে কাদিয়া
রক্ষোহঃখ। স্বর্ণমুদ্রা ছড়াইছে কেত,
ছড়ায় কুসুম বধা নড়ি ঘোর ঝড়ে
ভর। স্বাসিত্ত জল ঢালে জলবহ,
দমি উচ্চগামী রেণু, বিরক্ত সহিতে
পদভর। চলে রথ সিন্ধুতীরমুখে।

স্বর্ণ শিবিলাসনে, আবৃত কুসুমে,
বসেন শবের পাশে প্রমীলা সুন্দরী,—
যন্ত্যে রতি মৃত-কাম সহ সহগামী।
ললাটে সিন্দূর-বিন্দু, গলে ফুলমালা ,
কঙ্কণ মৃণালভূজে ; বিবিধ ভূষণে
ভূষিতা রাক্ষসবধু। ঢুলাইছে কাদি
চামরিনী স্র-চামর ; কাদি ছড়াইছে
কুলরাশি বামাবুন্দ। আকুল বিষাদে,
রক্ষঃকুল-নারীকুল কাঁদে হাহা রবে।
হার বে, কোথা সে জ্যোতিঃ ভাঙিত যে সদা
মুখচক্রে ? কোথা, যরি, সে সূচাকু হাসি,
মধুর অধরে নিত্য শোভিত যে, বধা
দিনকরকররাশি তোর বিষাদরে,



পঙ্কজিনি ! যৌনব্রতে ব্রতী বিধুম্বী—

পতির উদ্দেশে প্রাণ ও-বরাক ছাড়ি

গেছে যেন যথা পতি বিরাকেন এবে ।

শুকঠিলে তরুরাক, শূকার রে লতা,

স্বয়ংস্বয় বধু ধনৌ । কাতারে কাতারে,

চলে রকোবণী সাধে, কোষপুত্র অসি

করে, রবিকর তাতে ফলে ফলফলে,

কাঞ্চন-কঙ্ককবিভা নয়ন ফলসে ।

উচ্চে উচ্চারয়ে বেদ বেদজ্ঞ চৌদিকে ;

বহে চবির্কর ত্রোতী মহাময় অপি ,

বিবিধ ভূষণ, বস্ত্র, চন্দন, কঙ্করী,

কেলর, কুকুম, পুষ্প বহে রকোবধু

স্বর্ণপাত্রে , স্বর্ণকুন্তে পুত অস্তোরাশি

গাঙ্গেয় স্তবর্ণদীপ দীপে চারিদিকে ।

কাছে ঢাক, বাছে ঢোল, কাডা কড়কড়ে ;

বাছে করাল, বাছে মৃদঙ্গ, ভূষকৌ .

বাতিছে ঝাঁঝরী, শঙ্খ , দেয় ছলাছলি

লদবা রাকসনারী আদি অশ্রুদীপে—

হায় নে, মঙ্গলধ্বনি অমঙ্গল দিনে ।

বাহিরিলা পদলজে বক্ষঃকুলরাজ

রাবণ , বিশদ বস্ত্র, বিশদ উত্তরী,

ধুতুরার মালা যেন ধূর্জটির গলে .

চারিদিকে মস্তিঙ্গল দূরে নতভাবে ।

নীরব কর্তৃবশতি অক্ষপূর্ণ আশি,



নৌরব সচিববৃন্দ, অধিকারী যত
রক্ষঃশ্রেষ্ঠ । বাহিরিল কাঁদিয়া পশ্চাতে
রক্ষঃপুরবাসী রক্ষঃ—আকাল-যনিতা-
বৃদ্ধ ; শূত্র করি পুরী, আঁধার রে এবে
গোকুলভবন যথা শ্রামের বিহনে ।
দীরে দীরে সিকুমুখে, তিত্তি অশ্রুদীর্ঘে,
চলে সবে, পুরি দেশ বিষাদ-নিনায়ে !

কহিলা অক্ষমে প্রভু স্নমধুর স্বরে ;
“দশ শত রথী সঙ্গে যাও মহাবলী
যুবরাজ, রক্ষঃসহ মিত্রভাবে তুমি,
সিকুমুদীর্ঘে । সাবধানে যাও তে স্ত্র-রথী ।
আকুল পরাণ মম রক্ষঃকুলশোকে ।
এ বিপদে পরাপর নাই ভাবি মনে,
কুমার । লক্ষণশূরে ছেরি পাছে রোবে,
পূর্ক কণা স্মরি মনে কর্করূষিপতি,
যাও তুমি যুবরাজ ! রাক্ষুচূড়ামণি,
পিতা তব বিমুখিলা সমরে রাক্ষসে,
শিষ্টাচারে, শিষ্টাচার, তোম তুমি তারে ।”

দশ শত রথী সাথে চলিলা স্ত্র-রথী
অক্ষম সাগরমুখে । আইলা আকাশে
দেবকুল,—ঐরাবতে দেবকুলপতি,
সঙ্গে বরাজনা শচী অনন্তমৌবনা,
শিখিম্বরে শিখিম্বরে বন্দ তারকারি
সেনানী ; চিত্রিত রথে চিত্ররথ রথী ;



সৃগে বায়ুকুলরাজ ; ভীষণ মহিষে
 রুতাস্ত ; পুষ্পকে বক্ষ, অলকার পতি :—
 আইলা রজনীকান্ত শাস্ত্র সুধানিধি,
 মলিন তপনতেজে ; আইলা সুহাসী
 অশ্বিনীকুমারযুগ, আর দেব যন্ত ।
 আইলা সুরসুন্দরী, গরুড়, অপ্সরা,
 কিন্নর, কিন্নরী রঙ্গে বাছিল অশ্বরে
 দিবা বাস্ত । দেব-ঋষি আইলা কোতুকে,
 আর আর প্রাণী যত ত্রিদিবনিবাসী ।

উত্তরি সাগরতীরে, রচিলা সঙ্করে
 বধাবিধি চিত্তা রক্ষ : ; বহিল বাহকে
 সুগন্ধি চন্দনকাষ্ঠ, ঘৃত ভারে ভারে ।
 মন্দাকিনী পৃষ্ঠফলে ধুইয়া বতনে
 শবে, সু-কোমল বস্ত্র পরাই, ধুইল
 দাহস্থানে রক্ষোদল ; পড়িলা গভীরে
 মস্ত রক্ষ:-পুরোহিত । অবগাহি দেহ
 মহাতীর্থে সাধবী সতী প্রমীলা সুন্দরী
 • পুলি রক্ত-আভরণ, বিস্তরিল্য সবে
 প্রণমিয়া গুরুজনে মধুরভাবিলী,
 সম্ভাবি মধুরভাষে দৈত্যবালাদলে,
 কহিলা ;—“লো সহচরি, এতদিনে আজি
 ফুরাইল জীব-লীলা জীবলীলা-স্থলে
 আমার । ফিরিয়া সবে যাও দৈত্যদেশে ।
 কহিও পিতার পদে এ সব বারতা,



বাসন্তি ! মায়েরে মোর—” হায় রে, বহিল
সহসা নয়নজল ! নীরবিলা সতী ;—
কাদিল দানববালা হাহাকার রবে !
মুহুর্তে সংবরি লোক কহিলা স্তম্ভরী ; —
“কহিও মায়েরে মোর, এ দাসীর ভালে
লিখিলা বিধাতা যাহা, তাই লো ঘটিল
এত দিনে ! ধাহার হাতে মঁপিলা দাসীরে
পিতা যাতা, চলিহু লো আজি তাঁর সাথে ;—
পতি বিনা অবলার কি গতি জগতে ?
আর কি কহিব, সখি ! ভুল না লো তারে—
প্রমীলার এই ভিক্ষা তোমা সবা কাছে ।”

চিতায় আরোহি সতী (ফুলাসনে বেন ।)
বসিলা আনন্দযতি নতি-পদ-তলে ,
প্রফুল্ল কুসুমদাম কবরী-প্রদেশে ।
বাজিল রাক্ষসবাণ ; উচ্চে উচ্চারিল
বেদ বেদী ; রক্ষোনারী দিল হলাহলি ,
সে রবের সহ যিশি উঠিল আকাশে
হাহারব ! পুলকটি হইল চৌদিকে ।
বিবিধ ভূষণ, বস্ত্র, চন্দন, কস্তুরী,
কেশর, কুসুম-আদি দিল রক্ষোবালা
যথাবিধি ; পত্নকূলে নাশি ভীক্শুরে
দ্ব্যস্ত করিয়া রক্ষ : যতনে ধুইল
চারিদিকে, যথা মহানবমীর দিনে,
শাস্ত্র ভক্ত-গৃহে, শক্তি, তব পাঠতলে !



অগ্রসরি রক্ষোবাজ কহিলা কাতরে,—

“ছিল আশা, মেঘনাদ, মুন্দির অস্ত্রমে
এ নয়নধর আমি তোমার সঙ্গুখে,—
দাঁপি রাজ্যভার, পুত্র, তোমার, করিব
মহাব্রত। কিন্তু বিধি—বুঝিব কেমনে
তার লীলা ?—ভাঁড়াইলা সে সুখ আমাধু।

ছিল আশা, রক্ষ:কুলরাজসিংহাসনে
জুড়াহব অঁখি, বৎস, দেখিয়া তোমাগে,
বামে রক্ষ:কুললক্ষ্মী রক্ষোরাণীরূপে
পুত্রবধু। তুধা আশা। পূজ্যজন্ম-ফলে
হেরি তোমা দৌহে আজ এ কাল-আমনে।
ককর সৌরব-রবি চির-ব্রাহ্ম-গ্রাসে। ২

সেঁবিমু শিবেরে আমি বহু বক করি,
লভিতে কি এই ফল ? কেমনে ফিরিব,—
হার রে, কে কবে মোরে, ফিরিব কেমনে
পুত্র লক্ষ্যধামে আর ? কি সান্ত্বনাহলে
সান্ত্বনিব মাঝে তব, কে কবে আমাগে ?

- • ‘কোথা পুত্র পুত্রবধু আমার ?’ সুধিবে
ববে রাণী যন্দোদরী,—‘কি সুখে আইলে
রাখি দৌহে সিদ্ধুতরে, রক্ষ:কুলপতি ?’—
কি ক’রে বুঝাব তারে ? হার রে, কি ক’রে ?
হা পুত্র ! হা বীরশ্রেষ্ঠ ! চিরজয় রণে !
হা মাতঃ রাক্ষসলক্ষ্মি ! কি পাপে লিখিলা
এ পীড়া দারুণ বিধি রাবণের তালে ?”

অধীর হইলা শূলী কৈলাস-আলয়ে !
 নড়িল যন্তুকে জটা ; ভীষণ গজ্জনে
 গর্জিল ভুজঙ্গবৃন্দ ; ধক ধক ধকে
 জ্বলিল অনল ভালে ; ভৈরব কলোলে
 করোঁলিলা ত্রিপথগা, করিষায় যথা
 বেগবতী প্রোতস্থতী পক্ষতকন্দরে ।
 কাপিল কৈলাসগিরি গর গর ধরে ।
 কাপিল আতঙ্কে বিধ, সত্রে অত্যা
 কৃতাজ্জলপুটে সাধ্বী কহিলা মতেণে,—

“কি হেতু সরোব, প্রভু, কর তা দাসীরে ?
 মরিল সমরে রক্ষা বিধির বিধানে,
 নহে দোষী রঘুরধা । তবে যাদ নাশ
 আবিচারে তারে, নাপ, কর ভয় আগে
 আমায় ।” চরণযুগ ধরিলা জননী ।
 সাদরে সতীতে তুলি কহিল বৃজ্জটি,—
 “বিদগ্ধে হৃদয় ময়, নগরাজবালে
 রক্ষোত্তম্যে । জান তুমি কত ভালবাসি
 নৈকষের শূরে আয়ি । তব অনুরোধে,
 ক্রিয়ব. হে ক্ষেমকরি, শ্রী.রাম-লক্ষ্মণে ।”
 (আদেশিলা অগ্নিদেবে বিবাহে ত্রিশূলী,—
 “পবিত্রি, হে সক্ষত্তাচি, তোমার পরশে
 জান শত্রু এ সু-ধামে রাক্ষস-দলন্তী ।”

হৈরশ্বরূপে অগ্নি ধাইলা ভূতলে ।
 সহসা জ্বলিল চিতা । সচকিতে সবে

দেখিলা আগ্নেয় রথ ; স্বৰ্ণ-আসনে
সে রথে আসীন বীর বাসববিজয়ী
দিব্যমূৰ্তি ! বামভাগে প্রমীলা রূপসী,
অনন্ত যৌবনকান্তি শোভে তহুদেশে
চিরসুখহাসিরাশি মধুর-অধরে ।

উঠিল গগন-পথে রথবর বেগে,
বরষিলা পুষ্পাসার দেবকুল মিলি ;
পূরিল বিপুল বিশ্ব আনন্দ-নিবাসে !

চতুর্দ্বারে নিবাইল উজ্জ্বল পাষকে
রাক্ষস । পরম যত্নে কুড়াইলা সবে
ভয়, অমুরাশিতলে বিসর্জিলা তাহে
ধোত করি দাহতুল জাহ্নবীর জলে
লক্ষ রক্ষঃশিখী আত নিখিল মিলিলা
স্বর্ণ-পাটিকেলে যঁঠ চিতার উপরে,—
ভেদি অস্ত্র, যঁঠচূড়া উঠিল আকাশে ।

করি মান সিদ্ধনীরে, রক্ষোদল এবে
ফিরিলা লঙ্কার পানে, আশ্রি অশ্র-নীরে—
‘বিসর্জি প্রতিমা বেন দশমী দিবসে !
সপ্ত দিব্যানিধি লক্ষ্য কাঁদিলা বিবাসে ।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত ।

at the the

from a student

at the



বসন্তে

সখি রে,—

বন অতি রমিত হইল ফুল-ফুটনে ।

পিককুল কলকল,

চকল অলিদল,

উছলে সু-রবে জল, চল লো বনে ।

চল লো জুড়াব আখি দেখি ব্রজরমণে ।

সখি রে,—

উদয়-অচলে উষা দেখ আসি হাসিছে ।

এ বিরহ বিভাষরী,

কাটানু ধৈর্য ধরি

এবে লো রব কি করি ? প্রাণ কাঁদিছে ।

চল লো নিকুঞ্জে বধা কুঞ্জমণি নাচিছে ।

সখি রে,—

পূজে শতরাজে আজি ফুলজালে ধরনী ।

ধূপরূপে পরিমল,

আমোদিত, বনধূল,

বিহঙ্গমকুল-কল, যঙ্গলধ্বনি ।

চল লো নিকুঞ্জে পূজি শ্রীমরাজ, সজনি

সখি রে,—

পাশুরূপে অশ্রুধারা দিয়া ধোব চরণে ।

ছই কর-কোকনদে,

পূজিব রাজীব পদে,

বাসে ধূপ, লো প্রমদে, ভাবিয়া যনে ।

কঙ্কণ-কিঙ্কিনী-ধ্বনি বাজিবে লো সঘনে ।

• • • • •



সখি রে,—

বন যতি ওমিত হইল ফুল-ফুটনে,
 পিককুল কলকল, চকল অলিদল,
 উছলে সু-রবে জল, চল লো বনে,
 চল লো জুড়াব আঁখি দেখি যধুসুদনে।
 মাইকেল যধুসুদন দত্ত।

সীতা ও সরমা

ভাসিছে কনক-লঙ্কা আনন্দের নীরে
 সুবর্ণ-দীপ-মালিনী, রাজেন্দ্রাণী যথা
 রত্নহার্য। ঘরে ঘরে বাজিছে বাজনা,
 নাচিছে নর্তকীবৃন্দ, গাইছে সুতানে
 গায়ক; নারকে লয়ে কোলিছে নারকী,
 খল খল খল হাসি যধুর অধরে।
 ঘারে ঘারে কোলে মালা গাঁথা ফল-ফুলে;
 গৃহাগ্রে উড়িছে স্বজ; বাতায়নে বাতী;
 জনশ্রোতঃ রাজপথে বহিছে কল্লোলে,
 যথা মহোৎসবে, যবে যাতে পুরবাসী।



রাশি রাশি পুষ্প-বৃষ্ট হইছে চৌদিকে—
 সৌরভে পূরিয়া পুরী । আগে লকা আঁজি
 নিশাথে, ফিরেন নিদ্রা ছায়ায় ছায়ায়,
 কেহ নাহি সাথে তাঁরে পশিতে আলয়ে,
 বিরাম-বর-প্রার্থনে । —“মারিবে বীরেন্দ্র
 ইন্দ্রজিৎ কালি নামে ; মারিবে লক্ষ্মণে ;
 সিংহনাদে খেদাইবে শৃগাল সদৃশ
 বৈরি-দলে সিদ্ধ-পারে ; আনিবে বাধিয়া
 বিভীষণে ; পলাইবে ছাড়িয়া চাঁদেরে
 রাহ ; অগতের আঁখি জুড়ায়ে দেখিয়া
 পুনঃ সে সুধাংগু-ধনে ।”—আশা, মায়াবিনী,
 পথে, ঘাটে, ঘরে, বায়ে, নেউলে, কাননে,
 গাইছে গো এত গীত আঁজি রক্ত-পুরে—
 কেন না ভাসিবে রক্ত-আশ্লাদ-সলিলে ।

একাকিনী শোকাকুলা অশোক-কাননে,
 কাঁদেন রাঘব-বাহা আধার-কুটীরে
 নীরবে । হৃদয় চেড়ী, সীতাকে ছাড়িয়া,
 ফেরে দূরে যত সবে উৎসব-কোতুকে—
 হীন-প্রাণা হরিণীরে রাখিয়া বাধিনী
 নিভয়-হৃদয়ে বধা ফেরে দূর বনে ।
 মলিন-বদনা দেবী, হায় রে, বেগতি
 খনির তিমির-গর্ভে না পারে পশিতে
 সৌর-কর-রাশি যথা) সূর্য্যকান্ত-যনি,
 কিংবা বিদ্যধরা রমা অমুরাশি-তলে !

স্থনিছে পবন, দূরে রহিয়া রহিয়া,
 উচ্চাসে বিলাপী বধা ! নড়িছে বিবাদে
 মর্ম্মরিয়া পাতাকুল ! বসেছে অরবে
 শাখে পাখী ! রাশি রাশি কুসুম পড়েছে
 তরুশূলে ; বেন তরু, তাপি মনস্ত্রাপে,
 কেলিয়াছে খুলি সাজ ! দূরে প্রবাহিনী
 উচ্চ বীচি রবে কাদি, চলিছে সাগরে,
 কহিতে বারীশে বেন এ হৃৎ-কাহিনী !
 না পশে সুধাংস্ত-অংস্ত সে বোর বিপিনে ।
 কোটে কি কমল কভু সমল সলিলে ?
 তবুও উচ্ছল বন ও-অপূর্ব রূপে !

একাকিনী বসি দেবী, প্রভা আভাময়ী
 তমোময়-ধামে বেন ! হেনকালে তথা
 সরমা সুন্দরী আসি বসিল কাদিয়া
 সতীর চরণ তলে ; সরমা সুন্দরী—
 রক্তকুল-রাজলক্ষ্মী রক্ষাবধু-বেশে ।

কতক্ষণে চক্ষুঃ-জল মুছি স্থলোচনা
 কহিল মধুর স্বরে,—“হরস্ত চেড়ীরা
 তোমারে ছাড়িয়া, দেবি, ফিরিছে নগরে,
 যহোৎসবে রত সবে আজি নিশাকালে ;
 এই কথা শুনি আমি আঁঠু পূজিতে
 পা-দু'খানি । আনিয়াছি কোটায় ভরিয়া
 সিন্দূর ; করিলে আক্সা, সুন্দর ললাটে
 দিব কোঁটা । এযো তুমি, তোমার কি সাজে

এ বেশ ! নিষ্ঠুর, হার, ছুট লক্ষ্যপতি !

কে ছেঁড়ে পদ্যের পর্ণ ! কেমনে হরিল

ও-বরাদ্দ-অলঙ্কার, বুঝিতে না পারি !”

কোটা খুলি রক্ষাবধু যত্নে দিলা কোটা

সীমন্তে ; সিন্দূর-বিন্দু শোভিল ললাটে,

গোধূলি-ললাটে, আহা ! তার-রক্ত বধা !

দিয়া কোটা, পদ-ধূলি লইলা সরমা ।

“কম, লক্ষ্মি, ছু ইহু ও দেব-আকাক্ষিকত

তহু ; কিন্তু চির-দাসী, দাসী-ও-চরণে !”

এতেক কহিয়া পুনঃ বসিলা যুবতী

পদতলে, আহা মরি, সুবর্ণ-দেউটা

তুলসীর মূলে যেন অলিল উজ্জলি

দল দিল । মুহূ-স্বরে কহিলা মৈথিলী,—

“বৃথা গঙ্গ দশাননে তুমি, বিধুমুখি ।

আপনি গুলিয়া আমি ফেলাইহু দূরে

আভরণ, হবে পাণী আমারে ধরিল

বনাপ্রমে । ছড়াইহু পথে সে সকলে,

চিহ্ন-হেতু । সেই সেতু আনিয়াছে হেথা—

এ কনক-লক্ষ্যপুরে—ধীর রঘুনাথে ।

যশি, মুক্তা, রতন, কি আছে লো ঙ্গসতে,

বাহে নাহি অবহেলি লভিতে সে ধনে !”

কহিলা সরমা,—“দেবি, শুনিয়াছে দাসী

তব স্বয়ংবর-কথা তব সুধা-মুখে ;

কেন বা আইলা বনে রঘুকুল-মাণ ।

কহ এবে দয়া করি, কেমনে হরিল
 তোমারে রক্ষেন্দ্র, সতি ? এই ভিক্ষা করি,—
 দাসীর এ তুষা তোমার সুধা-বরিষণে ।
 দূরে ডষ্ট চেড়ীদল ; এই অবসরে
 কহ মোরে বিবরিয়া, তুমি সে কাহিনী,
 কি ছলে ছলিল রামে, ঠাকুর লক্ষণে,
 এ চোর ? কি মায়া-বলে রামবের ঘরে
 প্রবেশি করিল চুরি এ হেন রতনে ?”

যথা গোমুখীর মুখ হইতে সুবনে
 ঝরে পুত বারি-ধারা, কহিলা জানকী,
 মধুর-ভাবিণী সতী, আদরে সন্তানি
 সরমায়ে,—“হিতৈষিণী সীতার পরমা
 তুমি, সখি ! পূর্বকথা তুমিবারে যদি
 ইচ্ছা তব, কহি আমি, তন মনঃ দিয়া ।—

“ছিহু মোরা, স্থলোচনে, গোদাবরী-তীরে,
 কপোত-কপোতী যথা উচ্চ-বৃক-চূড়ে
 বাধি নীড়, থাকে সুখে ; ছিহু ঘোর বনে,
 নাম পঞ্চখটী, মর্ত্যে স্থর-বন সম ।
 সঙ্গ করিতেন সেবা লক্ষণ সুমতি ।
 লগ্নক ভাগ্যার যার, ভাবি দেখ মনে,
 কিসের অভাব তার ? যোগাতেন আনি
 নিত্য কল-মূল, বীর সৌমিত্রি ; যুগয়া
 করিতেন কতু প্রভু ; কিঙ্ক জীব-নাশে
 সন্তত বিরত, সখি, রাঘবেন্দ্র বলী,—



দয়ার সাগর নাথ, বিদিত জগতে ।

“ভুলিহু পূর্বের সুখ । রাজার নন্দিনী,

রঘুকুলবধু আমি ; কিন্তু এ কাননে,

পাইহু, সরসী সহৈ পরম গীরিত্তি ।

কুটীরের চারিদিকে কত বে দৃটিত ।

ফুলকুল নিত্য নিত্য, কহিব কেমনে ?

পঞ্চবটী-বন-চর যধু নিরবধি !

জাগা’ত প্রভাতে যোরে কুহরি সুবরে

পিকরাজ : কোন্ রানী, কহ, শশিমুখি,

হেন চিত্ত-বিনোদন বৈতালিক গীতে

খোলে আঁখি ? শিখী সহ, শিখিনী সুখিনী

নাচি ত ছায়ে যোর । নটক-নটকী,

এ দৌহার সম, রায়া, আছে কি জগতে ?

অতিথি আসিত নিত্য করত, করতী,

মৃগ-শিক্ত, বিহঙ্গম, স্বর্ণ-অঙ্গ কেহ,

কেহ শুভ্র, কেহ কাল, কেহ বা চিত্রিত,

যথা বাসবের ধনুঃ ঘন-বর-শিরে ;

অহিংসক জীব যত । সেবিতাম সবে, •

মহাদরে ; পালিতাম পরম যতনে

যকভূমে শ্রোতবতী তৃষাতুরে যথা,

আপনি সুজলবতী বারিদ-প্রসাদে ।

সরসী আরসী যোর ! তুলি কুবলয়ে

(অতুল রতন-সম), পরিতাম কেশে ;

সাজিতাম ফুল-সাজে ; হাসিতেন প্রভু,

বনদেবী বলি যোরে সস্তাষি কোতুকে !
 হায়, সখি, আর কি লো পাব প্রাণনাথে ?
 আর কি এ গোড়া আঁখি এ ছার জনমে
 দেখিবে সে পা-ছুখানি—আশার সরসে
 রাজীর ; নয়ন-মণি ? হে দাক্ষণ বিধি,
 কি পাপে পাপী এ দাসী তোমার সমীপে ?”

এতেক কহিয়া দেবী কাঁদিল নীরবে ।
 কাঁদিল সরমা সতী তিত্তি অশ্রু-নীরে ।

কতক্ষেপে চক্ষুঃ-জল মুছি রকোবধু
 সরমা, কহিল সতী সীতার চরণে,—
 “অরিলে পূর্বের কথা বাধা মনে যদি
 পাও, দেবি, থাক তবে ; কি কাজ অরিয়া ?—
 হেরি তব অশ্রুবারি হৈছি মরিবারে ।”

উত্তরিল প্রিয়ংবদা (কাদিয়া যেমতি
 মধু-স্বরা) —“এ অভাগী, হায়, লো সুভগে,
 যদি না কাঁদিবে, তবে কে আর কাঁদিবে
 এ জগতে ? কহি, তুন পূর্বের কাহিনী ।

“বরিবার কালে, সখি, প্রাবন-পীড়নে
 কাতর প্রবাহ ঢালে, তীর অতিক্রমি,
 বারি-রাশি ছই পাশে ; তেমতি যে মনঃ
 ছঃখিত, ছঃখের কথা কহে সে অপরে ।
 তেই আমি কহি, তুমি তুন, লো সরমে !
 কে আছে সীতার আর এ অরুণ-পুরে ?

“পঞ্চবটী-বনে যোরা গোদাবরী-তটে



ছিহ্ন সুখে । হায়, সখি, কেমনে বর্ণিব
 লে কাস্তার-কাস্তি আমি ? সন্তত স্বপনে
 তুনিভায় বন-বীণা বন-দেবী-করে ;
 সৌর-কর-রাশি-বেশে সুরবালা-কেলি
 পায়বনে ; কভু সাধবী জ্বিৎসংল-বধু-
 শূহাসিনী, আসিতেন দাসীর কুটীরে,
 সুধাংকুর অংকুর যেন অককার ধামে !
 অজিন (রঞ্জিত, আহা, কত শত রঙে !)
 পাতি বসিতাম কভু দীর্ঘ তরুমূলে,
 সখী-ভাবে সম্ভাষিয়া ছায়ায়, কভু বা
 কুরঙ্গিনী-সঙ্গে রঙ্গে নাচিতাম বনে.
 গাইতাম গীত তুনি কোকিলের ধ্বনি ।
 নব লতিকার, সতি । দিতাম বিবাহ
 তরু-সহ ; চুখিতাম, মঞ্জরিত যবে
 দম্পতী, মঞ্জরীবৃন্দে, আনন্দে সম্ভাষি
 নাতিনী বলিয়া সবে । গুঞ্জরিলে অলি,
 নাতিনী-জামাই বলি বরিতাম তারে ।
 কভু বা প্রভুর সহ প্রমিতাম সুখে
 নদী-তটে ; দেখিতাম তরল সলিলে
 নূতন গগন যেন, নব-তারাবলী,
 নব নিশাকাস্ত-কাস্তি ; কভু বা উঠিয়া
 পর্বত-উপরে, সখি, বসিতাম আমি
 নাথের চরণতলে, ব্রততী দেবতি
 বিশাল রসাল-মূলে । কত যে আদরে



তুমি তেন প্রভু যোরে, বরষি বচন-
 সুখা, হার, কব কারে ? কব বা কেমনে ?
 শুনেছি কৈলাসপুরে কৈলাসনিবাসী
 বোমকেশ, স্বর্ণাসনে বসি গৌরী-সনে,
 আগম, পুরাণ, বেদ, পঞ্চতন্ত্র-কথা
 পঞ্চমুখে পঞ্চমুখ কহেন উমারে,
 শুনিতাম সেইরূপে আমিও, রূপসি,
 নানা কথা । এখনও, এ বিজ্ঞান-বনে,
 ভাবি আমি, শুনি যেন সে মধুর-বাণী ।
 সাক্ষি কি দাসীর পক্ষে হে নিষ্ঠুর বিধি,
 সে সঙ্গীত ?"—নীরবিলা আশ্রিত-লোচনা
 বিবাদে । কহিলো তবে সরমা সুন্দরী,—

“শুনিলে তোমার কথা, রাঘব-রমণি,
 দুণা জন্মে রাজভোগে । ইচ্ছা করে, ত্যজি
 রাজ্য-সুখ, বাই চলি হেন বনবাসে !
 কিন্তু ভেবে দেখি যদি, ভয় হয় মনে ।
 রবিকর যবে, দেবি, পশে বনস্থলে
 তমোময়, নিম্নগুণে আলো করে বনে
 সে কিরণ ; নিশি যবে দায় কোন দেশে,
 মলিন-বদন সবে তার সমাগমে ।
 বধা পদার্পণ তুমি কর, যধুমতি,
 কেন না হইবে সুখী সর্বজন তথা ?
 জগৎ-আনন্দ তুমি ভুবনমোহিনী ।
 কহ, দেবি, কি কৌশলে হরিল তোমারে



রক্তপতি ? তুনিরাছে বীণাধ্বনি দাসী,
 পিকবর-রব নব-পল্লব-মাঝারে
 সরস মধুর মাসে ; কিন্তু নাহি তুনি
 হেন মধুমাখা বাণী কভু এ ভগতে !
 দেখ চেয়ে, নীলাধরে শর্মা, যার আভা
 • মলিন তোমার রূপে, পিইছেন হাসি
 তব বাক্যসুধা, দেবি, দেব সুধানিধি ।
 নীরব কোকিল এবে আর পাখী যত,
 তুনিবারে ও কাহিনী, কহিষু তোমায়ে ।
 এ সবার সাধ, সাধিব, যিটাও কহিয়া ।”

মাইকেল মধুসূদন দত্ত ।



ভারতসঙ্গীত *

“ আর ঘুমাইও না দেখ চক্ষু মেলি
দেখ দেখ চেয়ে অবনীমণ্ডলী,
কিবা সুসজ্জিত কিবা কুতূহলী,
বিবিধ-মানব-জাতিরে ল’য়ে ।

মনের উল্লাসে, প্রবল আশ্বাসে,
প্রচণ্ড বেগেতে, গভীর বিশ্বাসে,
বিজয়ী পতাকা উড়ায়ে আকাশে,
দেখ হে ধাইছে অকুতোভয়ে ।

হোথা আমেরিকা নব অভ্যুদয়,
পৃথিবী গ্রাসিতে করেছে আশ্রয়,
হয়েছে অদৈর্ঘ্য নিজ বীর্ষাবলে,

• ভারতবর্ষে যখন মোগল বাদসাহদিগের অত্যন্ত প্রাচুর্য্য এবং যোগল সৈন্যগণ ক্রমে ক্রমে ভারতভূমি আচ্ছন্ন করিয়া মহারাষ্ট্র-অঞ্চল আক্রমণ করে, তখন বাখবাচাঘী নামে একজন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ স্বদেশের ইনতার একান্ত চুঃখিত হইয়া স্বদেশের স্বাধীনতা-রক্ষার নিমিত্ত নগরে নগরে এবং পর্ব্বতে পর্ব্বতে ভ্রমণ করিয়া বীরত্ব এবং উৎসাহ-প্রবর্তক গান করিয়া বেড়াইতেন। শিবাজীর সময় হইতে ঠাহার সঙ্গীত মহারাষ্ট্রদিগের মধ্যে সর্ব্বত্র প্রচলিত এবং অত্যন্ত আদরীয় হয়। বাখবাচাঘীর মৃত্যুর পর অত্যন্ত গায়কেরা যেনে যেনে সেই গান করিয়া বেড়াইতেন। এই প্রবাদ অবলম্বন করিয়া ভারতসঙ্গীত লিখিত হইয়াছে ।

ছাড়ে হুহুকার, তুমুল টলে,
 যেন বা টানিয়া ছিঁড়িয়া ছুঁতলে,
 নুতন করিয়া গড়িতে চায় ।

মধ্যস্থলে হেথা আজ্ঞাপূজিতা
 চির-বীৰ্য্যবতী বীর-প্রসবিতা,
 অনন্ত-যৌবনা যুনানী-মণ্ডলী,
 মহিমা-ছটাতে জগৎ উজলি
 কোতুকে ভাসিয়া চলিয়া যায় ।

আরব্য, মিশর, পারস্ত, তুরকী,
 তাতার, তিব্বত—অন্ত কব কি ?
 চীন, ব্রহ্মদেশ, নবীন জাপান,
 তারাও স্বাধীন তারাও প্রধান,
 দাসত্ব করিতে করে হেয়জান,
 ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয় ।

বাজু রে শিক্কা বাজু এই রবে,
 সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
 সবাই জাগ্রত যানের গৌরবে,
 ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয় ।

এই কথা বলি মুখে শিক্কা তুলি,
 শিখরে দাঁড়ারে গায়ে নামাবলী,
 নগ্নন-জ্যোতিতে হানিয়ে বিজলী,
 গায়িতে লাগিল অনেক বুঝা



আয়তলোচন উন্নতললাট,
 স্নগোরাঙ্গ তনু সন্ধ্যাসৌর ঠাট,
 শিখরে দাড়ায়ে গায়ে নায়াবলী,
 নগ্ননন্দ্যোতিতে হানিল বিজলী,
 বদনে ভাঙিল অতুল অভা।

নির্নাশিল শৃঙ্গ করিয়া উচ্ছ্বাস,
 “বিংশতি কোটি মানবের বাস,
 এ ভারতভূমি যবনের দাস ?
 রয়েছে পড়িয়া শৃঙ্খলে বাধা।

আখ্যাবর্তজয়ী পুরুষ বাহারা
 সেই বংশোদ্ভব জাতি কি ইহারা ?
 জন কত শুধু গ্রহরী পাহারা
 দেখিয়া নয়নে লেগেছে দাঁধা ?

ধিক্ হিন্দুকুলে ! বীরধন্য ভূলে
 আত্ম-অভিমান ডুবায়ে সলিলে
 দিয়াছে সঁপিয়া শত্রু-করতলে
 সোণার ভারত করিতে হার।

হীনবীৰ্য্য সম হখে কৃতান্তলি
 মস্তকে ধরিতে বৈরি-পদধূলি,
 হৃদয়ে দেখ ধার মহাকুতূহলী
 ভারতনিবাসী বত কুলাঙ্গার।



এসেছিল যবে আখ্যাবর্ত্তভূমে
দিব্ অক্ষকার করি তেজোধূমে,
রণ-রক্ত-যন্ত পূৰ্ণশিতগণ,
যখন তাহারা করেছিল রণ,
করেছিল অর পঞ্চনদগণ,

তখন তাহারা ক'জন ছিল ?

আবার যখন জাহ্নবীর কূলে,
এসেছিল তাহা জয়ডঙ্কা তুলে,
যমুনা, কাবেরী, নর্মদা-পুলিনে,
ক্রাবিড, তৈলঙ্গ, দাক্ষিণাত্য বনে,
অসংখ্য বিপক্ষ পরাজয়ি রণে,

তখন তাহারা ক'জন ছিল ?

এখন তোরা যে শত কোটি তার,
অদেশ উদ্ধার করা কোন্ হার,
পারিস্ শাসিতে হাসিতে হাসিতে,
সুযুদ্ধ অবধি কুযুদ্ধ হইতে,
বিজয়ী পতাকা ধরায় তুলিতে,

বারেক জাগিয়া করিলে পণ ।

তবে ভিন্নজাতি শত্রুপদতলে,
কেন রে পড়িয়া থাকিস্ সকলে ?
কেন না ছিঁড়িয়া বন্ধন-শৃঙ্খলে,

স্বাধীন হইতে করিস্ যন ?



অই সেখ সেই মাথার উপরে,
রবি, শশী, তারা দিন দিন ঘোরে,
ঘুরিত ঘেরপে দিক্ শোভা ক'রে
ভারত যখন স্বাধীন ছিল।

সেই আঘাতবর্ষ এখনও বিদ্রুত,
সেই বিদ্রাগিরি এখনও উন্নত,
সেই ভাগীরথী এখনও ধাবিত,
পুরাকালে তারা ঘেরপ ছিল।

কোথা সে উজ্জল হতাশন সম
হিন্দু বীরদর্প বুদ্ধি পরাক্রম,
কীপিত বাহাতে স্বাধর জন্ম,
গান্ধার অবধি জলধি-সৌমা ?
সকলি ত আছে সে সাহস কই ?
সে গম্ভীর জ্ঞান নিপুণতা কই ?
প্রবল তরঙ্গ সে উন্নতি কই ?
কোথা রে আজি সে জাতি-মহিমা !

হরেছে স্থান এ ভারতভূমি,
কারে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেছি আমি ?
গোলামের জাতি শিখেছে গোলামি !—
আর কি ভারত সজীব আছে ?
সজীব থাকিলে এখনি উঠিত,
বীরপদতরে যেদিনী ছলিত,



ভারতের নিশি প্রভাত হইত,

হার রে সে দিন বুচিরা সেছে ।”

এই কথা বলি অশ্রুবিম্ব ফেলি,

কণমাত্র বুঝা শূন্যতার তুলি,

পুনর্বার শূন্য মুখে নিল তুলি,

গর্জিয়া উঠিল গম্ভীর স্বরে,—

“এখনও জাগিয়া উঠ রে সবে,

এখনও সোভাগ্য উদয় হবে,

রাখ-কর সম বিত্তল প্রভাবে,

ভারতের মুখ উজ্জল ক’রে ।

একবার শুধু জাতিভেদ তুলে,

ফজির, ব্রাহ্মণ, বৈত্র, শূত্র মিলে

কর হৃদ পণ এ মহীমণ্ডলে

তুলিতে আপন মহিমা-ধ্বজা ।

জপ তপ আর বোগ আরাধনা,

পূজা, হোম, বাগ, প্রতিমা-অর্চনা

এ সকলে এবে কিছুই হবে না,

তুণীর-কৃপাণে কর রে পূজা

বাণে সিঙ্কনীয়ে ভূধর-শিখরে

গগনের গ্রহ ভ্রম ভ্রম ক’রে,

বায়ু উদ্বাপাত বজ্রবিধা ধ’রে

স্বকাণ্ড-সাদনে প্রবৃত্ত হও ।



তবে সে শাণি ব বিপক্ষ নাশিতে
প্রতিদ্বন্দ্বী সহ স্মরক হ'তে,
স্বাধীনতারূপ ধনেনে যশিতে,
যে শিরে একপে পাতকী বণ্ড ।

ছিল বটে আগে তপস্তার বলে,
কার্য্যসিদ্ধি হ'ত এ মহোদগুণে,
অর্পনি আর্পিতা ভক্ত রূপে
সংগ্রাম করিত অমরলগ্ন ।

এখন সে দিন নশক রে আর,
দেব-আরাধনে ভারত-উদ্ধার
হবে না—হবে না—খোল তরবার,
এ সব নৈতা নহে তেমন ।

অগ্ন-পরাক্রমে হও বিনাশন
রূপ-রস-রসে হও রে উন্মাদ
তবে সে বাচিবে, ঘূচবে বিপদ
জগৎ হইয়া থাকিতে চাও
কিসের লাগিয়া হ'লি দিশেচারা,
সেই হিন্দুজাতি সেই বহুধরা,
জ্ঞানবুদ্ধিতে গাত চেয়তি প্রথবা,
তাব কন কুমে প'ড়ে লুটীও ।

অই দেখে সেই সঙ্গীর উপরে
রবি, শশী, ক'ন দিনে বারে,



ঘুরিত বেগশে দিক্ শোভা ক'রে,
ভারত স্বধন স্বাধীন ছিল।

সেই আর্থাবর্ত এখনও বিহৃত,
সেই বিক্যাচল এখনও উন্নত,
সে জাহ্নবী-বারি এখনও ধাবিত,
কেন সে মহত্ব হবে না উজ্জল ?

বাজ্ রে শিঙ্গা বাজ্ এই রবে,
শুনিয়া ভারতে জাগুক সবে,
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,
ভারত শুধু কি ঘুমায়ে রবে ?”

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্বত্র-সংহার

রুদ্রপীড়ের বাত্রা

বেষ্টিবাছে ইন্দ্রপুরী দেব-অনৌকিনী,
চৌদিকে বিস্তৃত বেন সাগর-সিকতা,
বোজন বোজন বাপ্ত, প্রদীপ্ত ভানুতে—
দেবকুল সেইরূপ দিক্ আচ্ছাদিয়া।



দূরস্থিত, সরিহিত যত শৈলরাজি
 অন্তোদয়-গিরিশৃঙ্গ প্রত্যেক উজ্জল
 অনন্তের সমুদয় মক্ষত্র বা যথা
 বিস্তীর্ণ হইয়া দীপ্তি ধরে চতুর্দিকে ।
 প্রাচীরে প্রাচীরে দৈত্য ভীষণদর্শন—
 পাষাণ-সদৃশ বগু দীর্ঘ, উরস্থান—
 নানা অস্ত্র ধরি নিত্য করে পরিক্রম
 ভীম ধর্মে ভীম তেজে সজ্জিয়া সজ্জিয়া,
 আশ্রিত, সুসজ্জ, সলা যুদ্ধের সজ্জায়,
 ত্রয়ে দৈত্য বস্ত্রের বস্ত্রের, অর্গ আনোলিখা,
 আচ্ছাদি সুমেরু-অঙ্গ, বৈজয়ন্ত ঢাকি,
 ঘোর শব্দ সিংহনাদ, অধর বিদারি ।
 অস্ত্রবৃষ্টি, শৈলবৃষ্টি, প্রতি-অহরহঃ,
 অনন্ত আকুল করি উভয় সৈন্তেতে :
 রাজি-দিবা যেন শূন্নে নিবৃত্ত বষণ,
 বিদ্রাও-মিশ্রিত শিলা দিকে দিকে ব্যাপি ।
 ত্রিদশ-আলয়ে হেন অমর-দানবে
 অলিছে সময়বহি নিত্য অহরহঃ ;
 বেষ্টিত অমরাবতী দেব-সৈন্তদলে ।
 স্নানসঙ্কর উভ দেবতা-দমুজে ।
 অর্পণের উদ্ভিরাশি যথা প্রবাহিত
 অহনিশ, অমৃক্ষণ, বিরতি-বিপ্রায়,
 স্রোতস্বতী বিধাবিত নিবৃত্ত বক্রণ
 ধাত্রা প্রসারিয়া গতি সিদ্ধ-অভিমুখে —



সেইরূপ অবিশ্রাম দানব-অমরে
হর যুদ্ধ অহরহঃ, স্বর্গ-বহির্দেশে,
জয় পরাজয় নিত্য নিত্য অনিশ্চয়—
দৈত্যের বিষয় কভু, কখন জিদশে ।
সভাসীন বৃত্তাহর সুমিত্রে সম্ভাবি
কহিছে গর্জন করি বচন কতধ—

“যুদ্ধে নৈল পরাজিত এখনও দেবতা
এখনও স্বরগ বেষ্টি সৈবত সকলে ?
সিংহের নিলয়ে আসি শৃগালের দল
প্রকাশে বিক্রম হেন নির্ভয়-হৃদয়ে ?
যন্ত্রমাতঙ্গের তুল্য করিয়া আঘাত
খাপদ বেড়ায় হেন করি আক্ষালন ?
ধিক আজি দৈত্য নামে ! হে সৈনিকগণ !
সমরে অমর ত্রস্ত করিলা দানবে !
কোথা সে সাহস বীৰ্য্য শৌর্য্য পরাক্রম,
লক্ষ্য বাহার তেজে চির-রণজয়ী ?
সঙ্গাগরা বহুকরা যুদ্ধে করি জয়,
প্রকাশিল কতবার অতুল বিক্রম,
নাহি স্থান বহুধার কোথাও এমন,
কম্পিত না হয় আজি দানবের নামে—
পশিলা অমরাবতী জিনিয়া অবনী,
বিস্তৃত করিয়া বহুকরাবাসিগণে,
জিনিলা স্বরগ যুদ্ধে অদ্বুত প্রতাপে
মহাদেবী সুরকূলে সমরে লাহিয়া :



খেলাইলা দেববৃন্দে পাতালপুরীতে —
 শশকবৃন্দের যত—দৈত্য-অদ্বাদাতে
 অচৈতন্য দেবগণ ব্যাপি যুগকাল
 তর্নিবার দৈত্যভেজ না পারি সহিতে ।
 সেই পরাক্রান্ত তিরস্কৃত সুরসেনা
 আবার আসিয়া দশে পশিল সংগামে ,
 না পারি জিনিতে তার স্তম্ভিষ্ণু হইয়া
 রে ভীকু দানবগণ ! নামে কলহিলা ।
 আপনি যাইব অস্ত পশিব সমরে ,
 যুচাইব অমরের সময়ের সাধ ”
 বলিয়া গচ্ছিল বীর বৃহ দৈত্যপতি,
 ধরিল শিবের শূল সিংহের বিক্রম ,
 দেখিয়া হ্রাসিত যত দানবসৈনিক,
 ব্রহ্মাসুর-আস্ত হেরি নিপ্তক সকলে
 “আনু রে সে শিবশূল—আনু রে অমর-
 বিক্রমী ত্রিশূল, যাহা দানিলা শঙ্কর ।”
 নিঃখে মাতঙ্গ-মুগ্ধ বদা গচ্ছপতি
 বিশাল বৃক্ষের কাণ্ড উপাতি, শুভ্রতে
 তুলিয়া গগনমার্গে বিস্তারে বখন,
 স্র উচ্চ শব্দের নাদে বৃংহিত করিয়া ।
 তখন বৃক্ষের পুন্স বীর রুদ্রপীড়—
 শোভিতমাণিক্যকুণ্ড কিটীট বাহার,
 অলঙ্কৃত শরীর যার ইন্দ্রাস্ত বতীত,
 কহিলা পিতারে চাহি হ’য়ে কৃতান্তলি,—



কহিলা—“হে তাত ত্রিকু দৈত্যকুলেশ্বর !
 অভিলাষ নন্দনের নিবেদি চরণে,
 কর অবধান পিতঃ, পুরাণ বাসনা,
 দেহ আজ্ঞা আমি অস্ত্র ঘাই এ সংগ্রামে
 বশবিন্ । বশঃ যদি সকলি আপনি
 যত্ত্বেন নিজ শিরে, কি উপায়ে তবে
 আয়ত্ন আমরা তব হব বশোভাগী ?
 কোন কালে আমরা তবে লভিব সুখ্যাতি,
 কীর্তি বাহা বীরলক বীরের আরাধ্য,—
 বীরের বাহিত বশঃ ত্রিদুবনে বাহা,
 সকলি আপনি পিতা তৈলা উপার্জন,
 কি রাখিলে রণকৌরু যত্ত্বিতে তনয়ে ?
 ভাবিতে ত হয়, তাত, ভবিষ্যতে চাহি,
 সমুত্তি পিতার নাম রাখিবে কিরূপে ?
 আলিলা যে যশোলীপ, প্রদীপ্ত কেমনে
 রাখিবে তব অঙ্গজগণ অতঃপরে ?
 জন্ম বৃদ্ধা । কণ্ঠ বৃদ্ধা । বৃদ্ধা বংশখ্যাতি ।
 কীৰ্ত্তিয়ানু জনকের পুত্র হস্তয়া বৃদ্ধা ।
 স্বনামে যদি না ধন্ত হয় সর্বলোকে —
 জীবনে জীবন-অশ্রে চিরস্মরণীয় !
 বিভব, ঐশ্বর্য, পদ সকলি সে বৃদ্ধা ।
 পিতৃভাগ্য হয় যদি ভোগ্য তনয়ের,
 পুত্র্য সেই কোন কালে নহে কোন লোকে,
 জলবিষবৎ ক্ষণে ভাসিয়া মিশায় ।

বিজয়ী পিতার পুত্র নহিলে বিজয়ী,
গৌরব সম্পদ তেজঃ নাহি থাকে কিছু,
ভ্রমিতে পশ্চাতে হয় কেকবৃন্দবৎ,
দানব-অবর-বন্ধ-মানব-দুশিত ।

স্বরবৃন্দ পুনৰ্জীৱ ফিরিবে এ স্থানে,
তব বংশজাতপণে ভাবি তুমি কীট,
না মানিবে কেহ আর বিশ্ব-চরাচরে,
তেজস্বী দৈত্যের নাথে হইয়া লঙ্কিত ।
বশোলিঙ্গা কদাচিৎ ভীকর(ও) অন্তরে
উদ্বীপ্ত হইয়া তারে করে বীৰ্য্যবান্ ।—
বীরের বর্গই বশঃ, বশই জীবন ;
সে বশে কিরীট আজি বাক্তিব শিরসে ।
কর অভিষেক, পিতঃ, এ দাসেরে আজ
সেনাপতি-পদে তব, সমরে নিঃশেষি
ত্রিশংত্রিকোট দেব, আসিয়া নিকটে
ধরিব যন্তকে দেখ অই পদরেণু ।

জানিবে অমর স্বর—নহে সে কেবল
দানবকুলের চূড়া দানবের পতি,
অজের সংগ্রামে নিত্য—অনিবার্য রূপে
অস্ত্র বীর আছে এক—আত্মজ তাঁহার ।”

চাহিয়া সহর্ষচিত্তে পুত্রের বদনে,
কহিল দমুজেশ্বর বৃত্রাসুর হাসি ;—
“কুত্ৰপীড় ! তব চিত্তে বত অভিলাষ,
পূর্ণ কর বশোরশ্মি বাক্তিয়া কিরীটে ।



বাসনা আমার নাই করিতে হরণ
 ভোমার সে বশঃপ্রভা পুত্র বশোধর ।
 ত্রিলোকে হয়েছ বহু, আরও বহু হও
 দৈত্যকুল উজলিয়া দানব-ভিলক !
 তবে যে বুকের চিত্তে সময়ের সাধ
 অজ্ঞাপি প্রোচ্ছল এত, হেতু সে তাহার
 বশোলিঙ্গা নহে পুত্র, অস্ত্র সে লালসা,
 নারি ব্যক্ত করিবারে বাক্য বিভাসিয়া ।
 অনন্ত তরঙ্গময় সাগরগর্জন,
 বেলাগর্ভে দাঁড়াইলে যথা সুখকর ;
 গভীর শরীরবোঙ্গে গাঢ় ঘনঘটা
 বিচ্ছাতে বিদৌর্ণ হয়, দেখিলে যে সুখ—
 কিংবা সে গজোত্রী-পার্শ্বে একাকী দাঁড়
 নিরখি যখন অমুরাশি ঘোর নাদে
 পড়িছে পর্বতশৃঙ্গে স্রোতে বিনুতিয়া
 ধরাধর ধরাতল করিয়া কম্পিত ।—
 তখন অন্তরে যথা দেহ পুলকিত
 হৃদয় উৎসাহে হয় সুখবিমিশ্রিত,
 সময়-তরঙ্গে পশি, খেলি যদি সদা
 সেই সুখ চিত্তে যম হয় রে উষিত ।
 সেই সুখ সে উৎসাহ হায় কত কাল
 না ধরি হৃদয়ে, জর স্বর্গে যে অবধি,
 চিত্তে অবসাদ সদা—কোথাও না পাই
 দ্বিতীয় জগৎ যুদ্ধে লভি পুনর্বার,



নাহি স্থান ত্রিভুবনে ভিনিতে সংগ্রামে,
 ভাবিয়া বৃত্তের চিত্তে পড়িয়াছে যলা ;
 দেখ এ ত্রিমূল-অঙ্গে পড়িয়াছে যথা
 সময়-নিরতি-চিহ্ন কলঙ্ক গভীর !
 যাও যুকে তোমা অস্ত করি অভিসেক
 সেনাপতি-পদে, পুত্র অমর ধ্বংসিতে
 যাও, যশোবিমণ্ডিত হইয়া আবার
 এইরূপে আসি পুনঃ দাঁড়াও সাক্ষাতে ।”
 রক্তপীড় প্রকলিত, পিঙ্গ-পদূল
 সাদরে লইলা শিরে গুনিয়া ভারতী,
 এ হেন সময়ে দূত নৈমিষ হইতে
 প্রত্যাগত, সভাস্তলে হ'ল উপনীত ।
 দূরে দেখি দৈত্যপতি উৎসুক-হৃদয়,
 কহিল, “সন্দেশবহ, কি বারতা কহ ।
 কিরূপে এ পুত্রীমণ্ডো প্রবেশিলে তুমি ?
 কোথা ইন্দ্রজায়া শচী কোথা বা ভীষণ ?”

অশ্রুপ্ত হইয়া দূত কিকিৎ তখন

কহিতে লাগিল পুত্রী-প্রবেশ-উপায়,
 বায়তে চঞ্চল বধা বিভ্রম পলাশ,
 রসনা তেমতি দ্রুত বিকম্পিত তার ।
 কহিল, “প্রথম ববে আইলু এ স্থানে,
 স্বর্গ হ'তে বহুদূর হিমচলপথে
 উত্তর পর্বত-শৃঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ
 হইল আমার দেব-অনীকিনী-সহ ।



নানা ছল নানা বেশ বিবিধ কৌশল
 আশ্রয় করিয়া পরে হৈলু অগ্রসর
 চিনিতে নাহিলা কেহ, অতঃপর শেষে
 পুরী-প্রান্তভাগে আসি হৈলু উপনীত,
 প্রাচীর নিকটে আসি অনেক চিন্তিয়া
 উদয় হইল চিত্তে, জাগরিত যদা
 সূর্য্য আদি দেব বসু নিত্য অশ্রুপারী,
 ভ্রমে নিত্য অবিরত দ্বার নিরখিয়া।
 আসন্ন বিপদ চিত্তে হইল উদয়,
 কটিল কৌশল এক গূঢ় প্রতারণা—
 ঐন্দ্রিয়ার শিঃ দৃষ্টি হিমালয় পারে,
 হয় যুদ্ধ সেইখানে গুরুত্ব মানবে,
 সেই সমাচার ল'য়ে দ্বিগিত গমনে
 ঐন্দ্রিলা-নিকটে যাই, পিতৃদেহে দ্বার,
 দৈত্যকুলেশ্বর বৃত্ত মহাবলবান্
 সমরে সহায় হন এ তাঁর প্রার্থনা।—
 এ প্রস্তাবে দেবগণ শুভ ভাবি মনে
 আদেশ করিল যোরে পুরী প্রবেশিতে,
 আদেশ পাইবামাত্র পুরীতে প্রবেশ
 করিয়া পড়ুর পদে আসি উপনীত "

তিনি দূতের বাক্য কহে বৃহত্তর :—

"এ বারতা দূত তোর অলৌক করনা
 সঙ্গে শচী ইন্দ্রপিত্রা ভীষণ সংহতি
 শচী কি সে সূর্য্য আদি দেবে অবিনতি ?"

দানবরাজের বাক্যে দূতের রসনা
 হইল ক্ষুভিতাপূর্ণ কম্পবিরহিত—
 যথা নব-কিশলয় বরবার নীরে
 আর্দ্রতম্বু, বিলম্বিত তরুর শাখায় ।
 স্তমিত দানব-যন্ত্রী কহিলা তখন,—
 “দৈত্যেশ্বর, দূত বৃদ্ধি হৈলা অগ্রগামী,
 পশ্চাতে ভীষণ ভাবি আসে শচী-সহ
 মঙ্গলবারতা নিত্য তড়িৎ-গমনা ।”

নতমুখ নিম্নদৃষ্টি দূত ক্ষুণ্ণমতি,
 কহিলা,—“না মদ্রি, বার্থ আশ্বাস তোমার
 নৈমিষ-অরণ্যে শচী ক্ষয়ন্তের সনে
 করিছে নির্ভয়ে বাস—ভীষণ নিহত ।”

“ভীষণ নিহত ?”—গর্জিলা দানবপতি ।
 “হা রে রে বালক—জয়ন্ত ইন্দ্রের পুত্র,
 আমার সংহতি সাধ বিবাদে একাকী !—
 মন্ত তোর এত ?” বলি ছাড়িলা নিশ্বাস ;
 “রুদ্রপীড় পুত্র, তুন কহি সে তোমাতে,”
 কহিলা তনয়ে চাহি গাঢ় নিরীক্ষণে—
 “যশোলিন্সা চিত্তে তব অতি বলবতী,
 কর তৃপ্ত জয়ন্তেরে করিয়া আহুতি ;
 শচীরে আনিতে চাহ অমরাবতীতে,
 অস্ত্রধা না তর যেন, যাহ ধরাধামে ;
 শত বোঝা সুসৈনিক বীর-অগ্রগণ্য
 লহ সঙ্গে অচিরে পালহ আদেশ ।”

কৃতজ্ঞালি হ'য়ে যত্রী স্মিত্র তখন
কহিলা,—‘দৈত্যেত্র, এবে দেব-পরিবৃত
বিতৌর্ণ এ শ্বর্গপুরী, কি প্রকারে কহ
কুমার ভেদি এ বৃহৎ হবেন নির্গত ?
যুদ্ধে পরাজয় যদি দেব-অনৌকিনী,
নির্গত হইতে হয় আনিতে শটীরে,
না বুঝি তবে বা সিদ্ধ সম্বর কিরূপে
করিবে কুমার কহ, তব অভিপ্রোক্ত ।
অসংখ্য এ দেব-সেনা হৃদয় সংগ্রামে,
অমর তাহাতে সবে হৃদ-প্রতিজ্ঞ,
শঙ্কিত নহেক কেহ অস্ত্র-অস্ত্রাঘাতে,
বুদ্ধিত না হবে শিব-ত্রিশূল-বিহনে ।
তবে কি আপনি যুদ্ধে করিবেন গতি
কুমার-সংহতি অস্ত্র, দানব-ঈশ্বর ?
বিমুক্ত করিয়া পথ পাঠান বস্ত্রপি,
কি প্রকারে পুনঃ হেথা হবে বা নিবেশ ?”

দৈত্যেত্র কহিলা ;—“যত্রী, সেনাপতি-পদে
বরণ করেছি পুত্র, না যাব আপনি,
রক্তপীড়ে দিব এই ত্রিশূল আমার,
বাইবে আনিবে শূলহস্তে অব্যাহিত ।”

নিষেধ করিলা যত্রী তেত্রাপিতে শূল,—
“পুরী-রক্ষা না হইবে অভাবে তাহার,
উপস্থিত হয় যদি সঙ্কট তাদৃশ
সমূহ দৈত্যের বল হবে নিঃসহার ।”



কুট করিয়া তবে ললাট-প্রদেশে
স্থাপিয়া অঙ্গলিদ্বয়, গর্জ প্রকাশিয়া
কহিলা দানবপতি ;—“সুমিত্র হে, এই—
এই ভাগ্য বহু দিন থাকিবে বৃত্তের,
জগতে কাহার সাধ্য নাহি সে আশায়
সমরে পরাস্ত করে—কিংবা অকুশল,
অমুকুল ভাগ্য যার অসাধ্য কি তার—
ধর রে তিশূল, পুত্র, বীর রুদ্রপীড় ।”

রুদ্রপীড় কহে, “যত্নি, কেন তত্ত্ব এত ?
জান না কি অভেষ্টা এ আমার শরীর ?
বাসবের অস্ত্র তির বিদৌর্ণ কখন
না হহবে এই দেহ অস্ত্র গ্রহরণে ।
ইন্দ্র নাহি উপস্থিত, চিন্তা কর দূর,
ধাইব অমর-বাহ ভেদিয়া সহর,
আসিব আবার বাহ ভেদিয়া তেমতি
শচীরে লইয়া সঙ্গে এ স্বরগপুরে ।
হে ভাত, তিশূল রাখ, নাহি রুদ্রতেজ
দেহেতে আমার, উহা নারিব তুলিতে ;
বীর কতু নাহি রাখে নিষ্ফল আয়ুধ
বিবর্ত হইতে পশি সংগ্রামের স্থলে ।”

এইরূপে করি ক্ষান্ত যত্নী, বৃত্তাস্তরে,
শত সূর্যসনিক দৈত্য সংহতি লইয়া
অম্বর-কুমার শয্য প্রাচীর-সন্নিধি
উপনীত হৈলা সুখে সুসজ্জিত বেশে ।



অমুসঙ্গী বীরগণ সহিত যুদ্ধা
 করিতে, কহিলা কেহ যুদ্ধ অবিলম্বে,
 কহিলা বা অস্ত্র কেহ সমর উচিত—
 রক্তপীড় নিপতিত উভয় সঙ্কটে
 নিজ ইচ্ছা বলবতী, যশোলিপা গাঢ়,
 ঘটনা দুর্ঘট আর সুযোগ ঈদৃশ ;
 যুদ্ধই তাহার ইচ্ছা একান্ত প্রবল,
 ছল কি কৌশল তাঁর নহে অভিপ্রেত ।
 নিকপায় কোন যতে সমরে সম্মত
 না পারি করিতে অস্ত্র সঙ্গিলে সবে,
 অগত্যা সপ্নান্তি দিয়া অবশেষে হবে
 অস্ত্র কোন সত্বপায় করিতে সুস্থির ।
 স্থির হৈল অবশেষে কাহার বচনে,
 ভীষণের সহচর দূত যে কৌশলে
 পশিলা নগরীমধ্যে, অবলম্বি তাহা
 নির্গত হইয়া গতি কর্তব্য নৈমিষে ।
 কল্পনা করিয়া স্থির, দ্বারদেশে কোন,
 আসি উপনীত দ্রুত—আসিয়া সেখানে
 ভুলিলা প্রাচীর-শিরে সুভদ্র পতাকা,
 দানবের ঘৃক-চিহ্ন শূল বিরহিত ।
 উড়িল কেতন তুণ শূন্যে বিস্তারিত ;
 প্রকাণ্ড অর্ণবপোত ছিঁড়িয়া বকন,
 বাদায় উড়িল যেন আকাশমার্গেতে,
 সমরকেতন অস্ত্র হৈল সঙ্কচিত ।



বাজিল সস্তায়-শব্দ, দূত কোন জন
 বার্তা ল'রে প্রবেশিলা অমর-শিবিরে ;
 কহিলা সেনানী-বর্গে উচ্চসস্তায়ণে,—
 “বৃত্তাসুর দৈত্যপতি যে হেতু প্রেরিল্য
 ঐঞ্জিলার পিতৃরাজ্য হিমালয়পারে,
 পক্ষ-সমরে তাঁর বিপন্ন জনক
 দৈত্যেশ বৃত্তের ইচ্ছা প্রেরিতে সহায়
 শত বোঝা সেই স্থানে শীঘ্র অবিরোধে ;
 দেবকুল তাহে যদি থাকহ সম্মত,
 সংগ্রামে বিশ্রাম তবে দেহ কিছু কাল,
 বহির্গত হৈতে তবে দেহ শত বোধে,
 ঐঞ্জিলার পিতৃরাজ্যে করিতে প্রস্থান ।”

বার্তা শুনি দেবপক্ষ-সেনাধ্যক্ষগণ—
 বরুণ, পবন, অগ্নি, ভাস্কর, কুমার—
 মিলিত হইয়া সবে করিলা মন্ত্রণা,
 কি কর্তব্য দানবের এ-বিধ প্রস্তাবে ।
 নিবেদ্য করিলা পানী—প্রচেতা সুধীর,—
 “উচিত না হয় পথ দিতে দৈত্যবোধে,
 কপট, বঞ্চক, কুর, দিতিমুত অতি,
 নহেক উচিত বাক্যে প্রত্যয় তাদের ।
 ঐঞ্জিলার পিতৃরাজ্য হৈতে দূত কেহ
 যদিও আসিয়া থাকে অজ্ঞাতে আশার,
 বিশ্বাস কি তথাপি সে দূতের বচনে ?
 সেখানে থাকিলে পান্ন না ছাড়িত তার ।”

স্বর্গ-অভিপ্রায়—“দৈত্য-যোদ্ধা শত জন
ঐন্দ্রিলার শিখালয়ে থাক অবিরোধে,
দেব-যোদ্ধা কিন্তু কেহ পশ্চাতে তাদের
গমন করুক যেন না পারে ফিরিতে ।”

অগ্নি কহে—“হুই তুল্য আমার নিকটে,
নিষেধ নাহিক তার নাহি অনিষেধ,
অমর দৈত্যের সনে যেইখানে থাক,
সম্মুখে পশ্চাতে শত্রু কি তাহে প্রভেদ ?”
সতত অস্থিরচিত্ত পবন চঞ্চল,
কছু অভিমতে এর, কছু অন্তমতে,
অভিমত দিলা তার—সদা অনিশ্চিত—
বে কহে বখন মিলে তাহারই সহিত ।
মহাসেন, সেনাপতি সকলের শেষে
কহিলা পার্শ্বভীপুত্র—“বিপক্ষে দুর্বল
করাই কর্তব্য কার্য্য হুঙ্কর বিধানে ;
দৈত্যের প্রস্তাব দেবপক্ষে প্রেরণ কর ।
স্বর্গ ছাড়ি মহাযোদ্ধা বীর শত জন
ধরাতে করিলে গতি দেবেরই মঙ্গল,
হীনবল হবে পুরী রক্ষক-বিহনে,
শ্রেয়ঃকর ছাড়িবারে অভিপ্রেত তাঁর ।”

সেনাপতি-বাক্যে অন্ত দেবতা সকলে
সম্মত হইলা—ধীর প্রচৈতা ব্যতীত ;
বার্তা ল’য়ে বার্তাবহ প্রবেশি নগরে
রুদ্রপীড়-সন্নিধানে নিবেদিলা ভ্রত ;



মহাহর্ষ হৈল সবে ; দৈত্য-বোধ শত
 নিজস্ব হইলা শীঘ্র ছাড়িয়া আমরা,
 আহ্লাদে করিলা গতি পৃথিবী-উদ্দেশে
 নৈমিষ অরণ্যে বধা শচী-নিবসতি ।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ।

হিমালয়

(১)

অসীম নীরদ নদ,
ওই গিরি হিমালয় ।
উথুলে উঠেছে বেন অনন্ত জলধি ;
ব্যোমের বিগুণিগন্তর,
তরঙ্গিণী বোরতর,
প্রাচীনা গগনাকন জাপে নিরবধি ।

(২)

বিশ বেন কৈলে পাছে
কি এক দাঁড়ারে আছে ।
কি এক প্রকাণ্ড কাণ্ড মহান্ ব্যাপার ।
কি এক মহান্ সৃষ্টি,
কি এক মহান্ সৃষ্টি,
মহান্ উদার সৃষ্টি প্রকৃতি তোমার ।

(৩)

পদে পৃথ্বী, শিরে ব্যোম,
তুচ্ছ তারা স্থা মোম
নক্ষত্র, নখাগ্রে বেন গণিবারে পারে ।



সম্মুখে সাগরাধরা
ছড়িয়ে রয়েছে ধরা,
কটাক্ষে কখন যেন দেখিছে তাহারে।

(৪)

ঝটিকা হ্রস্ব মেঘে
বুকে খেলা করে মেঘে,
ধরিত্রী গ্রাসিয়া সিদ্ধ লোটে পদতলে !
অলস্ত অনল ছবি
ধবকু ধবকু অলে রবি,
কিরণ অলন আলা মালা শোভে গলে।

(৫)

ও-ই কিবা ধবধব
ভূম ভূম শব্দ সব
উর্দ্ধমুখে মেঘে গেছে হুঁড়িয়া অধর।
দাড়াইয়া পাদ-দেশে
ললিত হরিত বেষে
নধর নিকুঞ্জরাজি সাজে ধরে ধর।

(৬)

ও-ই সপ্তশৈল-শিরে
জন্মরাজি চিরে চিরে
বিকশে গৈরিক ঘটা ছটা বসন্তময়।



তুণ তরু লতা-জাল,
অপকুণ লালে লাল ;
মেঘের আড়ালে যেন অকুণ উদয় ।

(৭)

কিবা ও-ই মনোহারী
দেবদারু সারি সারি,
দেদার চলিয়া গেছে কাতারে কাতার ।
দূর দূর আলবালে,
কোলাকুলি ডালে ডালে,
পাতার মন্দির গীণা মাধার সবার ।

(৮)

তলে তুণ লতা পাতা
সবুজ বিছানা পাতা,
ছোট ছোট কুণ্ডলন হেথায় হোথায় ।
কেমন পেথায় ধরি,
কেকারব করি করি,
ময়ূর ময়ূরী সব নাচিয়া বেড়ায় ।

(৯)

কেনিল সলিল-রাশি,
বেগভরে পড়ে আসি,
চন্দ্রলোক ভেঙ্গে যেন পড়ে পৃথিবীতে ।



সুধাংক-প্রবাহ-পারা
 শত শত ধার ধারা,
 ঠিকরে অসংখ্য তারা ছোটো চারিভিত্তে ।

(১০)

শূঁজে শূঁজে ঠেকে ঠেকে,
 লম্ফে লম্ফে ঝেঁকে ঝেঁকে,
 জেলের জালের যত হয়ে ছত্রাকার,
 ঘুরিয়ে ছড়িয়ে পড়ে,
 কেনার আরসি ওড়ে,
 উড়েছে যরাল যেন হাজার হাজার ।

(১১)

নেমে নেমে ধারাগুলি,
 করি করি কোলাকুলি,
 একবেণী হয়ে হয়ে নদী বয়ে বার ;
 ঝরঝর কলকল
 ঘোর রবে ভাঙ্গে অল
 পত পতী কোলাহল করিয়া বেড়ায় ।

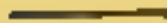
(১২)

কিবা ভৃগু-পাদ-মূলে
 উথলে উথলে হলে
 ট'লে ট'লে চলেছেন দেবী সুরধুনী ;



কবির, বোপীর ধ্যান,
 ভোলা মহেশ্বর-প্রাণ,
 ভারত-সুৰভি-পাতী, পতিতপাবনী ।
 পুণ্যতোয়া গিরিবালা !
 ছুড়াও প্রাণের আলা !
 ছুড়াও ত্রিতাপ-আলা যা তোমার বলে ।

বিহারীলাল চক্রবর্তী ।



শ্রায় সলিল তব, লোহিত ছিল কভু,
 পাণ্ডব-কুরুকুল-শোণিতে ও ।
 কাপিল দেশ, তুরগ-গজ-ভারে,
 ভারত স্বাধীন যে দিন ও ।

তব জল-তীরে, পৌরব বাদব,
 পাতিল রাজ-সিংহাসন ও ।
 শাসিল দেশ, অরিকুল নাশি,
 ভারত স্বাধীন যে দিন ও ।

দেখিলে কি তুমি, বৌদ্ধ পতাকা,
 উড়িতে দেশ-বিদেশে ও ।
 তিক্ত-চীনে, ব্রহ্ম-ভাতারে,
 ভারত স্বাধীন যে দিন ও ।

এ জল-ধারে ধীরে বহিল কভু,
 প্রেম-বিরহ-আখিনীর ও ।
 নাচিল গাইল, কত সুখ সম্পদ,
 এ তব সৈকত-পুলিনে ও ।

এ তম্বু-মুকুরে, আসি পূর্ণশশী,
 নিরখিত মুখ হবে শরদে ও ।
 ভাসিত দশ দিশি, উৎসব-রঙ্গে,
 প্রাবিত চিত সুখ-উৎসে ও ।



সে তুমি, সে শনী, ধীর অনিল সে,
 তবু সব মগন বিবাদে ও ।
 নাহিক সে সব প্রমোদ উৎসব,
 গ্রাসিল সকলে কালে ও ।

বে মুরলী-রবে নিবিড় নিশীথে,
 উন্মাদিত ব্রজবালা ও ।
 আকুল প্রাণে তব তট-পানে,
 ধাইত রব-সন্ধ্যানে ও ।

বর্দ্ধিত বিরহে, বাস-পবন কত,
 বিরচিত বলি তব হৃদয়ে ও ।
 হৃদয়-সমাগমে পুন এই দর্পণে,
 প্রতিবিম্বিত সিত হাসি ও ।

সে সব কোতুক, কাল-কবল আশি,
 লেশ না রাখিলে শেষ ও ।
 কই সেই গোরব, নিকুঞ্জ-সৌরভ,
 হ'ল পরিণত শত কাহিনী ও ।

কতু শত ধারে, এ উভ পারে,
 পাঠান, আক্শান, মোগল ও ।
 চালিল সেনা, ত্রাসি নিবাসী,
 বাধিল ভারতে বন্ধনে ও ।



অহো ! কি কু-দিবসে, গ্রাসিল রাহ,
যোচন হইল না আর ও ।

ভাঙ্গিল চূর্ণিল, উলটি পালটি,
লুটি নিল বা ছিল সার ও ।

সে দিন হইতে, অন্ধ বনৌগৃহ,
পরবল-অর্গল-পাতে ও ।

সে দিন হইতে, অশান ভারত,
পর অসিঘাত-নিপাতে ও ।

সে দিন হইতে, তব জল তরলে,
পরশে না কুলবালা ও ।

সে দিন হইতে, ভারত-নারী,
অবরোধে অবরোধিত ও ।

সে দিন হইতে, তব তট-সঙ্গনে,
নৃপুত্র-নাদ বিনোদ ও ।

সে দিন হইতে, সব প্রতিকূলে,
যে দিন ভারত-বন্ধন ও ।

এ পরঃ-পারে কত কত আতীর,
ভাঙিল কত শত রাজা ও ।

আসিল, স্থাপিল, শাসিল রাজ্য
ত্রিচি ঘর কত পরিপাটী ও ।



কত শত দুর্জয়, দুর্গম দুর্গে,
বেড়িল তব গুট দেশে ও ।

নগর-প্রাচীরে ঘেরিল শেষে,
চির-দুগ-সন্তোষ আশে ও ।

উপহসি সর্কে, মানব-গর্কে,
কাল প্রবল চিরকালে ও ।

গৃহ গড় পুণ্ডে, কতিপর ভুণ্ডে,
রাখিল করি বিকলাকৃতি ও ।

ঐ পুরোভাগে, ভর বিভাগে
গৃহবর শেষ শরীরে ও ।
দেখিছি যে সব, উজ্জল লেখা
সে গুণ-বোধান-রেখা ও ।

এর অলিন্দে, হৃদরীবন্দে,
মোগল নরপতি-কেশরী ও ।
বসি শু-মর্দরে, উন্নাস অন্তরে,
ভোলিত মোহন রূপে ও ।

কতু এ গবাক্ষে কোতুক-চক্ষে,
নিরখিত পরিজন লইয়ে ও ।

নিম্ন প্রদেশে, সে গজ-দুচ্ছে,
ভীষণ প্রাণ-বিনাশক ও ।



এ-ঘর মাঝে, নারী-সমাজে,
 বসি করু খেলিত চৌসর ও ।
 রাখিত পাশে, সে তরবারি,
 কাফর-কণ্ঠ-বিদারী ও ।

কৈ ? সব আজি, সময়-সমুদ্রে,
 যজ্ঞিত সহ শত আশা ও ।
 দেখিল শত শত, হ'ল না নিষারিত,
 নিরুপ যমুজ-পিপাসা ও ।

সে গৃহ-পাশে কাপিত আসে,
 ভূপতি-পদবিক্ষেপে ও ।
 সে সব ভবনে, কত শত অধয়ে,
 পুরিছে মৃত পুরীষে ও ।

যে ঘর-মাঝে, সুরভি-সমুদ্রে,
 সম্মোহিত-চিত কালে ও ।
 সে সব সদনে, উদ্ভবে বমনে,
 পুতিগন্ধ বিকিরণ ও ।

যে গৃহ-অঙ্গে, বহুবিধ রঙ্গে,
 বিখচিত ছিল মণিরাজি ও ।
 সে সব কালে, হরি এক কালে
 ঢাকিল মৃত্যু-জালে ও ।



ঐ তব তীরে, তব শরীরে,
দগ্ধারিত গৃহ-রাজ ও ।

বার সুরশ্রেণে, দিক্‌দিক্‌ হইতে,
কর্ষে যমুজ-সমাজে ও ।

কত মর-পঙ্করে, নির্ঝিল ইহায়ে,
শোবি' শোণিত কোষে ও ।
দর্শাইতে সব, দর্শক লোকে,
প্রমদা-গৌরব শেষে ও ।

অহো ! কত কাল, রবে এ জীবিত
তটনি ! তট তব শোভি' ও ।
ভূষণ হইরে, তব মল নীলে,
ব্যক্তিতে বন-অভিলাষে ও ।

হবে কোন কালে, হত ঘোর কালে
পরিমিত সুর-পরমায়ু ও ।
রহিবে শেষে, এ গৃহ-দেশে,
আকাশে শুধু বায়ু ও ।

বাঁদি এই শেষ, রবে সব শেষ,
জীবন-বশন প্রভাতে ও ।

তহু যন করিয়ে, ছথ শত সহস্রে,
চরিছে লোক কি আশে ও ।

গোবিন্দচন্দ্র দাস ।

সিদ্ধুতট

নির্মল আনন্দরাশি, নির্মল আনন্দ-হাসি,
 প্রভাসের মহাসিদ্ধ ! আনন্দ নির্মল,—
 জলরাশি ; হাসি,—লীলা তরঙ্গ চঞ্চল ;
 অপরাহ্ন,—বসন্তের তরু চতুর্দশী ।
 আনন্দ রবির কর, আনন্দ সুনীলাধর,
 প্রকৃতি আনন্দময়ী বোড়শী রূপসী ।
 আনন্দের সচঞ্চল লীলা রক্তাকর !
 আনন্দের অচঞ্চল লীলা নীলাধর !
 নীলিমার নীলিমার, মহিমার মহিমার,
 মিশাইয়া পরস্পরে—মহা আলিঙ্গন !
 মহাদূত !—অনন্তের অনন্ত মিলন !
 নীলসিদ্ধ, বেতবেলা ; বেলায় তরঙ্গ-খেলা—
 দিতেছে বেলায় সিদ্ধ বেতপুষ্পহার,
 গাহিয়া আনন্দগীত, চুপি অনিবার ।
 সিদ্ধ-বন্ধে বেলা, যেন বিফু-বন্ধে বাণী,
 সাক্ষ্য রখিকরে হাসে বেলা সিদ্ধুরান্বী ।

বিচিত্র শিবিরশ্রেণী, শত সংখ্যাতীত,
 বিচিত্র কেতন শিরে, শোভিতেছে সিদ্ধুতীরে,
 সিদ্ধ মৃত সিদ্ধুপ্রিয়া করি উরঙ্গিত ।



আসিছে ষাটবগণ—আসিয়াছে কত,—
 গজপৃষ্ঠে, অশ্বে, রথে, নানা দিকে, নানা পথে,
 কলোন্মিত সিদ্ধুপিয়া করি সিদ্ধু মত ।
 কিছু দূর যনোহর বঙ্কিম বেলায়,
 নীল গগনের পটে অমল বিভায়,
 কৃষ্ণের শিবিরশ্রেণী তুলি উর্কে শির
 শোভিতেছে যেন দেব-পবিত্রমন্দির ।
 শিবির-চূড়ায় স্বর্ণ-ধ্বজে নিকুপয়,
 নীল কেতনের বক্ষে, পীত সূদর্শন,
 কি লীলা সমুদ্রতীরে, সমুদ্র-অনিলে ধীরে
 করিছে মহিমায় ! সিদ্ধু অবিরাম
 অসংখ্য ভরস-করে করিছে প্রণাম ।

নবীনচন্দ্র সেন ।

পাণ্ডব-গৌরব

স্বাক্ষরকার কক্ষ

(প্রীকক্ষ ও ভীষ)

কক্ষ । এস ভাই, এস বৃকোদর ।
 দণ্ডীরে এনেছ সঙ্গে লয়ে ?

ভীষ । না জানি কি গুরু অপরাধে,
 বহু লজ্জা দিয়েছ ত্রিহরি !
 ত্রিভুবন অবশ গাহিবে,
 হুৰ্য্যোধন সহায় হইলে
 অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিতে হয় সাধ ।
 হে মুরারি, তব পদ স্মরি করিয়াছি পদ,
 রণে হুৰ্য্যোধনে করিব নিধন,—
 গদাঘাতে ভাঙ্গি উক ।
 মরমে দহিরে তোমারে স্মরিয়ে,
 পাঞ্চালী খুলেছে বেলী ;
 যা'ক যম প্রতিজ্ঞা অভলে,
 রহক দ্রোপদী এলোকে নী চিরদিন,
 কুশলে কোরব রহক হস্তিনাপুরে,
 খেদ নাহি করি ।
 কিন্তু আশ্রিতে ত্যজিব,



এ কলঙ্ক অর্পিতে মাধার,
ইচ্ছা কি হে তব ইচ্ছাময় ?
সকি হেতু আসি নাই চক্রধারী ।

কৃষ্ণ । কহ বীর কিবা প্রয়োজন ?

কহ তব কিবা হেতু আগমন ?

ভীম । মিনতি দাসের এই রাথ বহুপতি,
উপহিত রণ, আমার কারণ—

আমি তব অরি,

নহে আর চারি পাণ্ডব বিরোধী তব ;

বধিরা আমার—বিবাদ ঘুচাও প্রভু ।

আসিয়াছি বৈরধ-সমর-আকিঞ্চনে,

অকিঞ্চনে করো না বকনা,

বাহ্যকরতরু তব নাম ।

কৃষ্ণ । বুঝিয়াছি বৃকোদর তব অহঙ্কার ;

তুমি বলবান্,

বাহুবলে নাহিক সমান তব,

তাই চাও যুদ্ধ যম সনে ।

বুঝেছি কৌশল,

কিন্তু তুমি বদধিক ছল,

তা হ'তে অধিক ছল আমি ।

বুঝাও আমার,—

শত্রু নহে আর চারি ভ্রাতা তব !

বুদ্ধিহীন হেন কি ভেবেছ যোরে ?

প্রশ্রয় তোমার নাহি দিলে বুদ্ধিষ্ঠির,



বল না কেমনে,
দণ্ডী-সহ কর বাস বিরাটনগরে ?
কেন বা অর্জুন এমিয়া ভুবন,
সহায় করিবে যত ক্ষত্র রাজগণে ?
সহদেব নকুল হ'জনে,
প্রাণপণে যুদ্ধ-আয়োজন কেন করে ?
কহি আমি শুনেছি যেমন ।

ভীষ্ম : গিরিধারী,
নাহি বাহবল শুধু,
চাহ বুঝাইতে,
তোমা হ'তে আমি বলাধিক ।
কলিযুগসময়ে,
কথা বটে সন্মানহীনে !
হল নহি আমি—অতি হল তুমি,
যুক্তকণ্ঠে করি হে স্বীকার ।
হলে চাহ ভুলাইতে,
হলে কহ আপ্রিতে ত্যাগিতে,
চতুরের চূড়ামণি তুমি ।
কিন্তু তুমি চিন্তামণি,
কল্পতরু ধর নাম,—
মিথ্যাবাদী নহে যুধিষ্ঠির ।—
অনল সমান যদি নন্দ হয় অপমানে,
সে অনল নির্ঝাণ-কারণে,—
স্থান চাই তোমার চরণে ।



হৃতপুত্র কোরবের ক্রৌড়দাস,
 তাহারে সাধিল মাতা সাহায্য-কাষণ ;
 খচকে নেহারি—তবু প্রাণ ধরি,
 করি নাই আশি উৎপাটন !
 দেহ রণ—লজ্জা রাখ লজ্জানিবারণ ।
 কর্তে প্রাণ থাকিতে আমার,
 ছৰ্যোধন-মৃত্যু নাহি হয় ।
 সদাধর, বধিরা আমার,
 অপমানে কর জ্ঞান !

কক । সমবল-সহ রণ কপ্তির-নিবস ।
 যেই অরাসক-সহ রণে
 ভজ দিছি কত বার,
 তুণবৎ ছি ডিলে তাহারে ।
 ধরেছিহু কুদ্র গোবর্দ্ধন -
 কিন্তু তব চরণের ঘর,
 গিরিপির চূর্ণ শত শত !
 নাহি হেন শক্তি যব জিনিব সবার,
 লব তুরঙ্গিনী এই প্রতিজ্ঞা আমার,
 ছলে বলে কোশলে রাখিব সেই পণ ।
 পাইয়াছ অপমান চাহ বুঝাইতে,
 কিন্তু কোন মতে
 স্থান যব নাহি পায় চিতে ।
 জানিতাম সরল তোমার,—
 দেখি, তুমি আমা হতে অধিক চতুর ।

ভাল,

বল দেখি কিসে তুমি হতমান ?

ভীষ ।

বুঝেও না বুঝে বেই খন,

কথার শক্তি নাহি বুঝাতে তাহার !

রাধার নন্দন কর্ণ শত্রু বালাবধি,

করিল পাণ্ডব যাতা তাহারে মিনতি ।

পাণ্ডবের কুলনারী আনি কেশে ধরি,

বেই অরি উক দেখাইল,

সভামাঝে বসন-হরণ—

করেছিল আকিঞ্চন,—

তারে পাণ্ডব-প্রধান, করিয়ে সম্মান,

আবাহন করিল সমরে হ'তে সাধী ;

হা কক, এ হ'তে কিবা

হবে হে দুর্গতি ?

জানাব কাহার ? দীর্ঘবাস ঢালি তব পার,

সেই তপ্ত বাসে—

দড় হোক চরণ তোমার ।

কক ।

ভাল ভাল শঠ বুকোদর,

ঘুচাইলে চতুরালী-অহকার ।

কর্ণ-সহ কুন্তীদেবী কি কথা কহিল,

জানি আমি সে শুষ্ক বারতা ;

শত্রু তুমি, কি হেতু তোমাতে কব ?

মাতৃজ্ঞান করে কর্ণ তাঁরে,

আসন্ন-সমরে, পদ বন্দিবারে,



করেছিল আকিঞ্চন,
 দবশন পেয়েছিল সে কারণে তাঁর ।
 কৌরব-পাণ্ডবে যদি মিলে এ আহবে,
 তাহে তব কিবা অপমান ?
 বাড়িবে কেবল ভারতবংশের মান ;
 তোমার সম্মান অধিক বাড়িবে তাহে ।
 যম ডরে লগ্নীয়ে তাজিল হুয্যোধান,
 কিন্তু যথা—

অনল-সমনে উদ্ভাপিত হয় কার,
 সেটরূপ তোমার প্রভাব,
 প্রভাবিত হুয্যোধান ।
 অতুল বীৰত্ব তব ক্ষত্রিয়-ব্যাভার—
 পলিয়াছে রূময়ে তাহার ;
 ক্ষত্রধর্ম শিথিয়াছে ক্ষত্রিয়-সমাজ,
 তব উচ্চ আদর্শ হেরিয়ে ।
 তাই ভয়ে বারে করিল বর্জন,
 তাহার রক্ষণে পুনঃ প্রবেশিল রণে ।
 যাও যাও কি বুঝাও ভীমসেন ?
 চাহ বধিয়া আমার বিপদ করিতে দূর,
 চাহ ব্রাহ্মগণের কল্যাণ ?
 ভাব মনে ব্রিহদ্রথ আমার সহায়,
 পাছে হয় অকল্যাণ ভ্রাতার কাহারো ;
 তাই চল করি আসি ধারকার
 পুরাতন অভিল্য ।



বাও বাও—

দন্দযুদ্ধ তোমা সহ করু না করিব ।
 ভীম । অতি ছল, অতি ধল, অতীব কুটিল,
 তুমিই তোমার মাত্র উপমা কেবল !
 তুমি লজ্জাহীন,
 তোমাতে কি লজ্জা দিব ?
 সম তব মান-অপমান,
 নহে কল হ'য়ে কহ, কল, কলিয়-সদনে,
 পরাক্রম-ভয়ে রণে হও পরাবৃত্ত ।
 নিন্দা-স্তুতি সমান তোমার,
 কি হইবে কষ্ট কথা ক'য়ে ।
 কিন্তু নাম ধর ভক্তাধীন,
 কাষ মন প্রাণ অর্পণ করেছি রাজ্য পায়,
 তথাপি বশ্যপি তুমি না বুঝ বেদনা—
 রণস্থলে দেবতানগলে,
 উচ্চকণ্ঠে করিব প্রচার—
 নহ তুমি লজ্জানিবারণ,
 নহ করু ভক্তাধীন ?
 নহে কেন কর হতমান ?
 হ'লে কণ্ঠাগত প্রাণ,
 কৃষ্ণনাম আর না আনিব মুখে ।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ ।



সিদ্ধার্থের বৈরাগ্য

রাজপথ

(বুদ্ধের প্রবেশ)

সিদ্ধার্থ : এ কি ভীষণ আকার সম্মুখে আমার ।

নরাকার কিন্তু নহে নর !

শুধু চক্ষু অন্ধে আবরণ ;

অবনত বেন মহাভারে—

উন্নত করিতে নারে শির ।

কহ হে সারথি, কোন্ জাতি জীব এই ?

সারথি : নর-জাতি শুন হে কুমার,

অবনত বার্দ্ধক্যের ভারে,

অসহায় ভয়ে ধরা'পরে,

জরাভীর্ণ শোচনীয় দশা ।

সিদ্ধা : এ দশা কি হয় সবারকার ?

অথবা কি দৈবের বিপাকে

এ দশা ইহার ?

নর-জাতি তবে কি হে বার্দ্ধক্য-অধীন ?

সারথি : হায় প্রভু, কাল বলবান্ ।

কৈশোর যৌবন কালের নিয়ম,

বার্দ্ধক্যে তেমতি, যতিমান,

এ দশা সবার,



নিস্তার নাহিক এতে কার,—

দেহিমাত্র বার্কক্য-অধীন ।

সিদ্ধা । আমি—গোপা—হুমকান্তি সহচরী সবে—

জরাগ্রস্ত হব কি সময়ে ?

স্বামী । বুঝরাজ, সবে সমনিঃশয়-অধীন ;

রাজা কিংবা প্রজা—সমভাবে স্পর্শ করে কালে ।

সিদ্ধা । এই সুখ ধরে কি সংসার ?

জরার নিস্তার নাহি কার ।

এই হেতু জীবন-ধারণ ।

সুখের বোঝন—এইমাত্র পরিণাম ।

হায়, হেন কারাগারে,

কোন্ সুখে বাস করে নরে ?

কি কারণ শাসন-খালরে

উঠে জর-জর-ধ্বনি ?

(জনৈক কণ্ঠের প্রবেশ)

স্বামী । আমার ধর, আমার প্রাণ যায়, আমার চারদিকে
আন্তন জলছে—আমার অস্থিগ্রস্থি সব লিখিল হচ্ছে—আমায় 'ধর' !

সিদ্ধা । জীর্ণ-শীর্ণ হের চমৎকার !

দেহ-ভার চরণ না বহে ;

কহে—অনল চৌদিকে,

কল্পে ঘন ঘন,

মহাহিমে জর-জর তহু ঘেন !—

বার্কক্য কি স্পর্শিল ইহারে ?



সার । মহারোগে শীর্ণ কলেবর—

অস্থিগ্রস্থি কাপে নিরস্তর,

কিন্তু দেহে ঘোর তাপ

বল-ক্ষয় রোগের প্রভাবে !

সিদ্ধা । কহ বিচক্ষণ,

এও কি হে দেহের নিয়ম ?

এ দশা কি হয় সবাংকার ?

সার । চলে দেহ যত্নের সমান,

হে ধীমান,

কেবা জানে কবে প্রাপ্ত হইবে বিকার ।

দেহমাত্রে রোগ করে অধিকার,

এ নিয়ম না হয় খণ্ডন ।

সিদ্ধা । এই ছার দেহের গৌরব ?

এই হেতু বৈভব-লালসা ?

কলেবর রোগের আগার,

যত্ন এত তার, পীড়ার পোষণ-হেতু ?

কুসুম-সৌরভ, তপন-গৌরব,

চন্দ্রমার হাসি,

চিন্তাকুলকর কহে বাহ্য লাভ নরে,

ব্যঙ্গ করে ঋণ জনে !

বুঝিতে না পারি,

কি হেতু এ ধরাধামে বাস,

অপহায়ী সুখ-আশ কেন করে নরে ।

(অদূরে মৃত দেহ দেখিয়া)



স্পন্দহীন, হের পথমাঝে,

জড় বা চেতন

নির্ণয় করিতে নারি !

কককেশা বিবশা রমণী

পাশে বসি করিছে রোদন !

কহ বিষয়ণ, কিবা এই শোচনীয় ছবি ?

• দেখ—দেখ, বস্ত্রে করি আচ্ছাদন

কাষ্ঠ-সম ল'য়ে বাদ স্পন্দহীন দেহ !

সার । বিচিত্র কালের গতি, তনু যুবরাজ !

আছিল চেতন,

এবে অচেতন মৃত্যুর পরশে ।

মহানিদ্ৰাগত !

এ অভাগা আর না জাগিবে ।

সিদ্ধা । কহ সত্য, ছন্দক, আমায়.

এ কি এই অভাগার কুলরীতি,

কিংবা সবাচার ও-ই পরিণাম ?

মহানিদ্ৰা-কোলে আমিও কি করিব শয়ন ?

সার । কৈশোর, যৌবন, বার্দ্ধক্য, মরণ—

ক্রমে ক্রমে ফলে কালে, যুবরাজ !

এই মানবের পরিণাম—

মৃত্যু ফেরে লাখে,

নাহিক নির্ণয় কবে কার হস্তিবে চেতন ।

সিদ্ধা । বুঝিলায়—জলবিষ-সম এ শরীর ।

গৌরব ইহার কিবা ?



অশ্রুবিষ প্রায় নর উঠে,
 অশ্রুবিষ-প্রায় পুনঃ টুটে ।
 পাছে মৃত্যু ফিরে, লক্ষ্য নাহি করে ;
 ভ্রাস্ত নরে তবু করে সুখ-আশা !
 জেনে-তুনে অন্ধ রহে চিরদিন !
 না জানি কি অলক্ষ্য প্রভাবে
 ভুলায় মানবে,
 দেখেও না দেখে,
 জেনেও না জানে ;
 আচরণে হয় অমুমান,
 যেন অনন্ত সময়ে
 কর না হইবে কার !
 ধিক্—ধিক্ সংসার-প্রয়াস,
 ধিক্ সুখ-আশা,
 ধিক্ এ জীবন, ধিক্ এ চেতন !
 শত ধিক্ ভঙ্গুর এ দেহে !
 ভাবি যনে আমার—আমার !
 কেবা কার মৃত্যু-পরে ?
 ও-ই হাহাকারে কাঁদিছে রমনী—
 কণ্ঠমূলে না পরশে ধ্বনি,
 ধরায় সঞ্চক নাহি আর !

(ভিক্ষুর প্রবেশ)

দেখ—দেখ,
 গৈরিক বসন, প্রশান্ত বদন,



কমণ্ডলু করে—ধীরে করে আগমন !

কহ মোরে এ রহস্য কিবা ?

সার । বাসনা করিলে পরিহার,

ভ্রমে দার-দার,

ভিক্ষাজীবী সংসার-সঞ্চর-হীন ;

শুখ-আশে দিয়া জলাঞ্জলি,

নির্জ্বলে উষ্মে পুণ্ড্র ;

ব্রহ্ম-উপাসনা বিনা নাহিক কামনা ।

সিদ্ধা । কোথা ব্রহ্ম ? কোথা তাঁর স্থান ?

তুনি ত্রিভুবন সৃজন তাঁহার ;

তবে কেন রোগ শোক করা,

দুঃখের আগার ধরা ?

মৃত্যু কেন এ জীবনের পরিণাম ?

জীবকুল কিবা অপরাধী,

নিরবধি সহে দুঃখ ?

সন্তানের দুর্গতি দেখিতে

পিতা কত নাহি পারে !

এ সংসার সন্তাপ-সাগর

সহে নর অশেষ ব্যথা,

কেন ব্রহ্ম না করে মোচন ?

রোগ-শোকে করে আর্তনাদ,

এ সংবাদ ব্রহ্ম নাহি পায় ?

কিংবা ব্রহ্ম

শক্তিহীন দুঃখের মোচনে ?



তবু আছে অবশ্য ইহার ;
 শাস্ত্রব্যাখ্যা সকলি অসার,
 শাস্ত্রকার অজ্ঞান সকলে ।
 সৰ্বশক্তিমান্ যদি ভগবান্,
 দয়াবান্ কভু সে ত নয় !
 সত্বর চালাও রথ—
 যাব আমি পিতার সদনে ;
 লইব বিদায় ভূমিখ ধরায়
 জ্ঞানালোক-অন্বেষণে ।
 হৃৎকের উপায়
 পারি যদি করিতে নির্ণয়,
 দেশে দেশে জনে জনে দিব উপদেশ ,
 কাঁদে প্রাণ এ দুর্গতি হেরি,
 আর গৃহে রহিতে না পারি ;
 মমতায় আর নাহি বন্ধ রব !
 মহাকাব্য সন্মুখে আমার,
 অলসে না হরিব জীবন ।
 মহাকাব্যে যদি মম শুধু হয় ক্ষর,
 শূন্যকালে প্রবোধিব মনে,
 বধাসাধ্য করেছি উভয় ।

[সকলের প্রশ্নান ।]

গিরিশচন্দ্র ঘোষ ।



কাদম্বিনী

১

খল কাদম্বিনী, দামিনীহাসিনী,
কে তুমি কামিনী,
 বিমানচারী ।
ভুবন ভ্রমণ কর কি কারণ,
 কি ভাবে কখন,
 বৃদ্ধিতে নারি ॥

২

কছু ঘোরাননা, আধার-বরণা,
 সাজ বিভীষণা,
 সময়-সাজে ।
দশনে দশন, কঠোর বর্ষণ,
 ত্রাহি ত্রিভুবন
 উগার বাজে ॥

৩

ভখন ভায়িনী সরস মেদিনী,
 জীবনদায়িনী,
 বরষি বারি ।



নাহি বুদ্ধি গতি, নাহি বুদ্ধি মতি,
 কিবা রসবতী,
 ভাব তোমারি ॥

৪

কহু ভয়ঙ্করী, কহু শুভঙ্করী,
 তুমি কৃপা করি
 বাঁচাও জীবের ।
 নাই ভয় বুকে, অনলের মুখে,
 থাক বা কি মুখে,
 এ খেলা কিবে ॥

৫

লতা-নগ্নাগিনী, শুক্ল-সোহাগিনী,
 সাজাও রঙ্গিনী,
 হাসাও ফুলে ।
 হৃকুল-বসনে, সোণার ভূষণে,
 হাস উষা সনে,
 মানস ভুলে ॥



৬

পাগলিনী-প্রায়, ধূলা-মাখা গায়,
ছিন্ন-ভিন্ন কার,
 শুইয়ে থাক ।
কখন উত্তলা, গমন চপলা,
ধরি বায়ু-গলা,
 সলিলে ডাক ॥

৭

সদা সুখ মনে, থাক গিরি-সনে,
 প্রেম-আলিঙ্গনে,
 বেড়িয়ে কাট ।
ভরল সলিলে, গড় ভূমি শিলে,
এ কি নাট-লীলে,
 দেখাও নটী ॥

৮

লোক-অগোচরে, তিমির-গহ্বরে,
 স্নেহে কোলে ক'রে,
 পাল গো নদী ।
সাগরে শয়ন, বিমানে ভ্রমণ,
যজ্ঞে ত্রিভুবন,
 লুকাও যদি



খচিত রতনে, হস্ত শরাসনে,
 পর সযতনে,
 নিবিড় কেশে ।
 রবি শশধরে ঘেরিলে আদরে,
 হেরে, সভা করে
 দেবতা এসে ॥

কেন চাতকিনী হব কুতূকিনী,
 মিহিরযোহিনী,
 তোমার দেখে ?
 ছুটে তারা আসে, পড়ে তব গ্রাসে,
 উঠিলে আকাশে,
 সাগর থেকে ?
 গিরিশচন্দ্র ঘোষ ।



দেবতা-ভিখারী

- ও কে, গান গেয়ে গেয়ে চ'লে যায় .
 পথে পথে ঐ নদীদ্বার !
- ও কে, নেচে নেচে চলে, মুখে 'হরি' বলে
 চ'লে চ'লে পাগলেরই প্রায় ।
- ও কে, যায় নেচে নেচে, আপনায় বেচে,
 পথে পথে শুধু প্রেম বেচে বেচে,
- ও কে, দেবতা-ভিখারী মানব-হৃদয়ে
 দেখে বা রে তোরা দেখে বা ।
- (ও লে) বলে 'কৈ ত কেউ পর নাই',
 (ও সে) বলে সবাই যে নিজ ভাই, .
- (ও সে) বলে 'শুধু হেসে, শুধু ভালবেসে
 (আমি আমি দেশে দেশে—এই চাই ।
- ও কে, প্রেমে মাতোয়ারা, চোখে বহে ধারা,
 কঁদে কঁদে সারা, কেন ভাই ?
- সব ঘেঘ-হিংসা ছুটি' আসি পড়ে পুটি'
 ও তার) . ধলি-মাথা ছ'টি রক্তা পায় ।



বলে, 'ছেড়ে দাও মোদের, মোরা চ'লে যাই !
 নৈলে প্রভু, তোমার প্রেমে গ'লে যাই !
 এ যে, নূতন যখুর প্রণয়েরই পুর
 হেথা আমাদের কোথা ঠাই ?'

(ঐ যে) নরনারী সব পিছে ধায়,
 (শুই) প্রতিধ্বনি শুঠে নীলিমায় ;
 (তোরা) আর সবে চ'লে, মুখে 'হরি' ব'লে,
 (তোদের) ছেঁড়াপুঁথি ফেলে চ'লে যায় ।

বিজ্ঞানেশ্বর লাল রায় ।

প্রতিমা

প্রতিমা দিবে কি পৃথিবী তোমারে —এ বিশ্ব নিখিল
 তোমারি প্রতিমা,
 মন্দির তোমার কি গড়িব মা গো ! মন্দির বাহার
 দিগন্ত নীলিমা ।

তোমার প্রতিমা—শশা, তারা, রবি,
 সাগর, নিকর, ভূধর, অটবী,
 নিকুঞ্জভবন, বসন্ত-পবন, তরু, লতা, ফল, ফুলমধুরিমা ।



সতীর পবিত্র প্রণয়-মধু,—মা ।
 শিশুর হাসিটি, জননীর চুমা,
 সাধুর ভক্তি, প্রতিভা, শক্তি,
 —তোমারি মাধুরী —তোমারি মতিমা ,

যেই দিকে চাই এ নিখিল ভূমি—
 শতরূপে মা গো ! বিরাজিত ভূমি,
 বসন্তে, কি শীতে, দিবসে, নিশীথে,
 বিকশিত তব বিভব-গরিমা ।

তথাপি মাটির এ প্রতিমা গড়ি',
 তোমাতে পূজিতে চাই মা ঈশ্বরি ।
 অমর কবির হৃদয় সন্তোর
 ভাষার বাহার দিতে নারে সীমা ,

ধূলিরে বেড়াই অবোধ আয়রা,
 দেখি না আপনি দিয়েছ মা । ধরা,
 ছয়ারে দাঁড়ারে হাতটি বাড়ায়ে,
 ডাকিছ নিয়ন্ত করুণাময়ী মা ।
 বিক্রেতলাল রায় ।



স্বদেশ আমার

স্বদেশ আমার । নাহি করি দরশন

তোমা-সম রম্যভূমি নয়ন-রঞ্জন ।

তোমার হরিৎ ক্ষেত্র, আনন্দে ভাসায় নের,

ভটিনীর মধুরিমা তোষে প্রাণ-মন

প্রভাতে অরুণ-ছটা, সায়াহ্ন-অধরে

সুসজ্জিত মেঘমালা কাশ্য রবিকরে,

নিম্নাঙ্গে শুধাংকুর তারা-মাথা নীলাধর,

কে ভুলিবে, কে ভুলিবে থাকিতে জীবন ।

কোথাও প্রকৃতি এত খুলিয়ে ভাণ্ডার

বিতরেন মুক্ত করে শোভারশি তাঁর ?

প্রতি ক্ষেত্রে, প্রতি বনে, প্রতি কুন্ত-উপবনে

কোথা এত, কোথা এত বিমোহে নয়ন ?

বাসন্ত কুমুদরাজি বিবিধ বরণ

চুখি কোথা এত স্নিগ্ধ বহে সমীরণ ?

অকলঙ্কি তব-সম কলকণ্ঠ বিহঙ্গম,

পাইব না, পাইব না গুঞ্জিয়া ভুবন ।

কোথাকার নৃশাবলী স্রচার এমন ?

যদায় বাইব আমি, তোমাতে জনমভূমি,

ভুলিব না, ভুলিব না জীবনে কখন

বিজ্ঞেন্দ্রলাল রায় ।

অন্তর্যামী

যখন দেখিতে নারি, অন্ধকার আসে,
 পথ ধুন্ধে মরে প্রাণ, তারি চারি পাশে ।
 কোথা হ'তে আল দীপ, সম্মুখে তাহার ?
 নয়নে দরশ আসে, চলে সে আবার ।

যখনি হৃদয়-নগ্রে ছিঁড়ে বায় তার,
 স্তব্ধ হ'য়ে আসে সঙ্গীতের ধার —
 কোথা হ'তে অলক্ষিতে তুমি দাও সুর ?
 যহান্ সঙ্গীতে হয় প্রাণ ভরপুর ।

চিত্তরঞ্জন দাশ ।



সেথা আমি কি গাহিব গান

সেথা আমি কি গাহিব গান ?

যেথা, . গভীর ওঙ্কারে, সাম ঝঙ্কারে,
কাপিত দূর বিমান ।

যেথা, হরসপ্তকে বাধিরা বীণা,
বানী তত্রকমলাসীনা,
রোধি' তটিনী-জল-প্রবাহ
তুলিত মোহন তান ।

যেথা, আলোড়ি' চন্দ্রালোক শারদ,
করি' হরিশুণ গান নারদ,
যন্ত্রমুখ করিত ডুবন,
টলাইত ভগবান্ ।

যেথা, যোগীশ্বর-পুষ্পাশরশে,
মূর্ত্ত রাগ উদ্ভিল হরষে ;
মুখ কমলাকান্ত-চরণে
জাহ্নবী জনম পান ।

যেথা, বৃন্দাবন-কেলিকুঞ্জে,
মুরলী-রবে পুঞ্জে পুঞ্জে,
পুলকে শিহরি' স্ফুটিত কুসুম,
যমুনা যেত উজ্জান ।

আর কি ভারতে আছে সে যন্ত্র,
আর কি আছে সে মোহন যন্ত্র,
আর কি আছে সে যধুর কণ্ঠ,
আর কি আছে সে প্রাণ ?

রজনীকান্ত সেন ।

সৃষ্টির বিশালতা

লক্ষ লক্ষ সৌর অগস্ত
নীল-গগন-গর্ভে,
তীব্রবেগ, ভীমমূর্ধি
স্রমিছে যন্ত গর্বে ।
কোটি কোটি, তীক্ষ্ণ-উগ্র
অনল-পিণ্ড-তারা
দুপুনাদে, ঝলকে ঝলকে,
উগরে অনল-ধারা ।
এ বিশাল দূত, ধীর
প্রকটে শক্তি-বিন্দু—
নয়ি সে সর্বশক্তিমান,
চির-কারণ-সিদ্ধ !

রজনীকান্ত সেন ।

অতুল

১

শরতের শুক্লা ষষ্ঠী—বামিনী সুন্দর
 লইয়া পাখালি কোলে শিশু শশধর,
 ছাড়িয়া স্মৃতিকাগার—তমো সুগভীর,
 গগন-অগ্ননে যেন হরয়েছে বাহির।
 এসেছে পাড়ার মেঘে তারা সমুদর,
 দেখিতে বিধুর মুখ সুধার নিলয়।
 আনন্দ-সলিলে ভাসে কুবুদ বিমল,
 পুলকে পাগল যেন চকোরের দল,
 উপবনে হাসে বহু কুমুম-বালিকা,
 সুগন্ধা রক্তনীগন্ধা স্বর্ণ-শেফালিকা।
 বাপিয়া বিশাল বঙ্গ কেবল উল্লাস
 জননী-স্নেহের আঙ্গ বিব-অধিবাস।

বাজে শঙ্খ বাজে ঘণ্টা বাজে ঢাক-ঢোল,
 পাড়া পাড়া, বাড়ী বাড়ী মহা গণ্ডগোল,
 এসেছে প্রবাসী পিতা পতি পুত্র ভাই,
 আনন্দ-সাগরে যেন ভাসিছে সবাই।
 নূতন বসন আর নূতন ভূষা,
 স্তনের সঙ্গীত বিধ শিশু শোভা পায়।

খেলিতেছে নব বেশে বালক-বালিকা,
স্বস্তিক-মঙ্গল মুখে পারিজাতে লিখা ।
ব্যাপিয়া বিশাল বঙ্গ কেবল মিলন,
জননী-স্নেহের আজ মহা-উদ্বোধন ।

২

একখানি গ্রাম-ভাসে জলময় মাঠে,
গঙ্গা-মৃত্তিকার ফোঁটা সাগর-ললাটে ।
একখানি বাড়ী তার আধার কেবল,
কলঙ্কী শশাঙ্ক তার পরিচয়-স্থল ।
জগত উজ্জল যার রজত-কিরণে,
সে নহে সমর্থ তার তমো-নিবারণে ।
জন্ডের জীবন জাগে অমৃত্তে বাহার,
শত মৃত্যু ঢালে তাহে সুধাকর তার ।
কোমল শীতল আলো তারার হীরক,
অধুত অঙ্গার-খণ্ড জলে ধব্ধ ধব্ধ ।
জগত-জীবন গ্রিড শাত সমীরণ,
সেও বেন বহে বুকে বাষ্পীয় মরন ।
ডাকিছে নিশার কাক—সেও অমঙ্গল,
উপরে আকাশ কাঁপে নীচে কাঁপে জল ।
পেচক কর্কশ কণ্ঠে দেয় রুড় তালি,
একটা মাঘের বুক রহিয়াছে খালি ।
ওই হাতে অভাগিনী টেনে ছিঁড়ে চুল,
চীৎকারে আকাশ ভাঙ্গে ‘অতুল । অতুল ।’

অন্ত গেছে দশমীর দীপ্ত শশধর,
আচ্ছাদিয়া অককারে আকাশ-গম্বর,
যেন কার ভবিষ্যের ভীষণ উদরে,
তারকার স্বপ্নগুলি হাবুডুবু করে ।

হত্যায় প্রহর গত — নিখিল ভুবন
একই শব্দায় শুয়ে ঘুমে অচেতন ।
তরলতা ঘুম যায়, ঘুম যায় ফুল,
পল্লবের কোলে কোলে ঘুমায় মুকুল ।
আকাশে হেলান দিয়া ঘুমায় পর্বত,
সমুখে সমুদ্র পাতা মহাশয্যাযৎ ।
নিরাশার নিষ্পেষিত মহা মরুভূমে,
কত বক্ষ অহিচূর্ণ আছে ঘোর ঘুমে ।
ঘাসে ঘাসে ঘুম যায় কত অশ্রুজল
সৈকতে শোকের ঝাঁপ ঘুমেতে বিহ্বল ।
দিশ্বন্ধ শ্রামমাঠ অনিবন্ধ নীবি,
অলিত-অঞ্চল অঙ্গে ঘুমায় পৃথিবী ।
অনন্ত শান্তির সুখা ভুঞ্জিছে সবাই,
একটা শায়ের চোখে শুধু ঘুম নাই ।
চিরদাহ-জাগরণ তার বৃকে দিয়া,
ঘুম যায় চিতাচুরী নিবিয়া নিবিয়া ।

দাঁড়ারে বাহির বাড়ী অভাগী জননী
ভাবিতেছে শূত্রপানে চেয়ে একাকিনী,



আসিয়াছে ঝাড়ী ঝাড়ী ছেলেপিলে সব,
বিজয়ার বিসর্জন-উৎসব নীরব !

কোলে নিয়া জননীরা আপন সন্তান,
কপোলে দিয়েছে চুষ শিরে দুর্কীধান !

সকলে পেয়েছে বুকে বুকভরা ধন,
আমার অতুল দেরি করে কি কারণ ?

অকণের অগ্র জ্যোতি মূহু পরকাশ,
প্রাণিয়া রক্ত-স্বর্ণে পূরব আকাশ !
অভাগিনী পাগলিনী আনন্দে ভাসিয়া,
হুই ভুজ মেলে যাব কোলে নিতে গিয়া !
চীৎকারে, 'অতুল মোর আসিতেছে অহ',
খুঁজিতে উড়িল কাক—'ক—ই, ক—ই, ক—ই ?'
মুরছিয়া ধরাতে পড়িলা জননী,
ভুলিতে সহস্র কর মেলে দিনমাণ ।
শেফালী ঝরিল আগে তারকা নিবিল,
রজনী সজনী তার শোকের আশ দিল ।
দেখিল পাড়ার শেষে লোকজন জমি,
জননী-ব্রহ্মের সেই বিজয়া দশমী !

গোবিন্দচন্দ্র দাস ।

শ্যামাদ্রী বর্ষাসুন্দরী

মুক্ত মেঘ-বাতাসনে বসি'
 এলোকেশা কে ঐ রূপসী ?
 জলযত্র ঘুরায়ে ঘুরায়ে,
 জলরাশি দিতেছে ছড়ায়ে ।
 রিম্ কিম্ রিম্ কিম্ করি'
 সারাদিন, সারারাত্রি, বারিরাশি পড়িছে অক্ষরি ।

চমকিল বিদ্যুৎ সহসা ।
 এ আলোকে বুঝিয়াছি, এ নারীরে চিনিয়াছি ,
 এ যে সেই সত্তত-সরসা,
 ছুবনমোহিনী ধনী রূপসী বরষা ।
 শ্যামাদ্রী বরষা আজি, বিহ্বলা মোহিনী সাজি'
 এলায়ে দিবেছে তার মসৌবর্ণ কালো কালো চুল ;
 শ্রীকণ্ঠে প'রেছে বালা অপরাজিতার মালা,
 ড'কর্ণে দোড়ল দোলে নীলবর্ণ সূক্ষ্মকার ফুল ।



নীলাধরী মাড়ীখানি পরি'

অপূর্ব যন্ত্রার রাগ ধ'রেছে স্তম্ভরী ।

অস্ত্র কেশরাশি হ'তে বেলকুল চৌদিকে ঝরিছে ;

কালো রূপ ফাটিয়া পড়িছে । যাই বলিহারি ।

কে দেখেছে কবে ভবে হেন বরনারী ?

দেবেন্দ্রনাথ সেন ।



ভক্তবৎସল ভଗବାନ

ঘেব নাহি কোন জনে,
 বাধে মৈত্রীর বন্ধনে,
 সূর্য্যজীবে সকল প্রাণ,
 নির্ভয় নিরহকার,
 সুখ দুঃখ সম বার,
 শত্রুতেও যেই কমাঝান ।

সতত সতটে বতী, আশা'পরে স্থিরমতি,
 সংসত্তায়া বেই জিতোজয়,
 আশাতেই বুদ্ধি মন সপরে জীবন ধন,
 সেই ভক্ত -আমার সে প্রিয় ।

অন্তে নাহি দেয় ব্যথা, অব্যর্থ আপনি তথা,
নাহি জানে চিন্তের বিকার,
হৃদ রাগ ভরোবেগ, ক্রোধের নাহি আবেগ,
সেই ভক্ত—প্রিয় সে আমার ।

নাহি কোন অভিকৃষ্টি, যিনি দক্ষ, যিনি শুচি,
উদাসীন রহে নিরাশার,
কর্ণে নাহি অহুঃরাস, বিষয়েতে বীভৎসরাস,
মেই ভক্ত—প্রিয় সে আমার ।

নাহি শোক হ'ব ঘেয়, আকাঙ্ক্ষার নাহি লেশ,
 শুভাশুভ না করে বিচার,
 আয়াতে অচলা ভক্তি, আমার অনন্তাসক্তি,
 সেই ভক্ত—প্রিয় সে আমার ।

শেষ

ফোটে ফুল ঝরে ঝাঝ, লুটায় ধূলায়,
 ভ'রে ঝাঝ বনতল পাটল পাতায় ;
 আকাশে হারাবে ঝাঝ পুরাণ দিবস,
 স্মৃতিতে জড়াবে থাকে স্মৃতি-পরশ ।
 অপি নব্বীনের শিরে মুকুট-রতন
 ফিরে যায় কুণ্ডাহীন চিরপুরাতন ;—
 আদি সে সফল হয় আসে ববে শেষ,
 রূপে রাগে ধরাধের মূর্তি নিকরদেশ !
 আসা যাওয়া ফরে চাওয়া,—যিছে অভিনয় ?
 প্রাণপণ আকিঞ্চন, একি কিছু নয় ?
 যুগ যুগ রহস্তের নিহৃত নির্ধর,
 জলধনু-তোরণের বর্ণ-রেণু শর
 কোথা যায় ? কে শুধায় ? মুক নিরুত্তর—
 কাঞ্চন-শৃঙ্গের মত কি মস্ত্রে নিধর !—
 হায় ক্রব কোথা খুঁজি ! মুছি অশ্রুধারা—
 অতল স্পর্শের তলে কোথা হই হারা ।

এ কি রঙ্গ ! অদুরন্ত জন্ম মৃত্যু খেলা—
 তরুখলী-পতুপক্ষী-পতঙ্গের মেলা ।
 মুক্ত দ্বার,—অবারিত প্রাণের ভাঙার—
 অকস্মাৎ ধ্বনিকা মাঝখানে তার ।—



কবে বল' কোথা কোন্ নেশা-আড়ালে,
কোন্ রক্তনীর প্রান্তে দীপ্ত চক্ৰবালে,
সুগ্রাইবে এ বিরহ ? পারাবার-শেবে
চুড়িৰ অনন্ত বেলা তোমারি উদ্দেশে !

সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর !

বিজয়া *

বিনাবেধে বজ্রঘাত,
 অকস্মাৎ ইন্দ্রপাত,
 বিনাবাতে নিভে গেল মঙ্গল প্রদীপ ।
 শমন পাইত শঙ্কা,
 সম্মুখে শোনাতে ডঙ্কা,
 প্রবাসে ত্বরবেশে হইল প্রতীপ ॥

হৃদয় প্রতাপে পুষ্ট,
 পাটবাণে তরু ছুট,
 অশিষ্ট-শাসনপটু শিষ্টের সহায় ।
 বিজ্ঞাপীঠে গোষ্ঠিপতি,
 একচেট্ট ছটমতি,
 জয়পত্র-লিপ্ত ভালে সর্বত্র সভায় ॥

দ্বিজবুদ্ধি, তেজে ক্ষত্র,
 কৰ্ম্মক্ষেত্রে যত্র তত্র,
 অধিপতি একচ্ছত্র জন্ম অধিকার ।
 প্রতিভার পূর্ণদৃষ্টি,
 করিত নূতন সৃষ্টি,
 ধ্বংসমুখী নহে যাত্র চিত্ত অবিকার ॥



কেশাগ্র নখাস্তে দীপ্ত,
জাগ্রত জীবন লিপ্ত,
শুষ্ক দেহ দীপ্ত মন সুবিরাট্ কাষ ।
মরণের হলো বশ্ত,
মুহুর্তে হইল ভঙ্গ,
অধরের চিরহাস্ত নিমেষে শুখায় ॥

বঙ্গ-কণ্ঠ শূন্য ক'রে,
বিহার কি হার হরে,
অগ্নি জ্বলে দিলি যেবে ভগ্নীর অন্তরে
অহিংসার জগদ্বূমি,
বুদ্ধের অনন্য তুমি,
বিশ্বত্ৰিতে বিসজ্জিলি গৌতম-মন্তরে ॥

ধ্যানে ধার ছিল দৃষ্টি,
নবীন নাগন্দা-সৃষ্টি,
ভারতের ভারতীয়ে জাগাতে আবার ।
আলো দিতে এ জগতে,
জ্ঞান-জ্যোতি প্রাচ্য হ'তে,
পুনরায় দায় বাতে বারিতে আধার ॥

না হইতে কণ্ঠ-সঙ্গ,
মধ্যপথে ব্রত-ভঙ্গ,
বঙ্গের বরাদ্দ বীর লুকাল কোদায়



তদ্রাহীন কর্ষ রঙ্গে
বিরোধ বিশ্রাম সঙ্গে,
আলস্ত উপাস্ত চির হলো ছলনার ॥

সার্থক পুরুষ নার,
শৌর্যের পূর্ণধাম,
কমবান্ দম্ভি-দৰ্প করিসারে চূর্ণ ।
দীনজনে আশুতোষ,
বিদ্রোহীকে ক্রুদ্ধরোষ,
বিজ্ঞানে বহুদ-বাধে বেধে নিতে তূর্ণ ॥

এ বছের বত ছাত্র,
ছিল তব মেহপাত্র,
তারাই তো পুত্র মিত্র আগত অতিথি ।
অনর্গল গৃহধার,
ঢল ঢল হৃদাধার,
কত অশ্রুজল দেব মুছায়েছ নিতি ॥

মাতৃ-গোত্রে প্রীতি অতি,
আশুতোষ সরস্বতী—
উপাধি-ভূষণ তব বিজয়-নিশান ।
দেখিতে দেখিতে হাব,
সরস্বতীপূজা সার,
বিজ্ঞানের বিজয়ার প্রতিমা-ভাসান ॥



এ নগরী নিরানন্দে,
সাজাইয়া পুষ্প-গন্ধে
দেব-দেহ লয়ে স্বকে করিল বহন ।
জগত জাগারে নামে,
ফিরে গেলে নিজ ধামে, -
আদিগঙ্গা-তীর্থ-তীরে দেহের দাহন ॥

অমৃতলাল বসু ।

অতিথি

১

সন্ধ্যা-তারকা উঠেছে তখন
 - - - গগন-পারে,
 আসিল সে একা — অজানা অতিথি
 আমার ঘারে ।

চাহিলু যেমনি মুখপানে তার,
 মনে হ'ল — সে যে চির আপনার,
 বলল করিয়া যন্নিবে যোর
 লইলু তারে ।

আসিল সে যবে অজানা অতিথি
 আমার ঘারে !

রতন-প্রদীপ জালিয়া অমনি
 ঘটন-ভরে

কুম্ভ-আসন করিলু রচনা
 তাহার তরে ।

ভুলি' ছরাশায় ভাবিলাম মনে—
 প্রবাসীর শত স্নেহের বাধনে
 'চিরদিন তরে এই গৃহ-মাঝে
 রাখিব ধরে' ।

কুম্ভ-আসন করিলু রচনা
 ঘটন-ভরে ।

২

তখনো প্রাচীতে আসেনি অরুণ,
জাগেনি পাখী,
তখনো নিদ্রা- আবেশে অবশ
আমার আঁখি ।

ঘড় ছাড়ি আসি অতিথি আমার
বাহিরিল পথে একাকী আমার,
নিবাসে প্রদীপ গৃহখানি মোর
আঁধারে ঢাকি ।

তখনো প্রাচীতে আসে নাই উষা
জাগেনি পাখী ।
জানি না কোথায় কতদূর তার
আপন দেশ,
কবে হবে তার এই নিদারুণ
যাত্রা শেষ ।

দিয়াছি য় মোর বস্ত উপহার,
ফেলে গেছে সব, তবু মনে তার
জাগিবে কি কভু অগ্নিক নিশার
স্বপ্নের লেশ ।

এই নিদারুণ যাত্রা তাহার
কোথায় শেষ ।



০

কণ্ঠে তাহার

ছিল অমূল্য

রতন-হার,

ছিন্ন করিয়া

ফেলে গেছে যত

✱ মুকুতা তার!

তার সেই ধন কোথা আমি রাখি ?

হারাই হারাই ভয়ে সলা থাকি,

অতিথি আমার ফিরিয়া কি কভু

আসিবে আর ?

হার ছিঁড়ে সে যে

ফেলে গেছে যত

মুকুতা তার !

রঘুনীমোহন ঘোষ ।

মানব-বন্দনা

সেই আদি-যুগে যবে অসহায় নর

নেত্র মেলি' তবে

চাহিয়া আকাশ-পানে—কারে ডেকেছিল,

দেবে, না মানবে ?

কাতর আহ্বান সেই যেখে যেখে উঠি'

মুটি' গ্রহে গ্রহে.

কিরিয়া কি আসে নাই, না পেয়ে উত্তর,

ধরার আগ্রহে ।

সেই দুর অন্ধকারে, যকৃত-গর্জনে,

কার অবেষণ ।

সে নহে বন্দনা-গীতি, ভয়াৰ্ত্ত -সুধাৰ্ত্ত

ধুঁজিছে স্বপ্নন ।

২

আরক্ত প্রভাত-সূর্য উদিল যখন

ভেদিয়া' তিমিরে,

ধরিত্রী অরণ্যে ভরা, কর্দ্দমে পিচ্ছিল—

সলিলে শিশিরে ।



শাখায় আপটি' পাখা গরুড় চৌংকারে,

কাণ্ডে সর্পকুল ;

সম্মুখে আপদ-সজ্জ বদন ব্যাদানি'

আছাড়ে লাস্কুল ;

দংশিছে ~~ক~~ ক মাত্রে, পদে সরসীস্থল,

শূন্নে শ্বেন উড়ে ;—

কে তাহারে উদ্ধারিল ? দেব, না মানব—

প্রস্তরে লগুড়ে ?

৩

শীর্ণ অবসন্ন দেহ, গতিশক্তি-হীন,

স্থখার অস্থির ;

কে দিল তুলিমা মুখে স্বাদ পক ফল,

পত্রপুটে নীর ?

কে দিল মুছায়ে অশ্রু ? কে বুলা'ল কর

সর্কাসে আদরে ?

কে নব-পলবে দিল রচিয়া শরন

আপন গহ্বরে ?

দিল করে পুষ্পগুচ্ছ, শিরে পুষ্পলতা,

অতিথি-সংকার ;

নিশীথে বিচিত্র সুরে বিচিত্র ভাষায়

স্বপন-সস্তার।

শৈশবে কাহার সাথে জলে হলে ভসি'
শিকার-সকান ?
কে শিখাল ধহুর্ষেদ, বহিত্র-চাগনা,
চর্ষ-পরিধান ?
অক্লি-দগ্ধ যুগমাংস কার সাথে বসি'
করিমু ভক্ষণ ?
কাঠে কাঠে অগ্নি জ্বালি' কার হস্ত ধরি'
কুন্দন নর্তন ?
কে শিখাল শিলাভূপে, অখণ্ডের মূলে
করিতে প্রণাম ?
কে শিখাল ঋতুভেদ, চন্দ্র-সূর্য-মেঘে,
দেব-দেবী নাম ?

কৈশোরে কাহার মনে মৃত্তিকা কর্ণে
হইল বাহির ?
মধ্যাহ্নে কে দিল পাত্রে শালি-অন্ন ঢালি'
দধি দুগ্ধ ফোর ?
সাম্রাহ্ণে কুটীরচ্ছায়ে কার কণ্ঠ সাথে
নিবিদ্ উচ্চারি' ?
কার আশীর্ব্বাদ ল'য়ে অগ্নি সাক্ষী করি'
হইল সংসারী ?



কে দিল ঐষধি রোগে, কতে প্রলেপন,
 যেহে অতুরাপে ?
 কার ছন্দে—সোম-গন্ধে—ইন্দ্র অগ্নি বায়ু
 নিল বজ্র-ভাগে ?



৬

কৌবনে সাহায্যে কার নগর-পত্তন,
 প্রাসাদ-নির্মাণে ?
 কার ঋক্ সাম যজুঃ, চরক সুশ্রুত,
 সংহিতা, পুরাণ ?
 কে গঠিল দুর্গ, সেতু, পরিখা, প্রণালী,
 পথ, ঘাট, মাঠ ?
 কে আজ পৃথিবী-রাজ ? জলে স্থলে ব্যোমে
 কার রাজ্যপাট ?
 পঞ্চভূত বশভূত, প্রকৃতি উন্নত,
 কার জ্ঞানে বলে ?
 ভুক্তিতে কাহার রাজ্য—অন্নিপেন হরি
 যথুরা কোশলে ?

৭

প্রবীণ-সমাজ-পদে, আজি প্রৌঢ় আমি
 যুড়ি' ছই কর,
 নমি, হে বিবর্ত-বুদ্ধি ! বিদ্যৎ-মোহন,
 বজ্রমুষ্টিধর !

চরণে ঝটিকাগতি—ছুটিছ উধাও

দলি' নীহারিকা !

উদীপ্ত তেজসনেত্র—হেরিছ নির্ভরে

সপ্তসূর্য্য-শিখা !

এহে এহে আবর্তন—গভীর নিনাদ

তুনিছ শ্রবণে !

দৌলে মহাকাল-কোলে অণু পরমাণু—

বুঝিছ স্পর্শনে ।

নমি, হে সার্থক-কাম ! স্বরূপ তোয়ার

নিত্য অভিনব ।

যর দেখে নহ যর, অমর-অধিক

দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্য তব ।

ল'রে গলাজুল মেহ, স্থলবুদ্ধি তুমি

অস্মিলে অগতে,—

তুমিলে সাগর শেষে, রসাইলে মর,

উড়ালে পর্কতে ।

গঠিলে আপন যুক্তি—দেবতা-লাঞ্ছন,

কালের পৃষ্ঠায় !

গড়িছ—ভাঙিছ তুকে, দর্শনে, বিজ্ঞানে,

আপন অটায় !



৯

নমি, হে বিশ্বগ-ভাব ! আজন্ম চকল,
 বিচিত্র, বিগুল !
 হেলিছ—হলিছ সদা, পড়িছ আছাড়ি',
 ভাবি' সীমা—কূল !
 কি ধ্বংস—কি ধ্বংস, লক্ষন—গজ্জন,
 বন্দ—বহামার !
 কে ডুবিল—কে উঠিল, নাহি দয়ামায়া,
 নাহিক নিস্তার !
 নাহি তৃপ্তি, নাহি আশ্রিত, নাহি আশ্রিত ভয়
 কোথায়—কোথায় !
 চিরদিন এক লক্ষ্য,—জীবন-বিকাশ
 পরিপূর্ণতার !

১০

নমি তোমা, নরদেব ! কি গর্বে গৌরবে
 দাঁড়ায়েছ তুমি !
 সর্বাত্মে প্রভাত-রশ্মি, শিরে চূর্ণ মেঘ,
 পদে শল্যভূমি ।
 পশ্চাতে মন্দির-শ্রেণী, সূর্য-কলস
 অলসে কিরণে ;
 বালক-সমুখিত নবীন উদগোধ
 গগনে পবনে ।



হৃদয়-স্পন্দন সনে ঘুরিছে জগৎ,
চলিছে সময় ;
কতক্বে—ফিরিছে সঙ্গে—ক্রম ব্যতিক্রম,
উদয় বিলয় ।

১১

নমি আমি প্রতিজ্ঞে,—আধিষ্ণ চণ্ডাল,
একু ক্রীতদাস !
সিন্ধুমূলে জলবিন্দু, বিশ্বমূলে অণু,
সমগ্রে প্রকাশ !
নমি, কৃষি-তন্তু-জীবী, স্থপতি, ডাক্তর,
কর্ম-চর্ক-কার !
অদ্রিতলে শিলাখণ্ড—দৃষ্ট-অগোচরে
বহু অজি-ভার !
কত রাজ্য, কত রাজা গড়িছ নীরবে
হে পূজ্য, হে প্রিয় !
একবে বরণ্য ভূমি, শরণ্য এককে,—
আস্তার আশ্রয় ।

অক্ষয়কুমার বড়াল ।



নমস্কার

অনাদি অসীম অতল অপার

আলোকে বসতি যার,—

প্রলয়ের শেষে নিখিল-নিলয়

সৃজিল যে বার বার,—

অহঙ্কারের তন্ত্রী পীড়িত

বাজায় যে ওঙ্কার,—

অশেষ চন্দ্র যার আনন্দ

তাহারে নমস্কার ।

শ্রী-রূপে কমলা ছায়া-সম যার

আদরে ও অনাদরে,—

মালা দিল যারে সরস্বতী সে

আপনি স্বয়ম্বরে,—

কৌমুদী আর বন-কুল-হার

সমতুল থেমে যার,—

যার বরে তমু পেয়েছে অভয়

তাহারে নমস্কার ।

ভাবের গঙ্গা শিরে যে ধরেছে,

ভাবনার জটাতার,—

চির-নবীনতা শিশু-শশিরূপে

অক্লিষ্ট ভালে যার,—



জগতের মানি-নিন্না-গরল

বাহার কণ্ঠহারি,—

সেই গৃহবাসী উদাসী জনের

চরণে নমস্কার ।

সৃজন ধারার সোনার কমল

ধরেছে যে জন বৃকে,—

শরীতক-সম রক্ত অনল

বহিছে শাস্ত্রমুখে,—

অমুখন যেই করিছে মধন

অতীতের পারাবার,—

অনাগত কোন অমৃতের লাগি,—

তাহারে নমস্কার ।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ।

বুদ্ধ-পূর্ণিমা

মৈত্র-করুণার যন্ত্র দিতে দান

জাগ হে মহীমান্ ! মরতে মহিমায ,

সৃজিছে অভিচার নিষ্ঠুর অবিচার

রোদন-হাহাকার গগন মহী ছায় ।



নিরীহ বস্ত্রালের শোণিতে অহরহ

ভাসিছে সংসার, হৃদয় মোহ পার,
হে বোধিসত্ত্ব হে ! মাগিছে মর্ত্য বে
ও পদ-পঙ্কজে শরণ পুনরায় ॥

মনন-ময় তব শরীর চির নব

বিরাজে বাণীকূপে অমর ছাতিমাম্ ;
তবুও দেখে ধরি' এস হে অবতারি'
হিংসা-নাগিনীরে কর হে হতমান ।

অগত বাধা-ভরে জাগিছে জোড়-করে

এ মহা-কোজাগরে কে দিবে বরদান,
এস হে এস প্রেয় ! এস হে মৈত্রেয় !
ক্রুরতা-মূঢ়তার কর হে অবসান ॥

হে রাজ-সন্ন্যাসী ! বিমল তব হাসি

ঘুচাক্ মানি তাপ কলুষ সমুদায় ;
ক্ৰোধে অক্ৰোধে জ্বিনিতে দাও বল,
চিত্ত বে বিচলিত,—চরণে রাখ তায় ;

নিখিলে নিরবধি বিস্তর 'সম্বোধি'

যরমী ছোক্ লোক তোমারি করুণায় ;
কুবন-সাধরের হে মহা-শতদল ।
জাগ হে ভারতের মূণালে পরিমায় ॥



চাঁদের করে গড়া করত সুকুমার,
 ভুবন-মরুভূমে সুরতি চারুতার ;
 বিরাজো চারু হাতে অমিত জোছনাতে
 জুড়াতে জগতের পিরাসা অমিয়ার ।

তোমারি অমুরাগে অমৃত তারা জাগে,
 তুষিত আঁখি মাগে করণ আর বার,
 ভারত-ভারতীর সারথি চির, ধীর,
 তোমারি পায়ে ধায় আকৃতি বসুধার ॥

মুনির শিরোমণি । হৃদয়-ধনে ধনী ।
 চিন্তা-মণি-মালা তোমাতে ঘিরি ভার,
 বসিয়া ধ্যান-লোকে নিখিল-ভরা শোকে
 আজো কি শতধারা কমল-আঁখি ছায় ?

যমতাময় ছবি । তোমাতে কোলে লভি'
 ভূষিত হ'ল ধরা স্বরগ-সুখমার,
 করুণা-সিদ্ধ হে ! ভুবন-ইন্দু হে !
 ভিখারী জগজ্জয়ী ! প্রাণতি তব পার ॥

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ।



বৈকালী

১

অকূল আকাশে
অগাধ আলোক হাসে,
আমারি নয়নে
সন্ধ্যা ঘনায় আসে।
পরান ভরিছে আসে।

২

নিভৃত আশি
নিখিলে নিরখে কালি,
মন রে আমার
সাজা তুই বৈকালী,—
সন্ধ্যামণির ডালি।

৩

দিন ছ'পহরে
সৃষ্টি যেতেছে মুছি';
দৃষ্টির সাথে
অন্ত কি বার ঘুচি' ?
হায় গো কাহারে পুছি !

৪

একা একা আছি
 কুখিয়া জানালা দ্বার,—
 কাজের যামুখ
 সবাই বে ছনিয়ার,—
 সব কে দিবে আর ?

৫

অরি একা একা
 পুরাণো দিনের কথা
 কত হারা হাসি
 কত মুখ কত বাধা
 বুক-ভরা ব্যাকুলতা ।

৬

দিনেক ছ' দিনে
 মোহনিয়া হ'ল বুড়া !
 অন্নের ছবি
 ছুতে ছুতে হ'ল শুড়া—
 ডাটা-সার শিখিচুড়া ।

৭

স্মৃতি-যাত্রাবরে
 বতগুলি ছিল দ্বার
 উধাড়ি উধাড়ি
 দেখিছু বারংবার,
 ভাল নাহি লাগে আর ।



৮

দিন কত পরে
 পুরাণো না দিল রস,
 শুকায়ে উঠিল,—
 শূণ্য সুখা-কলস
 চিত্ত না মানে বশ ।

৯

চিত্ত না মানে
 বুক-ভরা হাহাকার,
 যত্ন-অধিক
 নিবিড় অন্ধকার
 সমুখে যে আমার ।

১০

ফাগুনের দিনে
 এ কি গো প্রাণবী মসী !
 বিনা মেঘে বৃষ্টি
 বজ্র পড়িবে খসি,
 নিরালায় নিঃশ্বসি ।

১১

সহসা আধারে
 শেলার পরশ কার ?—
 কে এলে দোসর
 ছুখে করিতে পার ?
 ঘুচাতে অন্ধকার !

১২

কার এ মধুর
পরশ সাধনার ?
এত দিন যারে
করেছি অস্বীকার।—
আস্বীয়া আস্বার !

১৩

জলে কি গো তুমি
এলে কি আমার চিতে ?
পূজা যে করেনি
বৈকালী তার নিতে ?
এলে কি গো এ নিহতে ?

১৪

দুঃখ-মণ্ডিত
চিত্ত-সাগর-জলে
আমার চিন্তা-
মণির জ্যোতি কি জলে !
অতল অশ্রু-তলে !

১৫

দুঃখ-সাগর
যত্ন-করা মণি,
অভয়-শরণ
এসেছ চিন্তামণি !
জনম ধন্ত গণি ।

১৬

বাহিরে তিমির
 বনাক্ এখন তবে,
 আজ হ'তে তুমি
 রবে মোর প্রাণে রবে,—
 হবে গো দোসর হবে ।

১৭

বাহিরে যা' খুসী
 হোক গো অতঃপর,
 মনের ভুবনে
 তুমি ভুবনেশ্বর
 নির্ভয়-নির্ভর ।

১৮

এমনি যদি গো
 কাছে কাছে তুমি থাক,
 অতর হস্ত
 যন্তকে যদি রাখ—
 কিছু আমি ভাবিনাক ।

১৯

আখি নিয়ে যদি
 ফুটাও মনের আখি,
 তাই হোক ওগো
 কিছুই রেখ না বাকী,
 উষল চিত্তে ডাকি ।



২০

হুটি হাত দিয়ে
ঢাক যদি তু' নয়ন,
তবুও তোমার
চিনে নেবে মোর মন ,
জীবন-সাধন-ধন ।

২১

পদের দত্ত
নয় গো এ আঁখি নয়,
তবু যদি নাও—
নিতে যদি সাধ হয়,
দিতে করিব না ভয় ।

২২

আজি আমি জানি
দিয়েও সে হ'ব ধনী—
চোখের বদলে
পাব চক্ষের যদি—
দৃষ্টি চিরন্তনী ।

২৩

জয় ! জয় ! জয় !
তব জয় প্রেমময় !
তোমার অভয়
হোক প্রাণে অক্ষয় ।
জয় ! জয় ! তব জয় !



১৩৬

বৈকালী

২৪

প্রাণের তরাস
মরে ঘেন নিঃশেষে,
দাঁড়াও চিন্তে
মৃত্যু-হরণ বেশে,
দাঁড়াও মধুর হেসে।

২৫

আমি কুলে বাই—
তুমি ভোলো নাকো কত,
ককশা-নিরাশ-
জনে কৃপা কর তবু!
জয়! জয়! জয় প্রভু!

সত্যোত্তরনাথ দত্ত।

আজমীর

বিপুল সাগর-বারি বিদারি' যেমন.
সিকুচর মহানাগ জাগায় শরীর,
তেমনি বালুকাসিকু করি' বিদারিত
বিরাজে অর্কলিগিরি রাহোয়ারাদেশে,
ব্যাপি' শতক্রোশাধিক । কোণা বক্রদেহ,
কজু কোণা, কোন স্থলে কুণ্ডলিতপ্রাণ.
কোণা যত্ন, অবিদুরে ভাসমান পুনঃ ।
শিরোমণি রূপে তার শোভে আজমীর,
শৈল-কিরীটিনী পুরী ; যুগ যুগাবধি
একাধারে ধর্ম্মে, কর্ম্মে অতুল ভারতে ।

এই আজমীর বক্ষে ভক্তিসরোরূপী
বিরাজিছে তীর্থরাজ স্বধন পুঙ্কর ;
দেশ-দেশান্তর হ'তে, বাকুলহৃদয়,
আসে বধা নর, নারী প্রক্ষালন তরে
কায়মনোগত পাপ । এই তীর্থভটে
আচরিলে মহাতপ, ব্রহ্মজান-আশে,
প্রত্যক্ষ পুঙ্কষকার বিশ্বামিত্র ঋষি ;
পুণো, পাণে, জীবনের উত্থানে, শতনে
শিক্ষা দিয়া নরকূলে ইন্দ্রিয়-বিজর,
ইষ্টসিদ্ধি সাধ্য, যদি রহে দৃঢ়পণ ।

এই আজমীর-মাঝে, নাগটেল 'পরে,
আচরিলে তপ সেই মহাপ্রাণ ঋষি



অগস্ত্য, স্বেচ্ছায় যিনি ত্যজি' চিরতরে
স্বদেশ, স্বজাতি, প্রাণ করিলা অর্পণ
উজ্জ্বলিত উপেক্ষিত অনার্য্য-সম্মানে ;
রচি' শাস্ত্র, সৃজি' বিধি, নবীন জীবন
সংগঠিলা দাক্ষিণাত্যে ; প্রশান্ত, সুন্দর
এখনও আশ্রম তাঁর বিরাজিছে হেথা ।

এই আজমীর-মাথো রাজা ভড়হরি,
জজ্জ্বরিত মনস্তাপে, করি' বিসর্জন
মায়াহা, সম্রম, সুখ, কাটাইলা কাল
চোর-কমণ্ডলু লয়ে । “শতক” তাহার
এখনও মধুর রসে তৃপ্ত করে নরে ।

এই আজমীর-মাথো দয়ানন্দরামী,
কন্দিষ্ঠ, নিভীক ঋষি, ব্যথিত হৃদয়,
নিরখিয়া আর্য্যসূত্রে বেদমাগ হ'তে
পরি-দ্রষ্ট, দৃঢ়পণে এমি' দেশে দেশে,
লাঞ্ছনা, গল্পনা, স্তুতি তুল্য উপেক্ষিয়া,
প্রচারিয়া বেদধর্ম, লভিলা বিপ্রাম ।

কিন্তু তপঃক্ষেত্র মাত্র নহে আজমীর,
প্রকৃতির রম্যোদ্ভান ; ভূধরে, নির্ধরে
নিরন্তর চিত্তহারী । পার্শ্বে নগরীর
দাঁড়াইয়া নাগশৈল ; শ্রাম শোভাময়,
মুখরিত বিহগের মধুর সঙ্গীতে ;
সুমনস্ক সমীরে স্নিগ্ধ ; বরষা-সম্ভারে
বহুত নির্ধর-রবে । অদূরে পুন্ডীর



যোগীন্দ্রনাথ বসু

১৩৯

নীলগিরি, রত্নগিরি, গিরি স্বর্ণচূড়
প্রাচীর আকাশে বেড়ি' রক্ষিছে পুঙ্করে ।
মাতৃবক্ষে স্তন-সম অমৃত-পূরিত
নগরীর মধ্যে শোভে রম্য হৃদয়,
আনাসরোবর তথা বিশাল মার্গর
চৌগানের পুণ্যকীর্তি শিরে নগরীর
বিরাজিত ভাগ্যগিরি ; হৃৎকণ্ড প্রাকারে
পরিবৃত ভূর্গ দ্বার উচ্চে তুলি' শির,
করে উপহাস নপা অরাতি-মৈনিকে ।

এই আজমীর তরে মহাবুদ্ধ কত
হিন্দু-মুসলমানে, তথা যোগল-পাঠানে,
রাজপুতে-রাজপুতে, মাইঠা-ইংরাজে,
ঘটিয়াছে যুগে যুগে । প্রতি গিরি, নদী,
প্রতি শিলা, প্রতি রেণু করিছে ইহার
গৌরব-কাহিনী কত মর্মবিঘাতিনী
পাপ-পুণ্যময়ী কথা । রাজ-নিকেতন
হইয়াছে পাহালা ; হিন্দু দেবালয়
ধরেছে মসজিদ-মুন্দি । সর্বধর্মসম্মিল
অতীতের চিহ্নগুলি মুছি' একে একে
জানাইছে আধিপত্য । হে পাঠক । যদি
তপঃক্ষেত্রে রণক্ষেত্র চাহ দেখিবারে,
এস, মোর সাথে, যাই আজমীর মাঝে ।

যোগীন্দ্রনাথ বসু ।



ভারতলক্ষ্মী

অগ্নি ভুবনমনোমোহিনী ।
অগ্নি নির্মল সূর্য্যকরোজ্জল ধরলী
জনক-জননী-জননী ।

নীল-সিন্ধু-জল-ধৌত চরণতল,
অনিল-বকস্পিত গ্রামল অঞ্চল,
অমর চূড়িত ভাল হিমাচল,
সুন্দ-তুয়ার-কিরীটিনী ।

প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে,
প্রথম সামর্য তব উপোষনে
প্রথম প্রচারিত তব বনভবনে,
জ্ঞানধর্ম কত কাব্যকাহিনী ।

• চিরকল্যাণময়ী তুমি ধনু,
• দেশ-বিদেশে বিস্তরিছ অর,
• জাহ্নবী-যমুনা-বিগলিত করুণা
পূণাপীষ্ম স্তম্ভবাহিনী ।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।



তাজমহল

এ কথা জানিতে তুমি, ভারত-ঈশ্বর সা-জাহান,
কালশ্রোতে ভেসে যার জীবন যৌবন ধন মান ।

ওধু তব অন্তর-বেদনা
চিরন্তন হ'রে থাক্ সম্রাটের ছিল এ সাধনা ।

রাজশক্তি বহু-সুকঠিন
সন্ধ্যারস্তুরাগসম তদ্রাতলে হয় হোক শীন,
কেবল একটি দীর্ঘশ্বাস

নিত্য উচ্ছ্বসিত হ'রে সক্রম করক আকাশ—

এই তব মনে ছিল আশ ।

হীরামুক্তাশাণিকোর ঘটা

যেন শূন্য দিগন্তের ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা

যার যদি লুপ্ত হ'রে থাক্,

ওধু থাক্

এক বিদ্যু নবনের জল

কালের কপোলতলে শুধু সমুজ্জল

এ তাজমহল ।

হার যে মানবহৃদয়

বারবার

কারো পানে ফিরে চাহিবার

নাই বে সময়,

নাই নাই ।

জীবনের খরস্রোতে ভাসিছ সঙ্গাই ।

ভুবনের ঘাটে ঘাটে ;—

এক হাতে লগ্ন বোঝা, শূন্য করে লগ্ন অস্ত্র হাতে ।

দক্ষিণের যত্র-শুক্ররশে

তব কুঞ্জবনে

যমস্বের মাধবী-যজ্ঞরী

বেহুফে দেয় ভরি'

মালকের ঢকল অকল,

বিদায় গোদুলি-আসে ধূলায় ছড়ায়ে ছিন্নদল ।

সময় যে নাই ;

আবার শিল্পিররাতে তাই

নিকুঞ্জে ফুটায় তোলে নব কুন্দরাজি

সাজাইতে হেমস্বের অশ্রুভরা আনন্দের সাজি ।

হায় রে হৃদয়

তোমার সঞ্চয়

দিগান্তে নিশান্তে পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হয় ।

নাই নাই, নাই যে সময় !

হে সত্রাট, তাই তব শঙ্কিত হৃদয়

চেয়েছিল করিবারে সময়ের হৃদয় হরণ

গৌন্দর্য্যে ভুলিয়ে ।

কণ্ঠে তার কি মালা ছলিয়ে

করিলে বরণ



রূপহীন মরণেরে যুহুহীন অপরাধ সাথে ?

ওহে না যে

বিলাপের অবকাশ

বারোঘাস,

তাই তব অশান্ত কন্দনে

চিরমৌন জাল দিগে বেধে দিলে কঠিন বন্ধনে ।

জ্যোৎস্নারাত্রে নিহৃত মন্দিরে

প্রেমসৌধে

যে নাথে ডাকিতে ধীরে

সেই কানে-কানে-ডাকা রেখে গেলে এইখানে

অনন্তের কানে ।

প্রেমের করুণ কোমলতা

কুটিল জা'

সৌন্দর্যের পুষ্পপুঞ্জে প্রশান্ত পাষাণে,

হে লম্বাটু-কবি,

এই তব হৃদয়ের ছবি,

এই তব নব মেঘদূত,

অপূর্ব অদৃত

ছন্দে গানে

উঠিয়াছে অলঙ্কার পানে

যেথা তব বিরহিনী প্রিয়া

রয়েছে মিশিরা



প্রভাতের অরুণ আভাসে,
 ক্লাস্ত-সন্ধ্যা দিগন্তের করুণ নিখাসে,
 পূর্ণিমায় দেহহীন চামেলির লাবণ্য-বিলাসে,
 ভাষার অতীত তীরে
 কান্তাল নরন বেদা ঘার হ'তে আসে ফিরে ফিরে ।

তোমার সৌন্দর্যাদৃত যুগ যুগ ধরি'
 এড়াইরা কালের প্রহরী
 চলিয়াছে বাক্যহারে এই বাক্তা নিরা
 "ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া ।"

চ'লে গেছে তুমি আজ,
 মহারাজ ;
 রাজ্য তব স্বপ্নসম গেছে ছুটে
 সিংহাসন গেছে টুটে ;
 তব সৈন্তদল
 যাদের চরণভরে ধরণী করিত টলমল
 তাহাদের স্মৃতি আজ বায়ুভরে
 উড়ে যায় দিল্লীর পথের ধূলি 'পরে ।
 বন্দীরা গাহে না গান ;
 যমুনা-কমল সাথে নহবৎ মিলায় না তান

তব পুরস্করীর নুপুর নিকণ

ভগ্ন প্রাসাদের কোণে

ম'রে গিয়ে ঝিল্লীঘনে

কাদায় রে নিশার গগন ।

তবুও তোমার দূত অমলিন

শ্রান্তি-ক্লান্তহীন,

তুচ্ছ করি' রাজ্য ভাঙাগড়া,

তুচ্ছ করি' জীবন-মৃত্যুর ওঠা-পড়া,

যুগে যুগান্তরে

কহিতেছে একস্বরে

চির বিরহীর বাণী নিরা

“ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া ।”

যিথ্যা কথা,—কে বলে যে ভোলে নাই ?

কে বলে রে খোলে নাই

স্বতির পিঙ্গর-হার ?

অতীতের চির অন্ত-অন্ধকার

আজিও সদর তব রেখেছে বাধিয়া ?

বিস্মৃতির মুক্তিপথ দিয়া

আজিও সে হয়নি বাহির ?

সমাধিমন্দির

এই ঠাই রহে চিরস্থির ;
 ধরার ধুলার থাকি',
 অরণের আবরণে অরণেরে যত্নে রাখে ঢাকি' ।

জীবনের কে রাখিতে পারে ?
 আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে ?
 তা'র লাগি নিমন্ত্রণ লোকে লোকে
 নব নব পূর্বাচলে আলোকে আলোকে ।

অরণের গ্রহি টুটে
 সে যে যায় ছুটে
 বিবশে বন্ধন-বিহীন ।
 মহারাজ, কোনো মহারাজ্য কোনো দিন
 পারে নাই তোমারে ধরিতে ;
 সমুদ্রস্তুপিত পৃথ্বী, হে বিরাট, তোমারে ভরিতে
 নাহি পারে,—
 তাই এ ধরারে
 জীবন-উৎসব-শেষে ছুই পায়ে ঠেলে
 মৃত্যুপাত্রের যত্ন বাও ফেলে ।

তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ,
 তাই শুধু জীবনের রথ



পশ্চাতে ফেলিয়া বার কীর্তিরে তোমার
বারংবার !

তাই

চিহ্ন তব প'ড়ে আছে, তুমি হেথা নাই ।

যে প্রেম সমুখপানে
চলিতে চালাতে নাই জানে,
যে প্রেম পথের মধ্যো পেতেছিল নিজ সিংহাসন,
তা'র বিলাসের সম্ভাষণ
পথের ধুলার মত জড়ায় ধরেছে তব পায়ে,
দিগেছে তা' ধুলিরে ফিরায়ে ।
সেই তব পশ্চাতের পদধূলি 'পরে
তব চিত্ত হ'তে বায়ুভরে

কখন সহসা

উড়ে পড়েছিল বীজ জীবনের মাল্য হ'তে থসা ।

তুমি চলে গেছ দূরে

সেই বীজ অমর অঙ্কুরে

উঠেছে অদ্বয়পানে,

কহিছে গভীর গানে—

যত দূর চাই

নাই নাই সে পথিক নাই ।

প্রিয়া তা'রে রাখিল না, রাজ্য তা'রে ছেড়ে দিল পথ,

কবিল না সমুদ্র-পার্বত্য ।

আজি তা'র রথ

চলিয়াছে রাত্রির আছানে

নকশের গানে

প্রভাতের সিংহদ্বারপানে ।

তাই

স্বভিত্তারে আমি প'ড়ে আছি

ভারযুক্ত সে এখানে নাই ।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

শত বর্ষ পরে

আজি হ'তে শত বর্ষ পরে

কে তুমি পড়িছ বসি' আমার কবিতাখানি

কৌতূহলভরে

আজি হ'তে শত বর্ষ পরে ।



আজি নব বসন্তের প্রভাতের আনন্দের

লেশমাত্র ভাগ—

আজিকার কোনো ফুল, বিহঙ্গের কোনো গান,

আজিকার কোনো রক্তরাগ—

অমুরাগে সিক্ত করি' পারিব না পাঠাইতে

তোমাদের করে

আজি হ'তে শত বর্ষ পরে ।

তবু তুমি একবার খুলিয়া দক্ষিণ-দ্বার

বসি' বাতায়নে

সুদূর দিগন্তে চাহি' করনার অবগাহি'

ভেবে দেখো মনে—

এক দিন শত বর্ষ আগে

চকল পুলকরাশি কোন্ স্বর্গ হ'তে ভাসি'

নিখিলের মর্মে আসি' লাগে,—

নবীন ফাক্তন-দিন সকল বকনহীন

উন্নত অধীর—

উড়ারে চকল পাখা পুষ্পরেণু-গন্ধমাখা

দক্ষিণ সমীর

সহসা আসিয়া স্বরা রাঙারে দিগ্গেছে ধরা

বৌবনের রাগে

তোমাদের শত বর্ষ আগে ।



সে দিন উত্তলা প্রাণে, হৃদয়-মগন গানে
 কবি এক আগে,—
 কত কথা, পুষ্প-প্রায় বিকশি' তুলিতে চায়
 কত অনুরাগে
 এক দিন শত বর্ষ আগে ।

আজি হ'তে শত বর্ষ পরে
 এখন করিছে গান সে কোন্ নূতন কবি
 তোমাদের ঘরে ?
 আজিকার বসন্তের আনন্দ-অভিবাदन
 পাঠাবে দিলাম তাঁর করে ।
 আমার বসন্তগান তোমার বসন্তদিনে
 ধ্বনিত হউক কণতরে,
 হৃদয়স্পন্দনে তব, ভ্রমরগুঞ্জে নব,
 পল্লবসম্মুখে
 আজি হ'তে শত বর্ষ পরে ॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

সার্থক বেদনা

আমার সকল কাঁটা ধসে ক'রে ফুটেবে গো ফুল ফুটেবে ।
 আমার সকল ব্যথা রঙীন হ'য়ে গোলাপ হ'য়ে উঠবে ।
 আমার অনেক দিনের আকাশ-চাওয়া
 আসবে ছুটে দখিন-হাওয়া
 হৃদয় আমার আকুল ক'রে অগন্ধ-ধন লুটেবে ॥

আমার লজ্জা যাবে যখন পাব দেবার যত ধন,
 যখন রূপ ধরিয়া বিকশিবে প্রাণের আরাধন ।
 আমার বন্ধ যখন রাত্রিশেষে
 পরশ তা'রে ক'রবে এসে,
 ফুরিয়ে গিয়ে মলগুলি সব চরণে তা'র লুটেবে ॥

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

জন্মান্তর

আমি ছেড়েই দিতে রাজি আছি
 সুসভ্যতার আলোক,
 আমি চাই না হ'তে নবযজ্ঞ
 নবযুগের চালক ।

আমি নাই বা গেলাম বিলাত,
 নাই বা পেলাম রাজার খিলাৎ,
 যদি পরজন্মে পাই রে হ'তে
 ব্রহ্মের রাখাল-বালক ।

তবে নিবিরে দেব নিম্নের ঘরে
 সুসভ্যতার আলোক ॥

যারা নিত্য কেবল দেখু চরায়
 বংশীবটের তলে,

যারা গুলা ফুলের মালা গোঁধে
 পরে পরায় গলে,

যারা বুলবুলের বনে
 সলাই শ্রাবের বাশি শোনে,
 যারা ঘমুনাতে কাঁপিয়ে পড়ে
 শীতল কালো জলে ।

যারা নিত্য কেবল দেখু চরায়
 বংশীবটের তলে ॥



ওরে বিহান্ হ'ল জাগো রে ডাই,
ডাকে পরম্পরে ।

ওরে ঐ দধি-মহন-ধনি
উঠল ধরে ধরে ।

হের মাঠের পথে খেত
চলে উড়িয়ে গো-গুর-রেণু
হের আঙিনাতে ব্রজের বধু
হৃৎ দোহন করে ।

ওরে বিহান্ হ'ল জাগো রে ডাই,
ডাকে পরম্পরে ॥

ওরে শাঙন মেঘের ছায়া পড়ে
কালো তমাল-মূলে,

ওরে এ-পার ও-পার আধার হ'ল
কালিন্দীরি কূলে ।

ঘাটে গোপাঙ্গনা ভরে

কাল্পে খেয়া-তরীর 'পরে,

হের কুজবনে নাচে ময়ূর

কলাপখানি কূলে ।

ওরে শাঙন মেঘের ছায়া পড়ে

কালো তমাল-মূলে ॥

মোরা নব-নবীন ফাগুন-রাতে
 নীল নদীর তীরে
 কোথা বাব চলি' অশোকবনে
 শিখিপুচ্ছ শিরে ।

যবে দোলায় ফুল-রসি
 দিবে নীপশাখায় কসি'
 যবে দখিন বায়ে বাণির ধ্বনি'
 উর্বে আকাশ ঘিরে,
 মোরা রাখাল মিলে ক'রুব মেলা
 নীল নদীর তীরে ॥

আমি হব না ভাই নববঙ্গে
 নবযুগের চালক,
 আমি জালাব না আধার দেশে
 সুসভ্যতার আলোক ।

যদি ননী-ছানার গায়ে
 কোথাও লশোকনীপের ছায়ে
 আমি কোনো জন্মে পারি হ'তে
 ব্রজের গোপ-বালক
 তবে চাই না হ'তে নববঙ্গে
 নবযুগের চালক ॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

সাধনা

দেবি, অনেক ভক্ত এসেছে তোমার চরণতলে

অনেক অর্থ্য আনি',

আমি অভাগ্য এনেছি বহিয়া নখনকলে

ব্যর্থ সাধনখানি ।

তুমি জান মোর মনের বাসনা,

যত সাধ ছিল সাধা ছিল না,

তবু বহিয়াছি কঠিন কামনা

দ্বিস-নিশি ।

মনে বাহা ছিল হ'য়ে গেল আর,

গড়িতে ভাঙিয়া গেল বার বার,

ভালয় মনে আলোয় আধার

গিরেছে নিশি' ।

তবু ওগো, দেবি, নিশিদিন করি' পূরাপূর,

চরণে দিতেছি আনি'

মোর জীবনের সকল শ্রেষ্ঠ সাধের ধন

ব্যর্থ সাধনখানি ॥

ওগো ব্যর্থ সাধনখানি

দেখিয়া হাসিছে সার্থককল

সকল ভক্ত প্রাণী ।

তুমি যদি দেবি, পলকে কেবল
কর কটাক নেহ-সুকোমল,
একটি বিন্দু ফেল আখিজল
করণা মানি'
সব হ'তে তবে সার্থক হবে
বার্ষ সাধনখানি ॥

দেবি, আজি আনিয়াছে অনেক যন্ত্রী তুনাতে গান
অনেক বস্তু আনি' ।

আমি আনিয়াছি ছিন্নতন্ত্র নীরব দ্রাব
এই গীন বীণাখানি ।

তুমি জান ওগো করি নাই হেলা,
পথে প্রাস্তরে করি নাই খেলা,
তধু সাধিয়াছি বসি' সারাবেলা
শতেক বার ।

যনে যে গানের আছিল আভাস,
যে তান সাধিতে করেছিষু আশ,
সহিল না সেই কঠিন প্রয়াস,
ছি'ড়িল তার ।

স্তবহীন তাই রয়েছি দাঁড়ায়ে সারাটি ধন,
আনিয়াছি গীতহীনা
আমার প্রাণের একটি বস্তু বুকের ধন
ছিন্নতন্ত্র বীণা ।



ওগো, হিরণ্য বীণা

দেখিয়া তোমার গুণিজন সবে

হাসিছে করিয়া তৃণ।

তুমি যদি এরে লহ কোলে তুলি,

তোমার শ্রবণে উঠিবে আকুলি

সকল অগীত সঙ্গীতগুলি,

জন্মাসীনা।

ছিল যা' আশায় কুটাবে ভাষায়

হিরণ্য বীণা ॥

দেবি, এ জীবনে আমি গাহিয়াছি বসি' অনেক গান,

পেয়েছি অনেক কল,

সে আমি সবারে বিশ্বজনারে করেছি দান,

ভরেছি ধরনীতল।

যার ভাল লাগে সেই নিয়ে মাক্,

যত দিন থাকে তত দিন থাক্,

যশ অপবশ কুড়িয়ে বেড়াক্

ধূলার মাঝে।

বলেছি যে কথা করেছি যে কাজ

আমার সে নম্র, সবার সে আশ্র,

ফিরিছে ভ্রমিয়া সংসারমাঝ

বিবিধ গায়ে।



বা' কিছু আমার আছে আপনার শ্রেষ্ঠধন
 দিতেছি চরণে আসি',
 অক্লান্ত কার্য্য, অকণ্ঠিত বাণী, অগীত গান,
 বিফল বাসনা রাশি ।
 ওগো বিফল বাসনা-রাশি
 হেরিয়া আত্মিকে ঘরে পরে সবে
 হাসিছে হেলার হাসি ।
 তুমি যদি দেবি, লহ কর পাতি',
 আপনার হাতে রাখ মালা গাঁথি',
 নিত্য নবীন রবে দিনরাতি
 সুবাসে ভাসি',
 সফল করিবে জীবন আমার
 বিফল বাসনা-রাশি ॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । •

পদ্মা

হে পদ্মা আমার,
 তোমার আমার দেখা শত শত বার ।
 এক দিন জনহীন তোমার পুলিনে,
 গোপালির শুভলগ্নে হেমন্তের দিনে,
 সাক্ষী করি' পশ্চিমের সূর্য্য অন্তর্য্যাম
 তোমারে সঁপিরাছিহু আমার পরাণ ।



অবসান সন্ধ্যালোকে আছিলে সে দিন
নতমুখী বদ্বন্দ্য শাস্ত বাক্যহীন ;—
সন্ধ্যাতারা একাকিনী স্নেহ কোতুকে
চেয়েছিল তোমাশানে হাসিভরা মুখে ।
সে দিনের পর হ'তে, হে পরা আমার,
তোমায় আমার দেখা শত শত বার ।

নানা কর্মে যোর কাছে আসে নানা জন,
নাহি জানে আমাদের পরাণ-বন্ধন,
নাহি জানে কেন আসি সন্ধ্যা-অভিসারে
বালুকা-শয়ন পাতা নির্জন এ পারে ।
যখন মুখর তব চক্রবাকমল
সুপ্ত থাকে জলাশয়ে ছাড়ি' কোলাহল ;
যখন নিস্তরু গ্রামে তব পূর্বতীরে
কুদ্ধ হ'য়ে যায় দ্বার কুটীরে কুটীরে,
ভুমি কোন্ গান করো আমি কোন্ গান
চুই তীরে কেহ তা'র পায়নি সন্ধান ।
নিভূতে শরতে গ্রীষ্মে শীতে বরষায়
কত বার দেখাশুনা তোমায় আমার ।

কত দিন ভাবিয়াছি বসি' তব তীরে
পরজন্মে এ ধরায় যদি আসি ফিরে,
যদি কোনো দূরতর জন্মভূমি হ'তে
তরী বেয়ে ভেসে আসি তব খর শ্রোতে,—



কত গ্রাম কত মাঠ কত ঝাউঝাড়
 কত বালুচর কত ভেঙে-পড়া পাত
 পার হ'য়ে এই ঠাই আসিব যখন
 ছেগে উঠিবে না কোনো গভীর চेतন ?
 জন্মাস্তরে শত বার যে নির্জন তীরে
 গোপনে হৃদয় মোর আসিত বাহিরে,—
 আর বার সেই তীরে সে সন্ধ্যাবেলায়
 হবে না কি দেখাওনা তোমার আমার ?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

গানভঙ্গ

গাহিছে কানীনাথ নবীন যুবা
 ধ্বনিত্তে সভাগৃহ ঢাকি',
 কণ্ঠে খেলিতেছে সাতটি সুর
 সাতটি যেন পোষা পাখী ।
 শালিত তরবারি গলাটি যেন
 নাচিয়া ফিরে দশ দিকে,
 কখন কোণা যায় না-পাই দিশা,
 বিহুলি-হেন ঝিকিমিকে ।

আপনি গড়ি' তোলে বিপদজাল
আপনি কাটি' দেয় তাহা ।
সভার লোকে শুনে' অবাক্‌ মানে
স্বপ্নে বলে "বাহা বাহা ॥"

কেবল বুড়া রাজা প্রতাপ রায়
কাঠের মতো ঝসি' আছে ।
বরজলাল ছাড়া কাহারো গান
ভাল না লাগে তাঁ'র কাছে ।
বালক-বেলা হ'তে তাহারি গীতে
দিল সে এত কাল বাপি',
বাদল দিনে কতো মেঘের গান,
হোলির দিনে কতো কাফি ।
গেয়েছে আগমনী শরৎ প্রাতে,
গেয়েছে বিজয়ার গান,
ছন্দ উছসিয়া অশ্রুজলে
ভাসিয়া গেছে হু' নদান ।
যখনি মিলিয়াছে বন্ধুত্বনে
সভার গৃহ গেছে পুরে',
গেয়েছে গোকুলের গোয়াল-গাথা
ভূপালী মূলতানী সুরে ॥

ঘরেতে বারবার এসেছে কতো
বিবাহ-উৎসব-রাতি,
পরেছে দাসদাসী লোহিত বাস
অলেছে শত শত বাতি ।



বসেছে নব বর সলাজ মুখে
 পরিয়া মণি-আভরণ,
 করিছে পরিহাস কানের কাছে
 সমবয়সী প্রিয়জন,
 সামনে বসি' তা'র বরজলাল
 ধরেছে সাহানার সুর,
 সে-সব দিন আর সে-সব গান
 হৃদয়ে আছে পরিপূর ।
 সে-ছাড়া কারো গান শুনিলে তাই
 মর্মে গিয়ে নাহি লাগে,
 অতীত প্রাণ যেন মস্তবলে
 নিমেষে প্রাণে নাহি লাগে ।
 প্রতাপ রায় তাই দেখিছে শুধু
 কাশীর বুধা মাথানাড়া,
 সুরের পরে সুর ফিরিয়া যায়
 হৃদয়ে নাহি পাণ সাজা ॥

ধামিল গান যবে, কণেক তরে
 বিয়ায় মাগে কাশীনাথ :
 বরজলাল পানে প্রতাপ রায়
 হাসিয়া করে আখিপাত ।
 কানের কাছে তা'র রাখিয়া মুখ,
 কহিল, "ওস্তাদ জি,
 গানের মতো গান শুনারে নাও
 এরে কি গান বলে, ছি !



এ ঘেন পাখী ল'য়ে বিবিধ ছলে
শিকারী বিড়ালের খেলা ।
সেকালে গান ছিলো, একালে হায়
গানের বড়ো অবহেলা ॥”

বরজলাল বুড়া শুক্কেশ
শুভ্র উকীষ শিরে,
বিনতি করি' সবে, সভার মাঝে
আসন নিলো ধীরে ধীরে ।
শিরা-বাহির-করা শীর্ণ করে
তুলিয়া নিলো তানপুর,
ধরিল নতনিরে নরন মুদি'
ইমনকল্যাণ সুর ।
কানিয়া ক্ষীণ স্বর মরিয়া যায়
বৃহৎ সভাগৃহকোণে
শুভ্র পাখী বধা ঝড়ের মাঝে
উড়িতে নারে প্রাণপণে ।
বসিয়া বামপাশে প্রতাপ দার
দিতেছে শত উৎসাহ—
“আহা হা, বাহা বাহা,” কহিছে কানে
“গলা ছাড়িয়া গান গাহ ॥”

সভার লোকে সবে অন্তমনা,
 কেহ বা কানাকানি করে ।
 কেহ বা তোলে হাই, কেহ বা ঢোপে,
 কেহ বা চ'লে যায় ঘরে ।
 "ওরে রে আয় ল'য়ে তামাকু পান,"
 হুতো ডাকি' কেহ কর ।
 মঘনে পাখা নাড়ি' কেহ বা বলে,
 "গরম আজি অতিশয় ।"
 করিছে আনাগোনা ব্যস্ত লোক,
 ফণেক নাহি রহে চুপ,
 নীরব ছিল সভা, ক্রমশ সেধা
 শব্দ উঠে শতরূপ ।
 বুড়ার গান তাহ চুঝিয়া যায়,
 তুফান-মাঝে ক্ষীণ তরী,
 কেবল দেখা যায় তানপুরার
 আঁতুল কাঁপে ধরদরি'
 হৃদয়ে যেথা হ'তে গানের সুর
 'উছসি' উঠে নিজ স্বখে,
 হেলার কলরব শিলার মতো
 চাপে সে উৎসের যুখে ।
 কোণায় গান আর কোণায় প্রাণ,
 ছ'দিকে যায় চুই জনে,
 শুকুও রাখিবারে প্রকৃত মান
 বরজ গায় প্রাণপণে ॥



গানের এক পদ যনের ভবে
 হারায়ে গেলো ক'ে করিয়া ।
 আবার ডাড়াডাড়ি ফিরিয়া গাহে
 নইতে চাহে শুধরিয়া ।
 আবার তুলে' যায়, পড়ে না যনে,
 সরমে যন্তক নাড়ি'
 আবার শুরু হ'তে ধরিল গান
 আবার তুলি' দিল ছাড়ি' ।
 বিগল ধরধরি' কাঁপিছে হাত,
 স্রবণ করে গুরুদেবে ।
 কণ্ঠ কাঁপিতেছে কাতরে, ঘেন
 বাতাসে দীপ নেবে নেবে ।
 গানের পদ তবে ছাড়িয়া দিয়া
 রাখিল সুরটুকু ধরি',
 সহসা হাহা রবে উঠিল কাঁদি'
 সাহিতে গিয়ে হা হা করি' ।
 কোথায় দূরে গেল সুরের খেলা,
 কোথায় ভাল গেল ভাসি',
 গানের সূত্র ছিঁড়ি' পড়িল খসি'
 অশ্রু-সুকুতার রাশি ।
 কোলের সখী তানপুরার 'পরে
 রাখিল লজ্জিত মাথা,
 তুলিল লেখা গান, পড়িল যনে
 খাল্য-ক্রন্দন-গাথা ।

নয়ন ছলছল প্রতাপ রায়
 কর বুলায় তার দেহে ।
 “আইস, হেথা হতে আমরা যাই,”
 কহিল সক্রম মেহে ।
 শতেক দীপজ্বালা নয়নভরা
 ছাড়ি’ সে উৎসব-ধর
 বাহিরে গেল দুটি প্রাচীন সখা
 ধরিয়া হুঁ হুঁ দৌড়া কর ,
 বরজ করজোড়ে কহিল, “প্রভু,
 যোদের সভা হ’ল ভঙ্গ ।
 এখন আসিয়াছে নূতন লোক—
 ধরায় নব নব রঙ্গ ।

রুগতে আমাদের বিজন সভা ।
 কেবল তুমি আর আমি ।
 সেপায় আনিয়ো না নূতন শ্রোতা,
 মিনতি তব পদে স্বামী ।
 একাকী গায়কের নহে ত গান,
 মিলিতে হবে দুই জনে ।
 গাহিবে এক জন পুলিয়া গলা,
 আর জন গাবে মনে ।
 তটের বুকে লাগে জলের ঢেউ
 তবে সে কলতান উঠে,
 বাতাসে বন-সভা শিহরি’ কাঁপে
 তবে সে মর্ম্মর ফুটে ।

জগতে যেথা বস রয়েছে ধ্বনি
 কুগল মিলিয়াছে আগে ।
 যেখানে প্রেম নাই বোবার মতা,
 সেখানে গান নাহি জাগে ॥”

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

দুর্লভ জন্ম

এক দিন এই দেখা হ'য়ে যাবে শেষ,
 পড়িবে নয়ন 'পরে অস্তিম নিমেষ ।
 পর দিনে এই মতো পোহাইবে স্বাত,
 জাগ্রত জগৎ 'পরে জাগিবে প্রভাত ।
 কলরবে চলিবেক সংসারের খেলা,
 সুখে হুঃখে ঘরে ঘরে বহি' যাবে বেলা
 সে কথা অরণ করি' নিখিলের পানে
 আমি আজি চেয়ে আছি উৎসুক নয়ানে ।
 বাহা কিছু হেরি চোখে কিছু ভুস্ক নয়,
 সকলি দুর্লভ ব'লে আজি মনে হয় ।



ছলভ এ ধরনের লেশতম স্থান,
 ছলভ এ জগতের ব'র্পিত্য প্রাণ ।
 বা পাইনি তাও থাক্ বা পেয়েছি তাও,
 তুচ্ছ ব'নে বা চাইনি তাই মোরে দাও ॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

আলোকে

আমরা তো আলোকের শিশু ।

আলোকেতে কি অনন্ত মেলা ।

আলোকেতে স্বপ্ন-ভাগরণ,

জীবন ও মরণের খেলা ।

জীবনের অসংখ্য প্রদীপ

এক মহা-চন্দ্রাতপ-ভলে,

এক মহা-নিবাকরু-করে,

ধীরে ধীরে অতি ধীরে জলে ।

অনন্ত এ আলোকের মাঝে

আপনারে হারাইয়া যাউ,

ছঃসই এ জ্যোতির মাঝার

অন্ধবৎ ঘুরিয়া বেড়াই ।

আমরা যে আলোকের শিশু,

আলো দেখি ভর কেন পাই ?

এস, চেষ্টা দেখি দল দিক্,

হেথা কারও ভর কিছু নাই ।



অসৌম্য এ আলোক-সাগরে

হুত্ব দীপ নিবে' যদি যাব,

নিবুক না, কে বলিতে পারে

জলিবে না সে যে পুনরাব ?

শ্রীকামিনী রায় ।

সুখ

১

গিয়াছে ভাঙ্গিয়া সাদের বীণাটি,

ছি ডিয়া গিয়াছে মধুর তার,

গিয়াছে শুকায়ে সরস বুকুল ;

সকলি গিয়াছে—কি আছে আর ?

নিবিল অকালে আশার প্রদীপ,

ভেসে-চূরে গেল বাসনা যত,

ছুটল অকালে সুখের স্বপন,

জীবন-মরণ একই মত !



জীবন-মরণ একই মতন,—
 ধরি এ জীবন কিসের তরে ?
 ভগন হৃদয়ে ভগন পরাণ
 কত কাল আর রাখিব ধরে' ?

বুঝিতাম যদি কেমন সংসার,
 জানিতাম যদি জীবন-আলা,
 সাধের বীণাটি লয়ে' থাকিতাম
 সংসার-আছানে হইরে কাল।

সাধের বীণাটি করিয়া দোসর
 যাইতাম চলি বিহ্বল বনে,
 নীরব নিস্তর কানন-হৃদয়ে
 থাকিতাম পড়ি আপন মনে ।

আপনার মনে থাকিতাম পড়ে',
 করনা-আরামে ঢালিয়া প্রাণ,
 কে ধারিত পাশ সংসার-ধার ?
 সংসারের ডাকে কে দিত কান ?

না বুঝিয়া হায় পশিহু সংসারে,
 ভীষণ-দর্শন হেরিহু সব,
 করনার ময় সৌন্দর্য্য, সঙ্গীত
 হইল শ্মশান, পিণ্ডাচরব ।



হেরিহু সংসার মরীচিকাময়ী
 মকছুমি মত্ত রয়েছে পাড়ে',
 বাসনা-পিয়াসে উন্মত্ত মানব
 আশার ছলনে মরিছে পুড়ে' ।

লক্ষ্য তারা ভূমে খসিয়া পড়িল,
 আধারে আলোক ডুবিয়া গেল,
 তমস হেরিতে কুটিল নরন,
 ভাবিয়ে হৃদয় শতধা হ'ল

সেই হৃদয়ের এই পরিণাম,
 সে আশার ফল ফলিল এই !
 সেই জীবনের কি কাজ জীবনে ?—
 তিলমাত্র সুখ জীবনে নেই ।

বাক্ বাক্ প্রাণ, নিবুক এ আলা,
 আর ভাঙ্গা বীণে আবার গাই—
 বাতনা—বাতনা—বাতনাই সার,
 নরভাগ্যে সুখ কখনো নাই ।

বিষাদ, বিষাদ, সর্বত্র বিষাদ,
 নরভাগ্যে সুখ লিখিত নাই,
 কাঁদিবার তরে মানব-জীবন,
 যত দিন বাঁচি কাঁদিয়া যাই ।



নাই কিরে সুখ ? নাই কিরে সুখ ?

এ ধরা কি শুধু বিষাদময় ?

যাতনে অলিঙ্গা, কাঁদিয়া মরিতে

কেবলই কি নর জনম লয় ?

কাদাতেই শুধু বিশ্বরচিতা

সৃজেন কি নরে এমন করে ?

মায়ার ছলনে উত্তিতে পড়িতে

মানব-জীবন অবনো'পরে ?

বলু ছিন্ন বোনে, বল উচ্চৈঃস্বরে,—

না,—না,—না, মানবের তরে

আছে উচ্চ লক্ষ্য, সুখ উচ্চতর,

না সৃজিলা বিধি কাদাতে নরে ।

কার্যক্ষেত্র আই প্রশস্ত পড়িয়া,

সমর-অঙ্গন সংসার এই,

যাও বীরবেশে কর গিয়ে রণ ;

যে জিনিবে, সুখ লভিবে সেই ।

পরের কারণে স্বার্থে দিয়া বলি,

এ জীবন-মন সকলি দাও,

তার মত সুখ কোথাও কি আছে ?

আপনার কথা ভুলিয়া যাও ।

পরের কারণে যরণেও সুখ,
 'সুখ', 'সুখ' করি কৈদ না আর,
 যতই কাঁদিবে, যতই ভাবিবে,
 ততই বাড়িবে হৃদয়-ভার ।

গেছে বাক্ ভেঙ্গে সুখের স্বপন,
 স্বপন অমন ভেঙ্গেই থাকে,
 গেছে বাক্ নিবে আলোর আলো,
 গৃহে এস, আর ঘুর' না পাকে ।

৩

যাতনা ! যাতনা ! কিসেরি যাতনা ?
 বিষাদ এতই কিসেরি তরে ?
 যদিই বা থাকে, যখন তখন
 কি কাজ জানায়ে জগৎ তরে' ?

লুকান' বিষাদ আঁধার অমায়া
 মূহুভাতি দ্বিগু তারার মত,
 সারাটি রজনী নীরবে নীরবে
 চালে সুমধুর আলোক কত ।

লুকান' বিষাদ মানব-হৃদয়ে
 গভীর নির্দেহ-শাস্তির প্রায়,
 হ্রাশার ভেরী, নৈরাশ চীৎকার,
 আকাক্ষার রব ভাঙ্গে না তার ।

বিষাদ—বিষাদ—বিষাদ বলিয়ে
 কেনই কাদিবে জীবন ভরে ?
 মানবের মন এত কি অসার ?
 এতই সহজে দুইয়া পড়ে ?

সকলের মুখ হাসিভরা দেখে
 পার না মুহিতে নয়ন-ধার ?
 পরহিতব্রতে পার না রাখিতে
 চাপিয়া আপন বিষাদ-ভার ?

আপনারে লয়ে' বিব্রত রহিতে
 আসে নাই কেহ অবনী'পরে,—
 সকলের তরে সকলে আমরা,
 প্রত্যেকে আমরা পরের তরে

শ্রীকামিনী রায় ।

অন্ধ বধু

পায়ের তলার নরম ঠেকল কি ।

আন্তে একটু চলনা ঠাকুর থি—

গুমা, এ যে স্বরা-বকুল । নহ ?

তাঁহেত' বলি, বসে' দোরের পাশে,

রাতিরে কাল—বধু-মদির বাসে

আকাশ-পাতাল—কতই মনে হয় ।

কোঁঠ আস্তে ক'দিন দেৱী ভাই—

আমের পায়ে বরণ দেখা যার ?

—অনেক দেৱী ? কেমন করে' হবে ?

কোকিল-ডাকা শুনেছি সেই কবে,

দখিন হাওয়া—বন্ধ কবে ভাই ;

দীঘির ঘাটে নতুন সিঁড়ি জাগে —

শেওলা-পিছল—এমনি শঙ্কা লাগে,

পা পিছলিয়ে তলিয়ে যদি ঘাই ।

বন্দ নেহাৎ হয় না কিন্তু তার—

অন্ধ চোখের বন্দ চুকে' যার !

হুঃখ নাইক সত্যি কথা শোন,
অন্ধ গেলে কি আর হবে, বোন ?

বাচুবি তোরা—দাদা ত' তোর আগে ;
এই আঘাতেই আবার বিয়ে হবে,
বাড়ী আসার পথ খুঁজে' না পাবে—

দেখুবি তখন—প্রবাস কেমন লাগে !
—কি বলি ভাই, কাদবে সন্ধ্যা-সকাল ?
হা অদৃষ্ট, হায় রে আমার কপাল।

কত লোকেই যায় ত' পরবাসে—
কালবোশেখে কে না বাড়ী আসে ?

চৈতালি কাজ, কবে যে সেই শেষ।
পাড়ার মাহুদ ফিরুল সবাই ঘর,
তোমার ভায়ের সবই স্বতন্ত্র—

ফিরে' আসার নাই কোন উদ্দেশ।
—ঐ যে হেথাও ঘরের কাটা আছে—
ফিরে' আসতে হবে ত' তার কাছে।

এইখানেতে একটু ধরিস্ ভাই,
পিছল ভারি—ফস্কে যদি যাই—

এ অক্ষমার রক্ষা কি আর আছে !
আসুন ফিরে'—অনেক দিনের আশা,
ধাকুন ঘরে, না থাক্ ভালবাসা—

তবু দুদিন অভাগিনীর কাছে !
অশ্রুশোধের বিদায় নিয়ে ফিরে'—
সেদিন তখন আস্বে দীঘির তীরে।



‘চোখ-গেল’ ঐ চোঁচিয়ে হ’ল সারা !

আচ্ছা দিদি, কি করবে ভাই তারা—

জন্ম লাগি’ গিয়েছে বার চোখ !

কাদার পুখ বে বারশ তাহার, ছাই !

কাদতে গেলে বাচ্ ত’ সে বে ভাই,

কতক তবু কম ত’ বে তার শোক !

‘চোখ-গেল’—তার ভরসা তবু আছে,

চক্ষুহীনার কি কথা কার কাছে !

টানিস্ কেন ? কিসের তাড়াতাড়ি ?—

সেই ত’ ফিরে’ যাব আবার বাড়ী,

একলা-ধাকা সেই ত’ গৃহকোণ—

তার চেয়ে এই দ্বিধা লীভল জলে

চুটো খেন প্রাণের কথা বলে—

দরদ-ভরা দুখের আলাপন ;

পরশ তাহার মায়ের স্নেহের যত

ভুলায় খানিক মনের বাধা যত !

এবার এলে, হাতটি দিয়ে গারে,

অন্ধ আঁখি বুলিয়ে খানিক পায়ে—

বন্ধ চোখের অশ্রু রুধি’ পাতায়,

জন্ম-দুখীর দীর্ঘ আয়ু দিয়ে

চিরবিদায় ভিক্ষা যাব নিরে,

সকল বালাই বহি’ আশন মাধায় ।—

দেখিস্ তখন, কাণার জন্ত আর

কষ্ট কিছু হয় না যেন তাঁর ।



তার পরে—এই শেওলা-দৌঘির ধার—
 সঙ্গে আস্তে বন্ব নাক' আর,
 শেঘের পথে কিসের বল' ভয়—
 এই খানে এই বেতের বনের ধারে,
 ডাহক-ডাকা সন্ধ্যা-অন্ধকারে—
 • সবার সঙ্গে সাজ পরিচয় !
 শেওলা-দৌঘির শীতল অতল নীরে—
 মায়ের কোলটি পাই যেন ভাই, ফিরে' !

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী ।

শবরীর প্রতীক্ষা

পম্পাসরোবরতীরে সূর্য্যদেব অস্ত্র বান ধীরে,
 বুলায়ে আরক্তকর ক্রান্ত তপ্ত ধরণীর শিরে • •
 শান্তির আশিসে ভরা । দূসর তরল স্নানকারে
 ছেয়ে আসে জল-হল-অন্তরীক্ষ অম্পষ্ট আকারে ।
 চাহিয়া ঈর্ষ্যার দৃষ্টি স্মৃটমান কুমুদের পানে
 পরিপাণ্ডু পদ্মদল মুদে আঁখি রুদ্ধ অভিযানে ।
 তীরাত্ত শৈবালের শ্রামারিত স্বচ্ছ অবকাশে
 হংস কারুণ্যব-দলে বিপ্রায়ের সাজা পড়ে' আসে



আত্মপু গঙ্গাদকণ্ঠে, বিধূনিত সিক্ত পক্ষপুটে ;
 শশ্পগন্ধে ঝিল্লিচ্ছন্দে সন্ধ্যাকাল পূর্ণ হয়ে উঠে ।
 যতদ্বৈর তপোবনে সাকা হোম হয়ে এল শেষ
 উদাস্ত গম্ভীর মস্ত্রে । ধীরে করি নয়ন-উন্মেষ
 উঠিলা তপস্বিবর মন্দ পদে ছাড়ি দর্ভাসন,
 যেথা ষার-প্রাস্তদেশে নতদ্বার মুদ্রিত নয়ন
 বসিয়া শ্রমণীবালা যুক্তকরে মৃত্তিকার 'পর ;
 কহিলা উদার কণ্ঠে—'বৎসে, আজি লব অবসর
 এ বারের জীবজন্মে, তাজি' দেহ সমাধি-আসনে ।
 ইহ জগতের চিন্তা কিছু আর নাহি আজি মনে
 তোমার মঙ্গল ছাড়া ; অনাধিনৌ শবরকুমারী
 আশ্রিত আশ্রয়ে মোর, জানি তুমি সত্যের ভিখারী ।
 (ঈষৎ ধামিয়া) কি ভাবিছ মৌনমুখে ?

শবরী । কি ভাবিব ? কি বা আছে আর ?

প্রভু, পিতা, এ জগতে কি আমার আছে বা চিন্তার !
 সবই 'মুখিজাত তব—চিন্তা, চেষ্টা, যরণ, মনন,—
 যে দিন ও-পাদপদ্মে পতিতেরে দিয়াছ শরণ
 আপনার কৃতা বলি', ইষ্টযন্ত্র সঁপি, তার কানে ;
 আর্জুন দর্ভাগা এই গৃহহীন অনাথ্য সম্মানে
 পালিয়াছ শিষ্টাঙ্গশে পবিত্র এ তপোবনবাসে ।
 এক প্রহর, তবু দেব, আচ্ছা কর, যনে বাহা আসে,
 কোন্ অপরাধে, প্রভু, অপরাধী আজি ও-চরণে,

হেন স্নহঃসহবানী যার লাগি' তুমি প্রবণে—
মৃত্যুসম পণি বাহা ?

যতন । অপরাধ ? নহে অপরাধ ।

শান্ত হও, বৎসে, তুমি । অনর্থক না গল প্রমাদ—
যথার্থ এ উক্তি শুনি' । চিত্ত তব পবিত্র নির্মল
সর্বদোষলেশহীন । তথাপি এ সঙ্কর নিশ্চল—
ভাজিব এ দেহবাস আপনারি অভিপ্রায়ক্রমে ।
বারংবার বলিরাছি,—মৃত্যুরে ভেব না শেব ভ্রমে ।
অনিত্য এ দেহমায়া । তোমাতে জানাই আশীর্বাদ—
পূর্ণ হোক ইষ্ট তব, সিদ্ধ হোক সাধনার সাধ ।
মত্যোর প্রতীকা কর জীবনের অনুভূতিমাঝে
নিষ্ঠার বাধিরা বন্ধ ।

শবরী । পিতা, পিতা, কিছু জানি না যে !

কে দিবে আমারে স্থান ? কোথা যাব ছাড়ি' তপোবন ?

যতন । বৎসে, এ আশ্রমভূমি তোমাতে করিহু সমর্পণ ;

আজি হ'তে সর্বকাৰ্য্যে তোমাতে সঁপিহু অধিকার,
যোগ্যহস্তে শুদ্ধচিত্তে যদি তুমি পাল' এই ভার;
ধরি' তব সিদ্ধিরূপ মর্ত্যে যিনি মূর্ত্ত নাটায়ণ,
সেই রামচন্দ্র তব আশ্রমে দিবেন দরশন ।
স্পর্শে যার সঞ্জীবিত অভিশপ্ত অহল্যার প্রাণ,
অস্পৃক্ত নিষাদে যিনি সখ্যে বাধি' বন্ধে দেন স্থান,
অরণ্যের শাখায়ূগ যার প্রেমে বদ্ধ প্রিয়তম,—
সেই রামচন্দ্র হেথা আসিবেন, শুন বাক্য মম ;



প্রতীকা করহ তাঁর ।... শিবমন্ত, আসন্ন সময় ।

(দীপপদে অস্তর্ধান)

শবরী । পিতা, পিতা ।

(ভূমিতে অবলুষ্ঠিত প্রণাম ও উত্থান)

রামচন্দ্র, রামচন্দ্র ! সেই পরামর

আসিবেন এ আশ্রমে ? হেন ভাগ্য কবে হবে তার ?

সাক্ষাৎ মিলিবে চক্ষে মর্ত্যরূপে জগৎপিতার !

শাস্ত হ' মন্দির মন ! মিথ্যা নহে মতজের বাণী,

সত্যজ্ঞে ঐশিক ঋষিকণ্ঠ অসত্য না কহে কভু আনি ।

—কি করিব ? কোথা যাব ? কি দিয়ে তুষিব দেবতারে ?

কোন্ পথে, কোথা হ'তে, কেমনে সাক্ষাৎ পাব তাঁরে ?

কি ফুলে গাঁথিব মালা ? কোন্ বর্ণ বানাইবে ভালো

নবদুর্ক্সাদল দেহে ? নিবে, যদি দিবসের আলো,—

সন্ধ্যায় আসেন যদি ? হেরিতে সে বরমুর্তিখানি

কোন নীপ আলি' লব ? কালো হাতে কোন্ অর্থ্য আনি'

কোথায় বসাব তাঁরে ? কি বলিয়া করিব আহ্বান ?

গাঢ়স্পর্শ করিব কি ? অস্পৃশ্য বে ! তিনি ভগবান্ ।

কি ফল লাগিবে মিটে ঐ মুখে ? মহারাজ তিনি—

ধরণীর শ্রেষ্ঠ বংশে,—ভোগ্য তাঁর চক্ষে নাহি চিনি ।

—পিতা, পিতা, এ কি ভার দিয়ে গেলে অক্ষমার হাতে ?

আমি বে অবোগ্যা তার, কাঁপে চিত্ত মনেহ-দোলাতে ।

দিনে-দিনে দিন যায়, দিন যায়,—রাত্রি যায় চলি' ;

মাসে-মাসে বর্ষ যায়,—বর্ষ যায়, আশার অঞ্জলি



তুকাইরা উঠে হাতে—বেদনার, ব্যর্থ প্রতীকার !
কৈশোর যৌবন ক্রমে, ভরে দেহ পূর্ণ সুসমায়
অজ্ঞাতে অনবধানে । দিন যায় ! রঘুপতি রাঘ—
কই তিনি ? কোথা তিনি ? হায় দরিদ্রের মনকাষ ।

লজ্জায় ফুটিল ফুল—স্তরে স্তরে, স্তবকে স্তবকে ;
পরিপুষ্ট তনুবল্লী কমলে কাঞ্চে কুকবকে —
পূজার্থী প্রতিমা বেন । প্রতীকার কাটে দীর্ঘ দিন ।
হৃদয়নয়নানন্দ কবে আসি' হবেন আসীন
অতর্কিত অবসরে । অনাদরে যদি যান চলি'
মতঙ্গের তপোবনে অভ্যর্থনা মিলিল না বলি'—
অকস্মাৎ অপরাধে অবহেলা ভাবি' মনে মনে ;
ছি ছি । মরি সে লজ্জায়, শিহরি সে ভ্রষ্ট আচরণে ।

অপেক্ষার একাগ্রতা উগ্রতর করি' তাই চোখে
বনবীধি-তলেতলে ফিরে বালা মুগ্ধ দিবালোকে
উচ্চকিত অনুক্ষণ ; তপস্যার কাল বয়ে' যায় ;
আসিয়া থাকেন যদি অন্তপথে, ভাবিরা স্বরাগি—
আবার আশ্রমে আসে ! শয্যা রচি' কুসুম-পল্লবে
বাণে দীর্ঘ বিভাবরী পথ চেয়ে বাহিত বহুভে !
কোথায় সে সীতাপতি, বুদ্ধিমান অধিলের স্বামী ।
অপেক্ষার কাটে দিন ; অকস্মাৎ চক্ষে আসে নামি' ।
রামচন্দ্রহীন রাত্রি ঘন হয়ে ঘিরে তপোবনে.
নিশি-জাগরণ-মসী আঁকি' শুধু কলকৌ নয়নে ।



দিন যায়, রাত্রি যায় ; দিনে-রাতে যাম যায় ঘুরে',
 মাসে-মাসে বর্ষ যায়, বর্ষে-বর্ষে যুগ আসে পূরে' ;—
 রাঘবের নাহি দেখা, আশ্রমে সে পদ নাহি পড়ে ;
 আবর্তিত কালচক্র । শিশিরে বসন্তকান্তি ধরে ।

পুষ্পহীন লতামঞ্চ, পকফলে আনত বিতান,
 শিথিল বকুনমূল, ত্রিহীন মালক স্নিগ্ধমাণ ;
 ধসে' পড়ে জীর্ণ পত্র, বিগলিত লোল গ্রহিভাল,
 বার্ককোর নাযাবলী সর্ষাঙ্গে পরায় মহাকাল ।
 ব্যর্থতার ভগ্নদেহ, দীপ্ত দৃষ্টি আচ্ছন্ন নয়নে,
 আশ্রয়-কুটীরপ্রান্তে শবরী তথাপি একমনে,—
 দৃষ্টি যেলি' পথপানে,—কখন সে আসিবেন রাম
 জরায় চরণ পদ,—মুখে শুধু জপে তাই নাম !
 সুসজ্জিত পাশু-অর্ঘ্য, সুবিভক্ত ফলমূল-ধারি,
 নারিকেলপাত্রপূর্ণ সমাহৃত সরোবর-বারি ।

দিন ব্রাহ্মি, রাত্রি দিন—জাগরণে অথবা তদ্রায়—
 কোমো মুহুর্তে যদি রামভক্ত এসে ফিরে' যায়
 মন্দ পদে ! যতদ্রষ্টা যতঙ্গের বানী অতর্কিত,
 শুভ আগমন তাঁর ঘটবেই, জানি যে নিশ্চিত ;—
 কিন্তু যদি প্রাণ যায় । 'রাম, রাম, কোণলানন্দন !'
 দ্রুততর চলে জপ—এস এস থাকিতে জীবন ।
 অবসন্ন দীর্ণ দেহ, অবশ্য অঙ্গুলি নাহি চলে,
 রাত্রি ভোর হ'য়ে আসে, হাসে উষা উদয়-অচলে ।



‘সূর্য্যবংশ-অবতংশ’ এস এস সর্ষগুণাধার,
এস হে ককণ-কান্ত—এ পতিতে করহ উদ্ধার ।
পম্পাসরোবরতীরে হাসে রবি কমললোচনে,
আপনারি গোত্রমাঝে প্রমুগ্ধ হেরিয়া নারায়ণে ।—
কার ঐ পদধরনি ? কে আসে রে ? আসে নাকি রাম ?
চরণ চলিতে নারে,—ঘন ঘন জপে আরো নাম ।
নামায় পশিছে গন্ধ—পদ্ম কি ফুটিল দুর্কাদলে ?
—কই, কোথা প্রাণারাম ? কঙ্ক দৃষ্টি নবনের জলে !

রায়চন্দ্র । (মন্দ পদে সম্মুখে আসিয়া)

এই তো এসেছি আমি ; কোথা তুমি শবরী হুন্দরি,—
কে বলে পতিতা তুমি ? তুমি যোর মর্শ্ব-সহচরী ।
কৃতার্থ আজিকে আমি তোমার বাহিত দরশনে ;
দৃষ্টি বার সত্যসন্ধী, তারেই তো খুঁজি ত্রিভুবনে ।

শ্রীমতীন্দ্রমোহন বাগচী ।

লালাবাবুর দীক্ষা

সিন্ত মর্শ্বরে খচি' বিরাট দেউল রচি'
 আঁঠু আঁতুর তরে খুলি দানপত্র,
 গড়িয়া অনাধশালা, সার করি খোলামালা,
 ভক্তগণের নামে লিখি' দানপত্র,
 লালাবাবু বৈরাগী,— শুরু-করণের লাগি,
 সারা পথ ভরি ভেট-উপহারপুঞ্জ,
 বাবাজী কৃষ্ণদাস যেখানে করেন বাস,
 একদা এলেন সেই নিবৃত্ত নিকুঞ্জে ।
 সাধুযুখে নাম-গান তনিয়া ছুড়াল গ্রাণ
 বাজিয়া উঠিল তাঁর হৃদয়ের বসন্ত,
 'সাধুর চরণে ধরি' ক'ন লালা, "কৃপা করি
 এ অধ্যয়ে দি'ন তরী,—তরণের মত ।"
 সাধু কন স্নেহভরে "এবে কিরে যাও ঘরে
 এখনো আসেনি তব দীক্ষার লগ্ন,
 নিজে বাবো, এলে দিন রবো নাক' উদাসীন ।"
 এত কহি আঁখি মুদি পুন জপে মগ্ন ।



লালাবাবু বান ফিরে বুক ভাসে আধিনীরে
 ভেট-দক্ষিণা সাথে বিস্তারে ক্ষুণ্ণ,
 ভাবেন, "হায় রে তবে বশই কিনেছি ভবে,
 পারের কড়ির খলি একেবারে শূন্য ?
 পুণ্যের আহরণে এখনো মনের কোণে,
 ছায়ারূপে বিরাজিছে অভিমান-দগু,
 ছাড়িয়া বিষয়-মায়া সে বুঝি ধরেছে কায়া,
 বাহিরে তাহার রূপ-মঠ বেদী স্তম্ভ ।
 যার ধন সেই পায় লোকে মোর গুণ পায়,
 তাই শুনি নিশিদিনই, ভাবি তাই সত্য ।
 ব্রজনাথ করে দান, জাগে মোর অভিমান,
 ভবরোগীটির এ যে দারুণ কুপথ্য ।"
 এই ভাবি সব ছাড়ি' মন্দির মঠ বাড়ী,
 চলিলেন লালাবাবু খুলি লয়ে ককে,
 পথে পথে ব্রজধামে জয় শ্রামরাধা নামে,
 মাধুকরী করি সলা ফিরেন আনন্দে ।
 ব্রজবাসিগণ তায় কেঁদে পিছু-পিছু ধায়,
 লাখপতি ভিখ মাগে অপরূপ দৃশ্য,
 সারা ব্রজমণ্ডলে রস-আলোড়ন চলে,
 সাথে সাথে ভিড় করে বত দীন নিঃস্ব ।
 ভাণ্ডার খালি ক'রে আনে থালী ডালি ভ'রে
 দিতে রাজভিখারীরে,—গৃহিগণ ব্যস্ত,
 ভিখারী লব না কিছু বদন করিয়া নীচ,—
 মুষ্টি-ভিক্ষা তরে পাতে শুধু হস্ত ।



শাস-ছয় গেল চ'লে

গুরুর চরণতলে

জানালেন লালাবাবু পুন সংকল্প,

হেসে তারে গুরু ক'ন,

“দেবী নাই, স্থলগন

নিকটে এসেছে বাছা,—বাকী আছে অন্ন।”

লালাবাবু ফিরে যান,

ভেবে খুঁজে নাহি পান,

দীক্ষার বাধা কোন্ ঐহিক সূত্র ?

বার কোন্ ফুটা দিয়া

সবি তার বাহিরিয়া,

কোন্ গ্রানি জীবনের দুখে গো-মূত্র ?

সারা পথ আশি-জলে

তিতাইয়া লাগা চলে,

নগ্ননে নাহিক নিদ—রুচে নাক' অন্ন,

শেঠেদের বাড়ীটার

পাশ দিবে খেতে তার,

জাগিল সহসা চিতে নব-চৈতন্য।

সহসা ভাবেন আমি,

“কি ধন পেলায় আমি,

কে করিল করাবাত জদয়-মৃদলে ?

এই শেঠেদের বাড়ী।

রেশা-রেশি আড়া-আড়ি

চলিয়াছে কত দিন—ইহাদের সঙ্গে,

ব্রত দান ধন্যমতে

কতই এদের সাথে,

প্রতিযোগিতায় আমি ছিলাম বজ্রোদ্রুপ,

পুণ্য-পণ্য তরে

দর-ডাকাডাকি ক'রে,

যশ-নিপাসারে মোর করিয়াছি ভূপ।

মনের কুহরমাঝে

আজো অভিমান রাজে ?

হায়, হায়, অধমের হ'ল নাক' শিক্ষা,

এ ব্রজের দার-দার

গেছি আমি বারবার,

পারি নাই এ ছয়াবেরে মার্গিবারে ভিক্ষা।”



ফিরে বেতে বারদেশে হেরিলেন, গুরু এসে
 কহিলেন, “আজি শেষ হয়েছে পরীক্ষা,
 নেচে হরি হরি বলো, যমুনার ঘাটে চলো,
 লগ্ন এসেছে লাল, লগ্ন আজি দীক্ষা।”

শ্রীকালিদাস রায় ।

সিন্ধু-বিদায়

বিদায়, সিন্ধু ! আসি,
 প্রবাস-বন্ধ, লীলাছন্দের নীলানন্দের রাশি ।
 ফুরালো জীবনে নয়নোৎসব লহরীপুঞ্জ গোণা
 সন্ধ্যাপ্রভাতে তোমার নান্দী বন্দনা-গান শোনা ।
 তোমার কেশর ছুঁয়ে ভয়ে ভয়ে ফুরাইল ছেলে-খেলা,
 ফুরালো বালুকা-মন্দির-গড়া আনমনে সারা বেলা ।
 হেরিব না হার তোমার ফণায় নির্মাণে মণির ছাতি,
 মহানীলিমাধু ইন্দিরাভীত লভিব না অশুভূতি ।
 হেরিব না আর পুলিন-মাতার স্নেহের অঙ্ক'পরে,
 উদ্গিমালায় ফেনিল মূর্ছা শ্রান্তি-হরণ তরে ।



লভিব না আর প্রীতির শব্দ শুক্তির উপহার,
কুরালো অবাধ প্রাণের প্রসার মুক্তির অধিকার ।

ছেড়ে যেতে তাই পিছু পানে চাই আর এক বার হৈরি,
আগাতে পারি না, পদে পদে বাধা দেয় বালুকার বেড়ী ।
ফিরে ফিরে আসি আর এক বার শেষ দেখে যাবো বলে'
এই ছুতা ধরে' আসা যাওয়া করে' সারাদিন গেল চলে' ।
বালুতল হ'তে শুল্ফ ধরিয়া প্রীতির ফল টানে
বলিত হর যাত্রা আমার চাহিতে তোমার পানে ।

ক'দিনের তরে শিশু-প্রাণটিরে আবার ফিরায়ে দিলে,
ত্রিশ বছরের গুরুভার বোঝা, বন্ধ, নাগায়ে নিলে ।
দৃষ্টি ছুটিল দিগ্দিগন্তে লহরে লহরে নাচি'
তব তরঙ্গ নিয়ে গেল মোরে ত্রি-লোকের কাছাকাছি ।
লভেছি চকিতে তুমার আভাস—অশেষের সন্ধান,
ইন্দ্রনীলের কুন্তে করেছি অমৃতানন্দ পান ।
রণাবসর সন্তান মার অঙ্গে আসিহু ফিরে
আত্মা আমার ফিরে এলো তার বেন সে আদিব নীড়ে ।
সৃষ্টির সেই নব প্রভাতের,—শত জনমের আগে—
প্রাকৃত জীবন মাধুরীর স্মৃতি ভীড় ঠেলে ঠেলে আগে ।
কার-সমুদ্র নহে কতু মোর ক্ষীর-সমুদ্র তুমি,
রম্যপদপুত শুভ কয়লে ভরা তব তীরভূমি ।

লীলা ফেলি' পুন ফিরিতে হইবে শিলা ঠেলিবার কাজে,
স্বৈদপকিল সেই অজগর-বিবর নগরমাঝে ।



আত্মার ঘেন পুনর্জন্ম পুন জগশুটতলে,
 কুলীরক ঘেন দংষ্ট্রার ধরি' কবলে টানিছে বলে ।
 ফিরে যেতে হবে দৃষ্টি বধায় যখন বে দিকে ধায়,
 প্রাচীরে ব্যাহত হইয়া জানায় ব্যাঘাতের বেদনায় ।
 ফিরে যেতে হবে সৃষ্টি বধায় যানুঘেরই চারিদিকে,
 ঢেকেছে পাথরে লোহালকড়ে অষ্টার সৃষ্টিকে ।
 ফিরে যেতে হবে জীবন বধায় বাতাসের ভিক্ষুক,
 উরাস হয়ে টেনে নিতে হয় আকাশের বায়ুটুক ।

ফিরে যেতে হবে পিষ্ট হইতে শাসন-ধাতার চাপে,
 ফিরে যেতে হবে টানিবারে ঘানি নাহি জানি কোন্ শাপে ।
 ঠাই নাই মোর হে বিরাট, তব সুবিশাল পরিষদে,
 তোয়ারে ছাড়িয়া, সিদ্ধ, ফিরিয়া যেতে হবে গোশদে ।
 এমন স্বর্গ অমুপভূক্ত এ ধরায় র'বে পড়ি
 বাঁচিতে হইবে অন্ধকূপের ভেকের জীবন ধরি' ।

বাই তবে বাই মিছে শুধু এই বাতুলের মত বকা,
 বাই তবে বাই জীবন-কুড়ানো কুবন-কুলানো সখা ;
 বাই তবে বাই ছদ্মতর্পণ কুখাত্বাতাপহারী,
 কাব্যের গুরু, মুক্তিসহায়, ভক্তির ভাগ্যারী ।
 তবে বাই তুমি ! অন্নের লোভে, মিছে আর মায়াভোর,
 বাধার সিদ্ধ বন্ধে বহিয়া, পাথার বন্ধ মোর ।



লোণা জল তার আছি অনিবার্য খরনার যত করে,
 প্রেমতৃষা-ধর সৈকতে তব আত্মবিলোপ করে ।
 সংসার ডাকে, বিদার, বিদায়—তরল বৃন্দাবন,
 বিগলিত প্রেম কল্পস্বপন, আনন্দ রসায়ন ।

শ্রীকালিদাস রায় ।

সাথী

ওগো সাথী । যম সাথী । —আমি সেই পথে যাবো সাথে,
যে-পথে আসিবে তরুণ প্রভাত অরুণ-ভিলক মাথে ।

যে-পথে কাননে আসে ফুলদল,
যে-পথে কমলে পশে পরিমল,
যে-পথে যলর আনে সৌরভ শিখির-সিক্ত প্রাতে ।
(আমি সেই পথে যাবো সাথে ।)

যে-পথে বহু যমুনার কূলে
যায় ফুল হাতে প্রেমের দেউলে ;
যে-পথে বহু বহুর দেশে চলে বহুর সাথে ।
(আমি সেই পথে যাবো সাথে ।)

যে-পথে পাখীরা যায় গো কুলায়,
যে-পথে তপন যায় সন্ধ্যায়,
সে-পথে যুদ্ধের হবে অভিসার শেষ তিমির-রাতে ।

শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন ।



মেঘের দল

মেঘেরা দল বেঁধে যায় কোন্ দেশে,

—ও আকাশ বল্ আমারে ।

কেউ বা রঙীন গুড়না গায়ে, কেউ সাদা, কেউ নীল বেশে ।

তারা কোন্ যমুনার নীরে ভরবে গাঙ্গরী,

কার বাশরী শুন্ল এরা সাগর-নাগরী, মরি মরি !

তারা বাজিয়ে নুপুর কুমুর কুমুর, যায় চ'লে কার উদ্দেশে ?

—ও আকাশ বল্ আমারে ।

কতু বাজিয়ে ডমরু তারা উল্লাসে নাচে,

কতু ভানুর সনে খেলে হোলি, প্রভাতে সাঁখে, মরি মরি !

তারা বিধুর সনে কি কথা কয় উজ্জল মধুর হেসে !

—ও আকাশ বল্ আমারে ।

আকাশ বল্বে আমার বল্, আমার আখি-জল

তাদের মত জীবনখানি করবে কি শ্রামল—আশায়-বল্ রে !

(আখি তাদের মত) আমার বিধুর সনে মধুর খেলা,

খেল্বে কি দিনের শেষে ?

—ও আকাশ বল্ আমারে ।

শ্রী অতুলপ্রসাদ সেন ।

হৃদ-যমুনা

যদি তোর হৃদ-যমুনা হ'ল রে উছল, রে ভোলা ।

তবে তুই এ-কূল ও-কূল ভাসিয়ে দিয়ে চল, রে ভোলা ।

আজি তুই ভরা প্রাণে, ছুটে যা নৃত্যে গানে ;

যে আসে প্রেম-প্রাবনে ভাসিয়ে দিয়ে চল, রে ভোলা ।

যে আসে যনের দুখে, যে আসে ফুল মুখে,
টেনে নে সবায় বুকে, তোর থাকনা চোখে জল, রে ভোলা ।

হৃদ্যারে ফুল কুড়িয়ে, চ'লে যা মন জুড়িয়ে ;
যালা তোর হ'লে বিফল, কব্বি কি তুই বল, রে ভোলা ।

মিছে তোর হৃথের ডালি, মিছে তোর হৃথের কালি ;
হৃদিনের কায়া-হাসি, চল, চল, চল, রে ভোলা ।

জীবনের হাটে আসি', বাজা তুই, বাজা বাণী,
ধাকনা সেধা বেচা-কেনার দারুণ কোলাহল, রে ভোলা ।

অরূপের রূপের খেলা, চূপ ক'রে তুই দেখু হ'বেলা ;
কাছে তোর এলে কুরুপ,—তুই মুখ ফিরিয়ে চল, রে ভোলা ।

শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন ।



শ্রীমানকুমারী বসু

১২৭

বর্ষা-সুন্দরী

১

রাত দিন ঝম্-ঝম্
 রাত দিন টুপ্-টুপ্,
 কি সাজে সেজেছ, রাশি ।
 এ কি আজ অপরাধ !

২

আননে বিজলী-হাসি,
 গলায় কণ্ঠ-হার,
 আঁচলে কেতকী-ছটা—
 এ আবার কি বাহার !

৩

শিখী নাচে, ভেকে গায়,
 মেঘে গুঁক প্রবজন,
 বসুধা আনন্দভরে
 কত করে আয়োজন !

■

ভূবেছে রবির ছবি,
 ভূবেছে চাঁদিয়া-ভাঙ্গা,
 আকাশ গলিয়া পড়ে
 তরল রক্ত-ধারা ।



৫

উধলিছে সন্ধ্যা, পদ্মা,
 পরাণে ধরে না সুখ,
 মরমে রয়েছে ছেয়ে
 তোয়ারি মেহের মুখ ।

৬

রাত দিন কন্-কন্
 রাত দিন টুপ্-টুপ্,
 দেখেছি অনেক তর
 দেখিনি তো এত রূপ ।

৭

জলদ-বিজলী তা'রা
 এ উহার কর ধরে'
 চলেছে পিছল পথে,
 পা ধেন পড়ে না সরে' ।

৮

ভিক্ষে গেল—ভেসে গেল—
 ডুবে গেল ধরাখান,
 গ'লে গেল, মেতে গেল
 যানবের ক্ষুদ্র প্রাণ ।



৯

প্রকৃতি ঢেকেছে মুখ
 হামল সুন্দর বাসে,
 চাহিলে তাহার পানে
 কত-কি-বে মনে আসে ।

১০

জোছনার কুল ধারা
 কুটিবে বসন্ত-বা'য়,
 আমি নিতি জেগে থাকি
 বরিষার নীলিমায় ।

১১

প্রাণ গলে—মন গলে—
 দিগন্ত অনন্ত গলে,
 ব্রহ্মাও ডুবায়ে যেন
 প্রেমের তুফান চলে ।

১২

কে যেন লুকিয়ে আছে,
 সে যেন সুস্থে নাই ;
 কারে যেন ডাকি নিতি
 শত প্রাণ দিবে তাই !



২০০

বর্ষা-সুন্দরী

১৩

সসীমে অসীমে আভ

হ'য়ে গেল মিশামিশি,

বুঝিনে আপন-পর

চিনিনে সে দিবাশি।

১৪

শরৎ বসন্ত শীত

জানে শুধু হাসাহাসি,

বরিষা ! তোয়ারি বুকে

অনন্ত প্রেমের রাশি !

১৫

সাধে কি বেসেছি ভাল,

সাধে কি আপনা-ভুলে

দিয়েছি ক্ষমস্থানি

তোয়ারি চরণ মূলে ।

১৬

জোছনার ফুল ধারা

ছুটেবে বসন্ত-বা'র,

ঢালিব আমারি প্রাণ

বরিষার নীলিমায় ।



শ্রীমানকুমারী বসু

২০১

১৭

সবি তো ডুবিছে, রাপি !
 আমিও ডুবিয়া যাব,
 চির-সাধনার ফল
 তোমাতে ডুবিলে পাব ॥

শ্রীমানকুমারী বসু ।

—

দারিদ্র্য

হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে করেছ মহান্ !

তুমি মোরে দানিয়াছ ঈশ্বরের সম্মান

কণ্টক-মুকুট শোভা ।—দিয়াছ, তাপস,

অসঙ্কোচ প্রকাশের ছরস্র সাহস ;

উদ্ধত উলঙ্গ দৃষ্টি ; বাণী ক্ষুরধার ;

বাণী মোর শাপে তব হ'ল তরবার ।

হঃসহ দাহনে তব হে দণ্ড তাপস,

অম্মান স্বর্গেরে মোর করিলে বিরস,

অকালে শুকালে মোর রূপ রস প্রাণ !

শর্ণ করপুট ভরি' সুন্দরের দান

যত বার নিতে যাই—হে বুলুফু তুমি

অগ্রে আসি কর পান ! শূন্ত মরুভূমি

হেঁরি মম করলোক । আমার নগ্নন

আমারি সুন্দরে করে অগ্নি বরিষণ ।

বেদনাইন্দু-বৃন্ত কামনা আমার—

শেফালির যত শুভ্র সুরভি-বিধার

বিকশি' উঠিতে চাহে, তুমি হে নির্মম

দল বৃন্ত ভাঙ শাখা কাঠুরিয়া সম !

আধিনের প্রভাতের যত ছলছল

ক'রে ওঠে সারা হিয়া, শিশির-সজল



টলটল ধরণীর যত করুণায় ।
 তুমি রবি তব তাপে শুকাইয়া যায়
 করুণা-নৌহার-বিন্দু ! স্নান হয়ে উঠি
 ধরণীর ছায়াধূলে । স্বপ্ন যায় টুটি
 সুন্দরের, কল্যাণের ! তরল সরল
 কণ্ঠে ঢালি তুমি বল, 'অমৃত কি ফল ?'
 জালা নাই, নেশা নাই, নাই উন্মাদনা,—
 রে দুর্কল, অমরার অমৃত-সাধনা
 এ দুঃখের পৃথিবীতে তোর ব্রত নহে ।
 তুই নাগ, জন্ম তোর বেদনার দহে ।
 কাটা-কুঞ্জে বসি তুই গাধিবি মালিকা,
 দিয়া গেছ ভালে তোর বেদনার টাঁকা ।'
 গাহি গান, গাধি মালা, কণ্ঠ করে জালা,
 দংশিল সর্বদেহে মোর নাগ নাগ-বালা !

ভিক্ষা-ঝুলি নিয়া ফেরো ঘারে ঘারে ঋষি
 কমাহীন হে দুর্কাসা ! বাপিতেছ নিশি
 সুখে বর-বধু বধা—সেখানে কখন
 হে কণ্ঠার-কণ্ঠ, গিয়া ডাক,—'মুচ, শোন,
 ধরণী বিলাস-কুঞ্জ নহে নহে' কারো,
 অভাব বিরহ আছে, আছে দুঃখ, আরো
 আছে কাটা শয্যাতলে, বাহ্যেতে প্রিয়র,
 তাই এবে কর ভোগ !'—পড়ে হাহাকার
 নিমেষে সে সুখ-স্বর্গে, নিবে যায় বাতি,
 কাটিতে চাহে না যেন আর কাল-রাতি !



চল পথে অনশন-ক্লিষ্ট ক্ষীণ তনু,
 কি দেখি থাকিয়া ওঠে সহসা ক্র-ধনু,
 হু'নয়ন ভরি' কদ্র হান অগ্নি-বাণ,
 আসে রাজ্যে মহামারী হুঁক-তুফান,
 প্রমোদ-কানন পুড়ে, পুড়ে অট্টালিকা,—
 তোমার আইনে শুধু মৃত্যু-দণ্ড লিখা।

বিনয়ের ব্যাচ্যার নাহি তব পাশ,
 তুমি চাহ নয়তার উলঙ্গ প্রকাশ।
 সঙ্কোচ সরম বলি জান নাক' কিছু,
 উন্নত করিছ শির দার মাথা নীচু,
 মৃত্যু-পপয়াত্রিদল তোমার ইন্দ্ৰিতে
 সলায় পরিছে ফাঁসি হাসিতে হাসিতে !
 নিত্য অভাবের কুণ্ড জ্বালাইয়া বুক
 সাধিতেছ মৃত্যু-যজ্ঞ পৈশাচিক সুখে।

লক্ষীর কিরীট ধরি' ফেলিতেছ টানি
 পুলিতলে। বীণা-তারে করাবাত হানি
 সারদার, কি সুর বাজাতে চাহ, গুণী ?
 যত সুর স্মার্তনাদ হয়ে ওঠে শুনি।

প্রভাতে উঠিয়া কালি শুনিয়া, সানাই
 বাজিছে করুণ সুরে ! বেন আসে নাই
 আজো কা'রা ঘরে ফিরে। কাদিয়া কাদিয়া
 ডাকিছে তাদেরে বেন ঘরে 'সানাইয়া' !
 বধূদের প্রাণ আজ সানাই'রের সুরে
 ভেসে যায় যথা আজ প্রিয়তম পুরে



আসি আসি করিতেছে ! সখি বলে, বল
মুছিলি কেন লা আখি মুছিলি কাজল ?.....

ওনিতেছি আজো আমি প্রাতে উঠিয়াই

‘আয় আয়’ কাদিতেছে তেমনি সানাই

জ্ঞানমুখী লেফালিকা পড়িতেছে ঝরি

বিধবার হাসি সম—‘দ্বিগু গন্ধে ভরি’ !

নেচে ফেরে প্রজ্ঞাপতি চকল পাখার

হরস্ত নেশার আজি, পুষ্প-প্রসন্নাধ

চুষনে বিবশ করি’ ! ভোমরার পাখা

পরাগে হলুদ আজি, অঙ্গে মধু মাখা ।

উছলি’ উঠিছে ঘেন দিকে দিকে প্রাণ !

আপনার অগোচরে গেরে উঠি গান

আগমনী আনন্দের । অকারণে আখি

পূ’রে আসে অশ্রু-জলে । মিলনের রাখী

কে ঘেন বাঁধিয়া দেয় ধরতীর সাথে,

পুষ্পাজলি ভরি’ দুটি মাটি-মাখা হাতে

ধরতী এগিরে আসে দেয় উপহার ।

ও ঘেন কনিষ্ঠা মেয়ে জ্বলানী আয়ার !—

সহসা চমকি উঠি । হরে মোরি শিশু

জাগিয়া কাদিছ ঘরে, খাও নিক’ কিছু

কালি হ’তে সারাদিন তাপস নিষ্ঠুর,

কাদ মোর ঘরে নিত্য তুমি স্খাতুর !

পারি নাই বাছা মোর, হে প্রিয় আমার,

ছই বিন্দু হৃদয় লিতে ।—মোর অধিকার



আনন্দের নাহি নাহি । দারিদ্র্য অসহ
 পুত্র হ'রে জায়া হ'রে কঁাদে অহরহ
 আমার দুয়ার ধরি । কে বাজাবে বানী ?
 কোথা পাব আনন্দিত শূন্যের হাসি ?
 কোথা পাব পুষ্পাসব ?—ধুতুরা-গেলাস
 ভরিয়া করেছি পান নয়ন-নির্যাস !

আজো তুনি আগমনী গাহিছে সানাই,
 ও যেন কাঁদিছে শুধু—'নাই, কিছু নাই !'

নজরুল ইসলাম ।



সাধনা

বকে তব বক দিয়ে শুয়ে আছি আমি,
 হে ধরিত্রি, জীব-ধাত্রি ! নিত্য দিনখামি
 মাতৃদয়ের মোর ব্যাকুল স্পন্দন
 প্রবাসী সম্মান লাগি, নিয়ত ক্রন্দন
 তারি লুপ্ত স্পর্শ তরে, করি দাও লয়
 বিপুল বকের তব মহা শস্যময়
 অনন্ত স্পন্দন-মাঝে, শিখাও আশায়
 সে পুণ্য-রহস্ত-মগ্ন যার মহিমায়
 প্রত্যেক নিমেষে সহি বিয়োগ-বেদন
 লক্ষ কোটি সম্মানের, প্রশান্তবদন ।
 তবু ফুটাতেছ কুল, জালিছ আলোক
 উজলিয়া রাত্রি দিন ছালোক ভুলোক ।

শ্রীপ্রিয়দর্শনা দেবী ।

গঙ্গাস্তোত্র

চির-ক্রন্দনযরি গড়ে ।

কুলু কুলু কল কল প্রবাহিত আধি-জল
দেব-মানবের একসঙ্গে !

বিশ্বের ক্রন্দন বিচলিত নারায়ণ,
আধি তার অশ্রুতে ভরিল,—

গোলোকে হ'ল না ঠাই, শিবছটা বাহি তাই
শতধারা ধরনীতে ঝরিল ।

হিমগিরি-নির্ঝরে তোমার জীবন গড়ে,—
মিথ্যা, মা ! মিথ্যা এ কাহিনী ;

যুগে যুগে নরনারী- অকুরান-আধিবারি
পুষ্ট করিছে তব বাহিনী ।

তব তীর-ধীর-বায়ু হরিল কত না আয়ু,
কত আলো স্রোতোজলে মিলালো ।

ভরি' তব ভাঙ্গা পাড় কত কোটা হাহাকার
ভাঙ্গা বুক রাঙ্গা আধি ঘুয়ালো !

ভরা কোল করি' খালি জননীরা আনে ডালি
যুগে যুগে না গো ! তোরি অঙ্গে,—

কত না বালুর চর সে ব্যথার উর্ধ্বর
বলি-অঙ্কিত তট-পঙ্কে ।



অশ্রুপূত ও-জল, পূত তব তটন্তল

গুপ্ত করিয়া কত কীর্তি ;

কত না চিত্তার ছাই মিশাইয়ে আছে, তাই
পবিত্র তব তট-মুষ্টি ।

তাই আনি' তব মাটি গড়ি' নিজ দেবতাটি—
তোমারি সলিলে হবে পূজি, মা ।

যুগে যুগে বত ব্যথা মানব পেয়েছে হেথা
তারি পূজা করি যে তা বুঝি না ।

তাই গাহি তব তীরে, তাই নাহি তব নীরে,
তাই চাহি ঘুমাতে ও কোলে, মা ।

কল কল কুল কুল এ ধারার কোথা মূল,
কোথা কুল দিস্ যদি ব'লে, মা ।

বন্দি ত্রিকালজয়ী গঙ্গাে মূর্তিময়ি—
অনন্ত-জীব-ব্যথা-প্রবাহ ।

অনাদি ও-ক্রন্দনে মিশাইয়ু ক্রন্দন এ,
বুঝে নে, মা ! এ প্রাণের কি দাহ ।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ।



প্রিয়া

তোমারে পাই জ্যোৎস্না রাতের

অলস ঘুম যাখে,

আমার বাণী তোমার হাতে

গভীর সুরে বাজে ।

নিখিল ব্যাপি' চাহিয়া থাকে

কাজল তব আঁখি,

নিজেরে খুঁজি' হারাই নিশা

মনেরে হানি কঁাকি ;

উষসী তব সিঁদূর 'পরে

বলাকা-সারি মালিকা গড়ে.

তোমারে যাই ধরিতে চাই—

অমনি পাই না যে ।

তোমারে পাই শরৎ-প্রাতে

শিশির-ছেঁচা ফুলে,

নৃত্য তব উছলি উঠে

নদীর কূলে কূলে ।

কখনো দেখি বাহিয়া বাও

যেথের তরীখানি,

পাতায় ফুলে দেখেছি কত

লিখিতে তব বাণী,



মাগর-তালে বাজাও বীণা
মনেতে জানি এ-স্বর চিনা,
কখনো তাহা শুজরেছি—
কখনো গেছি ভুলে ।

ফাগুন দিনে মাধবী রাতে
ষে-ছবি তব জাগে ;
চমকি দেখে—শিহরি উঠি
পুলক বুকে লাগে ;
অশোক-শাখে মুছেছে তব
চরণ রাঙা লেখা,
আমের নব যজ্ঞরীতে
কখনো দেখে দেখা ।
শিমূল-শাখে আবির খেলি'
অঙ্গে ধরি' পলাশ-চেলী
বধূর বেশে কভুবা এলে
জীবন-পুরোভাগে ।

নয়নে তব যে-ভাষা কোটে—
বুঝিতে পারি তায়,
সপিয়া দাঁও রিক্ত করি'
সকল আপনার ।



কাঁপিছে ! প্রিয়া, যে-গানখানি

তরুণ তব মনে,

আমার বুকে তাহার রঙ

লেগেছে অকারণে ।

তোমাতে পাই সুদূর হ'তে

আগুন-ভরা যে-স্বর পথে,

সেখায় মোরা রচেছি গেহ

গোপন নিরাশায় ।

ঝড়ের সাথে এলারে কেশ

এসেছ, বিরহিনী !

তোমাতে দেখে ছেগেছে মনে

চিনি গো যেন চিনি ;

বরষা-রাত্রে চোখের জলে

হেসেছ পলাতকা,

চখীতে দেখে যেমন করি

হেসেছে ভীক চখা ।

পেয়েছি তোমা জীবন ভরে,

নানান রূপে পলক তরে,

কখনো হারি খেলার ছলে

কখনো যেন জিনি ।

বন্দে আলী মিয়া ।

পথিক

সংসার পথে পথিক চলেছি একা

দিগন্ত পানে প্রসারিত পথ রেখা ।

পঙ্কাতে চাহি' দেখি দূর হ'তে দূরে

গেছে কত দেশ মদী পর্বত ঘুরে,

অতীতের স্মৃতি উদাস বিষাদ সুরে

ভরিয়া রেখেছে বন্ধুর পথখানি,—

সন্মুখে কোথা শেষ তার নাহি জানি ।

অদেশে বিদেশে কুবন ভরিয়া ঘোর

সে পথের মায়া হৃদয়ে আগার ঘোর ।

পরিচিত বেণা বাসগৃহে দীপ জলে ।

কানন ভরিছে বসন্তে ফুল-ফলে,

শেফালি ফুটিছে নিশির আঁচল-তলে,

মুগ্ধ নয়ন মেলিয়া তাহারে হেরি,—

অস্তরে তবু ডাকে দূরে কার ভেরী ।

কাহারো নয়নে দেখেছি নবীন মায়া

প্রাণের স্বপন লভিল স্তামল কারা ।



অধরের কোণে খলিয়াছে হাসিখানি,—
কি কহিতে গিয়া সহসা ফুরায় বাণী,
অশ্রুতে হাসি নিভে যায়, কল্যাণি !

দীপ্তনয়নে গভীর ব্যাধার রেখা ।
—উন্মনা হিরা তবু পথে চলি একা ।

অজানা ভুবনে অজানা লোকের মাঝে
সে পথ বহিয়া এসেছি প্রভাত সাঁঝে ।
বিদেশী ফুলের অচেনা করুণ-বাস
সহসা জাগার কায়াহীন অভিলাষ,
হৃদয় ভরিয়া স্বপ্ননিত অবকাশ ।
চল জলে তরী ভাসারে আকাশে চাহি,
—মনে পড়ে' যার আর বেশী বেলা নাহি ।

উদয়-তপন লুকার অন্ত্রাচলে
আকাশ তখন তরল সোণার খলে ।
পূরবে তুষার-শিখরে দিবস-শেষে
দীড়াল রজনী লাজ্জাকর বধুবেশে,
শেষ আলোখানি রবি তারে ভালবেসে
বিদায়ের খনে পরালো মুকুট সম,
—জাগে মনে পথ শেষ হয় নাই যম ।



সে পথের কত শেষ ঘেন নাহি হয় ।
 —না মিলিলে ঘর তবু যেনে নাহি ভয় ।
 বন্ধুর কত গিরি হ'য়ে এমু পার,
 কত নদী হৃদ দেশ বন কান্তার,
 হাসি-কান্নার আলোক অন্ধকার,—
 তবু আজো পথ সমুখে রয়েছে পড়ি'
 তাই চলা শুধু দিবস-রজনী ভরি' ॥

হুমায়ুন কবির ।